অগ্রবাহিনী

শৈবাল মিত্র

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
মে, ১৯৬৫

প্রকাশক:
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনিতাই চন্দ্র জানা
জয়তারা প্রেস
৩৫/সি, গোরাচাঁদ বোস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীপ্রদ্যোৎবরণ রায়

বন্ধুবরেষু

অগ্রবাহিনী

এক

জেলখানার লোহার গেটটা পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। গেটের ঠিক সামনে থেকে লাল মাটির পথ কিছুটা এ গিয়ে পিচের রাস্তায় মিশেছে। পিচের রাস্তার ডান দিকে ধূধূ ফাঁকা উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো জমি। অনেক দূরে আবছা কুয়াশার মত পাহাড়। কিশোরের পা কাঁপছিল, মাথা ঘুরছিল, মনে হচ্ছিল, এই মাত্র সে দাঁড়াতে শিখেছে। অজিত বিড়ি টানছিল। সাত মাস তেরো দিন পরে একটু আগে দুমকা জেল থেকে খালাস পেয়েছে তারা। জেলের সামনে ছায়ায় ঢাকা একটা বড় পিপুল গাছের তলায় শান বাঁধানো গোল চাতাল। শীতকাল। আকাশে খর রোদ থাকলেও রোদে ধার নেই। ঠান্ডা হাওয়া বইছিল ঝিরঝির করে। বেশী শীতশীত লাগছিল কিশোরের।

কোর্টে যাওয়া আসার সময়ে এই পিপুল গাছের তলায় পুলিশভ্যান এসে দাঁড়ায়। বেশ কয়েকবার কোর্টে যাবার পথে কিশোর আর অজিত এখানেই পুলিশ ভ্যানে ওঠানামা করেছে। জেলগেট খুলে জমাদার বেনীনন্দন বেড়িয়ে আসতে কিশোর দেখল, তার ঝাঁকড়া গোঁফে দুধের ফেনা লেগে আছে। জেলখানার যে সব গরু মোষ কয়েদীরা দেখা শোনা করে, তাদের দুধের বেশীটা খায় জেলের জমাদার, সিপাইরা, অল্প যায় জেল হাসপাতালে রুগীদের জন্যে।

জমাদার বেনীনন্দনকে দেখে শান বাঁধানো রকে বসে অজিতের দু' চোখের মণি স্থির হয়ে গেল। খালাস হওয়ার পর থেকেই অজিত রি-এ্যারেস্টের ভয় পাচ্ছিল। কিশোরকে অজিত বলল, এখানে বসবো না।

লাল মাটির পথ ধরে ওরা দুজন পিচের রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল। কারো মুখে কথা নেই। সাত মাস তেরো দিন বেমালুম গায়েব হয়ে গেল। সামনে কত কাজ, অথচ শুরু করার মুখেই কি অদ্ভুতভাবে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তাদের।

পিচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিশোর দেখল সামনে লাল মাটির ঘূর্ণি, হাওয়ায় ভাঙচুর হচ্ছে। বুক ভরে লম্বা শ্বাস নিল কিশোর। এই স্বাধীনতা মুক্তি হাঁটা ভারি ভাল লাগছিল তার। অনেকদিন একটানা হাঁটেনি বলেই কিশোরের মনে হচ্ছিল তার পায়ের তলার মাটি কাঁপছে, সে যেন হাওয়া মাড়িয়ে চলেছে। পাকা রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে পেছনে ফিরে জেলের বিবর্ণ উঁচু পাঁচিল, ঝাঁকড়া পিপুল গাছটা কিশোর দেখতে পেল। নিজের মনে কিশোর বলল, সাত মাস তেরো দিন, তিনটে ঋতু পার হয়ে গেছে।

রাস্তার দু'পাশে ছোটছোট দোকান, পুরোনো ঘর বাড়ি, সব কিছু ভারি মলিন, ধুলোর সর পড়ে আছে। পা ফেলার সঙ্গে বেশ কয়েকবার কিশোরের চোখের সামনে দুলে উঠল পৃথিবী। এক পোষাকে জেলে ঢুকলেও দু'জনের কাঁধে এখন লুঙ্গি,

গেঞ্জি, গামছা জড়ানো দুটো পুঁটলি। সাত মাস জেলখানায় থেকে এটুকু পুঁজি তাদের জমেছে। দুটো পুরোনো বেঞ্চিপাতা একটা চায়ের দোকানে ওরা ঢুকল। শুকনো মুখে দোকানি দু'কাপ চা বানিয়ে দিল দু'জনকে। রাস্তায় লোকজন কম, চারপাশ চুপচাপ। নিঃশব্দে চা খাচ্ছিল কিশোর, অজিত। চাকার আর্ত শব্দ তুলে ধুলো উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। গাড়ির চালক এবং গরু দুটোর জরাজীর্ণ, দুঃস্থ দশা।

সিউড়ি থেকে রাতের ট্রেন ধরে আজ কলকাতায় যাবে কিশোর। সেখানে কথা বলবে পার্টির সঙ্গে। সিউড়ি পর্যন্ত কিশোরের সঙ্গে গিয়ে অজিত যাবে নিজের এলাকায়, বাহেঙ্গা গ্রামে।

অচেনা গাঁয়ের গরিব মানুষদের মধ্যে কাজ শুরু করে যখন পা রাখার মাটি মিলছিল, তখনই ধরা পড়ে যাবার জন্যে খুবই আফশোস হয়েছিল কিশোরের। কিন্তু কিছু করার ছিল না। অপচয় হয়ে গেল অনেকগুলো দিন।

সাত মাস তেরো দিন আগে ধরা পড়ার আগের রাতটার কথা কিশোরের মনে পড়ল। মশানজোড় যাবার জন্যে সন্ধ্যের পর তাঁতলুই থেকে কিশোর আর অজিত বেরিয়েছিল। তাঁতলুই থেকে মশানজোড় এমন কিছু দূর নয়। আট মাইল দূরে তরণী পাহাড়। পাকদণ্ডী পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে মশানজোড়। উঁচু নিচু রাস্তা ধরে প্রায় ঘণ্টাখানেক হেঁটে কিশোরের সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল। দিনের বেলায় ওরা তখন হাঁটতো না গাঁ ছেড়ে বেরোতো না। চারপাশে অনেক শত্রু, দেখে ফেলতে পারে, তাই এত সতর্কতা। একটু শিথিল হলেই মারা পরতে হবে। তা ছাড়া পার্টির নির্দেশ, ছড়িয়ে কাজ নয়, একটা নির্দিষ্ট এলাকা, নির্দিষ্ট ইউনিট, স্কোয়াড বেছে নিয়ে গরিব মানুষের মধ্যে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। গরিব কৃষকদের গ্রামের বাইরে সংগঠকদের যাওয়া চলবে না। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার প্রায় মাস তিনেক আগে প্রথমে অজিত তারপর কিশোর এই এলাকায় এসেছিল। এলাকা ছেড়ে আর বেরোয় নি। পাশাপাশি গাঁ গুলোতে রোজ মাঝরাতে সভা, বৈঠক, আলোচনা করেছে। দিনের বেলা দু'চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। গরিব মানুষদের বিশ্বাস অর্জন খুব শক্ত কাজ হলেও বরফ গলতে শুরু করেছিল। ধরা পড়ার আগের সন্ধ্যেটা টুকরো স্মৃতির মতো মনে পড়ছে কিশোরের। পাহাড়ি রাস্তা যেখানে পশ্চিমে বেঁকেছে, সেখানেই একটা শাল গাছের নীচে কানুপার সঙ্গে সেই সন্ধ্যেতে দেখা হয়েছিল দু'জনের। কিছু আগে সূর্য ডুবেছে। আবছা অন্ধকারে শালগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কানুপা বসেছিল। অদূরে মাঝিপাড়া থেকে ভেসে আসছিল মাদলের দ্রিমদ্রিম শব্দ। গরমকাল। দুপুরের রোদে পোড়া পাথুরে লালমাটি তপ্ত হাওয়া ছাড়ছে। গরুর পাল নিয়ে হুটহাট শব্দ তুলে ঘরে ফিরছিল বাগালেরা।

তাঁতলুই থেকে পাঁচমাইল দূরে বাহেঙ্গা গ্রামে আস্তানা গেড়েছিল অজিত। মাঝ বিকেলে তাঁতলুইতে কিশোরের কাছে সে যখন এলো, তার মুখে হাঁড়িয়ার গন্ধ। কোমরে চেক লুঙ্গি, মাথায় গামছা জড়ানো, লম্বা চওড়া শক্ত চেহারা, নাকের নিচে

পাকানো গোঁফ, গায়ের কালো রঙ দেখে মাস তিনেক আগেও প্যাণ্ট শার্ট পরে কলকাতায় এই অজিত যে অফিসে যেত, বোঝা মুশকিল। চারপাশের মানুষের সঙ্গে ও খুব তাড়াতাড়ি মিশে যেতে পারে। যে কোনো বিপদে ঝুঁকিতে অবলীলায় ঝাঁপ দেয়। এই চেক লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি, কয়েকটা বই এবং একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নিয়ে কলকাতা ছেড়েছিল অজিত।

সেই সন্ধ্যেতে কানুপা, কিশোর, অজিত শব্দহীন তিন মানুষ তরুণী পাহাড়ের পাকদন্ডী পথ ধরে হাঁটছিল। দু পাশে শাল সেগুন মহুয়ার ঘন বন। এ বনে অচেনা মানুষ পথ হারায়। মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ আলো ছড়াচ্ছিল। ফুরফুরে হাওয়া শুরু হতেই মহুয়া ফুলের গন্ধ পেল অজিত। অজিত বলল, কানুপাকে এখানে আগে থেকে আসতে না বললে আমরা ঠিক পথ হারাতাম।

কানুপাকে কিশোরও চেনে। ভালুকী নাচানো কানুপার পেশা। মাস খানেক আগে ভালুকটা মরে যাবার পর থেকে কানুপা খুব মুষড়ে পড়েছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে কানুপা হাসতে তার মুখ থেকেও হাঁড়িয়ার গন্ধ পেল কিশোর। অন্ধকার পাথুরে রাস্তার মাঝে মাঝে ঢিবি, গর্ত, তিন জোড়া পায়ের চাপে শুকনো পাতায় মড়মড় শব্দ হচ্ছিল। মহুয়া ফুলের রস খাবার জন্য এ সময়ে পাহাড়ে ভালুক বেরোয়। সাঁওতালরা এই পাহাড়কে তাই বলে বানাকুলি, ভালুকের পাহাড়।

কপালে মিনমিনে ঘাম, হাঁফ ধরছিল কিশোরের। অজিত বলল, পথটা আমার চেনা তবু কানুপাকে যে আসতে বলেছিলাম, তার কারণ, ও থাকলে ভালুক ঘেঁসবে না।

অজিতের কথা শুনে হেসেছিল কানুপা। অন্ধকারে শীর্ণ কালো মানুষটার সাদা দাঁত চিকচিক করে উঠল। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটার ক্লান্তির চেয়েও দারুণ খিদেতে কিশোরের নাড়িভুঁড়ি মুচড়ে উঠছিল। সেই সকালে কয়েক মুঠো মুড়ি খাবার পর থেকে আর দানাপানি জোটে নি। খিদেতে মাথা ঝিমঝিম, গা গুলোচ্ছিল তার। অজিতের হাতের রেশন ব্যাগটার দিকে লোলুপ চোখে তাকালেও কিশোর জানত, সেখানে খাবার কিছু নেই, আছে একটা ধারালো ছোরা আর খানকতক বই।

কিশোর একদিন প্রশ্ন করেছিল ছোরা নিয়ে ঘুরিস কেন?

অজিত বলেছিল, কত হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে, যে কোনো সময়ে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

পাথুরে একটা ঢিবি পেরিয়ে হঠাৎ থলি থেকে ঝকঝকে ফলওয়ালা ছোরাটা বার করল অজিত।

কি হলো, জানতে চেয়েছিল কিশোর।

সামনে কী যেন একটা দেখলাম চাপা গলায় অজিত বলল।

অন্ধকারে শুকনো পাতায় মসমস শব্দ শুনে নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকল কানুপা। চাঁদের আলোয় কিশোর দেখল, উত্তেজনায় কানুপার দুচোখে ঝিলিক দিচ্ছে। চারপাশে ঝিম ধরা অন্ধকারে গাছে গাছে জড়াজড়ি, ধুলোর আবছা পর্দা চাঁদের আলোয় কাঁপছে। অনেক নিচে তাঁতলুই টোংরা আর বৃন্দাবনী গ্রাম অন্ধকারে লেপে মুছে একাকার।

কানুপার অসুস্থ ছেলেকে চিকিৎসার সুবাদে মাসখানেক আগে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অজিতের। কী একটা মেলায় বেহিসেবি খেয়ে দশ বছরের ছেলেটার কলেরা হয়েছিল। অজিতের ওষুধে বেঁচে গিয়েছিল ছেলেটা। কিশোর হোমিওপ্যাথির কিছু বোঝে না। কলকাতায় থাকতেই হোমিওপ্যাথির চর্চা করত অজিত। নানা ঝামেলার মধ্যেও হোমিওপ্যাথির বই কিনত, পড়ত, গায়ে পড়ে সে ওষুধও দিত অনেককে। কেউ খেত, কেউ খেত না।

থলি থেকে একমুঠো ছোলাভাজা বার করে কানুপাকে দিয়ে, ছোলা ভাজার একটা ঠোঙা অজিত সবটাই এগিয়ে দিয়েছিল কিশোরকে। একমুঠো ছোলা ভাজা নিয়ে কিশোর ঠোঙাটা ফিরিয়ে দিল অজিতকে। খাড়াই শেষ করে যে রাস্তা ধরে ওরা নামছিল, সেখানে গাছপালা কম, উত্তর পশ্চিমে হেলে পড়া চাঁদের আলোয় পাথরের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বৈশাখের নির্মেঘ আকাশের তারায় ছড়িয়ে ছিল আলোর সংকেত। ছোলাভাজা চিবোতে চিবোতে কিশোরের মনে হচ্ছিল অনেকদিন এমন সুখাদ্য সে খায়নি। খিদের চোটে অর্ধেক ছোলা ভাজা একাই খেয়ে ফেলেছিল সে।

একটু বিশ্রাম করার জন্যে একটা বড় তেঁতুলগাছের তলায় বসেছিল ওরা। অন্ধকার আকাশের নিচে পৃথিবী অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। কানুপা নিজের সংসারের গল্প বলছিল। সাঁওতালরা এমনিতে কম কথা বলে। তবে ভাব, ভালবাসা হলে কথার লাগাম থাকে না। অজিতকে পেলে ছেলে, বুড়ো, সকলেই অনর্গল কথা বলে। পোষা ভালুকের কথা বলতে গিয়ে কানুপার চোখে জল এসে গিয়েছিল। কানুপার ছেলের সমবয়সী ভালুকটার নাম ছিল নানকু। নানকুই ছিল কানুপার সারা দিনের সঙ্গী। সাঁওতাল পরগণার এ অঞ্চলে যাদের জমিজমা নেই, দু তিন মাসের বেশী খেত-খামারে কাজ পায় না তারা। বছরে আট-ন মাস তাই নানকুকে নিয়ে মেলায়, বাজারে, বাবুপাড়ায় ঘুরে খেলা দেখিয়ে দু' চার পয়সা রোজগার করতো কানুপা। জন্তুটা যেমন অনেক খেলা শিখেছিল, তেমনই ছিল তার সাহস আর বুদ্ধি। এই সাহস, বুদ্ধির জন্যই বেঘোরে মারা পড়ল নানকু।

বাঁশকুলি গাঁয়ের মুরুব্বি হরনাথ মন্ডলের নাতির মুখেভাতের খবর পেয়ে নানকুকে নিয়ে সেখানে খেলা দেখাতে গিয়েছিল কানুপা। শেষ বিকেলে নানকুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল একপাল কুঁচোকাঁচা। কিছুতেই তারা ছাড়তে চাইছিল না কানুপাকে। হরনাথ মন্ডলের ভাই নরনাথ মণ্ডল বাড়ির মেজ কর্তা। তার খুব পশুপাখির শখ, মাথায় বাবরি চুল, আলকাপ করে। মেজ কর্তা বলেছিল, তু রাতে খেয়ে যাস, আজ আর ঘরে ফিরতে হবেক নাই।'

খুব খুশী হয়েছিল কানুপা। গাঁয়ের মুরুব্বিদের বাড়িতে নানা বাছ-বিচার ছোঁয়াছুঁয়ি। রাস্তায় বসে খাওয়া, খাওয়ার পর, সে জায়গা গোবর জলে সাফ করতে হবে। তা হোক। তবু পেট পুরে কত রকমের অন্ন ব্যঞ্জন খাওয়া যাবে। রাতে কানুপার সঙ্গে নানকুও খেয়েছিল প্রচুর। দাওয়ার খুঁটিতে নানকুর গলার দড়িটা বেঁধে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল কানুপা। মাঝরাতে কী এক শব্দে ঘুম ভাঙতে

কানুপা দেখল, অন্ধকারে নানকুর চোখ দু'টো দপদপ করে জ্বলছে। কান খাড়া করে কানুপা শুনল, পাঁচিলের ওপাশে বাড়ির ভেতর ফিসফিস কথার আওয়াজ। কারা যেন কথা বলছে। নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে চৌকি দিতে এসে দাঁড়াল একজন অচেনা মানুষ। মুরুব্বির বাড়িতে যে ডাকাত পড়েছে বুঝতে দেরী হয়নি কানুপার। ভয়ে তার হাত, পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। দাওয়ায় শুয়ে কানুপা ভাবছিল, সব দোষ তার ঘাড়ে চাপবে। কাল সকালে তার কোমরে দড়ি বেঁধে দারোগা থানায় নিয়ে যাবে। চারপাশ অন্ধকার, জন মুনিষ্যির সাড়া নেই। সদরে দাঁড়ানো লোকটা হঠাৎ ভেতরে ঢুকে গেল। মানুষগুলোর চাপা কথা, নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল কানুপা। দু এক সেকেন্ড মুখ বুজে শুয়ে থাকার পর কানুপার বুদ্ধি খুলে গিয়েছিল। খুঁটি থেকে নানকুর গলার দড়ি খুলে, দড়ির খুঁটটা বাঁ হাতে ধরে জন্তুটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে সদর দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল কানুপা। তারপর ডাকাত ডাকাত বলে হল্লা জুড়ে দিল। নিমেষে শুরু হোল তুলকালাম কান্ড। দরজার ওপাশে হুটোপাটি, চিৎকার, গোঙানি, নানকু যে একজনকে চিরে ফেলেছে, কানুপা বুঝতে পারল। বন্ধ দরজা খুলে পালাবার জন্যে দু' জন ডাকাত একটা পাল্লা ধরে ভেতর থেকে টানাটানি করছিল। একহাতে নানকুর গলার দড়ি, আর এক হাতে দু' দরজার লোহার কড়া ধরে শরীরের সব শক্তি দিয়ে লড়াই করেছিল কানুপা। গোটা বাড়ি তখন জেগেছে, ভেতরে হৈ-চৈ, বন্দুকের শব্দ শোনা গেল, গুড়ুম গুড়ুম।

গল্প শেষ করার আগেই ভিজে উঠল কানুপার গলা। কানুপা বলল, আমার নানকুও বন্দুকের গুলিতে মরি গেল।

থমথমে অন্ধকারে কিশোরের চোখে চোখ পড়তে অজিত বলল, ওঠা যাক, এখনও অনেক পথ।

আরও আধঘন্টা পরে অনেক দূরে মশানজোড়ের আলো চোখে পরতে কানু-পাকে অজিত বলল, এবার তুমি যাও, আমরা ঠিক পৌঁছে যাব।

তরণী পাহাড়ের অন্ধকার রাস্তা ধরে কানুপা ফিরে গেল। সারা রাত এখন একটা ভালুকের বাচ্চা খুঁজবে কানুপা। রাত একটা নাগাদ মশানজোড় পেঁৗছে তারপর সন্দীপের বাড়ি খুঁজে বের করতে আরও আধঘন্টা সময় লাগল। সন্দীপের সঙ্গে আলোচনায় বসে তাকে পার্টির রাজনীতি, কর্মসূচী বুঝিয়ে বলল কিশোর। দেশব্রতী প্রকাশনীর ছাপা দলিল, সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন, পড়া হল। আলোচনার সময় কিশোর বলল, শ্রীকাকুলামে প্রাথমিক স্তরে লাল রাজ-নৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়েছে। শ্রীকাকুলামের বীর কৃষকরা শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে হত্যা করার একচেটিয়া অধিকার কেড়ে নিয়েছেন। প্রতিটি আক্রমণের বদলা নেওয়ার জন্যে তারা তৈরী। অত্যাচার হলেই প্রতিরোধ তৈরী হবে। এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই জন্ম নেবে নিজেদের ইজ্জত সম্পর্কে সচেতন নতুন যুগের নতুন মানুষ। শ্রীকাকুলামে নতুন মানুষের সংখ্যা রোজ বাড়ছে।

গাঁয়ে গিয়ে কাজ করার জন্যে অধৈর্য সন্দীপ বলেছিল, কমরেড, আর পারছি না, পাতিবুর্জোয়া এই জীবনে অরুচি ধরে গেছে।

সন্দীপ সিউড়ি কলেজের ছাত্র। টগবগে তাজা এই তরুণটির পিঠে হাত রেখে কিশোর বলেছিল আর কিছুদিন থাকো এখানে। জঙ্গী পার্টি আর রেডগার্ড সংগঠন তৈরী করে শহরের শ্রমিক, গরীব মানুষদের জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব ছাত্রদের।

আলোচনা শেষ হতে প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল। চোখে মুখে জল দিয়ে তৈরী হলো দুজন। ওরা যাবে রানীশ্বর। সন্দীপ যাবে ফরাক্কায়। রানীশ্বরের বাসে কিশোর, অজিতকে তুলে দিয়ে সন্দীপ চলে গিয়েছিল। রানীশ্বরে কয়েকজন কমরেডকে নিয়ে সভা করার কথা ছিল কিশোর, অজিতের। ফাঁকা রাস্তায় হু হু করে ছুটে চলেছিল বাস। জানলা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া এসে মাথায় লাগতে ভারি আরাম বোধ করছিল অজিত। সন্দীপের কিনে দেওয়া এক বান্ডিল বিড়ি থেকে একটার পর একটা টেনে যাচ্ছিল কিশোর।

রানীশ্বর বাসস্ট্যান্ডে নেমে সন্দীপের দেওয়া তপন সাহার বাড়ির ঠিকানা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল দুজন। বোলপুর কলেজের ছাত্র তপন সাহা সেখানেই ছাত্রদের মধ্যে কাজ করছে। কিশোর অজিত কেউ আগে তপনকে না দেখলেও নাম শুনেছে তার। ঝাঁক বেঁধে আসা নতুন ছেলেদের কী ভাবে সংগঠিত করতে হবে, সে বিষয়ে তপনের সঙ্গে কিশোরের কথা বলার ইচ্ছে ছিল। সন্দীপের দেওয়া রাস্তার হদিশ ধরে কিশোর অজিত এগিয়ে চলেছিল। রাস্তার দু' ধারে ছোট বড় নানা রকমের দোকান। একটা দোকান থেকে চায়ের সুবাস নাকে ঢুকতে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কতকাল চা খায়নি তারা! মাসখানেক আগে লাউবেড়েতে দুধবিহীন ভেলিগুড়ের চা কিশোর খেয়েছিল। কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে অজিত বলল, একটু চা হোক।

দুজনে দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিতে দোকানী দুটো ছোটো গ্লাসে চা আর দুটো বিস্কুট দিল। বেঞ্চিতে পা তুলে বাবু হয়ে বসে মৌজ করে চায়ে চুমুক দিল তারা। অজিত কিশোরের মাথার ক্লান্ত কোষগুলো চায়ের তাপে জেগে উঠছিল। অজিতের কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে কিশোর ধরালো। দোকানের বাইরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, বেশ কিছু মানুষের জটলা। তাদের দেখছে সকলে। কিশোরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ভীড়ের সামনের লোকটা সরে গেল। অচেনা মানুষগুলোর তাকানোর ভঙ্গি কিশোরের ভাল লাগল না। অজিতের হাঁটু টিপে কিশোর প্রশ্ন করল, ওরা আমাদের দেখছে কেন?

অজিত বলল, গুলি মার!

খয়েরি লাল ডোরাকাটা অজিতের লুঙ্গি থেকে ধুলো উড়ছিল। নিজের সবুজ লুঙ্গিটা হঠাৎ ভীষণ ময়লা মনে হল কিশোরের। অচেনা লোকগুলো, নিরীহ শান্ত চোখে কিশোর, অজিতকে এক পলক দেখে সামান্য সরে গিয়ে আবার ফিরে আসছিল। গত তিন মাসে অজিতের গোঁফ এমন ভয়ঙ্কর বেড়েছে, যে তাকে গুন্ডার মতো দেখাচ্ছিল। দোকানের বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বেপরোয়া অজিত গোঁফ পাকাল। নিজের মুখের দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে দু আঙুল ডুবিয়ে কিশোর ভাবছিল, তার দাঁড়ি

গোঁফ ধারাল কাস্তে দিয়ে টুংরো মাঝি কাল কামিয়ে দিতে চেয়েছিল। সে রাজী হয়নি।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ থাকায় সূর্য উঠলেও ধূসর হয়ে ছিল পৃথিবী। একবার বাইরে দাঁড়ানো জটলা পরক্ষণে কিশোর, অজিতের দিকে তাকিয়ে উসখুস করছিল দোকানী। একটা বিপদের সঙ্কেত পেয়ে কিশোরের বুকে গুড়গুড় শব্দ। চা বিস্কুটের পয়সা দোকানদারকে দেবার সময় কিশোর প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার, সকলে আমাদের দেখছে কেন? প্রশ্ন শুনে ভাঁজপরা কপালে ঢেউ তুলে একটু কেশে দোকানদার বলল, কাল রাতে এ পাড়ায় দুটো বড় ডাকাতি হয়েছে। মোছলমান ডাকাত।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অজিতের লুঙ্গির দিকে আঙুল তুলে বলল, ইরকম ডুরাটানা লুঙ্গি আর গেঞ্জি ছিল তাদের গায়ে।

শিরশিরে ঠাণ্ডা এক আতঙ্ক কিশোরের বুক থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে বোবা হয়ে গেল সে। গত তিন মাসে কিশোরের শরীর আধখানা হয়ে গেছে। পুরোনো গেঞ্জি গায়ে ঢলঢল করে। অজিত কিন্তু একটুও টসকায়নি, দমেনি। চওড়া বুক, মোটা কব্জি, ছাঁচে ঢালা স্বাস্থ্য, অজিত সহজে ভয় পায় না। দোকানদারকে অজিত প্রশ্ন করল, রাতে ডাকাতি করে সকালে সে পাড়ার চায়ের দোকানে বসে ডাকাতরা চা খায় নাকি?

অজিতের প্রশ্ন দোকানী বুঝল না। বলল, তুমরাই জানেন।

বাইরে ভীড় বাড়ছিল। কথা না বাড়িয়ে অজিত আর কিশোর রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কালচে মেঘটা আকাশে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ায় চারপাশ বেশ ঝাপসা, বাতাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিচরাস্তা থেকে ছুটে ভিড়ের কাছে এসে একজন বলল, দারোগাবাবু এসে গেছে।

ভীড়ের কয়েকজন লাফিয়ে উঠল, কুথা? কুথা?

কারো কথায় কান না দিয়ে কিশোর, অজিত হাঁটতে শুরু করল। একটু এগিয়ে তারা যে নিরীহ, প্রমাণ করার জন্যে রাস্তার একজনকে কিশোর প্রশ্ন করল, তপন সাহার বাড়িটা কোথায়?

অচেনা লোকটা কিশোরের কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। সামান্য এগিয়ে আরেকজনকে কিশোর একই প্রশ্ন করতে সে পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনারা তপন সাহার কুথাকার কুটুম?

কুটুম নয় বন্ধু, কিশোর বলল।

এই লোকটা যে এলাকার সরপঞ্চ, চৌকিদার, লোকটার খাঁকি হাফপ্যাণ্ট, শার্ট, হাতে বেতের লাঠি দেখেই কিশোর বুঝেছিল। কিশোর অজিতকে ভাল করে দেখে সরপঞ্চ খুশী না হলেও আঙুল তুলে তপনের বাড়ির রাস্তাটা দেখিয়ে দিল।

কিশোর ভাবছিল, তপনকে কেমন দেখতে, রাস্তায় এখন তপনকে দেখলেও সে চিনতে পারবে না। সন্দীপকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল।

সামনের রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে খাটো ধুতি ফতুয়া পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক

সাইকেলে আসছিল। ভদ্রলোকের রোগা পাকানো শরীর, চোখে রুপোলী তারের চশমা। তাকে থামিয়ে সরপঞ্চ প্রশ্ন করল, তপনা ঘরে আছে নাকি?

হঠাৎ সাইকেল থেকে নামতে হওয়ার বিরক্ত ভদ্রলোক প্রশ্ন করল, কেনে?

কিশোর, অজিতকে দেখিয়ে সরপঞ্চ বলল, ইনারা তপনের বন্ধু, চিনেন না কি?

দুজনের ওপর এক পলক নজর বুলিয়ে সাইকেল বাবু বলল, না, চিনি না।

বাড়তি কথার সুযোগ না দিয়ে সাইকেলে চেপে ক্রিংক্রিং ঘণ্টা বাজিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

চায়ের দোকানের সামনের ভিড় কিশোর, অজিতের সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল। সাইকেলবাবুর জবাব শুনে ভিড়ের মানুষগুলোর চোখে সন্দেহ ঘন হল। একটু ঘাবড়ে গিয়ে দুজনে হনহন করে হাঁটছিল। বাজার ছাড়িয়ে নিচের পাড়ার মেঠো রাস্তায় তপনদের বাড়ি। দ্রুত তপনের বাড়িতে পেঁছোতে চাইছিল তারা।

অচেনা মানুষ দেখে ঘেউঘেউ করছিল রাস্তার একটা কুকুর। ভীড়ও সমানে চলছিল দুজনের সঙ্গে। দপদপ করছিল অজিতের চোখ দুটো। চাপা গলায় অজিত বলল, থলিতে ছোরা না থাকলে এখনই আমি চ্যালেঞ্জ করতাম এই ভীড়কে।

কিশোর কোন সাড়া দিল না। ডান দিকের উ'চু মাঠ ধরে বছর পঁচিশের একজন যুবককে আসতে দেখে ভীড়ের একজন বলল, শিবু আসছে।

লুঙ্গির মত ধুতি, হাফহাতা সার্ট পরা যুবকটি মাঠের ওপর থেকেই প্রশ্ন করল, কি হয়েছে, এত ভীড় কেন?

জটলার একজন প্রশ্ন করল, এ দুজন তোমার ভেয়ের বন্ধু নাকি?

অবাক চোখে কিশোর, অজিতকে এক মুহূর্ত দেখে বিরক্তির শব্দ করে শিবু চলে গেল। শিকারের উপর লাফিয়ে পরার আগে বাঘ যেমন নিথর স্তব্ধ হয়ে যায়, কিশোর আর অজিতের দিকে তাকিয়ে ভীড়ের চেহারাও সেরকম।

তপন আছে বাড়িতে?

কিশোরের প্রশ্ন শুনে পেছনে না তাকিয়ে শিবু চেঁচিয়ে বলল, না।

অজিত এক দৌড়ে শিবুর সামনে গিয়ে বলল, আমরা তপনের বন্ধু। মশানজোড় থেকে আসছি, আপনাদের বাড়িটা একটু দেখিয়ে দিন।

আমার অনেক কাজ, সময় নেই, শিবু এড়িয়ে গিয়েছিল অজিতকে।

অনেক দূরে আবছা তরুণী পাহাড়ের তলায় লাল রুক্ষ ঢেউ খেলানো মাঠে বাদামী ধুলো উড়ছিল। আবার হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

ভীড়ের ধৈর্য ফুরিয়ে এসেছিল। তারা ভাবল, দুই ডাকাত বোধহয় পালাচ্ছে। রে রে আওয়াজ তুলে ছুটতে শুরু করল তারা। জনতার সামনে লাঠি হাতে সরপঞ্চকে দেখে চলকে উঠল কিশোরের মাথার রক্ত। তাড়া খেয়ে কিশোর, অজিতও ছুটতে শুরু করল।

বিপদটা বুঝলেও হাতের থলি এবং থলির ভেতরের ছোরার জন্যে জনতার মুখোমুখী হতে চাইছিল না তারা।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বললে অবস্থা হয়তো

এমন ঘোরালো হতো না। কিন্তু তখন জট পাকিয়ে গিয়েছিল সব।

কিশোর বলতে পারতো, আমরা ডাকাত নই। আপনাদের ক্ষতি করতে নয়, আপনাদের মুক্তির জন্যেই আমরা ঘরবাড়ি ছেড়েছি, ভদ্রলোকের পোশাক ছেড়েছি, আমরা আপনাদের বন্ধু।

ছুটতে ছুটতে কিশোর এসব কথা ভাবলেও, সামনে ঝাঁজ পানায় ভরা একটা মজা পুকুর দেখে পুকুরে নেমে পড়ল দুজন। পুকুরে জল কম। কালো রঙের জলের তলায় শুধু পাঁক। দুজনের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল পচা পাঁকে। বুজকুড়ির সঙ্গে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল জলের উপর। পুকুরের ভেতরে আরো কিছুটা সরে গেল দুজনে। শ্যাওলা, পানা জড়িয়ে ধরেছিল ওদের। অজিতকে কিশোর বলল, থলিটা ফেলে দে।

অনেক লোক জমে গিয়েছিল পুকুরপাড়ে। তাদের চেঁচামেচি, গালিগালাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিশোর ভাবছিল, দুজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে তপন সাহা হয়তো এখানে হাজির হবে। হঠাৎ শক্ত একটা পাথর কপালে লাগতে কিশোরের চোখের সামনে ফ্যাকাসে আকাশ আর পৃথিবী ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ঝুপ করে নেমে এলো অন্ধকার। তখনই ইট, পাথর বৃষ্টি শুরু হ'লো। কিশোর যে বেঁহুশ হয়ে যাচ্ছে টের পেয়ে তার হাত শক্ত মুঠোয় ধরেছিলো অজিত। ইট পাথরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিশোরকে অজিত বলছিল, ডুব দে, ডুব দে, এবং অজিত নিজেও টুপটাপ ডুব দিচ্ছিল। তবু একটা বড় ইট লেগে ফেটে গেল অজিতের চোয়াল।

বুকের মধ্যে হঠাৎ সাহস আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে কিশোর বলল চল পাড়ে যাই।

দুহাত তুলে পাড়ে এসে দাঁড়াল দুজনে। অজিত প্রথমে এসে পেঁছোতেই তার মাথায় বাঁশের ঘা মারল একজন। অজিতের গলায় ফিকে আর্তশব্দ। তার কপাল মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল। সেই রক্ত দেখেই বোধহয় কিশোরের মাথায় কেউ বাঁশ মারল না। চড় চাপড় পড়তে থাকল তার শরীরে। অজিতের রক্ত দেখে ভয় পেয়ে সরপঞ্চ বলল, মেরো না, বড়বাবু আসছে।

রক্তে জলে জড়িয়ে গিয়েছিল অজিতের মাথার চুল। কিশোরের রোগা ফর্সা শরীরে কালশিটের দাগ।

গুন্ডার হাতের থলিটা কুথায়?

কে যেন প্রশ্ন করতে ভীড়ের সকলে হল্লা জুড়ল, থলি কুথা? থলি কুথা? তখনই পাঁচ ছ'জন পুকুরে নেমে জল কাদা হাতড়ে থলি তুলে আনল। থলি দেখে উত্তেজনায় আনন্দে ফেটে পড়ল জনতা। থলি থেকে ধারালো ঝকঝকে ছোরটা সরপঞ্চ বের করতেই একলাফে একটা ঢিপির ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল কিশোর। কিশোরের দুটো হাত শক্ত করে ধরে ছিল দু'জন লোক। ছোরা দেখে ভীড়ের মধ্যে চমক জাগল। ডাকাতরাও ছোরা নিয়ে এসেছিল গতরাতে। ছোরার পর থলি থেকে কিছু ভিজে কাগজ, বই পুস্তিকা বেরোল। লাল প্ল্যাস্টিকের মলাট দেওয়া মাও সে-তুং এর কোটেশান বইটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল কয়েকজন।

সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে সব কিছু খুলে বলার জন্যে কিশোরের বুকে ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ছিল আবেগ। মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে না পারার জন্যে লজ্জায় নিজেকে খুবই ছোটো মনে হচ্ছিল তার। জনগণই আসল বীর, ইতিহাসের স্রষ্টা। এ কথা ভুলে সাধারণ মানুষের সামনে থেকে কেন সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল ? কিশোর বক্তৃতা শুরু করল, আমরা কম্যুনিস্ট, আপনাদের শত্রু নই বন্ধু। গরিব মানুষের সেবা করতে চাই আমরা, এমন এক ভারতবর্ষ গড়তে চাই, যেখানে শোষণ নেই, অত্যাচার নেই, গরীব বড়লোক নেই, সকলেই সমান। নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্যে লড়াই করছি আমরা। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে গরীব মানুষ জেগে উঠেছেন আজ। তাদের লড়াই শুরু হয়েছে। সেই যুদ্ধে জীবন দেবার জন্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। আমরা ডাকাত নই আপনাদের সেবক। এখনও কি আপনারা বিশ্বাস করবেন না আমাদের ?

বক্তৃতার মধ্যেই কিশোর বুঝতে পারছিল যে তার দু'হাত চেপে ধরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যাচ্ছে তাদের মুঠো। ভীড়টাও দু'টুকরো। একদল তাদের কাছাকাছি দাঁড়াল, একটু পিছিয়ে গেল বাকিরা। দাঁতে দাঁত টিপে অজিত দেখছিল কিশোরকে। অজিতের কানে মুখে চাপচাপ রক্ত, গেঞ্জির বুক ভিজে লাল। উত্তেজনায়, স্নায়ুর চাপে কিশোরের চোখের সামনে হলুদ ফুলকি জ্বলছিল নিভছিল। পাশে দাঁড়ানো একজনের হাত থেকে লাল বইটা টেনে নিয়ে সেটা ওপরে তুলে কিশোর বলল, এ বই ভারতবর্ষের গরিব মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে।

আরো অনেক শব্দ, কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল তার শুকনো গলায়, জিভে। কী বলছে, বুঝতে পারছিল না সে। সরু রক্তস্রোত কপাল বেয়ে চোখের পাতার উপর নামতে ঝাপসা, লালচে হয়ে গেল তার দৃষ্টি। কেউ একজন কিশোরকে বলল, ফালতু ঝামেলা ছেড়ে চলুন ডাক্তারের কাছে যাই।

সরপঞ্চ কাকে যেন হুকুম করল, দাবাই লে আও ইসব নাদান আদমী হ্যায়।

তেষ্টায় গলা বুজে গেলেও থামতে পারছিল না কিশোর। একটানা বলেই চলেছিল। তার ডান হাত মাথার ওপর, হাতে লাল বই, হাত দুলছে, বই দুলছে, ভীষণ ভারি লাগছিল বইটা।

দারোগাবাবু আসতে গমগম করে উঠল ভীড়। জনা দশ কনস্টেবল নিয়ে তাগড়াই চেহারা নিখুঁত কামানো দাঁড়ি গোঁফ দারোগাবাবু ভীড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কিশোর তখনও বলছিল, দুনিয়া বদলাতে হবে, সেই সঙ্গে নিজেদেরও। নিজেদের বদলাতেই আমরা এখানে গরীব মানুষের কাছে এসেছি। গরীব মানুষেরাই আমাদের বন্ধু, তারা যা পরে, আমরা তা পরি, যা খায়, আমরা খাই, তাদেরই একজন হতে চাই। কিশোরের বুক, পেট, সমস্ত চেতনা ভেদ করে অনেক দুঃখ, কান্না হিম্মত বেড়িয়ে আসছিল। অজিতের গেঞ্জি চেপে ধরে কিশোরের দিকে তাকিয়ে দারোগা হুঙ্কার ছাড়ল, এ উল্লুকা পাঁঠা, চোপ রাও।

কিশোর থামল না। হাত ধরে একজন কনস্টেবল হেঁচকা টান দিতে তার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল। বেহুঁশ কিশোর পড়ে গেল মাটিতে। পাতা ওল্টানো লাল বইটা পড়ল তার মাথার কাছে। অজিত দেখল খোলা বইয়ের পাতায় মাও-এর মুখ। দু'জনকে তুলে একটা কালো ভ্যান যখন স্টার্ট দিল, তখন পানসে হয়ে গেছে ভীড়ের মেজাজ। অনেক খুঁজেও থলি থেকে পাওয়া ছোরাটার হদিশ পেল না পুলিশ। দুই অচেনা তরুণের জন্যে মমতায় কেউ সরিয়ে ফেলেছিল ছোরাটা। ভ্যান ছাড়ার সময় অজিতের কানে সরপঞ্চ বিড়বিড় করে বলেছিল, নাদান, বিলকুল নাদান।

রানীশ্বর থানার দিকে দু'জনকে নিয়ে পুলিশের গাড়ি যখন ছুটে চলল, সূর্য তখন মাঝ আকাশে, লাল ধুলোয় পেছনের রাস্তা, মানুষজন ঝাপসা। অদৃশ্য আগুন চুষে নিচ্ছিল পৃথিবীর রস।

ভবঘুরেদের জন্যে বানানো আইনের একশ ন' ধারায় হাজতি বন্দী হিসেবে কোর্ট থেকে কিশোর আর অজিতকে দুমকা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। সাত মাস তেরো দিন বিচারের পর গতকাল বিকেলে দু'জনকে ছ মাসের সাজা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিল। তার মানে ছ মাস সাজা খেটেও বাড়তি তেতাল্লিশ দিন জেল খেটেছে ওরা। রায় শুনে চটে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অজিত চেচাঁচ্ছিল, তেতাল্লিশ দিন ফেরৎ চাই।

ম্যাজিস্ট্রেট তখন এজলাস ছেড়ে উঠে গিয়েছিল।

ফাঁকা কোর্ট ঘরে দাঁড়িয়ে কিশোর ভাবছিল অন্য কথা। জেলগুলো যেন কবরখানা। মানুষের হাজার হাজার বছর জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে কবর দেওয়া আছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের শরীর নেই, রক্ত মাংস নেই, তবু মানুষের জীবন থেকে সময়কে ছিঁড়ে নেওয়া যায়। একটা বড় জেলে কত হাজার লক্ষ বছর মাটি চাপা দেওয়া আছে? কিশোর হিসেব করেছিল, দুমকা জেলেই গত পাঁচ বছরে প্রায় চার হাজার বছর কবর দেওয়া হয়েছে। চার হাজার বছর আগে ব্যাসদেব, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত লিখেছেন কি?

কোর্ট থেকে জেলে ফিরেও এই সব চিন্তা ভীড় করেছিল কিশোরের মাথায়। জেলগুলো যেন আয়ুর ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্ক থেকে যদি কিছু ধার পাওয়া যেত। মুঠো মুঠো উজ্জ্বল তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে নানা চিন্তায় কিশোরের মাথা ঝনঝন করছিল। হঠাৎ একটা তারা খসে দিগন্তহীন অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে হাজার হাজার নষ্ট বছরকে মুহূর্তের মধ্যে কিশোর ছুঁয়ে ফেলেছিল। তখনই ঘুপসি জেলের ছাদ ফুঁড়ে কিশোরের মাথা আকাশ আর দুটো পা, পৃথিবীর গভীরে যেখানে ছলছল কালো মহাকালের জল, পরমায়ু, স্পর্শ করেছিল। নক্ষত্রলোকের সোনালী রাজপথে হাজতবাসের সাত মাস তেরো দিনকে স্ফুলিঙ্গের মতো উড়ে যেতে দেখেছিল কিশোর।

চা খাওয়া শেষ হলেও চায়ের দোকান থেকে ওঠার নাম করছে না কেউ।

অজিত বলল, ওঠ, বাস ধরতে হবে।

সাতমাস তেরো দিন আগের চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকা কিশোর চমকে জেগে উঠল। আর কোন খদ্দের না থাকায় দোকানীর তাড়া নেই। সে ঢুলছিল। চায়ের দাম মিটিয়ে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল দুজনে। অনেক পথ যেতে হবে।

দুই

দুপুরের আগে শালবনে ঘেরা মাঠের মধ্যে জানগুরুর দরবার বসেছিল। আকাশে ছড়ানো সকালের টুকরো ছেঁড়া মেঘ দুপুরের আগেই ঘন কালো এলোকেশী মূর্তিতে ছড়িয়ে পড়ল দিগন্ত জুড়ে। শূন্য মাঠে হুহু হাওয়া। শালবনের পাতায় শব্দ বাজছিল। সামনে বসা গ্রামের মানুষেরা অবোধ চোখে তাকিয়ে আছে গুরু চিমনজানের দিকে। চিমনজান দারুণ ক্ষমতাবান. চন্দ্র সূর্য তার কথা শোনে। গুরুর ধ্যানস্থ মুখের দিকে গেঁয়ো মানুষগুলো ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। গুরুর পেছনে বসেছে মহাজন ভগতরাম। তার ওপর পাটির সামনের দুটো দাঁত সোনা বাঁধানো, চোখে কটাসের দৃষ্টি, গেঁয়ো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে খড়কে দিয়ে দাঁত খুটছিল ভগতরাম। জান গুরুর বন্ধু বলেই তার কাছাকাছি বসার সুযোগ পেয়েছে মহাজন। শালপাতায় হাওয়ার শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল, স্বর্গে সেই দেবতারার যারা ডানের নাম গুরুকে দিয়ে যাবে, হাজির হচ্ছে। ঘোর লাগা লালচে চোখে সামনে বসা মানুষগুলোকে এক পলক দেখে শালবনের মাথায় চিমনজানের দৃষ্টি সরে গেল। নিচু গলায় বাতাসের সঙ্গে কী যেন কথা বলে ফিক করে একবার হাসল চিমনজান। সকলে জোড় হাত করে বসে আছে। গাঁয়ের মুখিয়া নানকু মাঝি বলল, হেই জানগুরু, বাঁচাও আমাদের।

রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে চিমনজান বলল, ডানটি খুব শয়তান বটেক।

কাঁধে কাঠের বোঝা, কোমরে ঝকঝকে দা, শালবন থেকে বেড়িয়ে এসে ভীড়ের একপাশে দাঁড়াল লখাই।

এই দরবার, ডান ধরা, জানগুরুর কেরামতিতে লখাইয়ের বিশ্বাস গত কয়েক মাসে অনেক কমে গেছে। মেয়েদের ভীড়ে সে খুঁজছিল ঝুমরিকে। তার ইচ্ছে ছিল চোখের ইশারায় দরবার থেকে ঝুমরিকে ডেকে নিয়ে জঙ্গলে বসে গল্প করবে। ঝুমরি কিন্তু লখাইয়ের দিকে তাকাল না।

বাতাসে ফুঁ দিয়ে অদ্ভুত সব মন্ত্র পড়ে নানকুর দিকে তাকিয়ে চিমনজান বলল, বড় শক্তপুক্ত ডান. এক ঘড়িতে যাবে না লাগছে। দেখা যাক, কী করে তেঁইতিশ দেওতা, আমার আর কী খেমতা আছে?

কথাটা বলে চিমনজান কপালে দু হাত ঠেকাতে সমবেত মানুষগুলো অদৃশ্য তেত্রিশ দেবতাকে দু হাত জুড়ে প্রণাম করল। উদ্বেগে অপেক্ষায় সকলের মুখ ফ্যাকাসে। ভয়ে কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছে না। কে যেন প্রশ্ন করল, ডানটি কে বটেক গুরুবাবা?

উইটি তো জানা গেছে নাই। খুব শয়তান ডান বটে. গুরু বলল। তারপর শুরু হলো তেলপাত। মসৃণ সবুজ শালপাতায় তেল সিঁদুর মাখিয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু

করল গুরু। দেবতা সদয় হলে এই পাতায় ভেসে উঠবে ডাইনির মুখ। ডাইনি ধরা পড়বে। ভীড়ের সামনে বসা চার বুড়োর হাতে তেল সিঁদুর মাখা একটা করে পাতা ধরিয়ে দিল চিমনজান। পরিবেশ, মেঘ, হাওয়া সব কিছু খুব ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছিল লখাইয়ের মাথায়। উত্তেজনায় দুরদুর করছিল তার বুক। জ্ঞান হওয়া থেকে সে দেখছে ডাইনিগুলো শুধু গাঁয়ের সুন্দর মেয়েদেরই ভর করে, কোনো জন্তু জানোয়ারের ঘাড়ে নামে না। অনেকদিন পরে লখাইয়ের আজ মনে পড়ল ডাক্তারের কথা। ডাক্তার মানে অজিত। নিজের মনে লখাই বলল, তু যে কবে আবার ফিরবি রে ডাক্তার।

লখাই ভাবছিল, মেয়েগুলো কি সত্যি ডান হয়? সুন্দর তাজা মেয়েগুলো কি এমন শয়তানি করতে পারে? সামনে বসা ফুলমনি, কুরচি, তাদের পাশে ঝুমরিকে দেখে হঠাৎ দারুণ ভয়ে দুলে ওঠে লখাইয়ের বুক, গলা শুকিয়ে যায়। বছর দুই আগের একটা ঘটনা লখাইয়ের মনে পড়ল। টোংড়া গাঁয়ের মেঘনার ওপর ডান চেপেছিল। জানগুরুর কৃপায় সেই ডান ধরা পরার পর গাঁয়ের কুলিতে পড়ে ছিল মেঘনার দু টুকরো দেহ। ঝুমরির মুখের দিকে অপলক তাকিয়েছিল লখাই। কাল রাতের ঘটনা লখাইয়ের মনে পড়ল। গত রাতে রুপোর থালার মতো বিরাট এক চাঁদ উঠেছিল আকাশে। তালে তালে বাজছিল মাদল, নাকড়া, ডুগ-ডুগ কুড়কুড় কুড়ুম। গাঁয়ের বাড়ি ঘর গাছপালা মাঠ চাঁদের আলো আর কুয়াশায় মিশে বড় মায়াময় দেখাচ্ছিল। দাউদাউ চুলোর আগুনের ওপর মাটির হাঁড়িতে রান্না হচ্ছিল তিনটে খরগোশ আর দুটো পায়রা। মাংস সেদ্ধ হয়েছে কিনা বুধন টিপে টিপে দেখছিল। মাংস নামলে চুলোয় উঠবে খুদের জাউ। গাঁয়ের মরদেরা শিকারে গিয়ে সারাদিন ঘুরে বিশেষ কিছু পায়নি। তেরো জন মরদ আর দুটো কুকুর শিকারে গিয়েছিল বলে মাংসের পনেরোটা সমান ভাগ হয়েছিল। ভাগ বাটোয়ারার কাজে বুধনের ওপর সকলের খুব বিশ্বাস। বুধনের জুড়ি নেই। সামান্য দূরে কুলিমুড়োয় বাজনার সঙ্গে নাচছিল একদল ছেলে মেয়ে। লখাই শিকারে গেলেও রান্নার জায়গা ছেড়ে কুলিমুড়োয় দাঁড়িয়ে নাচ গানের সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছিল। দু লাইনে মুখোমুখি দাঁড়ানো ছেলে মেয়েদের নাচ গানের উথাল পাথাল শব্দে কেঁপে উঠছিল অন্ধকার। ঝুমরির সঙ্গে চোখাচোখি হতে তাকে ইশারায় ডাকল লখাই। হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল ঝুমরি। নাচগানের আসরে সেদিন গাঁয়ের কোরাকুরিরা জুটলেও বুড়োরা কেউ আসে নি। গত কয়েকদিনে গাঁয়ের পাঁচটা গাভীন গরু মরে যাওয়ায় ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছিল তারা। কাল জান গুরুর দরবার, ঝাড়ফুঁক হবে, সে সবের আয়োজন, তেল পান সুপুরি জোগাড় করছিল বয়স্করা।

দ্রামদ্রাম, ধামসা বাজতেই ছেলে মেয়েদের পায়ের গতি বাড়ল, জমে উঠল নাচ, হাসির তুফান তুলে খুশীতে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ল তারা।

নমং মোনেঞ বড়েই কেদা ঘনে ঘনে বদল কান, মেয়েরা কোমর দুলিয়ে গান

শুরু করল, তোমার মনে কী যে আছে, ঘন ঘন বদলে যাচ্ছো, বুঝতে পারছি না।

মাদলের উদ্দাম বোলের সঙ্গে মেয়েদের চকচকে ভারি খোঁপা থেকে খসে পড়ছিল সাকমবাহা ফুল। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ শব্দ, দীঘল আথের মত শরীর লখাইকে আরেকবার ঝুমরির দেখতে ইচ্ছে করছিল। হিম আর জ্যোৎস্নার সোনালী চিকে ঢাকা বাহেঙ্গার কুলিমুড়ো ফেটে পড়ছিল ফুর্তিতে।

ঝুমরির সঙ্গে মিটমাট হয়ে যাওয়ায় দারুণ খুশীতে বাঁশি বাজাচ্ছিল লখাই। সামনের মাসে ওদের তিলকচুরি, পাকা দেখা। লখাইয়ের বুকের মধ্যে চুলবুলে আবেশ, কিছুতেই নেশা ধরছিল না তার। বাঁশির মধ্যে বাতাস পুরে লখাই ক্রমাগত ডেকে চলেছিল, ঝুমরি, ঝুমরি। গান শেষ হবার পরেও দইপার মাদলের দ্রিমদ্রিম ধ্বনি থামেনি। খাপ খোলা হাওয়ায় শুকনো কাঠ পাতার আগুন হিলহিল করে নাচছিল অদূরে। সে আগুনে মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েরা সেকে আসছিল নিজেদের হাত পা। ঝুমরি একবারও কাছে না আসায় অভিমানে বুজে আসছিল লখাইয়ের গলা। চোখ ঠেরে বাঁশি হেলিয়ে ঝুমরিকে আসরের বাইরে যাবার জন্যে বেশ কয়েকবার সংকেত পাঠিয়েছিল লখাই। হিমেল হাওয়ায় অসাড় আঙুলের ডগা থেকে বাঁশির ফুটোগুলো হারিয়ে গেলেও আগুনের কাছে যায়নি সে। শরীরে কাঁপুনি নিয়ে আগুন থেকে একটু দূরে বসেছিল লখাই।

ঝুমরির দিকে তাকিয়ে লখাই ভাবছিল কবে কোন মোরগ ডাকা সকালে একটা কচি মেয়ে হঠাৎ কী করে এমন ডাগর ডোগোর, এক মালসা আগুন হয়ে উঠল? মাংসের ভাগ ছেলেদের সবাইকে পৌঁছে দেবার পর নাচ যখন শেষ হল, চাঁদ তখন তরুণী পাহাড়ের পূব দিকে হেলেছে। ছেলেমেয়েরা একে একে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ঠিক তখনই সামান্য দূরে থেকে ঝুমরির চোখের অব্যর্থ সংকেত পেল লখাই। পাশাপাশি হেঁটে একটু এগিয়ে একটা খড়ের গাদায় ঢুকে গিয়েছিল দুজনে। শীতে অসাড় লখাইয়ের শরীর ঝুমরির দেহের তাপে চনমনে তপ্ত হয়ে উঠেছিল নিমেষে। উলের লাছির মতো নিজের শরীরের তাপে ঝুমরি ঢেকে দিয়েছিল লখাইকে।

দিন সাতেক আগে ভগতরাম মহাজন গ্রামে আসার পর একটা সামান্য ঘটনায় ঝুমরির সঙ্গে লখাইয়ের ঝগড়া হয়েছিল। ভগতরাম যে পসরা নিয়ে আসবে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে জানান দিয়ে গিয়েছিল। একটা মুনিষের পিঠে কাপড়ের বিরাট বোঝা চাপিয়ে. রাণীশ্বর না আসনবুনি কোথায় যেন ভগতরামের বাড়ি, সেখান থেকে প্রতি বছর ও আসে। জানগুরু চিমনের ঘরে থাকে, সেই ঘরের কাছাকাছি দোকান সাজায়। এ তল্লাটে মস্ত গুনিন হিসেবে সকলে চেনে, ভয় পায়, খাতির করে জানগুরুকে। আপদে বিপদে অসুখ বিসুখ কলেরা বসন্ত দুধেল গরুর বাঁটে ঘা, সব দুর্ভোগে জানগুরুর শরণাপন্ন হয় লোকে। জানগুরু ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্র তাবিজ কবচ জলপড়া, তেলপড়া. ফুলপড়া, পানদর্পণ, নখদর্পণ তেলপাত, সিঁদুর পাত, তামাম ভেল্কিতে ভূত পেত ডান দাত্যি, সকলকে ঘায়েল করে। রোগ মড়ক লাগলে, কার জন্যে এই দুর্ভোগ, দেবতারা বলে যায় গুরুকে। গাঁয়ে কার ঘরে

মেয়ে বউ ডান হয়েছে. চিমনজান সে হদিস জানার পর মজলিসের মধ্যে ডানটাকে দারেম দিতে হয়। দারেমের টাকায় মদের ফোয়ারা ছোটে, শুয়োর কাটা হয়। জরিমানার সব টাকা অবশ্য খরচ করা হয় না. অর্ধেক রাখা হয় জানগুরুর জন্যে। জরিমানা দিতে না পারলে গাঁয়ের লোক গুরুর আদেশে ডানটাকে পিটিয়ে মারে। খড়ের গাদায় পাশাপাশি শুয়ে মাংস খাবার পর লখাইয়ের হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঝুমরি। খড়ের ওপর খসে পড়েছিল ঝুমরির খোঁপায় লাগানো গাঢ় লাল রঙের আঠাল ফুল। খড়ের গাদা হিমে ভিজে উঠলেও লখাই জাগালোনা ঝুমরিকে। দিন পাঁচেক আগে মহাজনের সঙ্গে ঝগড়ার সময় তাকে বেশ কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়েছিল লখাই। ভগতরাম গাঁযে এসেই চিমনজানের আখড়ায় দুটো গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল রঙিন বাহারী শাড়ি, মেযেদের গায়ের জামা, লুঙি. গামছা, আরো হরেক জিনিস। ফি-বারের মতো এবারেও ভগতরামের সওদা দেখে গাঁয়ের মেয়েদের মুখচোখে চকচক করে উঠেছিল উত্তেজনা, লোভ। নতুন শাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জোড়ে শ্বাস টেনে কেউ কেউ বলেছিল, ইস রে, কি মিঠি বাস।

পান খাওয়া লালচে দাঁতে খড়কে চালাতে চালাতে খাটো কাপড়ে ঢাকা মেয়েদের আঁটসাঁট শরীরের ওপর ভগতরামের খুদে দুটো চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মেযেদের আদুলে গলা, কণ্ঠা. কোমর বেয়ে মহাজনের দৃষ্টি যতো নামছিল, সে ততো হেসে হেসে সুর করে বলছিল, যার যা ইচ্ছে লিয়ে যা. লুঙি শাড়ি গামছা, বাপের নাম টিপ সই, এই আমার খাতা বই, লাগবে নাকো টাকা কড়ি, সস্তা দামে গামছা শাড়ি।

ভগতরামের গান শুনে নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে তাকিয়ে খিলখিলিযে হেসে মেয়েরা কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়েছিল পরস্পরকে। রসিয়ে রসিয়ে আরো দুটো মজার লাইন জুড়ে দিল মহাজন, বিক্রি করে ভগতরাম, শীতকালে কম দাম।

গত বর্ষায় আর পাঁচটা মেয়ের মতো, হয়তো লখাইয়ের ওপর কিছুটা অভিমানে ভগতরামের কাছ থেকে একটা শাড়ি নিয়েছিল ঝুমরি। রাণীশ্বরের মেলা থেকে একটা রঙিন শাড়ি আর লাল চিরুনী আনার কথা দিযে লখাই না আনায় তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে মহাজনের কাছে খাতায় লিখে শাড়ি নিযেছিল ঝুমরি। তখনও দুজনের এত চেনা জানা হয়নি, ধীরে ধীরে কাছাকাছি আসছিল।

ঝুমরিকে একটা দিন না দেখলে তখন খাঁখাঁ করতো লখাইয়ের বুক। আবছা ভোরে ঝুমরিদের ঘরের সামনে হাঁটাহাঁটি, গলার শব্দ করতো। কেশে কেশে শুকনো গলা জ্বলে গেলে পোষা কুকুরটার নাম ধরে লখাই চেঁচিয়ে ডাকত, কুঙ্গা, কুঙ্গা।

কুঙ্গা দৌঁড়ে এসে পায়ের কাছে মাটির ওপর কিছু সময় লুটোপুটি করে সামনের পা দুটো তুলে লখাইযের কোমর জড়িয়ে ধরতো। তখন ঝুমরির দেখা পেলে খুশীতে কুঙ্গার মাথায় চুমু দিত লখাই। ঘর থেকে ঝুমরি না বেরোলে রাগে লখাইয়ের চোখ ফেটে জল আসতো। গুনে গুনে ঝুমরিকে দশটা গাল পেড়ে কুঙ্গাকে নিয়ে মাঠে চলে যেত লখাই। তারপর দিন শেষের ফিকে আলোয় বাঁশ বনে অথবা শাল গাছের তলায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে ঝুমরিকে লখাই বুকে জড়িয়ে ধরতো। তার

প্রবল সোহাগে ছটফট করতো মেয়েটা। বোঙ্গার কাছে লখাই তখন প্রার্থনা করতো, সকালে দেওয়া তার গাল যেন ঝুমরির না লাগে।

তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারা। চিকন গভীর মতো গনগনে হয়েছে ঝুমরির শরীর। এখন সে পলাশ ফুলের গন্ধ টের পায়। মস্ত কালো খোঁপায় লাল শিমুল ফুল গুঁজে লখাইয়ের প্রতীক্ষায় একা থরথর করে কাঁপে। লখাইকে একদিন না দেখলে তার বুকের মধ্যে অঝোর বৃষ্টি, উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া কল্পনা সোঁসোঁ ঝড় তোলপাড় করে। নিজের মনে ঝুমরি গুনগুন গান গায়, মাণ্ডেওয়া লগররে কামেদা লগররে।

মান অভিমান মেশা এমনই এক নিঝুম দুপুরে ঝুমরিকে লখাই বলেছিল. আসছে চৈতে রাণীশ্বরের মিলাতে তুকে একটা লাল পারা শাড়ি কিনে দিব।

টাকা কম থাকায় লখাই কথা রাখতে পারে নি। মেলা থেকে ফিরে এক গোছা সাদা কাশফুল ঝুমরির খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল সে। ঝুমরি কিন্তু শাড়ির কথা ভোলেনি। ভগতরাম আসতে তাই সে টিপসই দিয়ে লাল রঙের একটা শাড়ি নিয়েছিল।

ভগতরাম যেমন নতুন মাল বেঁচছিল. বাকী টাকা আদায়ের জন্যে তাগাদা দিচ্ছিল ঘরে ঘরে। একদিন ঝুমরির ঘরে তাগাদায় গিয়ে তার শুকনো মুখ দেখে নকল স্নেহে ভগতরাম বলল. মুখটা অমন ছোটো করছিস ক্যানে রে? তুর মতোন আমার একটা ভাইঝি আছে. ঠিক এই রকম টিকোলো নাক।

খ্যাকখ্যাক করে হাসতে হাসতে ভগতরাম আদর করে ঝুমরির নাক টিপে দিয়ে বলেছিল, হাতে ট্যাকা নাই, দু এক ট্যাকা কম পড়েছে? তাতে খ্যেতি কি? যা পারবি তাই দিবি। না পারলে যখন পারবি ত্যাখন দিবি। তা বলে আমার দুকানে যাবি না ক্যানে?

কথার সঙ্গে ঝুমরির মাথায় কপালে মুখে হাত বোলাচ্ছিল ভগতরাম। ঝুমরির অসহায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল। ভগতরাম বলেছিল, আমি বাঘ না ভালুক রে? তুরা পাঁচজনা না গেলে দুকান জমে? না মন ভাল থাকে. আজ বিকেল করে একটু গিয়ে উনুন ধরিয়ে ডেচকিটা মেজে দিবি। আর ওই পথে তোর লেগে একটা লাল গামছা নিয়ে আসবি। চিমনজান তুর কতো নাম করে। যাস কিন্তু।

কথাটা বলে বেড়িয়ে গিয়েছিল ভগতরাম। গলা জড়িয়ে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়া ঝুমরির মুখে লখাই দেখল হিমে ভেজা চাঁদের আলো। ঝুমরির আদুল শরীর বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল লখাই। গোটা পাড়া নিঝুম, পায়ের কাছে শব্দ করে শ্বাস ফেলল কুত্তা।

সেদিন বিকেলেই ঝুমরির মুখে মহাজনের বেয়াদপির কথা শুনে লখাইয়ের মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। নিজের পেতলের বড় কাঁসিটা মাত্র চব্বিশ টাকায় বেচে লখাই ছুটে গিয়েছিল চিমন জানের ঘরে। হাঁফাতে হাঁফাতে ভগতরামকে বলেছিল, এই সুদাগর ঝুমরির নামে কত ট্যাকা বাকি আছে শিগগির বুলতো।

এলোমেলো একমাথা চুল, লালচে চোখ, হাতে তীর ধনুক, সারাদিন রোদে রোদে মেঠো ইঁদুরের পেছনে ছুটেছিল লখাই। তার ঘোলাটে চাউনি আর কাঠকাঠ কথায় ভগতরাম চটে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, ঝুমরির ধার বাবিতে তুর কি? তুই কি ঝুমরির বাপ?

কাঁধ থেকে তীরধনুক নামাতে নামাতে লখাই বলেছিল, যা শুধোইছি, তু বুলবি কিনা, উ আমার কে বটেক, তা তুকে জানতে হবেক নাই।

কথা শেষ করে ট্যাঁক থেকে নোটগুলো বার করে হাতের মুঠোয় রেখেছিল লখাই। চেহারা, তীরধনুক নোট দেখে কথা না বাড়িয়ে হিসেব দিল ভগতরাম। টাকা মিটিয়ে কাঁধে ধনুক রেখে লখাই বলেছিল, ই গাঁয়ের মেয়েছেলে দিখু্য জাতের এঁটো থালা মাজেক না। সেমনি হলে ঘর থেকে কাউকে উ কাজ করতে লিয়ে আসবি।

পাঁচ দিন আগের ঘটনা এটা। তারপরই শুরু হলো মড়ক। দু' চারটে গাই, কোনটা মাঠে কোনটা গোয়ালঘরে মারা যেতে গাঁয়ের লোক হকচকিয়ে গেল, রটে গেল ডান এসেছে। ঝাড়ফুঁকের জন্যে সকলে যখন জানগুরুর কাছে ছুটেছিল, লখাই ভেবেছিল, এখন ডাক্তার থাকলে খুব কাজ হতো, সাত আট মাস আগে মানুষটা সেই যে রাণীশ্বরে গেলো আর ফিরল না। তাঁতিপাড়ার মোতি এসে একদিন খবর দিয়ে গিয়েছিল ডাক্তারকে পুলিশে ধরেছে। লোকটা থাকলে বুকে বল পেত লখাই।

হঠাৎ লখাইয়ের পায়ের কাছ থেকে কে যেন বলল, ভড়ং। কথাটা শুনে চমকে উঠে লখাই দেখতে পেলো বুধনকে। জানগুরুর দরবারে তাহলে বুধনও এসেছে। ডাক্তারের খুব কাছের মানুষ বুধন। সে লখাইয়ের বন্ধু। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুধন বললো, কতো ডাইন মারা পড়ল, তাও গাঁয়ে এ্যাত জানোয়ার মানুষ মারা পড়ে ক্যানে?

বুধনের কথা কানে ঢুকলেও চার বুড়োর হাতের তেল সিঁদুর মাখানো লাল শালপাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে কী এক আশঙ্কায় লখাইয়ের বুকের রক্ত দানা পাকাচ্ছিল। এক বুড়োর শালপাতার ওপর লখাই নিজের ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মুখ যেন দেখতে পেল।

চার বুড়োর একজন, নফরমাঝি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, গুরুবাবাগো আমার তেলপাতে ডান এসে গেইছে।

নফরকে কাছে ডেকে তার পাতাটা একপলক দেখে কপালে দু' হাত রেখে চাপা গলায় কিছু বলে ধ্যানস্থ হলো গুরু। কারো মুখে কথা নেই। ছুঁচ পড়ার শব্দও শোনা যায়। মেয়েগুলোর মুখ ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ মেলে ভীড়ের দিকে তাকিয়ে জানগুরু বলল দেওতা বলেছে, মাঝিপাড়ার কুঞ্জমাঝির বেটিটা ডান বটেক। ইঁয় দেখো সবাই।

সামনে বসা দু' একজন ঘাড় উঁচু করে দেখল, তেলপাতে অবিকল ঝুমরির মুখ ভেসে আছে। জানগুরু বলল, ই ডানটি বড়হি ডান বটেক। ইটি পিরথমে আমাদের জানোয়ারকে খাবেক, তারপর খাবে গাঁয়ের লুককে।

আরো কি সব চিমনজ্ঞান বলছিল, কানে ঢুকছিল না লখাইয়ের। তার বুকের মধ্যে তোলপাড়, চোখের সামনে রাশি রাশি কাশফুল উড়ছিল। ঝুমরি শব্দটা

কলজের মধ্যে তীর খাওয়া পাখির মত ডেকে বেড়াচ্ছিল। হৃৎপিন্ডে ত্রস্ত রক্ত, পায়ের নিচে ভূমিকম্প, মনে হচ্ছিল দুনিয়া লন্ড ভন্ড হয়ে যাবে। লখাইয়ের একটা হাত বুধন শক্ত করে ধরে বলল, শালা জান গুরুটা বদমাস পাজি।

চিমনজান আর ভগতরামকে মাঝখানে রেখে মজলিসে তখন আলোচনা শুরু হয়েছে। গলায় গামছা দু' চোখে জল, জানগুরুর পা জড়িয়ে ধরে কুঞ্জমাঝি বলছিল, গুরু বাবা, অ গুরু বাবা, আর খানিক ভাল করে দেখ। আমার ঝুমরি বেটি ডান নয়. হতে পারে না, আর কেউ বটেক। তুমার পায়ে পরি বাবা, অত টাকা আমি দিতে লারবো। ই গাঁয়ে থাকবো না সুবাই মিলে আজকেই চলে যাবো।

ঝুমরির বাবার কথা লখাইয়ের কানে ঢুকছিল না। সে দেখল মাটিতে লুটিয়ে ঝুমরি ফুঁপোচ্ছে। চিমনজানের কানে ফিশফিশ করে ভগতরাম কিছু বলতে দু' হাতে কুঞ্জকে মাটি থেকে তুলে জানগুরু বলল, তুর বেটিকে সুদাগরের সঙ্গে শহরে পাঠিয়ে দে, দারেমের টাকা উ দেবে. তুর বেটিও জানে বাঁচবে।

শক্ত করে একটা হাত বুধন ধরে থাকলেও, সে বুঝতে পারছিল তেতে ফুঁসে ক্রমশ উম্মাদ হয়ে উঠছে লখাই। তার কানে কানে বুধন বলল, সামাল সামাল।

চপোজাম, চুপ মারো, লখাই ধমক দিল বুধনকে। লখাইয়ের পাশে কুংগার দু' চোখে ধকধক আগুন, ল্যাজ খাড়া, ঝাঁপিয়ে পরার জন্যে কুকুরটা যেন তৈরী। ঝড় ওঠার আগের মুহূর্তে আকাশে বিদ্যুৎ চিকির দিল। ঘন মেঘে শাল গাছের মাথা মিশে গেছে। ভীড়ের মধ্যে চাপা গলায় গুনগুন কথা। মন্ত্র পড়ে যে পাকা কলাটা এখনি ঝুমরিকে খাওয়ানো হবে, মাঝি পাড়ার সিধুমাঝি তার খোসা ছাড়াচ্ছে। লখাইয়ের দিকে তাকিয়ে ভগতরাম মুচকি হাসতে লখাইয়ের মাথার মধ্যে এক বিষধর সাপ নেচে উঠল। ফুলে উঠল তার হাত পায়ের পেশী। ঝড়ো হাওয়ায় লখাইয়ের ধুলো মাথা ঝাঁকড়া চুল উড়ছিল। হ্যাঁচকা টানে বুধনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লখাই ঝাঁপিয়ে পড়ল চিমনজানের ওপর। লখাইয়ের শরীরের সব কটা লোমকূপ থেকে রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। লখাই চিৎকার করল। ডান মিয়ালাং গজ মিয়ালাং, ই শালাই ডান পয়দা করে, ডান তাড়ায়, ই শালাই গাঁয়ের সব কিছু লুঠ করছে, সব ডান আজ্ঞ আমি ঘুচিন দিবে।

কথার সঙ্গে লখাইয়ের হাতের ধারালো রামদা ঝলসে উঠছে বারবার। পাগলের মতো চিমন জানের উপর ঝপাঝপ কোপ মারছিল লখাই। গাঁয়ের মানুষের হৈচৈ মেয়েদের গোঙানি, কিছুই লখাইয়ের কানে ঢুকলো না। বোঁচকা ফেলে ভগতরাম ভয়ে দৌড় মারল, পেছনে ছুটলো তার মুনিষ। মনিবের কাছ থেকে মুনিষটার সাত টাকা পাওনা আছে।

সাহস করে লখাইয়ের সামনে এলো না কেউ। চিমনজানের বুক. পেট, ধারালো দায়ের কোপে হাঁ হয়ে গেছে। তোড়ে রক্ত বেরোচ্ছে। দু' হাতে ক্ষতগুলো চেপে জান গুরু রক্ত ঠেকাতে চাইছিল। রক্ত বন্ধ হোলো না। হামাগুড়ি দিয়ে জানগুরু পালাতে গেলে চুলের মুঠি ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে, সজোরে তার পেটে লখাই একটা লাথি কসালো। গোঁ গোঁ শব্দ করে ধরাশায়ী হলো জানগুরু।

আজ শালা জানের ঝাড়বংশ নিপাত্তি করবো, একনাগাড়ে লখাই চেঁচাচ্ছে, তুমি শালা চিনো না আমাকে।

কথার সঙ্গে লখাইয়ের হাতের দা চলছে। চিমনজানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুটি কুটি, নাক ঠোঁট কপাল কিমা হয়ে ছোটো ছোটো টুকরো হাড় মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। একতাল মাংসর মতো দেখাচ্ছিল দেহটা।

লখাইয়ের হাত মুখ কোমরের ছোটো টেনা রক্তে লাল। লখাই বলছিল, শালা এখনো মরে নাই, দেওতা বলছে, ডানটি ইখনো শেষ হয় নাই, আভি বড়ি ডান, গঁজো সে গঁজো সে শালা ডানের গুষ্টির তুষ্টি গঁজো সে উড়ুক তাও।

ভীড় ভয়ে স্তব্ধ। আকাশ ফাটিয়ে একটা বাজ পড়ল, উঠল ঝড়, শালগাছের মাথা ছুঁয়ে গাঁক গাঁক শব্দে হাওয়া ছুটতে লাগল। লাল মাটির ধুলোয় চারপাশ আবছা, শুকনো, কুটো পাতা, ডাল ভাঙার আওয়াজ, মেঘের গুড় গুড় শব্দ শুনে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিশেহারা একপাল গরু ছুটোছুটি করছিল। পাথর হয়ে যাওয়া মানুষগুলো ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হতে সম্বিত ফিরে পেল। লখাই তখনো বকবক করছিল, ডান দুষমনের খেল খেতম আর ডর লাইরে ঝুমরি তু খাড়া থাক।

মৃত গরুর সর্বাঙ্গ কুংগা শুঁকছিল। লখাইয়ের হাত ধরে বুধন ভীড়ের বাইরে নিয়ে এলো তাকে। দারোগাকে নিয়ে ভগতরাম হাজির হওয়ার আগেই লখাইকে গাঁ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

তিন

অসুস্থ বাবাকে দেখতে এসেছিল মোতি। দু' মাস আগে হঠাৎ একটা স্ট্রোক হওয়ায় শরীরের বাঁ দিক পড়ে গিয়ে যেতে বাবা এখন অকেজো, পঙ্গু, শয্যাশায়ী।

গোটা তাঁতিপাড়া এখন নিঝুম, আধমরা, ঝিমোচ্ছে। মাঝে মাঝে তাঁত চলার ঘটাক চঙ ঘটাক চঙ শব্দ শোনা গেলেও আজ থেকে কয়েক বছর আগে সারাদিন তাঁতি পাড়ার সব বাড়ি এই শব্দে মুখর হয়ে থাকতো। এই শব্দ তাঁতি পাড়ার জীবন। ভারি ক্লান্ত রোগা দেখাচ্ছিল মাকে। মায়ের হাতে কয়েকটা ওষুধ দিয়ে মোতি বলল, ডাক্তারদা দিয়েছে।

মাটির দেয়ালের কুলুঙ্গিতে ওষুধগুলো মা রেখে দিল। ঘরটার হতশ্রী চেহারা দেখে মোতি বুঝল, আর একটা বর্ষাও এ ঘর সইবে না।

খড় ওঠা চাল, দেওয়ালের মাটি ঝরছে, যে কোনো দিন ধসে পড়বে দেওয়াল। ছোট ভাইবোনরা কেউ বাড়ি নেই। ফাঁকতালে কোথাও একটু খাবার আশায় সারা দুপুর তাঁতিপাড়া চষে ফেলে তারা। ভিজে কাপড়, হাতে কয়েকটা মাজা বাসন, পুকুর ঘাট থেকে ছোট বোন ইন্দু ঘরে ফিরে মোতিকে দেখে অল্প হাসল। ইন্দুর যে বিয়ের বয়স হয়েছে, বড় ভাই হিসেবে বোনের বিয়ে দেওয়া যে দায়িত্ব মোতির আবার মনে পড়ল। অনেক ভেবেও বোনের বিয়ের জন্য সে কিছু করতে পারে নি। মোতির জন্যে রান্না ঘরে ভাত আনতে গেলো মা। ভিজে কাপড় ছেড়ে তক্তাপোশে বাবার পায়ের কাছে ইন্দু এসে দাঁড়াতে মোতি দেখল, বোনটা খুব রোগা হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও টানা টানা চোখ লম্বা ঘন চুল, মাজা শ্যামলা রঙ, দারুণ সুন্দর দেখতে ছিল ইন্দুকে।

ঘরের মেঝেতে জল ছড়া দিয়ে মা ভাত দিতে খেতে বসল মোতি। হপ্তাখানেক আগে শেষ বাড়ি এসেছিল সে। এখন ওর অনেক কাজ। ডাক্তারের সহকারী সেজে সারা সকাল কাজ করে সেই সঙ্গে প্রচার চালায়। মোতির মাথার মধ্যে সব সময় একটা গনগনে আগুন, দেশটাকে বদলাতে হবে, দেশের মানুষ কুকুর বেড়াল নয়, কেন তারা এ ভাবে বেঁচে থাকবে?

দু' দশ মাইল জুড়ে সাঁওতাল গাঁ গুলোতে কাজ হচ্ছে। সন্ধ্যের পর মাদলের তালে তালে আরো এক উত্তেজনা, সেখানে এখন ধিকি ধিকি নেচে বেড়ায়।

ওষুধপথ্যের অভাবে রোগের সঙ্গে লড়াই-এ বাবা যে হেরে যাচ্ছে বিছানায় মিশে থাকা বাবার রোগা ফ্যাকাসে শরীর দেখে মোতি টের পেল। এই মানুষ একদিন কি তাগড়াই সবল ছিল, মুখে হাসি নিয়ে দিনরাত মোষের মত খাটতো। বেশ সুখের ছিল সে সব দিন। বাড়িতে তখন ওরা ছিল চার ভাইবোন, পরে আরো তিনজন এসেছে। সারাদিন বাবা তাঁত বুনতো। তাঁতের ওঠাপড়ায় তৈরী হতো কত রকমের জিনিস, গরদ মটকা তসর, মাসলাইট, বাফতা রেশম, আরো কতো কি! তখনও দোকানে

হাটে নকশাদার কারুকাজ করা সুতির শাড়ি, বিছানার চাদর, সুতির গামছা কেনাবেচা হতো, ভালো জিনিসের কদরও ছিল খুব। নিত্যদিন লেগে থাকতো মেলা আর হাট। বৃহস্পতিবার রাজনগর তো রবিবার রানীশ্বর, পরদিনই আবার আসনবুনির হাট। গাঁয়ের হাটের চেয়ে বেচাকেনা বেশী জমতো মেলায়। বছরে মেলাও কম নয়। বক্রেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা শেষ করে ঐ রাস্তাতেই দাতাসাহাবের পাথরচাপরির বিরাট মেলা সিউড়ির বড়বাগানের মেলা, বছরে আট দশটা মেলা তো বটেই, বেশীও করতে হতো। কখনো বাসে, কখনো পায়ে হেঁটে, শীতের দুপুরে লালমাটির উঁচুনিচু মাঠ, নির্জন রাস্তা দিয়ে বাবার সঙ্গে অনেকবার মোতি মেলায় গেছে। বাবা পাশে থাকলেও ফাঁকা ধুধু রাস্তায় হাঁটার সময়ে কেমন যেন গা ছমছম ভাব, ঠিক ভয় নয়, মোতির মনে হতো, বাবা যদি মরে যায়, তাহলে কী করে তারা বাঁচবে, কে দেখবে তাদের।

স্বাস্থ্যবান জোয়ান বাবাকে দেখেও কেন যে এমন মনে হতো, সে ব্যাখ্যা মোতি জানে না। মোটঘাট নিয়ে বাবা তৈরী হলে নানা ফরমাস, ফর্দ হাতে হাজির হতো মা, বলতো কতদিন থেকে বলছি বাপু, মুড়ি ভাজার হাতাটা ক্ষয়ে গেছে, ইটো দিয়ে আর চাল ওলান যায় না রুটির তাওয়া একটা চাই, আর শক্ত পারা ছোটো একটা ঝাঁঝরা, যদি সস্তায় মেলে তো একটা পায়াঅলা তালঘষা এনো। একবার কিনলে অমর অক্ষয়, জীবন ভোর চলবে। কাজের জিনিস পরের দোরে চাইতে আমার ভাল লাগে না। দেখো তো ভাঙা মেলায় যদি একটা পঞ্চপ্রদীপ পাও, আর পাথরের একটা নারকেল কোরা, সত্যনারানের পুজোতে লাগবে। ওপাড়ার বমুনমাসি বলছিল।

মাকে থামিয়ে বাবা বলতো, ও মোতির মা, তুমি দেখি রেলগাড়ি চালালে।

বাবার কথা শুনে মা একটু থমকে গেলে বাবা হেসে বলতো, আনার তো ইচ্ছে কিন্তু বেচাকেনার চাপে মনে যে থাকে না।

মোতি এগিয়ে এসে বলতো, আমার সব মনে থাকবে আমি নে আসবো।

মা বলতো, ভুলিস না বাপ।

ইন্দু তখন বছর দশেক, পরের দুই ভাই বোন হাঁটতে শিখেছে। মার হাত ধরে দাঁড়িয়ে তারাও কলবল করে কথা বলতো। ইন্দুর ওপর বাবার স্নেহ ছিল সবচেয়ে বেশী। ইন্দুকে কোলে তুলে বাবা প্রশ্ন করতো, তোর কী চাই মা ?

ইন্দু গড়গড় করে বলতো, কাচের চুড়ি, চুলের ক্লিপ, তরল আলতা।

মেয়েকে বুকে চেপে মাকে বাবা বলতো, গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে ভাঙা মেলায় এসো একদিন। তখন ভীড় পাতলা হবে, আমার হাতেও পয়সা আসবে, পছন্দ মত জিনিসপত্র কিনতে পারবে তোমরা।

নকল রাগে মা বলতো, ভাঙা মেলায় যাবো কেন ? তখন তো যত ঝরতিপড়তি মাল। ওই যে সেবার বড়বাগান থেকে নিয়ে এলে তেরো সিকের হেরিকেন, তেরো দিনও জ্বলল না।

মায়ের মুখের দিকে বাবা অসহায় চোখে তাকালে চওড়া লাল পাড় শাড়ির আড়ালে মুখ টিপে মুচকি হাসত মা।

একমুঠো ভাত মুখে পুরে মোতি একটা লম্বা শ্বাস ফেলল। ঘরের বাইরে ইন্দুর পায়ের শব্দ পেয়ে তাকে ডেকে মোতি বলল, আমার পাতে ভাত তরকারী থেকে গেল খেয়ে নে তুই।

ঘরে ঢুকে কোনো কথা না বলে ইন্দুর দিকে তাকাল মা। ইন্দু কিছুতেই খাবে না। ধমক দিয়ে তাকে খেতে বসালো মোতি। পুরনো দিনগুলো সেই মেলা, উৎসব, সুমধুর নানা স্মৃতি খোঁচাচ্ছিল মোতিকে। হাত ধুয়ে বাবার বিছানার পাশে মোতি বসল। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে তরণীপাহাড়। দুপুর রোদে থমথম করছে লাল মাটি, ফাঁকা মাঠ। ছেলেবেলায় ওই পাহাড় ছিল রূপকথার দেশ, গল্প আর রোমাঞ্চের কারখানা। কিশোর আর অজিত ধরা পরার পর থেকে মোতির কাজ বেড়েছে। হপ্তায় দু' তিন বার তরণী পাহাড়ের চারপাশের গ্রামগুলোতে যেতে হয় তাকে।

পাশ ফিরে বাবাকে শুতে সাহায্য করল মোতি। উঠোনের ছায়ার পাশে ফাঁকা তাঁত ঘর। মোতি যখন কলকাতায়, তখন বিক্রি হয়ে গেছে তাঁত। তাঁত ঘরের মধ্যে পা রাখার হাঁ মুখ শুধু জেগে আছে।

মোতি ভাবছিল, কলকাতায় না গিয়ে সে এখানে থাকলে সংসার হয়তো এমন বেহাল হতো না। তাঁত এবং সংসার দুটোই বাঁচতো। সত্যি কি বাঁচতো? তাঁতিপাড়ার যে সব ছেলেরা ঘরে থেকে বাপঠাকুর্দার সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাজ করেছে, জাতব্যবসা তারাও বাঁচাতে পারে নি। কলকাতায় যাবার আগে কয়েক ছর বাবার সঙ্গে মোতি নিজেও কাজ করেছিল। কী হলো?

ভাদ্র মাস পড়লেই কাঁচা মাল তোলার জন্যে তখন তাঁতিপাড়ায় সাজসাজ রব উঠতো। মরশুমের কাজ শুরুর জন্যে ছেলে বুড়ো মিলিয়ে চার পাঁচ গাঁয়ের বিশ পঁচিশ জন তাঁতি জড়ো হতো চন্ডীমন্ডপে। তারপর শুভদিন দেখে তাঁতি পাড়া ছেড়ে বেড়িয়ে পড়তো তারা। একজন পুরনো, অভিজ্ঞ দলপতির নেতৃত্বে চার পাঁচ জনের ছোটো ছোটো দল গুটি পোকা আর তসরের খোঁজে হাজারিবাগের পাহাড় জঙ্গলে, জামবুনির অরণ্যে, যদুগড়ার পাথুরে এলাকায় ঘুরে বেড়াতো।

হাজারিবাগের ছোটছোট পাহাড়, জঙ্গলের মধ্যে দু' আড়াই মাইলের ব্যবধানে আদিবাসী পাহাড়িয়াদের গ্রাম। তসরপোকার গুটির নাম পোকলু আর পোকলু পালকদের নাম পোকলেখাপী। সারা বছর তাঁতিদের পথ চেয়ে থাকতো পোক লেখাপীরা। নিজেদের গাঁয়ে বাড়িতে আদর তারা করে আতিথ্য দিতো তাঁতিদের, তসর চাষ নিয়ে গল্প গুজব আলোচনা করতো। একটা ভালবাসার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। মোতির মনে আছে, কয়েকটা দিন কি সুখেই কাটতো! তাঁতিরা ছিল যেন ভিনদেশী কুটুম। সব পোকলু বস্তাবন্দী না হওয়া পর্যন্ত তাঁতিদের থাকা খাওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব পাহাড়িয়ারা নিতো। শুধু হাজারিবাগ নয়, যদুগড়াতেও সে খাতির পেতো তাঁতিরা। যদুগড়ার সাঁওতাল আদিবাসীরা গুটিকে বলে লুমাগ। পোন হিসেবে গুটির দরদাম হতো। আঠারো পোনে এক খাড়ি। সারা বছরের সম্বল হাজার হাজার মানুষের জীবিকা কয়েক শ খাড়ি লুমাগ বস্তা বন্দী হতো। গাঁয়ে ফিরে দরকার মতো গুটি ভাগ

করে গ্রুটির দামের সঙ্গে সংগ্রহের খরচ জুড়ে হিসেব নিকেশ হতো। বিছানায় মুমূর্ষ বাবার দিকে তাকিয়ে মোতি ভাবছিল, এই মানুষই কি তার বাবা অবিনাশ কুন্ডু? জাত শিল্পী হিসেবে এই লোকটারই কি খুব সুনাম ছিলো? গুটি কিনে বাড়ি ফিরে বাবা তাঁতে বসে যেতো। মাকে বলতো, আরো কিছু পুঁজি থাকলে বেশ হতো আরো কাহন দশেক তসর কিনতুম।

আঁতকে উঠে মা বলতো, আর দরকার নেই, সকাল থিকে সাঁঝতক তাঁতশালেই তো তাঁত ঠুকছ, বাড়তি দশ কাহন আবার কখন বুনবে শুনি? এই ভাল বাপু।

তোমার কি আক্কেল মোতির মা, বাবা বলতো, সংসার বাড়ছে, জিনিসপত্রের দামও খুব, কাজ বাড়াতে হবে। মোতি বড় হচ্ছে। ও হাত লাগালে, বাপ বেটায় আমরা সাত দিনেই একটা থান বুনে ফেলবো।

মুখে স্নেহ হাসি নিয়ে মোতির দিকে তাকিয়ে মা বলতো, কথাটা মন্দ বলো নাই, আমার সোনার বালা জোড়া বন্দক রেখে বা বেচে দশ কাহন কিনে নাও, ও জোড়াটা রেখেই বা কি লাভ?

হা হা করে উঠে অবিনাশ বলতো, ও দুটো বেচবো না। দেখা যাক, অন্য কী ব্যবস্থা করা যায়!

কথা না বাড়িয়ে মা চলে যেত। বলতো, উনুনের কয়লাগুনান পুড়ছে, হাঁড়িটা বসিয়ে দিগা যাই।

অবিনাশ ঢুকতো তাঁতশালায়। তাঁতের গর্তে হাঁটু পর্যন্ত দু'পা ঢুকিয়ে তাঁত চালাতো ঘটাক চঙ ঘটাক চঙ। বাবার পিছনে দাঁড়িয়ে মোতি কাজ দেখতো, প্রয়োজনের জিনিস এগিয়ে দিত বাবার হাতের কাছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কয়েকশ তাঁতের শব্দে বোঝা যেত তাঁতিরা বেঁচে আছে। তখনও বাজারে এত টেরিকটন, টেরিলিন, স্ট্রেচ, ক্রেপ, ইজিপসিয়ান কটন, নাইলন আসেনি। বিয়ে পৈতে আরো অনেক অনুষ্ঠানে তসর গরদ না হলে চলতো না। দিন বদলালো, টাকার দাম কমে ছ' আনা হলো, বাড়লো জিনিসপত্রের দাম। তসর পোকার দাম বাড়ার জন্যে তসরের কাপড় সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলো। মিলের কাপড়, স্যুটিং সার্টিং-এ ভেসে গেলো বাজার। সস্তায় টেঁকসই জিনিসের জন্যে লোক ছুটল নতুনের পেছনে। তার ওপর কতো নকশা, কতো রঙ, পরে আরাম, তসর চাদরের জায়গা নিলো কাশ্মীরী শাল, জামিয়ার। মা ঘরে ঢুকে মোতিকে বলল, তু এবার যা।

মোতি দেখল মায়ের দুটো সরু হাত একদম খালি। তক্তাপোশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের হাতে পাঁচটা টাকা দিল মোতি। দূরে ছোটো ভাই-বোনদের গলা শুনে মোতি বুঝল, তারা ফিরছে। গরু বাছুর বিক্রি হওয়ার কথা মনে থাকলেও মায়ের হাতের সোনা বাঁধানো শাঁখা জোড়া যে কবে চলে গেল মোতির খেয়াল নেই। ঘরের বাইরে এসে মোতি দেখল, উঠোনের লাউ মাচা শুকিয়ে যাচ্ছে, লতাতে শুরু করেছে সিম বড়বটির গাছ।

মিলের কাপড়ে বাজার ভেসে যাবার পরেও বাবা হাল ছাড়ে নি। ধুঁকতে

ধ্ৰুকতে মেলায় গিয়ে নকশা করা রঙিন তসরের থান, শাড়ি সাজিয়ে বসতো। রঙ আর কারুকাজের নেশায় বাবা তখনও মশগুল। সাজানো জিনিসে ধুলো পড়লে ফুঁ দিয়ে ঝাড়ন লাগিয়ে সাফ করে বাবা বলতো, হাতে বোনা থান শাড়ি, ছেলেমেয়ের চেয়ে কম কি ?

ক্রেতারা হাত দিয়ে কাপড়চোপড় যাচাই করে দাম শুনে হেসে ঠাট্টা মস্করা করতো। বাবার সঙ্গে অপমানে রাগে লাল হয়ে উঠে মতি ভাবতো লোকগুলো কি বোকা! তসর ডাবাতসর, মুগা, বাফতা, শাড়িয়ান, কিছুই না চিনে মিলের কাপড় আর সিন্থেটিক কিনে বাড়ি ফিরছে। দোকানে খদ্দের যত কমে আসছিল, অসহ্য রাগে আক্রোশে কোনো এক অদৃশ্য শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছে ততো বাড়ছিল মোতির। বাবাকে তাগাদা দিয়ে বলতো, চলো বাড়ি ফিরি,

ভাঙা মেলা পর্যন্ত বসে থাকার চেয়ে অবিনাশও পালাতে পারলে যেন বাঁচে, এমন অবস্থা। ঝড়ো কাকের মতো চেহারা, মুখ শুকনো চোখ ঢুকে গেছে ধুলোয় শরীর ঢাকা, তাড়াতাড়ি মালপত্র গুছিয়ে ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরতো সে। বাবার মুখ চোখ চেহারা আর কাপড়ের গাঁটখানা দেখে সব বুঝে মা কোনো প্রশ্ন করতো না। কাঁধ থেকে কাপড়ের গাঁটরা নামিয়ে দুম করে দাওয়ার উপরে রেখে বাবা চেঁচাতো, ইন্দু, ও ইন্দু, কোথা গেলি ?

বাবাকে মদত দিয়ে মা ডাকতো, ও মুখপুড়ি বাবাকে জল দে গা যা।

মুখচোরা ভীতু মেয়েটা এক ঘটি জল বাবাকে দিয়ে অবাক হয়ে ভাবতো, সকলের মেজাজ এতো মারমুখী হয়ে যাচ্ছে কেন ?

মেলা থেকে ফিরে মা-বাবার সামনে দাঁড়াতে ইচ্ছে করতো না মোতির। ঘাটে এসে হাত মুখ ধুয়ে, ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে নিজেকে ঠান্ডা করতে চাইতো সে। রেগে গিয়ে ভাবতো এ সব শিল্পকর্ম বাবার করার দরকার কি ? ওগুলো ধুয়ে কি জল খাবে ? ঘাটের জল পা দিয়ে পুকুরের অনেক দূরে ছুঁড়ে বিকেলের মরা আলোয় দাঁড়িয়ে মোতির মনে হতো, আঠারো বছর বয়স হলো তার। আঠারো বছর কম নয়। সংসারের জন্যে তার অনেক কিছু করার আছে। জলে দাঁড়িয়ে মোতি দেখতো পেতলের ঘড়া নিয়ে দিবাকর কাকার মেয়ে মাধু জল নিতে আসছে। মাধুকে দেখে মোতির বুক কলসির জলের মতো ছলাৎছল শব্দ করতো। মোতি ভাবতো, মাধুকে এখানে রেখে সে কোথায় যাবে ? দু' চোখ ঠেলে কান্না আসতো, মনে হতো, বয়সটা দু চার বছর বেশী হলে মাধুকে নিয়ে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তো সে।

মোতির দিকে না তাকিয়ে পুকুরে নেমে ঘড়া দিয়ে ঘাটের জল দূরে সরিয়ে দিতো মাধু। খালি ঘড়া জলের ওপর দুলতো ধীর চালে।

সেবার মেলা থেকে ফিরে পুকুর ঘাটেই মোতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মাধুর। মোতির সঙ্গে কোন কথা না বলে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পেতলের কলসিতে জল ভরে নিল, মাধু। ভারি আনমনা দেখাচ্ছিল তাকে। মোতির সঙ্গে কথা হাসিঠাট্টা নয়, এক রাশ ঘন কালো চুলের খোপা ভাঙা গড়ার খেলা নয়, বড় অচেনা লাগছিল

মাধবকে। মাধবর গায়ে জল ছিটিয়ে তাকে রাগাবার চেষ্টা করেছিল মোতি। ঝগড়া না করে জলের ঘড়া নিয়ে চুপচাপ ঘাটের দুটো সিঁড়ি উঠে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মাধব বলল, আমার বিয়ে। আর কেনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি বাকি সিঁড়িকটা পেরিয়ে চলে গিয়েছিল সে। পেতলের কলসী থেকে বারকয়েক চলকে এতো জল পড়েছিল যে শুকনো ঘাট জলে থৈথৈ ভিজে গিয়েছিল। মোতির মাথার ঘিলুর মধ্যে কেউ পা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চোখের সামনে পুকুর. জল. পৃথিবী বাঁইবাঁই করে ঘুরছিল। উদ্বেগে বুক আনচান, মোতির ঘুম হলো না সে রাতে। শেষ বিকেলে মাধবর মুখে তার বিয়ের খবর শুনে মোতির সব ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা যেন মরে গিয়েছিল। দু' দিন বাদে বড় বাগানের মেলায় বাবার যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও যাওয়ার জন্যে মোতি খোঁচাচ্ছিল বাবাকে। মাধবর খবর শুনে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে মেলায় যাবার ইচ্ছে উবে গিয়েছিল তার। চুলোয় যাক মেলা, তাঁত তসর. বাফতার সওদা। ঝুপ করে দেওয়ালের মাটি ভেঙে পড়ার শব্দ পেল। শেষ রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখল ঠাকুরদা তাঁতে বসেছে, তাঁত থেকে বেরিয়ে আসছে রাশি রাশি সোনালী রঙের তসরের থান। নাটায় সুতো গোটাচ্ছে ঠাকুমা। ঘটাক চঙ ঘটাক চঙ শব্দের স্রোত। তাঁতি পাড়ার আকাশে কতকাল পরে ভেসে বেড়াচ্ছে এই শব্দ।

পুরোনো দিনের দুঃখের টুকরো স্মৃতি আজও তার মনে আছে। সত্যনারায়ণ পুজোর কথা একদিন সকালে মা তুলতে খেঁকিয়ে উঠে বাবা বলেছিল, রাখো তোমার সত্যনারায়ণ। ও নাড়ুগোপালের ভোগ আমি আর জোটাবো না। কুলুঙ্গি থেকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো একদিন।

ভয়ে কালো হয়ে যেত মায়ের মুখ। কোন সাড়া করত না মা। মায়ের অসহায় মুখ, ফুলে ওঠা ভারি পেটের দিকে তাকিয়ে মোতির মনে হয়েছিল মায়ের পৃথিবী যেন ভেসেগেছে। দেওয়ালে অনেকগুলো ঠাকুর দেবতার ছবি। কালী, চন্ডী, শিব, রামকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্টের ছিল পাশাপাশি হাওয়ায় দুলছিল। নানা সময়ে বিভিন্ন মেলা থেকে এই ছবিগুলো কিনেছিল মোতি। মোতি দেখল ছবিগুলোর শরীরে ধুলো, অনেকদিন পরিষ্কার করা হয়নি। সারাদিন কান্না দলা পাকাচ্ছিল তার গলায়, বুকের মধ্যে অসম্ভব জ্বালা। সে রাতেই মোতি ঠিক করেছিল বড়বাগানের মেলা থেকে বাড়ি না ফিরে বাবার চোখে ধুলো দিয়ে শহরে চলে যাবে সে। এতো অভাব কষ্ট সহ্য করতে পারছিল না মোতি।

পিঠে হাত দিয়ে মা ডাকতে মোতি দেখলো ঘরের বাইরে দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠোনে ভাইবোনদের গলার শব্দ। তারা খেলছে। আকাশে মরা আলো, ঘন ছায়া নেমেছে পৃথিবীতে। বাড়ির পেছনের বাঁশ বাগানের ভেতর দিয়ে কারা যেন আসছে। পায়ের শব্দ শুনে সজাগ হয়ে উঠল মোতি। বাড়িতে আজ আত্মীয় কুটুম আসার কথা নয়। এলেও খিড়কির পথে নয়, সদর দরজা দিয়ে সকলে আসে। ঠিকঠাক ব্যাপারটা বোঝার আগেই নাম ধরে কেউ ডাকল। তাড়াতাড়ি গিয়ে মোতি দেখল বুধন আর লখাই দাঁড়িয়ে আছে। লখাইয়ের পেছনে একটা কুকুর।

চার

অফিসের শেষ দিনটা কিশোরের মনে পড়ছিল। তার চিঠি পড়ে বেশ ঘাবড়ে গিয়ে হরিপদবাবু ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তার। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছিল। ফ্যানের হাওয়ায় হরিপদবাবুর দু'আঙুলে ধরা কিশোরের চিঠিটা কাঁপছিল। ফাঁকা ঘর। চশমার মোটা কাচের আড়াল থেকে হরিপদবাবুর দুটো ফ্যাকাশে চোখ কিশোরকে দেখছিল, একটু অস্বস্তি নিয়ে কিশোর বলেছিল, যাই।

কিশোরের কথা শুনে নড়েচড়ে বসে চিঠিটা ভাঁজ করে পেপার ওয়েটের তলায় রাখল হরিপদবাবু। ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চম্যানেজারের পি এ ছিল হরিপদ। টেবিলের ওপর টাইপরাইটার নিয়ে ছোট একটা ঘরে হরিপদবাবু একা বসতো। টাইপরাইটার রোলারের মধ্যে আধখানা টাইপ করা একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে, সামান্য কেশে হরিপদ জানতে চেয়েছিল, বেটার চান্স ?

আবছা হেসে কিশোর বলেছিল, তেমন কিছু নয়।

তবে ?

কিশোরকে খুঁটিয়ে দেখছিল হরিপদ। কিশোর চুপ।

অসহায় মুখে হরিপদ প্রশ্ন করেছিল, ভাল করে ভেবেছ ?

হ্যাঁ।

আরো দিন সাতেক সময় নাও। চাকরী যখন খুশী ছাড়তে পারো। তার আগে আরো একটু ভাবো।

ভাবার কিছু নেই, কিশোর বলেছিল, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটা তাড়াতাড়ি চাই।

আর কথা না বলে টেবিলের ওপর দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে হরিপদ বলল, সাহেবকে জানাবো।

দু' চোখ বুজে কিছু ভুলতে চাইছিল হরিপদ। বাবার বয়সী মানুষটার মুখ দেখে মায়া হলো কিশোরের। ভাল মানুষ হরিপদবাবু পছন্দ করতো কিশোরকে। কানাঘুষোয় কিশোর শুনেছে তাকে জামাই করার জন্যে হরিপদর বাসনা আছে। পাকা চাকরি কিশোরের। এই বয়সে সে এসিস্টান্ট ক্যাশিয়ার হয়েছে। কিশোরের চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তে দুঃখ পেয়েছিল হরিপদ। হরিপদর ঘরের বাইরে তখন খদ্দেরের ভীড়। ব্যাঙ্কের কাজ চলছিল পুরোদমে। কাচ লাগানো বন্ধ দরজা ফুঁড়ে কথা গুঞ্জন ঢুকছিল। হরিপদর ঘরে আর বসে না থেকে বন্ধ দরজা ঠেলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল কিশোর। হরিপদ তখনও দু' চোখ বুজে চেয়ারে বসে আছে। নিজের জায়গায় ফিরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে ছিল কিশোর। জোরকদমে টাকা লেনদেন হচ্ছে। চেয়ারের পাশে অজিতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে নিয়ে দোতলার ক্যানটিনে

এসে চা খেলো দুজনে। মোতি গ্রামে যাবার পর থেকে ক্যানটিনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। অজিত আসায় অনেকদিন বাদে ক্যান্টিনে ঢুকল কিশোর।

মোতি ছিল ক্যানটিন বয়, টেবিলে টেবিলে খাবার পৌঁছে দিত। কিশোরের একমাস আগে ক্যানটিনের চাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিল মোতি। কিশোরের অফিসে প্রথম বিপ্লবী মোতি, সে চাকরী ছেড়ে গ্রামে যাবার পথ দেখিয়েছে! ব্যাঙ্কের একতলায় কাজ চলেছে একনাগাড়ে, মানুষজন যাতায়াত করছিল। কিশোর সাতদিন ছুটি নেওয়ায় তার চেয়ারে বিদ্যুৎ বসছিল। সাতদিন ছুটি ফুরোতে চাকরী ছেড়ে দিয়েছিল কিশোর। ব্যাঙ্ক ছেড়ে চলে গেলেও কিশোর জানতো সব কিছু সহজ স্বাভাবিক, জীবন চলছে, ব্যাঙ্ক চলছে, চলবে, কারো জন্যে কিছু আটকায় না পৃথিবীতে।

হারুদার গলার শব্দে সজাগ হলো কিশোর। চট দিয়ে দু' ভাগ করা এই ঘরের এক কোনে রান্নাঘর। রান্নাঘরে রুটির জন্যে আটা মাখছে হারুদা। হারুদা খুকখুক করে কাশতে কিশোর বুঝলো সর্দি কাশি হয়েছে মানুষটার। পুরোনো দিনগুলো কেন যে এমন মনে পড়ে কিশোর ভেবে পেল না। আবছা তন্দ্রার আকাশে এক ঝাঁক ধূসর পাখির মতো কিশোরের মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে স্মৃতি।

ভোরবেলায় কিশোর যখন কলকাতায় এসে পৌঁছোলো, তখনও রাস্তায় ভীড় কম, কলকাতা জুড়ে ছাই রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশা ঝুলছিল। হাওড়া ব্রিজ থেকে গঙ্গার খোলা স্থির জল দেখেছিল কিশোর। স্টেশন থেকে সোজা এসে উঠেছিল হারুদার ঘরে। হারুদার ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে ভেজানো থাকলেও সব সময় খোলা, তালাচাবির বালাই নেই। টিনের পাত লাগানো ঘরের বন্ধ দরজার ওপর একটা ময়লা ধুতি ঝুলছিল। ধুতি সরাতেই দরজার টিনের ওপর চকখড়িতে গোটা গোটা হরফে লেখা হারুদার নোটিশ, রেশন দোকানে যাচ্ছি, আধঘন্টার মধ্যে ফিরবো, কিশোর দেখতে পেল। নোটিশ পড়ে খুশী হয়ে দরজার ওপর ধুতিটা আগের মতো ঝুলিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল কিশোর। ঘরের খরখরে সিমেন্টের মেঝে মাজা বা পালিশ হয়নি। তক্তাপোশে ময়লা চিটচিটে বিছানা। ধুলো নোংরায় ভর্তি ঘরের দেওয়ালের কাঠের তাকে কাচের তৈরী কয়েকটা বড় জার। ঘরের মাঝখানে চটের পর্দা থাকলেও জানালায় পর্দা নেই।

শুধু পর্দা কেন, কোন জানলাতে পাল্লা নেই। শুধু পাঁচটা লোহার শিক তিনটে জানলায় লাগানো রয়েছে। নতুন হলেও বাড়িটা পুরো তৈরী হয়নি। বাইরেটাও তাই। দেওয়ালে বালি সিমেন্ট নেই, রঙ হয়নি। গত দশ বছর এভাবে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। হারুদার ঘরের দুটো জানলা রাস্তার দিকে, একটা জানলায় দুটো আয়না মুখোমুখি এমন ভাবে লাগানো যে রাস্তার দু' দিকের মানুষের আসা যাওয়া বিছানায় শুয়ে দেখা যায়। সতর্ক হারুদা রাস্তায় নজর রাখার জন্যে এই কল বানিয়েছে। ছ' ভাই-এর বাড়ি। হারুদার ভাগে দোতলার এই ঘর। একতলায় কিছু ড়াভাটে আছে। বাড়ির মধ্যে লোকজনের কথা, কল থেকে জল পড়ার শব্দ শুনতে পেল কিশোর। ফাঁকা ঘরে হারুদার বিছানায় শুয়ে তার আসার জন্য অপেক্ষা

করছে কিশোর। ময়লা বিছানায় হারুদার ঘামের নোনা গন্ধ। হারুদার পায়ের শব্দে কিশোরের আবছা তন্দ্রা ছুটে গেল। কিশোরকে দেখে হারুদা অবাক। ফর্সা গোলগাল চেহারা, মাথা জোড়া টাক, লুঙি হাফ শার্ট পরা হারুদা এক লহমা কিশোরকে দেখে হেসে প্রশ্ন করল. কি ব্যাপার, কোথা থেকে ?

কিশোরের উত্তরের অপেক্ষা না করে গায়ের জামা খুলে দড়িতে রাখল হারুদা। হারুদা গায়ে জামা রাখতে পারে না। বেশীরভাগ সময় হারুদার খালি গা, জামা পরলে হারুদার সুড়সুড়ি লাগে।

চা খাবে, জানতে চাইল হারুদা।

হ্যাঁ।

চা বানিয়ে দুধ না থাকায় কালো চা বিকারে ভরে হারুদা এগিয়ে দিলো। কিশোরের চেনা. বিকারগুলো অনেকদিন এ ঘরে আছে। হারুদার বাবার কেমিক্যালের ছোটো কারখানা ছিল. বাবা মারা যাবার পর ছেলেরা কেউ না দেখায় কারখানা যখন উঠে গেল. তখন সেখানকার নানা জিনিস ঢুকেছিল ছয় ভাইয়ের ঘরে। হারুদার ঘরের কাচের জার আর বিকারগুলো সেই কারখানার সম্পত্তি। মরার আগে হারুদার বাবা বাড়িশেষ করতে পারে নি। বাড়ির কথা উঠলে হারুদা বলে. বাড়িটা পুরোপুরি না বানিয়ে ভালই হয়েছে, ট্যাক্স কম লাগে।

বিয়ে করেনি হারুদা। কিশোরের একটু খ্যাপাটে মনে হয় মানুষটাকে। ভায়েদের মধ্যে যোগাযোগ কথাবার্তাও কম। হারুদার ঠিক সামনের ঘরের যে দাদার ঘর, সে সারাদিন অংক করে। তার ঘরেও টিনের দরজার ওপর নীল কালিতে থার্মোডায়ানামিক্সের তৃতীয় সূত্র প্রকৃতির টানা পোড়েন কখনো কমে না। অবস্থা স্বাভাবিক রাখলে সেটা স্থিতাবস্থায় থাকে. লেখা, সূত্রের তলায় একটা কঠিন অংক। হারুদার সঙ্গে সময় কাটানোর একটাই সুবিধে যে কথা বলার দরকার হয় না। একা হারুদা কথা বলে যায়। যাকে বলল, তার শোনা না শোনা নিয়ে হারুদা মাথা ঘামায় না, প্রশ্নও করে না। কিশোরও কিছু শোনে কিছু শোনে না। নিজের মেজদার গল্প বলছিল হারুদা। ঊনিশ'শ সাতান্নয় ত্রিবেণীর কাছে যে জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল. সেই ডুবো জাহাজের খোঁজে আজ দু' মাস হলো মেজদা বাড়ি থেকে বেড়িয়েছে। জাহাজকম্পানী জাহাজটা তুলতে না পারায় নিলাম করছে আগামী মাসে। মেজদা দর দেবে। জাহাজ ভর্তি আছে তামার বার।

হারুদার মেজদাকে কিশোর চেনে। একই পাড়ার লোক, না চেনার কারণ নেই। গত বিশ বছর ধরে একটা তাগড়াই সুযোগ খুঁজছে মেজদা। বি. ই কলেজ থেকে ফেরার পথে বছর তিন আগে বোটানিকাল গার্ডেন্সের কাছে মাঝ দুপুরে মেজদার সঙ্গে কিশোরের দেখা হয়েছিল একবার। লঞ্চ ধরার জন্য নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটছিল কিশোর। গঙ্গার ধার ঘেঁষে লম্বা ঝাঁকড়া গাছ মানুষজন ছিল না। চারপাশ চুপচাপ, ঝিরঝির হাওয়া বইছিল। কয়েকটুকরো ইট হাতে জলের ধারে কাদার উপর মেজদাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব অবাক হয়েছিল কিশোর। ঘোলা জলে মেজদা এক টুকরো ইট ফেলতে সামান্য জল ছিটকে কয়েকটা বুদবুদ জাগল। শব্দ করে কিশোর নিজেকে জানান

দিতে চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে মেজদা দেখেছিল কিশোরকে। সামান্য বিস্ময়ের পর মেজদার চোখ মুখ সহজ হয়ে উঠল। কিশোরের কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় মেজদা বলল, উনিশ'শ তেষট্টিতে সেনট্রাল ইনল্যান্ড কোম্পানীর একটা লঞ্চ, নাম মধুকর, চাটগাঁ থেকে আসার পথে এখানে ডুবে গিয়েছিল। লঞ্চের মধ্যে পাঁচশ বস্তা স্টেনলেস স্টিলের বাসন ছিল। প্রায় দু শ টন ওজনের সেই লঞ্চটাকে দায়সারা ভাবে তোলার চেষ্টা করে কম্পানী পারে নি। পনেরো দিন পরে সেই ডুবো লঞ্চের নিলাম হবে। উত্তেজনায় মেজদার দু' চোখ চকচক করছিল. মেজদা বলেছিল. দারুন সুযোগ।

কথাটা বলে আবার এক টুকরো ইট জলে ফেলে বিড়বিড় করে হিসেব করে মেজদা বলল, সাত সেকেন্ড।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হিসেবটার ব্যাখ্যা দিয়ে বলল, বুদবুদ গুণে জল মাপছি। আমার হিসেব যদি ঠিক হয়. ডুবো লঞ্চ আমি তুলবোই।

কিশোরের সময় ছিলনা। সে বলল, আমি চলি।

কিশোরের পাশাপাশি কিছুটা হেঁটে মেজদা বলেছিল, খবরটা যেন পাঁচ কান না হয়।

সে ডুবো লঞ্চ যে কোনো কারনে কেনা হয়নি। হারুদা বলল, তিনটের সময় এঘরে মিটিং আছে।

কলকাতায় কাজের ছকটা ভাবছিল কিশোর। কাছেই তার বাড়ি। শহর ছাড়ার আগে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে যাবে। হারুদার মুখে মিটিং-এর কথা শুনে কিশোর কান খাড়া করল। হারুদা বলল রতনদের গ্রুপের মিটিং।

শুনে কিশোর দমে গেল। রতন পার্টির বাইরে আলাদা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর লোক। কিশোরও আগে ছিল সেই গোষ্ঠীতে। পরে বেড়িয়ে এসে পার্টিতে যোগ দিয়েছে। কিশোরের সুবাদেই হারুদার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল রতনের। কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে হারুদা বলল, অসুবিধে কীসের? রতন তো তোমার বন্ধু।

কিশোর চটে গেল। হারুদা বোকা না ভাঁড়? সমস্ত দল গ্রুপের সঙ্গে কেন যে ওর এত মাখামাখি কিশোর বুঝতে পারল না। এ বাড়ি ছেড়ে এখনই কোথাও চলে যাওয়া দরকার। কোথায় যাওয়া যায়. কিশোর ভাবতে লাগল।

পার্টির সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করে কাজের রিপোর্ট দেবে কিশোর। সারা দেশ জুড়ে যে লড়াই চলেছে, তার অভিজ্ঞতা শিক্ষা পার্টির পরামর্শ নেবে। কিন্তু শহরগুলো হঠাৎ এমন তেতে উঠল কেন? গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে এ মুহূর্তে শহরে কর্মসূচি নেওয়ার কথা ছিল না। ভারতবর্ষে কমবেশী পাঁচ লক্ষ গ্রাম. বাইশ শ শহর। শহরগুলো শত্রুর ঘাঁটি। জনযুদ্ধের তত্ত্ব অনুযায়ী এখানে অনেকদিন চুপচাপ মাটি কামড়ে পড়ে থেকে গণআন্দোলন. গণ সংগঠন করতে হবে। গ্রামগুলো মুক্ত হলে তারও পর শুরু হবে শহরের লড়াই। শব্দ করে চা খেতে খেতে হঠাৎ চমকে উঠে হারুদা বলল, পল্লব আসছে।

কোথায়?

প্রশ্ন করে সোজা হয়ে বসল কিশোর। চায়ের বিকার হাতে জানালার আয়নার

দিকে আঙুল তুলে হারুদা দেখালো পল্লবকে। আয়নায় কিশোর দেখতে পেল পল্লবকে। কিশোরের মাথা ঝাঁঝাঁ করছিল। হারুদাকে বলল, নিচে গিয়ে ঠেকান পল্লবকে।

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে চটপট নিচে নেমে গেলো হারুদা। কিশোরের কপালে ঘাম জমছিল। গরম চায়ে পুড়ে জ্বলছিল জিভের ডগা। এখানে থাকা যাবে না, কিশোর ভাবল। হারুদার বিরুদ্ধে এক রুক্ষ রাগ ছড়িয়ে পড়ল কিশোরের মাথায়। যে লাল ঝাণ্ডা গ্রুপের সঙ্গে পল্লবের সম্পর্ক সেই গ্রুপ পার্টির বাইরে, পার্টির সঙ্গে তাদের বনিবনা নেই। আজকের পরিস্থিতিতে পার্টিতে না ঢুকে যারা আলাদা গ্রুপ রেখেছে, তারা শুধু পার্টির নয়, সাধারণ মানুষেরও শত্রু। এদের সঙ্গে হারুদা সম্পর্ক রাখছে কেন? হারুদার আচরণ খুব দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মতো লাগছিল কিশোরের। পল্লবকে ঠেকাতে হারুদা নিচে যাবার পরে অনেক সময় সে না ফেরায় কিশোর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। কিশোর ভাবছিল, এই রতন, পল্লব একদিন কতো কাছাকাছি ছিল, এক ঘরে, এক বিছানায় রাতের পর রাত পাশাপাশি শুয়েছে, ভাগাভাগি করে খেয়েছে মুখের ভাত। সম্পর্কের ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায় জেনেও কি একটা খিঁচ থেকে গেল কিশোরের মনে। রতন আর পল্লব শত্রুতা বেইমানি করবে, পুলিশে খবর দেবে, ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল কিশোরের। তার চেয়ে রতন, পল্লব কম জ্বলছে না। রতন পল্লবের সঙ্গে আরো অনেকের মুখ কিশোরের মনে পড়ল। কামাক্ষাদা আজ সংশোধনবাদী, অধঃপতিত। অথচ এই লোক একদিন বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছিল কিশোরের কানে।

রাজাবাজার বস্তিতে দিন নেই রাত নেই পড়ে থাকতো কামাক্ষাদা। সারাজীবন বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন করেও একটা বিড়ি খায়নি। উনিশ'শ চৌষট্টি সালের দাঙ্গার সময়, সে রাতের কথা আজও কিশোরের মনে আছে, মুসলমান বস্তিতে দাউ দাউ আগুন, বাঁশ ফাটার ফটফট শব্দ, রাতের কালো আকাশ ফুটো হয়ে রক্তের ঢল নেমেছে, কান্না চিৎকার হৈ চৈ। পার্টির নির্দেশে কামাক্ষাদার সঙ্গে কিশোরও রাজাবাজারে পাহারা দিচ্ছিল। যে কোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রীতি রাখতে হবে। রাজাবাজারে কামাক্ষাদার দু' তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কিশোর। হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটা বোমা ছুটে এসে ফাটল কামাক্ষাদার ঘাড়ের উপর। একটু দূরেই ছিল পুলিশ চৌকি, মজা দেখছিল তারা। দাঙ্গাবাজ লুঠেরারা পালাল, কেউ আটকাল না। বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পরে গিয়েছিল কামাক্ষাদা। ঘাড়ের মাংস থ্যাঁতলানো, রক্ত ঝড়ছিল কান থেকে। হাসপাতালে প্রায় দুমাস থাকার পর কামাক্ষাদা যখন বাড়ি ফিরল তখন একটা কান একদম কালা, অন্যটার শ্রবণশক্তিও কমে গেছে অনেক। সেই কামাক্ষাদা, সংশোধনবাদী শাসকশ্রেণীর উমেদার, ভাবতে কিশোরের বুক ভারি হয়ে ওঠে। কামাক্ষাদার সঙ্গে কিশোরের অনেকদিন কথা বন্ধ। রাস্তায় মুখোমুখি হলে দু জনই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

আজীবন একটা মানুষের পক্ষে বিপ্লবী থাকা খুব শক্ত কাজ। সততা তেজ নিয়ে জীবনের কয়েকটা বছর কাটাবার পর কিভাবে যেন এই সব গুণাবলির ধার কমে আসে, সেগুলো মরে যায়। একজন মানুষের আদর্শ তেজ ঝরে গেলে ইতিহাস তাকে

ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ভুলে যায়। চিতার আগুনেও যার বুকের আগুন পোড়ে না, সময় তাকে সেলাম করে, মনে রাখে। যে মানুষ তবু কিছুকাল লড়েছে, মৃত্যুর সঙ্গে হাতাহাতি পাঞ্জা কষেছে, তার কথা কি পুরোপুরি ভুলে যাওয়া সম্ভব? সে তার অধঃপতনের জন্যে দুঃখ হলেও তাকে কি অস্বীকার করা যায়? রতন পল্লব কি অধঃপতিত, দলছুট কামাক্ষাদা কি চেন বাঁধা কুকুর? এসব তীক্ষ্মধার প্রশ্নে কিশোর ভারি ক্লান্তি বোধ করছিল। একটু আগে হারুদা যখন রতন পল্লবকে বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছিল, হেসেছিল কিশোর। মনে মনে ভেবেছিল, হারুদা হলো পয়লা নম্বরের বুর্জোয়া লিবারাল। দুনিয়ার সকলেই বন্ধু। পুরোনো লোকদের এই এক অসুবিধে। তাদের বেশীরভাগ ভন্ড, দুমুখো। মুখের সামনে হেসে গলে যাবে, আড়ালে গাল দেবে। এই নীতিহীন বন্ধুতা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা। ভাল-মন্দকে সোজাসুজি চেনা, দুটোর সীমানা পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত। না করলে ক্ষতি হয়, লড়াই ঝিমিয়ে পড়ে, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলকে কোলাকুলি করার পেছনে এক বিপজ্জনক অভিসন্ধি থাকে। বয়স্ক মানুষেরা বেশীর ভাগ এই গূঢ় অভিসন্ধি মাথায় রেখে সব কাজ করে ভাল এবং মন্দ দুটো গাছের ফল, দুধ এবং তামাক, সবই তারা খেতে চায়। ফলে আদর্শগত লড়াইয়ে তাদের দ্বিধা হয়, কাউকে তারা চটাতে চায় না। সকলেই ভাল, বন্ধু, বিপ্লবী, এ ধরনের একটা হাওয়া তুলে সকলের কাছ থেকে কিছু সুবিধে বাগিয়ে নেবার এক ধুরন্ধর কৌশল তারা রপ্ত করেছে।

এইসব মুহূর্তে কিশোরের বুকে এক ভয়ঙ্কর জ্বালা কাজ করে, এক অদৃশ্য রাঁধুনী ফুটন্ত তেলের কড়াতে তার হৃদ্‌পিন্ডটা ভাজছে, এ রকম কষ্টকর অনুভূতি জাগে। বহুকাল আগে যখন সে শিশু, বাবা মার সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল, সেই ছেড়ে আসা দেশের ভূ-প্রকৃতির আবছা ছবি কিশোর দেখতে পায়। আকাশ থেকে নেমে আসা একটা ঘন সবুজ বৃত্ত তখন তার চারধারে জেগে ওঠে। কিশোর দেখে, ভয়ে কুঁকড়ে জনস্রোতে ভেসে মা বাবার সঙ্গে একটি শিশু কুটোর মতো কলকাতায় আছড়ে পড়ল। তারপর নানা দুঃখ, কষ্টে হু-হু করে যে শিশু বেড়ে উঠল, বড় হওয়ার সঙ্গেই সে বুঝেছিল, গরিবের ঘরে বেশীদিন শিশু থাকা যায় না। অভাব অনটন দারিদ্র একজন শিশুকে তাড়াতাড়ি বুড়ো করে দেয়।

অচেনা শহর। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে শহরে আসা ছিন্নমূল সংসারটির পায়ের তলায় মাটি পেতে সময় লেগেছিল অনেক। তবু ক্ষোভ আর বেদনা কিশোরের মাথার মধ্যে অবিরাম ধিকধিক করতো। অসংখ্য তীক্ষ্ম প্রশ্ন দিন রাত অস্থির করে তুলতো তাকে। দেশটাকে দু' টুকরো করার অধিকার কে দিল? কেমন করে আমার পিতৃভূমি রাতারাতি বিদেশ হয়ে যায়! এক হানাদারি ভয়ে শুকিয়ে উঠতো তার গলা বুক, মনে হতো, যারা পিতৃভূমি দ্বিখন্ডিত করে, বেচে দেয়, তারা হয়তো একদিন বাড়ি থেকে জোর করে তার মাকে ধরে নিয়ে যাবে। অসহায় বিপন্নতায় হু-হু করে উঠতো কিশোরের বুক। খবরের কাগজে তখন প্রায়ই গান্ধী, নেহেরু, জিন্না এবং আরো অনেক নেতার ছবি ছাপা হতো। মাঝরাতের

দুঃস্বপ্নে কিশোর দেখতো যে নেতাদের কেউ একজন এসে 'ঘর থেকে তার মাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে আতঙ্কে ডুকরে উঠে কিশোর জড়িয়ে ধরতো মাকে। আরো বড় হয়ে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার অধ্যায় পড়ে উতলা হতো কিশোর। পাশার আসবে রিক্ত নিঃসম্বল যুধিষ্ঠির, শেষ বাজী হিসেবে দ্রৌপদীকে আসরে হাজির করেছিল তারপর পাঁচ স্বামী বেচে দিল স্ত্রীকে! দ্রৌপদীর ছেলেরা তখন কী করছিল ?

বুকের মধ্যে ক্ষোভ, অসহায়তা নিয়ে বড় হওয়ার জন্যে কথা কমে গিয়েছিল কিশোরের মুখে। তাই চিরকাল সে স্বল্পবাক। কিন্তু দু' চোখের কালো মণিতে আপসহীন দুঃসাহস। কিছু একটা করার আছে, করতে হবে, এ তাগিদ অহরহ মাথার মধ্যে কাজ করতো। পুরোনো যুগের মানুষ আর নেতাদের কথায় কোন মিল নেই, তারা স্বাধীনতা আনার অহংকারে ফুটছে, যেন স্বাধীনতার জন্যেই স্বাধীনতা, দেশ গঠনের কাজ শেষ। এই দায়িত্বহীন প্রবাহ, ফাঁকি কারচুপিতে ভরা। এই স্রোতের সঙ্গে কিশোর মেলাতে পারলো না নিজেকে। বয়স্ক মানুষ আর আত্মীয়দের মুখে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা, শহরে গাঁয়ে হাজার হাজার মৃত মানুষের পচা গলা দেহ, রাস্তায় একটু ফ্যানের জন্যে বুক ফাটা কান্নার গল্প শুনে আড়ষ্ট, কাঠ হয়ে যেত কিশোর। এক মেসোমশায়ের মুখে ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গার কথাও শুনেছিল কিশোর। হিন্দু মুসলমান, দু' সম্প্রদায়ের লোকই মার মার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পরস্পরের ওপর। গঙ্গার ধারে হাওড়া ব্রিজের তলায় কয়েকশ লাশ, শরীর থেকে মাংস খসে পড়ছে। ব্রিজের মাথায় শকুনের দল তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল। কামাক্ষাদার মুখ থেকে অগ্নিগর্ভ তেলেঙ্গানা আর কাকদ্বীপের গল্প কিশোর শুনেছিল। তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপের কাহিনী গোষ্ঠদাও প্রায়ই বলতো। ত্যাগ, সাহস শৌর্যে উজ্জ্বল বাস্তব, অথচ রূপকথার মতো সে কাহিনী। কাকদ্বীপ সংগ্রামের নেত্রী কৃষক বধূ গর্ভবতী অহল্যার পেটে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়েছিল পুলিশ। দক্ষিণ বাংলার চারণকবি গান বেঁধেছিলেন,

অহল্যা মা তোর সন্তানের জন্ম হলো না
মাঠে মাঠে হাজার সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা

কামাক্ষাদার গলায় এ গান শুনে কিশোরের মনে হতো, নদী পাহাড় অরণ্য জনপথ ঝাঁপিয়ে এক দামাল হাওয়া ছুটে আসছে।

ইতিহাসকে সরাসরি সজ্ঞানে চোখে দেখল উনষাট সালে। সকালবেলায় কাগজে কালো বর্ডার দেওয়া শহিদের ছবি স্বাধীনতা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কিশোরের বাবা স্বাধীনতা কিনতেন হারুদার কাছ থেকে, পাড়ায় এক বাড়ির দেয়ালে সাঁটা হতো স্বাধীনতা। পুলিশমন্ত্রীর একটা ছবি, গোরিলার মতো মুখ, ফোকলা দাঁত, ঝোলা গোঁফ, রসগোল্লা খাচ্ছে, স্বাধীনতায় ছাপা হয়েছিল এক সকালে। ছবির তলায় মন্ত্রীর বাণী, দেশে খাদ্যের অভাব নেই। ছবিটা আজও কিশোরের মনে আছে। খেতে চাওয়ার অপরাধে যে একাশি জন মানুষ শহিদ হয়েছিলেন, তাদের অনেকের ছবি স্বাধীনতা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। রোজ সকালে কাগজ খুলে মৃত মুখের মিছিল

দেখে কিশোর ভাবতো, কেন এমন হয়, এমন হবে? অনেক পরে বুঝেছিল সামাজিক নিয়মগুলো। বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা অহিংসার কথা বলল, গোলা বারুদ অস্ত্রকে ঘৃণা করতে শেখালো, স্বাধীনতার পর দেশশাসনের জন্যে হিংসা, অস্ত্র ছাড়া তাদের অন্য কোন রসদ নেই।

উনিশ'শ বাষট্টি সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় কিশোরের নতুন এক অভিজ্ঞতা হলো। পুরোনো বন্ধু, প্রতিবেশী, এক দেশের বিরুদ্ধে হিংসা, ঘৃণা ঘুলিয়ে উঠতে থাকল। প্রচার হলো, ইঁদুর, আরশোলাখেকো চীনারা অসভ্য, বর্বর, বিশ্বাসঘাতক। দরকার হলে চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একশো বছর যুদ্ধ করবে ভারতের মানুষ।

চীনবিপ্লব ও নতুন চীন সম্পর্কে পরিচিত বয়স্কদের মুখে, দেশী বিদেশী লেখক, সাংবাদিকের লেখা পড়ে কিশোর যা জেনেছিল, প্রচারের তোড়ে সব ভেসে যাবার দশা হলো। চীন দেখে মুগ্ধ ভারতীয় লেখক সাংবাদিকরা যে সব বই লিখেছিল, যুদ্ধের জিগিরে সে সব লেখা বাজার থেকে তুলে নিয়ে তারা বিবৃতি দিল, চীনে তারা যা দেখেছে, সব ভুল। চীনারা আসলে যুদ্ধবাজ। স্বাধীনতা, শান্তির পয়লা নম্বর শত্রু তারা।

গুণিজনের বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রচারের আগে দেশে জারি হয়েছিল জরুরী অবস্থা। সীমান্ত সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কমুনিস্ট পার্টির যে একাংশ চাইছিল, জেলে ঢোকানো হলো তাদের। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হলো ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙের নাম।

বুকচাপা, কণ্টকর সেই পরিবেশে কিশোর বুঝতে পারলো, কমুনিস্টদের সঙ্গে তার মনের কোথাও মিল আছে।

রাস্তা থেকে পল্লবকে বিদায় করে ঘরে ফিরতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় নিল হারুদা। কাল সারা রাত ট্রেনে গাদাগাদি ভীড়ে ঘুম না হওয়ায় হারুদার বিছানায় বসে কিশোর ঢুলছিল। বিছানার সামনে মেঝেতে বসে একটা পুরোনো মোটরের আর্মেচারে তামার তার জড়াতে জড়াতে নিজের মনে হারুদা বলছে, এতো ভাগ, দলাদলি ভালো লাগে না। সমস্ত বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকে মেলাবার দায়িত্ব বিপ্লবীদের। অথচ তাদের মধ্যে খেয়োখেয়ির শেষ নেই! কেন এতো দলাদলি ঝগড়া আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ বলেই বোধহয় বুঝতে পারি না। কিন্তু দেশে আমার মতো লোকই তো বেশি। বেশীরভাগ লোক যে কাজ বুঝতে পারে না, সে কাজের দাম কি? ফাঁকা ঐক্যের কথা বলছিনা আমি। নীতি আর আদর্শ নিয়েই জোট বাঁধতে হবে। কিন্তু তার মানে, কমুনিষ্ট নীতি আদর্শই সেরা, বাকি সব ফালতু, ভুষি একথা ভাবা ঠিক নয়। আদর্শের জোর কমুনিষ্টদের সবচেয়ে বেশি বলেই নরম, সহনশীল হতে হবে তাদের।

আবছা ঘুম, ঢুলুনির মধ্যে হারুদার সব কথা কিশোরের কানে ঢুকছে না। তন্দ্রার সঙ্গে তার মাথায় বয়ে যাচ্ছে চিন্তাস্রোত। স্বাধীন দেশের নাগরিকের সুখ শান্তি, মর্যাদা, কিছুই সে পায়নি। দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তুর স্রোত, বেকারী, খরা, বন্যার নিরবচ্ছিন্ন

সংকটের মধ্যে তার জন্ম, বড়ো হওয়া, বেঁচে থাকা। গরু, ছাগলের চেয়ে এ দেশে মানুষের দাম যে কম, সে জেনে গেছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে খবরের কাগজ, রেডিও, জনসভায় যতো বিবৃতি, বক্তৃতা, সে শুনেছে, পড়েছে, তার একভাগ কাজ হলে দেশের মানুষ বেঁচেবর্তে থাকতো। তা হয়নি। কোনদিন যে হবে, সে ভরসা নেই।

বহু বছর পরে হঠাৎ কিশোরের মনে পড়লো ঠাকুর্দার কথা। সাধারণ ছাপোষা ঠাকুর্দার পেশা ছিল যজমানি। লাঠি হাতে পাকাচুল সেই বুড়ো মানুষটা শীতের দুপুরে নাতিনাতনিদের নিয়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে রোদ পোহাতো। সামনে ফসল কাটা ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে দাদু প্রায়ই বলতো ; এতো টাকা পয়সা, ভূসম্পত্তি, দাপট, প্রভাব সত্ত্বেও কোথায় মিলিয়ে গেল জমিদার, কিরণশঙ্কর, কনকশঙ্কর! অথচ যারা পৃথিবীতে খালি হাতে এলেন, সেই গরিব বিদ্যাসাগর, পি সি. রায়কে আজও মানুষ মনে রেখেছে। আসল কথা হলো কাজ, সুকৃতি। ভালো কাজ করতে হবে।

সব কথা না বুঝলেও আবেশে বোজা দাদুর দু'চোখ ; প্রসন্ন মুখ দেখে, ভালো কাজ করার প্রবল তাগিদে আলোড়িত হতো কিশোর।

পাঁচ

দুটো গাড়ি বাতিল হওয়ার পর সিউড়ি থেকে যে বাস ছাড়ল, সেটা তাঁতিপাড়া ছুঁয়ে বক্রেশ্বর যাবে। বক্রেশ্বরের দু'মাইল আগে তাঁতিপাড়া। আজ রাতে সেখানে থেকে কাল সকালে বাহেঙ্গায় যাবে অজিত। তাঁতিপাড়ায় মোতিদের বাড়িতে রাত কাটাবে।

ফাঁকা রাস্তায় বাস ছুটেছে ঝড়ের গতিতে। চলন্ত চাকার সঙ্গে সমান বেগে ছুটে চলেছে পিচের রাস্তার দুপাশের লাল ধুলো। ধুলোয় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। বাসের খোলা জানলা দিয়ে ধুলো ঢুকছে ভেতরে। অঘ্রাণের বেলা পড়ন্ত হলেও বাইরে রোদ, তাপ আছে। দু পাশের ফাঁকা মাঠের কোথাও ধান কাটছে চাষী। সিউড়ি থেকে তাঁতিপাড়া কম বেশি দেড়ঘণ্টার পথ। জ্বলন্ত বিড়িতে টান দিয়ে অজিত ভাবছিল, সামনে অনেক কাজ। এখনই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ভাড়ার একটাকা পঁচিশ পয়সা কণ্ডাক্টরকে দিয়ে টিকিট নিল সে। পুরোনো পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হওয়ার স্মৃতি, মনে পড়লো তার। বাগবাজারে একটা বাড়িতে ছাত্রপার্টির সভা ছিল। জেলা পার্টির এক বয়স্ক নেতা হীরেন সেন গম্ভীর মুখে বসেছিল সভায়। হীরেন পার্টির হোলটাইমার। অজিত আর তার অনুগামীদের পার্টি থেকে তাড়াবার জন্যে ছাত্রপার্টির নেতৃত্ব নিজেদের সমর্থকদের তালিম দিয়ে নিয়ে এসেছিল সভাতে। ছাত্রদের মধ্যে তখন অজিত, বিভাস, অমলের প্রভাব, জনপ্রিয়তা বেড়েছে। রাজনৈতিক, আদর্শগত নানা প্রশ্নে নেতৃত্বের সঙ্গে খটাখটি লেগেছিল তাদের। শাসকদের সঙ্গে পার্টি যে আপোস করছে ভবিষ্যতে তা বাড়বে, অজিত এবং তার অনুগামীরা ধরতে পেরেছিল। সমালোচক, বিরোধীদের তাড়াতে কোমর বেঁধে নেমেছিল পার্টি নেতৃত্ব।

সভার শুরুতে বক্তৃতায় হীরেন বলল, হঠকারীদের হঠাও। পার্টিকে তারা ভাঙতে চায়।

হীরেন বলার পর বেলঘরিয়ার বিজন হালদার প্রশ্ন করল, আপনার অভিযোগের কোনো প্রমাণ আছে?

নিশ্চয় আছে, হীরেন বলল, পার্টিকে গালমন্দ দিয়ে যে গোপন দলিল এরা বিলি করছে, তা পার্টির হাতে এসেছে।

নীরবতায় থমথম করছিল ঘর। নিস্তেজ হয়ে আসছিল ঘরের আলো। অভিযোগের জবাব দিতে উঠে অজিত বলল, পার্টি চীনবিদ্বেষী, পার্টিতে গণতন্ত্র নেই। আপনারা, মধ্যপন্থীরা নেতৃত্ব দখল করে পার্টি এবং জনসাধারণের সঙ্গে বেইমানী করছেন।

আগুনঝরা চোখে হীরেন তাকিয়েছিল অজিতের দিকে। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পার্টি থেকে অজিত, বিভাস, অমলের বহিষ্কারের প্রস্তাব ভোটে পাশ হয়ে গেল।

পার্টি ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় সে সন্ধ্যেতে খুব খারাপ হয়েছিল অজিতের মন। বহিষ্কার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে সভা থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর আলোগুলো তখন জ্বলেছে। পেঁজা তুলোর মতো কুয়াশা ঝুলছে আলো ঘিরে। ম্লান আলোর রাস্তা দিয়ে চুপচাপ হাঁটছিল তিনজন। মুষড়ে পড়া বিভাস, অমলের মুখের দিকে এক মুহূর্ত তাকালো অজিত। পার্টি জীবনের টুকরো ঘটনা, স্মৃতি মনে পড়ছিল তার। পার্টির ইমারতের ভিতে যে তার রক্ত ছিটেফোঁটা লেগে আছে, এ কথা সে কাকে বলবে? চাঙ্গা হওয়ার জন্যে চাপা গলায় বিভাস গান ধরেছিল, ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না।

বিভাসের সুরেলা মিষ্টি গলার গান অন্যদিনের চেয়ে বেশি ভালো লাগলো অজিতের। চুপচাপ সিগারেট টানছে অমল। অজিত বুঝেছিল, ছাত্র আন্দোলনের এক নতুন পর্ব এবার শুরু হবে।

লোকালয় পেরিয়ে বক্রেশ্বরের রাস্তায় ঝড়ের গতিতে বাস ছুটে চলেছে। যাত্রী না থাকায় স্টপে দাঁড়াচ্ছে না গাড়ি। রাস্তার দু পাশের লাল মাটির প্রান্তরে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে খাটো একটা দুটো খেজুরগাছ। কোথাও মাঠে ফুটবল খেলছে ছেলেরা।

স্কুলে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে সুনাম ছিল অজিতের। স্কুল টিমেও খেলেছে সে। তারপর কবে খেলা ছেড়ে দিল, মনে করতে পারলো না। কেন ছাড়লো? আসলে মধ্যবিত্ত জীবনের কোনো ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা সফল হয় না। সাফল্যের জন্যে যে পরিচর্যা তোয়াজ লাগে, মধ্যবিত্ত সংসারে তা মেলে না। বরং অবহেলা, উপেক্ষাই বেশি জোটে। কোনো কাজে, উৎসাহ, প্রেরণা কখনও বাড়ি থেকে পায়নি অজিত। পাবার কথাও নয়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে নাজেহাল হয়ে থাকতো বাবা, মা। বিশেষ একজনের ওপর নজর দেওয়ার উপায় ছিল না বলে কাউকেই বাবা, মা নজরে আনতো না। কিছু একটা হওয়ার বাসনা ছেলেবেলা থেকে মাথায় পুষে রাখতে হয়, এ বুদ্ধি যখন হলো, তখন আর হওয়ার বয়স নেই। তবু অজিতের বুকের মধ্যে বোতলবন্দী আলাদিনের সেই দৈত্য জেগে উঠতো মাঝে মাঝে। তখন ঝড় বয়ে যেত তার পৃথিবী জুড়ে। সেই ঝড়ে উড়তো দৈত্যের তামাটে চুল, তার হা হা হাসি শুনতে পেত অজিত।

বিকেলের মরা রোদে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়ই নিজেকে অন্য চেহারায় দেখতে পেত সে। মাথায় রাজমুকুট, কোমরে তলোয়ার নিয়ে সুসজ্জিত রাজপথে সে হেঁটে চলেছে। রাস্তার দু ধারে দাঁড়ানো লক্ষ লক্ষ মানুষ তালি বাজাচ্ছে তাকে দেখে। তাদের হাতে ফুলের মালা, মুখে হাসি, গলায় গান।

অন্ধকার রাতে কখনও ঘুম ভাঙলে সে অনুভব করতো বুকের মধ্যে দৈত্যের দাপাদাপি। তার মনে হতো সারা পৃথিবী দখল করতে চায় সেই দৈত্য। সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো কিছু একটা করার সাধ জাগতো তার। এ তাড়নাতেই ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ে একবার বাড়ি থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা ছিল বাড়ি ছেড়ে একবার বেরোতে পারলে বিশাল ব্যবসা, প্রাসাদ, গাড়ি, দু' দশ লাখ টাকা বানানো কঠিন কাজ নয়।

বাড়ি ছাড়ার আরও একটা কারণ ঘটেছিল। আঁচলে বাঁধা দশটা টাকা হারাতে মা সন্দেহ করেছিল অজিতকে। বেশ খানিকটা অশান্তির পর দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল অজিত। সারা বিকেল রাস্তায় ঘুরে রাত দশটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হলো সে। খড়্গপুরের একটা ট্রেন তখন ছাড়বে। বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে জনমানবহীন খড়্গপুর স্টেশনে অজিত যখন পৌঁছোলো, তখন রাত প্রায় একটা। অচেনা জায়গা। কোথাও যাবার ছিল না তার। খিদেও পেয়েছিল খুব। প্ল্যাটফর্মে জলের কল খুলে জল খেল পেট ভরে। প্ল্যাটফর্মের ভেতরে, বাইরে ঘুমোচ্ছে অনেক মানুষ। দূর থেকে ভেসে আসছে ইঞ্জিনের শান্টিং এর আওয়াজ। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে একটা বড়ো গাছের নিচে শানবাঁধানো চাতালে শুয়ে পড়েছিল সে। ভোরের দিকে গাঢ় ঘুম অনেক মানুষের হৈচৈ চিৎকারে থিতিয়ে গেল। ঘুম জড়ানো চোখে কী হচ্ছে বুঝতে পারলো না। হাত মুখ নেড়ে তাকে কিছু বলছিল একদল লোক। তখনই সে টের পেল একটা ষাঁড়ের মুখে সে ঝুলছে। তার জামার অর্ধেকটা চিবিয়ে বাকি আধখানা খাওয়ার জন্যে টানাটানি করছে সেই বিশাল কালো পশু। জামাটা খুলে পালিয়ে আসার জন্যে দু চার জন যাত্রী, কুলি উপদেশ দিচ্ছে তাকে। অজিত তাই করল। জামা খুলে খালি গায়ে সে যখন যাত্রীদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো, তখন অনেকে হাসছে। লজ্জা অপমানে মুখ কালো করে সে দেখলো বোতাম শুদ্ধু তার জামা খেয়ে ফেললো ষাঁড়টা। তখনই সে খেয়াল করল যে তার চটিজোড়া রাতে চুরি হয়ে গেছে। খালি পা, আদুল শরীরে সেবার অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরছিল সে। বাড়ি থেকে দেড়দিন নিখোঁজ থাকলেও খুব অল্প জবাবদিহি করতে হয়েছিল তাকে। তারপর সে শুরু করল শরীরচর্চা। বছরখানেক ব্যায়াম করার পরে শরীর যখন সবল, দশাসই হয়ে উঠছে, পাঁচজনে নজর করছে, তখনই সে ব্যায়াম বন্ধ করে দিল। সে সব দিনের কথা ভেবে পরে সে খুব হেসেছে। এখনও হাসে। প্রায়ই তার মনে হয় যে, খুব সহজেই সে স্মাগলার, গুণ্ডা হয়ে যেতে পারতো, একজন মাঝারি মাপের ঝানু ব্যবসায়ী হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি। কলেজে পড়ার সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা তার মাথায় ঢুকলো। দু চারটে বই কিনে শুরু করল লেখাপড়া। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হওয়ার আবছা ইচ্ছেও তখন জেগেছিল তার। কিন্তু জীবনের ছক কালি কলমের নিয়ম মেনে চলে না। সামাজিক বিকাশের নিয়ম খুব বিস্ময়কর। এ নিয়মে ঘাসফুল থেকে গোলাপ জন্ম নেয়, দামী হীরে অন্ধকার মেখে কাঠকয়লার মতো পড়ে থাকে। রহস্যময় রূপান্তরের মূল গায়েন হলো সময়। সময় যেমন শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতির জন্ম দেয়, তেমনই বিশাল কুমিরকে কেটে হেঁটে টিকটিকি বানিয়ে ছাড়ে।

চা, জল খাওয়ার জন্যে চন্দ্রপুরে কয়েক মিনিট বাস থামলো। অনেক যাত্রী ওঠা নামা করে এখানে। পুরোনো দিনগুলোর কথা ভাবলে তিক্ততার বদলে এখন অজিতের মনে এক ভোঁতা কষ্ট জেগে ওঠে। হেলাফেলায়, অনাদরে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বছরগুলো কেটে গেছে। বাড়ি ছাড়ার পর কলকাতায় এক গরিব বস্তিতে কিছুদিন ছিল সে। তারপর এলো বাহেঙ্গায়। কলকাতার গরিব বস্তির সঙ্গে এই সাঁওতাল পরগনার

দরিদ্র গ্রামের অনেক ফারাক। দাঁত ওঠার আগেই ক্ষুধার্ত শিশুকে এখানে কড়াইভাজা খেতে দেওয়া হয়। শিশুরা খায় এবং হজম করে। যাদের হজম শক্তি কম, তারা মারা যায়। দারুন শীতে খোলা উঠোনে আগুনের পাশে কুকুর আর শিশু গায়ে গা লাগিয়ে সারারাত ঘুমোয়, ঠাকুর্দার কোলে বসে তার সঙ্গে দু'মাসের নাতি এক বাটিতে হাঁড়িয়ায় মুড়ি ভিজিয়ে খায়। এসব দেখে নিজের ছেলেবেলা অজিতের এখন দারুন রমণীয় মনে হয়। না খেয়ে, ল্যাংটো থেকে অন্তত তার শৈশব কাটেনি।

বড়ো অদ্ভুতভাবে অজিতের জীবনের গতি বদলে গিয়েছিল। টেস্ট পরীক্ষার মাস কয়েক আগের ঘটনা। রাস্তা থেকেই অজিত দেখেছিল স্কুল গেটে জটলা, ভীড়। নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা আছে। স্কুলে না গিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া ঠিক করেও অজিত গেল না। স্কুলের সামনে এসে দেখল, গেট বন্ধ কয়েকটা অচেনা মুখ বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছিল। তারা যে পাশের কলেজের ছাত্র, অজিত বুঝতে পেরেছিল। স্কুলের স্যাঁতসেঁতে, সরু অন্ধকার গলি উত্তেজনায় গরম। গেটের চারপাশে দাঁড়িয়ে সহপাঠী বন্ধুরা। একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে কলেজের এক দাদা বক্তৃতা শুরু করল। সস্তা দরে চাল, ডাল, কেরোসিন চাই। উত্তেজনায়, ক্ষোভে বক্তার চোখ মুখ লাল, হাত মুষ্টিবদ্ধ, গলা, কপালের পেশী টানটান সজাগ, মানুষটা যেন বিদ্রোহের মূর্তিমান প্রতীক। অবাক অজিত তাকিয়েছিল। কিছু স্পষ্ট, কিছু ঝাপসা, বক্তৃতার সবটুকু অজিত বোঝেনি। তবু তার মনে হয়েছিল, কথাগুলো ভুল নয়, বক্তৃতার গভীরে কোথাও জরুরী সত্য মিশে আছে। গেটের সামনে তখন অনেক ছাত্র, থৈথৈ ভীড়। কিছু ছেলে ভীড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। দু চারজন আগেই বাড়ি ফিরে গেছে। ধুতি, পাঞ্জাবি, কাঁধে পাটকরা চাদর মাঝখানে সিঁথি, তেল চুকচুকে চুল চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার তুলসীবাবু হঠাৎ স্কুলের ভেতর থেকে গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্কুলে তুলসীবাবুর প্রবল প্রতাপ। তাঁকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল শ্রোতারা। বক্তৃতা থামতে কলেজের ছাত্রদের তুলসীবাবু বলেছিলেন, এবার তোমরা যাও, আমার ছেলেদের ঢুকতে দাও।

বন্ধ দরজা ধরে দাঁড়ানো কলেজের ছেলেগুলো মুখ চাওয়াচায়ি করছে দেখে তুলসীবাবু বললেন, কলেজ থেকে এসে স্কুলে স্ট্রাইক করা যায় না। আমার স্কুলের একজন ছাত্রও স্ট্রাইক চায় না।

কলেজের দাদাদের চোখমুখের দ্বিধা, অসহায়তা, ভীড়ের গুঞ্জন, অস্বস্তি, অজিতের বুকের মধ্যে বন্ধ বোতলের ছিপিটা খুলে দিল। গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে লাগলো। নাহ, এটা হয় না, হতে পারে না। বোতল থেকে বেরিয়ে ধোঁয়ার দানব শব্দহীন হুঙ্কার দিল। ভীড় ঠেলে কলেজের দাদাদের পাশে এসে তুলসীবাবুকে অজিত বলেছিল, আজকের স্ট্রাইকে আমরাও আছি।

অজিতের কথা শুনে নিস্তেজ, ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তুলসীবাবুর মুখ। রাস্তায় দাঁড়ানো ছাত্রদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে স্কুলে ঢুকে গিয়েছিলেন তুলসীবাবু। অজিতকে ঘিরে তখন স্লোগানের ঝড় উঠেছে। ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ ধ্বনিতে কাঁপছে

স্কুল গেট। কলেজের এক দাদা অজিতকে বলল, আমাদের মান বাঁচালে তুমি।

অনেক দূরে গড়িয়েছিল সেই ধর্মঘট, বিক্ষোভ। বেলা দুটোয় খাদ্যের দাবিতে বেরোলো এক লম্বা মিছিল। ফেস্টুন, পোস্টারে সাজানো সে মিছিল দেখে অভিভূত হয়েছিল অজিত। কলেজের দাদাদের সঙ্গে মিছিলে পা মিলিয়েছিল সে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে মিছিলের ওপর গুলি চালালো পুলিশ। হৈচৈ, ছুটোছুটির মধ্যে কেউ কেঁদে উঠলো। অজিতের সামনে রাস্তায় লুটিয়ে পড়লো একজন অচেনা মানুষ। পিঠে গুলি লেগে যে মানুষটা মারা গেছে, এখবর সে জেনেছিল পরের দিন।

লম্বা হর্ণ দিয়ে বাস দাঁড়াতে কন্ডাক্টর চেঁচিয়ে উঠলো, তাঁতিপাড়া।

চমকে জানলার বাইরে তাকিয়ে সিট ছেড়ে উঠে পড়লো অজিত। বাসস্টপের উল্টোদিকে তাঁতিপাড়া। রাস্তার শেষ মাথায়, দূরে আকাশের গায়ে লেপ্টে আছে আবছা তরণী পাহাড়। রাস্তা পেরিয়ে ধুলোয় ঢাকা লাল মাটির পথে হেঁটে চলল অজিত।

ছয়

ধাঁধায় পড়ে বাড়ির অন্ধকার দাওয়ায় বোকার মতো বসে আছে দিবাকর। রাতে গ্রামবাসীদের সজাগ রাখতে গাঁয়ের কুলিতে কুলিতে এখনই তার রন দেওয়ার কথা। কিন্তু কিছুতে উঠতে পারছে না সে। একবার ভাবলো চুলোয় যাক সব। গাঁয়ের ছেলেরা যা খুশি করুক। আমার কি? দু' এক সেকেণ্ড পরে মনে হলো, গাঁয়ে কোনো অঘটন হলে খাটো হবে তার মান। এই রাজনগর থানায় আটাশ বছর চৌকিদারী করছে সে। অনেক দুর্যোগ, বর্ষা, শীত তার ওপর দিয়ে গেছে। সরকারী কাজে কখনও সে গাফিলতি করেনি। আটাশ বছরের চাকরিতে কখনও ছুটি নেয় নি। খাঁকি উর্দির ওপরে পেতলের চাকতি লাগানো বেল্ট বেঁধে, বেতের লাঠি হাতে গত আটাশ বছর বনবাদাড়, নদী, পাহাড় মাড়িয়ে সে ছুটে চলেছে। কখনও থামে নি। কোমরে আঁটা বেল্টের পেতলের চাকতি দিনের আলোয় ঝিলিক কাটে, রাতে জ্বলজ্বল করে, রাতেই তার কাজ বেশি। অন্ধকার নামলে চোর ছ্যাঁচোর দাঁত্য দানোরা উপদ্রব শুরু করে।

একটা কুকুর নিয়ে ভিন গাঁয়ের দু জন অচেনা মানুষকে বিকেলে গ্রামে ঢুকতে দেখেছিল দিবাকর। দাওয়ায় তাকে দেখে মোতির বাড়ির হদিশ জানতে চেয়েছিল একজন। একটা বাঁখারি ছুলছিল দিবাকর। আড়চোখে অচেনা মানুষ দু'জনকে দেখে ভালো না লাগলেও মোতির বাড়ির পথ বলে দিয়েছিল। বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়স, ঝাঁকড়া চুল, সাজোয়ান মানুষদুটো যে সাঁওতাল, মাঝিপাড়ার ছেলে, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। একজনের ধুতিতে রক্তের দাগ দেখেছিল সে। সন্ধ্যের মুখোমুখী তাগড়া চেহারা, মোচওলা আর একজন অচেনা মানুষকে তাঁতিপাড়ায় ঢুকতে দেখে চমকে উঠেছিল দিবাকর। মুখ চেনা লাগলেও কোথায় দেখেছে, মালুম করতে পারলো না। তার দাওয়ার পাশ দিয়ে মোতির বাড়ির দিকে মানুষটা চলে যাবার পরেই তার মনে পড়লো সব। গতকাল বিকেলে রাজনগর থানার বড়োবাবুর টেবিলের ওপর মোচওলা মানুষটার ছবি দিবাকর দেখেছে। আরো একটা ছবি ছিল টেবিলে। দুটো ছবি দিবাকরকে দেখিয়ে বড়োবাবু বলেছিল, এক হপ্তা আগে এ দু জন ছেলেকে আমরা পুলিশ রিমাণ্ডে চাইলেও ভুল করে বিহার পুলিশ আজ সকালে দুমকা জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে এদের। এ দুই ছোকরা খুব ডেঞ্জারাস। আমরা ধারণা দু চারদিনের মধ্যে এরা এই এলাকায় আসবে।

একমুহূর্ত চুপ থেকে বড়োবাবু বলেছিল, কড়া নজর রাখবি। কোনো খবর থাকলে দেরি না করে চলে আসবি থানায়।

ছবির একজন যে তার চোখের সামনে দিয়ে এখনই গেল, বুঝতে দিবাকরের অসুবিধে

হয় নি। বুঝে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। গাঁয়ে কিছু গোলমাল হচ্ছে জেনেও এতদিন সে না দেখার ভান করছিল। না করে উপায় ছিল না তার। গাঁয়ে যে সব গোলমেলে কাজ শুরু হয়েছে, সেগুলোর পেছনে যে মোতির মাথা কাজ করছে, আঁচ করেছিল দিবাকর। মোতির জন্যেই অস্বস্তিতে জবুথবু হয়ে এখনও দাওয়ায় বসে আছে সে। মোতি শুধু এ গাঁয়ের ছেলে নয়, দিবাকরের প্রায় ঘরের ছেলে, আপনজন। বিদঘুটে চিন্তা মাথায় নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বাড়ি থেকে বেরোবার জন্যে তৈরি হলো সে। বৌকে ডাকলো, মাধুর মা, ও মাধুর মা!

নিঝুম অন্ধকারে নিজের গলার শব্দ দিবাকরের অচেনা লাগলো। ঘরের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে সে আবার ডাকতে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কথা বলে মাধুর মা, যমুনা পাশ ফিরে শুলো। মেয়েছেলের এতো ঘুম দেখে বিরক্ত দিবাকর উবু হয়ে বৌয়ের পাশে বসে ডাকলো, এ্যাই শুনছিস, এ্যাই মাধুর মা।

রেগে উঠে যমুনা বলল, কী বলছো, বলো। সুস্থিরে একটু ঘুমোতেও দিবে না?

এখনও নিসাড়ে ঘুমোবে নাকি, দিবাকর বলল, আমি চললুম। ফিরতে রাত দুপহর হবেক।

এবার বিছানা ছেড়ে ধড়পড়িয়ে উঠে যমুনা প্রশ্ন করল, যাবে কুথা?

জবাব না দিয়ে লণ্ঠনের শিস্ উসকে ঘুমন্ত মাধুর বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে পঁচিশ বছরের পুরোনো একটা কাঠের বাক্স খুললো দিবাকর। বাক্সে টুকিটাকি হরেক জিনিস। বেশির ভাগ টুকরো ছেঁড়া কাগজ। বাক্স থেকে রঙ ওঠা, মলিন একটা ডাইরি, খয়ে যাওয়া ছোট পেন্সিল নিয়ে দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো খাকি শার্টের বুক পকেটে রাখলো সে। এতোক্ষণে পকেটটা ফুলে উঠেছে। উর্দির পকেট ফুলে না থাকলে মানায় না। বাক্স বন্ধ করে, চাবি জায়গা মতো রেখে, খাকি শার্ট পরে, কোমরে বেল্ট বেঁধে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো দিবাকর। যমুনা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। উঁচু গলায় দিবাকর বলল, আমি চললুম। কপাট খোলা থাকলো।

বিছানায় উঠে বসে যমুনা প্রশ্ন করল যাবে কুথা?

থানাতে, দিবাকর বলল।

তুমি বেশ মানুষ তো, যমুনা বলল, আমি কালকেও তুমাকে বলেছি যে বামুন মাগী ক দিন থিকে জানিযে গেছে উ'দের ঘরটা ছুঁইয়ে দিতে হবেক। সিই বোশেখ মাসে ঘর ছওনোর কথা দিয়ে দু'সের চাল এনে খিনছি, ইয়াদ নাই তুমার? আজ রাতে থানায় গেলে কাল কাজ করতে পারবে?

যদি কাল ফের ডাকতে আসে, বলিস পরশু লাগবো।

কথা শেষ করে রাস্তায় নামলো দিবাকর। যমুনা তখনও কী বলছে, দিবাকরের কানে গেল না।

যার যা খুশি মনে করুক, দিবাকর ভাবলো কর্তব্যে সে অবহেলা করবে না। তার যে কতো দায়িত্ব, সে কে বুঝবে? এই যে লাউজোড়, পদমপুর, গুড়ুলগাছি কুসুমাশুল, সব গাঁয়েই চৌকিদার আছে, তারাও কি বোঝে? বরং দিবাকরকে নিয়ে তারা ঠাট্টা তামাসা করে, পেছনে যা খুশী বলে। যে যা বলুক নিজের বিশ্বাসে দিবাকর স্থির, কারো কথার

পরোয়া করে না। যতোদিন শরীরে সরকারী কুর্তা, কোমরে চৌকিদারী বেল্ট, সরকারের মাইনেতে ভরণপোষণ, ততোদিন সে মন দিয়ে কাজ করে যাবে। তার শরীরে নেমকহারামী নেই। সেবার সিউড়ি থেকে যখন বড়োসাহেব থানায় এলো, কতো চৌকিদার, দফাদার থানায় জড়ো হয়েছিল। কই আর কারো নাম তো বড়ো সাহেব করল না। শুধু দিবাকরকে কাছে ডেকে সকলকে শুনিয়ে সাহেব বলল, এই দিবাকর মাল একজন সামান্য চৌকিদার হয়েও জানে যে সরকারী কাজ মানে দেশের সেবা, কাজের জন্যে দিবাকর জীবন দিতেও রাজী। তাই সশস্ত্র একদল ডাকাতের সামনে দাঁড়াতে সে ভয় পায়নি। কেমন কায়দা করে জাপটে ধরেছিল একজনকে। এই সাহস নিয়ে সকলে কাজ করলে সরকারের সুনাম বাড়বে। গাঁয়ের লোকেরা ডাকাতদের তাড়া করেছিল বটে, কিন্তু তাদের সামনে ছিল দিবাকর। ডাকাতের ছোরায় রক্তে শরীর ভেসে গেলেও বদমাসটাকে দিবাকর ছাড়েনি। এর নাম কর্তব্যনিষ্ঠা!

বড়োসাহেবের কথা শুনতে শুনতে গর্বে ভরে উঠেছিল দিবাকরের বুক। করকরে নতুন একটা দশ টাকার নোট পিন দিয়ে দিবাকরের শার্টের বুকে নিজের হাতে আটকে দিয়েছিল বড়োসাহেব। সে কী হাততালি! হেডকনস্টেবল এমনকি থানার বড়োবাবুও তাকিয়ে ছিল দিবাকরের দিকে। বড়োসাহেব আবার বলেছিল, দিবাকর যে সাহস দেখিয়েছে, তাব তুলনায় এ টাকা কিছু নয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সরকার সম্মান আর স্বীকৃতি দিচ্ছে দিবাকরকে। ও শুধু রাজনগর থানার গর্ব নয়, সারা দেশের চৌকিদারদের গর্ব। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

বক্তৃতা শেষ করে দিবাকরের হাজিরা খাতায় ইংরিজিতে পুরো একপাতা বড়োসাহেব লিখেছিল। পড়তে না পারলেও, লেখাটা যে প্রশংসা, বুঝতে পেরেছিল দিবাকর। সেই থেকে তার মাইনে বেড়েছিল পাঁচ টাকা।

এতো বড়ো একটা ব্যাপার নিয়েও তিন সহকর্মী চৌকিদার, সুখলাল, রামদয়াল, প্রাণকৃষ্ণ ঠাট্টা করেছিল। প্রাণকৃষ্ণ বলেছিল, বরাত জোরে বেঁচে গেছো। ছোরাটা আর খানিক নামলে ঠ্যালা বুঝতে। তখন তোমার বড়োসাহেব বলো, আর গাঁয়ের কেনারাম চাটুজ্জেই বলো, কেউ তোমার সংসার চালাতো না। সকলে বলতো, দিবাকর পয়লা নম্বর বুড়বাক, বোকা। তাই লাঠি হাতে ডাকাত ধরতে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়ল। তখন তোমার বৌকে ভিখ মেগে খেতে হতো, কানাকড়ি ঠেকাতো না কেউ। এরকম বতো দেখেছি।

দিবাকর তর্ক করে নি। কী হবে? ভেবেছিল এতো যদি প্রাণের ভয়, তাহলে কেন চৌকিদারী করতে আসা বাপু? খেটে খাবার অনেক রাস্তার একটা ধরে নেওয়া ভালো। মুখে কিছু না বললেও নিজের বিশ্বাসে দিবাকর অনড়। যাই হোক, সরকারের মান সে নষ্ট হতে দেবে না। দিবাকর জানে, তার কাজের জন্যেই বড়োবাবু এতো খাতির করে তাকে। বড়োবাবু সেদিন বলছিল, কাজে ফাঁকি দেওয়ার লোক তুই নয়। তবু তোর এলাকায় দুটো ইস্কুল পুড়ে ছাই হলো, অঞ্চল অফিসে কারা আগুন লাগালো জানা গেল না। দেওয়াল লিখনের খবর আনলি, কিন্তু কারা লিখল সে খবর দিতে পারলি না। এখন কী উপায়? একটা কিছু করতে না পারলে চাকরি রাখা শক্ত হবে।

অন্ধকার রাস্তায় হনহন করে হেঁটে চলল দিবাকর। নুনের দাম সে দেবে। সেই দুটো ধুমসো সাঁওতাল আর ছবিতে দেখা ছোকরাটা আজ সারারাত নিশ্চয় মোতির বাড়িতে থাকবে। হয়তো আরো অনেকে জুটে সারারাত গুজগুজ সলাপরামর্শ করবে। তারপর ?

উত্তেজিত দিবাকরের চলার গতি বেড়ে গেল। দিবাকর জানে, বড়োবাবু ভয় পেয়েছে। বড়োবাবু বলেছিল, এটা কী হচ্ছে? দেশটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে নাকি ওরা ? দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করে, মহাপুরুষদের মুখে কালি মাখিয়ে, অন্য দেশের নেতাকে এদেশের নেতা বানিয়ে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেশকে ? বড়োবাবুর থমথমে গম্ভীর মুখ দেখে আতঙ্কে চুপসে গিয়েছিল দিবাকর।

বড়োবাবু বলেছিল, শুধু শহরের ছেলেরা ঢুকে এসব করছে, একথা ঠিক নয়। গাঁয়ের ছেলেরাও আছে। কলকাতা পুড়িয়ে সেখান থেকে কার ভরসায় ছেলেরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকছে ?

অন্ধকার মাঠ। মাথার ওপর বিরাট আকাশে রাশিরাশি তারা জ্বলছে। পায়ের নিচে শক্ত, পাথুরে মাটি। রাস্তা নেই। পায়ে চলা পথের আভাসটুকু অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। দিবাকরের মনে হলো, বড়োবাবুর কথা ঠিক। গতকাল রাতে গাঁয়ের উত্তর সীমানায় যে ছেলেগুলো জটলা করছিল, তারা পাড়ার ছেলে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিল দিবাকর। মই, আলকাতরা, বুরুশ নিয়ে যারা এলো, তাদের মধ্যে ছিল নরেন মাইতির ছোট ছেলে রঞ্জন। দেওয়ালের গায়ে মই লাগিয়ে যে লিখছিল, সে ডাক্তারবাবুর ছেলে বাবলু। ওপরপাড়ার শিবেন আলকাতরার টিন হাতে মইএর মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। মাঝেরপাড়ার জগাই তিলির বড়ো ছেলের, নাম দিবাকরের খেয়াল নেই। চারপাশে নজর রাখছিল সে। লুকিয়ে না থাকলে দিবাকর ধরা পড়ে যেত। অন্ধকার থাকলেও কাউকে চিনতে দিবাকরের ভুল হয় নি। তাঁতিপাড়ার বাইরে রাস্তায় কাল সন্ধ্যের পর শিবেন আর রঞ্জনকে ঘুরঘুর করতে দেখে দিবাকর প্রশ্ন করেছিল, এখানে কেন ?

ডিম কিনতে এসেছি শিবেন বলেছিল। দিবাকর আর কিছু বলেনি। আসলে এরা কেউ খারাপ ছেলে নয়। রঞ্জন কলেজে পড়ে। শিবেন, বাবলুও গাঁয়ের ইস্কুলে যায়। জগাই তিলির বড়ো ছেলে, কী যেন নাম গতবছর ইস্কুলের পাশ দিয়ে এখনো বেকার। ঘরে বিয়ের যুগ্যি দুটো বোন। বাপ দিনরাত হাহুতাশ করে, আর ছেলেকে দোষে। কিন্তু দেয়ালে লিখে, ইস্কুল, আপিস পুড়িয়ে কি চাকরী মিলবে, দেশ এগোবে ? কোনটা ঠিক, কী বেঠিক, এসব নিয়ে দিবাকর মাথা ঘামায় না। সে দায় তার নয়। এসব ভাবার জন্যে মোটা মাইনে দিয়ে প্রচুর বুদ্ধি, মাথাওলা অফিসার পোষা হয়। কিন্তু ছেলেগুলো চেনা হওয়া এক পাতলা মায়া দিবাকরকে জড়িয়ে থাকে। ছেলেগুলো ভালো, নেশাভাঙ, নোংরামি নেই। এরা কী করে ইস্কুল পোড়াচ্ছে ?

রাত ভারী হলো। দূরে তরণীপাহাড়ের মাথায় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। চাপচাপ

কুয়াশা নেমে এসেছে মাটিতে। কুয়াশা ঢাকা গুড়ুলগাছি গ্রামকে দূরে থেকে দেখে মনে হয় একটা নদী। দু'পাশে শালবন যেন মোমের তৈরী। মাথা ঝাঁকিয়ে দিবাকর বিড়বিড় করে, না, এভাবে হয় না। বড়োবাবুর কথাই ঠিক, এরা দেশের শত্তুর।

জোরে পা চালালো দিবাকর। নিজের চোখে সব দেখার পর আর চুপ করে থাকা যায় না। সে চৌকিদার, সরকারের নুন খেয়ে বেইমানী করবে না। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যে চুকলি সে করেনি কোনদিন।

আমার কোনে দোষ নেই, কথাটা নিজেকে শোনালো দিবাকর। শব্দহীন অন্ধকার মাঠের মধ্যে হঠাৎ একমাত্র ছেলে স্বাধীনের মুখ দিবাকরের মনে পড়লো। সিউড়ি কলেজে পড়ছে স্বাধীন। সেখানেও নাকি গণ্ডগোল! স্বাধীন কী করছে? কথাটা মনে হতেই আতঙ্কে সিরসির করে উঠলো দিবাকরের শরীর। এ পাড়ার যে ছেলেরা কাল দেয়ালে লিখেছে, তাদের কেউ কেউ স্বাধীনের বন্ধু। স্বাধীনও কি এদের দলে ভিড়ে গেছে?

অন্ধকার ফাঁকা মাঠের মধ্যে দৌড়োত শুরু করল দিবাকর। ভয় তাকে তাড়া করেছে।

অবিনাশ তাঁতির ছেলে মোতিই যতো নষ্টের গোড়া, দিবাকর ভাবলো। শহর থেকে কী বিষ নিয়ে যে গাঁয়ে ফিরল মোতি! বিষিয়ে গেল গাঁ। মোতির ওপর রাগে ফুঁসতে থাকলো দিবাকর। তার মেয়েটাকে বশ করেছে মোতি। মোতি বলতে মাধু অজ্ঞান। দিবাকরের মাথায় কেমন ঝিমুনি লাগলো। মাধুর কথা ভাবলেই দিবাকরের মাথায় ঝিম লেগে যায়। মাসকয়েক আগে বাড়ি ফিরে দিবাকর দেখল, ঘরের দরজার সামনে বছরখানেকের ছেলে কোলে মাধু বসে আছে। বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড। ছেলে নিয়ে মাসখানেক আগে তাঁতিপাড়া থেকে শ্বশুরবাড়ী ফিরেছিল মাধু। হঠাৎ সে ফিরে এলো কেন? আকাশ ফাটিয়ে যমুনা চেঁচাচ্ছিল। গাল দিচ্ছিল বিশ্বসংসারকে। অবস্থা দেখে কিছু না জেনেও ঘাবড়ে গিয়েছিল দিবাকর। থানায় হঠাৎ সি আই সাহেবের দেখা পেয়ে তাকে লম্বা সেলাম ঠুকে খোসমেজাজে বাড়ি ফিরেছিল দিবাকর। তার মুখে দেশ গাঁয়ের খবর শুনে চারপাশে কড়া নজর রাখার উপদেশ দিয়েছিল সি আই সাহেব। দিবাকর ভাবছিল, সি আই সাহেবকে ধরে এবার হেড চৌকিদার হবে সে। কিন্তু বাড়ির দরজায় পা দিতে তার সব ভাবনা, সাধ মিলিয়ে গেল। দিবাকরকে দেখেই চিড়বিড়িয়ে উঠে মাধুর মা বলল, তুমার এখন ঘরকে আসার সময় হলো? কী দরকার ছিল আসার? থানাতেই থাকতে পারতে। ঢের ঢের লোক দেখেছি, তুমার মতন। আমার হয়েছে জ্বালা, মরণটো হলে খালাস পাই।

রেগে গিয়ে দিবাকরও চেঁচাতে শুরু করল। বলল, কী হয়েছে বলবি তো, শুধু চিল্লালে কিছু ফয়দা হবেক?

দিবাকরের কথা কানে ঢুকলো না যমুনার। একভাবে সে বলতে থাকলো, আমি তখুনি বলেছিলুম, অতো দূরে বিটির বিয়ে দিয়ো না, তা আমার কথা মানলে না। বেয়ানের পাকা দালান দেখে ছুটেছিলে। এ্যাখুন ঠ্যালা সামলাও।

কথা শেষ করে মেয়ের শ্বশুর, জামাইয়ের বিরুদ্ধে যমুনা গালাগালি শুরু

করল। তারপর দম ফুরিয়ে যেতে কপাল চাপড়ে শুরু করল কান্না। মায়ের চিৎকার, গালাগালি, কান্না শুনে লজ্জায় ভয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল মাধু। একটু কেঁদে যমুনা চুপ করলেও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না দিবাকর। যমুনাকে ভয় পায় দিবাকর। যমুনা নিজেই বলল, জামাই তার দাদার শালীকে নিয়ে মেতেছে। সংসারের সকলে তাল দিচ্ছে জামাইকে। জামাইএর দাদার শ্বশুরের দুই মেয়ে, ছেলে নেই। অগাধ সম্পত্তি মেয়ে দুটো পাবে। তাই।

কথা শেষ না করে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো যমুনা। নিজের জীবনের কথা দিবাকরের মনে পড়লো। বিয়ের পাঁচ বছর পরেও ছেলেপুলে না হতে যমুনাকে যখন দিবাকর অপয়া ভাবছে তখনই একদিন স্বামীকে সুখবর শোনালো সে। সেই সুখবরের মেয়ে মাধু। কী আদুরে ছিল মেয়েটা। দিবাকরের কোলে চেপে ঘুরতো সারাদিন। মাধু কাঁদলে বৌকে গাল দিত দিবাকর। মাধু যখন বছর দুই, তখন স্বাধীন হলো।

স্বাধীনের কথা ভাবলে বড়োবাবু, যোগেশ ব্যানার্জীর মুখ দিবাকরের মনে পড়ে। সেই বড়োবাবুও খুব ভালোবাসতো দিবাকরকে। ফি রবিবার দিবাকর থানায় হাজিরা দিত তখন। স্বাধীন যে শনিবারে হয়েছিল পরের দিন রবিবারে থানায় যেতে না পারায় সোমবার সকালে হাজির হয়েছিল দিবাকর। কাঁচুমাচু মুখে দিবাকরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়োবাবু প্রশ্ন করেছিল কী ব্যাপার?

দিবাকরের মুখে সব শুনে তাকে স্নেহের ধমক দিয়ে বড়োবাবু বলেছিল, এমন একটা সুখবর খালি হাতে দিতে এসেছিস?

খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল দিবাকর। পরদিন একটা বড়ো ঝাঁড়া মোরগ নিয়ে থানায় এসেছিল সে। মোরগ দেখে খুশি হয়ে বড়োবাবু বলেছিল, তোর ছেলের নাম দিলুম, স্বাধীন। স্বাধীন দেশের নয়া নাগরিক।

অন্ধকার মাঠ ছেড়ে রাস্তায় এসে দিবাকর ভাবলো, ছেলেটা কতোদিনে স্বাধীন হবে? ছেলের জন্যে টাকা গুঁজে গুঁজে ফতুর হয়ে যাচ্ছে সে।

সাত

দুপুর দুটোর পর হারুদার ঘর থেকে বেরোলো কিশোর। শীতের দুপুরে রাস্তায় ঘন রোদ। কয়েকটা চড়ুই পাখি কিচিরমিচির ডাকছে। গঙ্গায় বোধহয় ভরা জোয়ার। হাইড্রান্ট থেকে ভকভক করে জল বেরোচ্ছে। দোকান খুলে পিঁড়িতে বসে ঢুলছে নারানমুদি। তার সামনে দাঁড়িপাল্লায় কয়েকটা মাছি ভনভন করে উড়ছে। বড়ো রাস্তা ছেড়ে তাড়াতাড়ি ডান পাশের সরু গলিতে ঢুকলো কিশোর। চেনা শহরটা অনেকদিন পর দেখে কিশোরের মনে হলো, খুব বদলে গেছে কলকাতা। প্রায় প্রতি বাড়ির দেওয়ালে পেনসিলে আঁকা মাও সে তুং-এর মুখ চারু মজুমদারের বাণী ঝলমল করছে। কিশোরের বুক ভরে গেল। শহর জাগছে, গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে, এ বিষয়ে কিশোরের আর সন্দেহ নেই। হরতুকিবাগানের এক বস্তিতে কিশোরের একমাত্র মাসি থাকে। মাসির কাছে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটিয়ে রাত গাঢ় হলে বাড়িতে যাওয়ার মতলব এঁটেছে কিশোর। দীর্ঘদিন বাড়ি ছেড়ে থাকার জন্যে বাবা মাকে দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে তার। কবে ফের কলকাতায় আসা হবে, কিশোর জানে না।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হারুদার জানলায় লাগানো কাচের দুটো ঝকঝকে আরসি দেখে কিশোরের ধাঁধা লাগে। বিপ্লবী রাজনীতি আর পার্টির ঘনিষ্ঠ লোক হয়েও পার্টির বাইরের গ্রুপগুলোর সঙ্গে হারুদার কেমন করে যোগাযোগ হয়? কিশোর জানে হারুদার মতে শুধু পার্টি নয়, পার্টির বাইরে যে সব বিপ্লবী, সৎ, আদর্শ কর্মী আছে, তাদের জড়ো করে সংগঠন গড়তে হবে। এসব কথা বলার সময়ে সাধুসন্তের মতো দিব্য আলোয় ভরে যায় হারুদার মুখ। অথচ এসব কথা শুনে কিশোরের মাথা ধরে, সব হিসেব গুলিয়ে যায়। তার মনে হয়, গত পঞ্চাশ বছর ধরে কিছু লোক মিলন আর ঐক্যের কথা তুলে সব গোলমাল করে দিচ্ছে। মিলন, ঐক্যের পথ কী? কেউ জানে না। শুধু ঐক্যের অজুহাতে গা বাঁচায়। হরতুকিবাগান লেনের ছোট পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে কিশোর ধরালো। কলেজ জীবনে রোজ এ দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে টানতে টানতে কলেজে পৌঁছে যেতো সে। কলেজগেটের সামনে সিগারেটে শেষ টান দেওয়ার সময়ে কলেজের বিরাট লালবাড়ি জেগে উঠতো চোখের সামনে। রাস্তার বাঁদিকের হলুদ রঙের তেতলা বাড়ির ছাতের পাঁচিলে বুক চেপে যে মেয়েটা রোজ দাঁড়িয়ে থাকতো, একদিন সে ভাঁজ করা একটা চিঠি ছুঁড়ে ফেলেছিল কিশোরের পায়ের কাছে। কাগজের সে গুলিটা কিশোর স্পর্শ করেনি। কলেজে যাওয়ার রাস্তা সেই থেকে বদল করে ছিল।

সামান্য এগিয়ে ঝরঝরে পুরোনো একটা বস্তির মধ্যে মাসির বাড়ি। বস্তিতে ঢোকার

মুখে কর্পোরেশনের একটা সিংহমুখ জলের কল। সিংহের মুখে লাগানো চুরুটের মতো লোহার পাইপ দিয়ে দিনরাত ঝরঝর করে জল পড়ে। কল বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। এই কলে শীতের সময় সারাক্ষণ জল, গরমে শুকনো খটখটে পাইপের মুখ। কলের পাশ দিয়ে দুফুট মাটির পথ বস্তিতে ঢুকেছে। পথের দুপাশে হাতখানেক চওড়া খোলা নর্দমায় ভনভন করছে মাছি। ময়লার দুর্গন্ধে টেঁকা যায় না। বস্তির চল্লিশ, পঞ্চাশটা ঘরের নোংরা, মাছের কাঁটা, পিত্তি, আবর্জনা নর্দমায় বয়ে চলেছে। কারও কোনো অভিযোগ নেই। নর্দমা কখনও বন্ধ হলে, ঝগড়া মারামারি লেগে যায়।

দেশভাগের পর কলকাতায় এসে কোথাও জায়গা না পেয়ে মেসোমশাই সপরিবারে এই বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছিল। বস্তির সামনে, রাস্তার ওপর একটা ঘরও মেসোমশাইএর দখলে। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার, একটা বেঞ্চি আর কাচ ভাঙা ছোট একটা আলমারিতে সেই ঘর সাজিয়ে মেসোমশাই শুরু করেছিল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। বস্তির দু'চারজন নিঃসম্বল, গরিব মানুষ ছাড়া মেসোর রুগী জোটে না। কী করে যে মাসি সংসার চালাচ্ছে, কিশোর জানে না। কিশোরের সমবয়সী, মাসির একমাত্র ছেলে গৌর, পাগল। একই স্কুলে কিশোরের ক্লাসে গৌর পড়তো। লেখাপড়াতে খারাপ ছিল না। টাইফয়েডে মাস দেড় শয্যাশায়ী থেকে সুস্থ হয়ে স্কুলে যাওয়া শুরু করার কিছুদিন পর গৌরে ক্ষেপামি টের পায়নি কেউ। তিন মাস পরে ক্লাস এইটের এ্যানুয়াল পরীক্ষায় গৌরা পাশ করতে পারল না। ক্লাস নাইনে প্রোমোশন না পাওয়ার পর থেকে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। স্কুলে যাওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্লাসে না এসে কোথায় যেন ঘুরতো। যেদিন ক্লাস করতো, মাষ্টারমশাইদের জ্বালাতো। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি, ক্লাসের পড়া এক বর্ণ না বুঝেও ঘনঘন মাথা নাড়তো। বিশ্বশ্রী হওয়ার জন্যে মুগুর, বারবেল কিনলো। ভোর চারটে থেকে শুরু হতো তার কসরৎ। মাঝে মাঝে একটা ফিতে দিয়ে বুক আর হাতের গুলি মেপে, সেগুলো কেমন বাড়ছে, বুঝতে চাইতো। কালো রং, চারফুট দশ ইঞ্চি হাইট, গৌর আর বাড়লো না। শরীর চর্চার জন্যে ছোলা আর ডিম দরকার। কয়েকটা টিউশনি জোগাড় করল গৌর। যেখানে যা দরকার, সেভাবে কোথাও স্কুল ফাইনাল, আই এস সি, বি. এস. সি পাশ বলে সে চালাতো নিজেকে। কোনো টিউশনিতেই বিশ পঁচিশ টাকার বেশি পেতো না। লেখাপড়ার মিথ্যে ধরা পড়ায় কয়েকবার সে মার খেয়েছে। পাড়ার ছেলেরা ওকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। গৌরের সামনেই তাকে বোতল বলে ডাকতো।

এই বস্তির দুটো ঘরে রেবার বাবা মণীন্দ্র ঘোষালের সংসার। রেবাদের ঘরের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো কিশোর। রেবারা সাত বোন, এক ভাই। রেবার বাবার বয়স বছর পঞ্চাশ, পোর্টে চাকরী। সাতটা মেয়ের পর ছেলে হতে, মণীন্দ্রকাকা ভারি খুশি হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা একটু বড়ো হতে ধরা পড়ল, সে জড়বুদ্ধি, পশু। সাত বছরের সেই ছেলে, রেবার ছোট ভাই রন্টু আজও ছাগল ছানার মতো নির্বোধ হয়ে আছে। দেশভাগ হওয়ার আগে কিশোরদের পাশের গ্রামে ছিল মণীন্দ্রকাকার বাড়ি। স্বচ্ছল অবস্থা ছিল ঘোষাল বাড়ির। মণীন্দ্রকাকা আর মাসির

পরিবারের যোগাযোগ, ঘনিষ্ঠতাও ছিল খুব। তাই মাসির কাছে এলে ঘোষালকাকীমার সঙ্গে দেখা করতো কিশোর। ফরসা ফ্যাকাসে চামড়া জড়ানো রক্তহীন ঘোষালকাকীমাকে দেখে কাকতাড়ুয়া মনে হতো কিশোরের। ছেলে হওয়ার পর বছরখানেক খুব খুশিতে ছিল ঘোষালকাকা। তারপর রণ্টুর রোগ ধরা পড়তে বেসামাল হয়ে গেল। চাকরীতে বাড়তি রোজগারের সুযোগ থাকলেও এই সৎ, সজ্জন মানুষটা সেদিকে তাকায় নি। বস্তির ফুটো চালের নিচে ডাল ভাত খেয়ে মাটি কামড়ে কাকা পড়েছিল। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের ঘোষালকাকার বড়োভাই, ইতিহাসে তাঁর নাম আছে, শহীদ হয়েছিলেন। অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবী মানুষটির স্মৃতিই বহু বছর আগলে রেখেছিল ঘোষালকাকাকে। কিন্তু অসুস্থ রণ্টুর সারিয়ে তোলার তীব্র বাসনা, জেদ ঘোষালকাকাকে পেয়ে বসলো। জাত গেল, দুর্নাম হলো, ছেলে সুস্থ হলো না। ধীর, শান্ত, সৎ ঘোষালকাকা এমন রগচটা, বদমেজাজী হয়ে গেল, ভাবা যায় না। বড়ো দুই মেয়েকে বাদ দিয়ে বাকি মেয়েদের যখন তখন ধেধড়ক পিটিয়ে বেহুঁশ হয়ে যেত ঘোষালকাকা। দু একজন মেয়েও জ্ঞান হারাতো। কিশোরকে দেখে ঘোষালকাকী খুশি হলো। তারপর বলল রেবা কাজে গেছে।

কথাটা শুনে কিশোর অবাক হতে কাকী বলল, টেলিফোন মোছার একটা কাজ পেয়েছে রেবা। মাসে একশো টাকা মাইনে। সকাল ন টা থেকে তিনটে পর্যন্ত ডিউটি।

কিশোর কিছু ভাবছিল। কাকী বলল, রেবার আসার সময় হয়েছে।

সামনে পেছনে দুটো খুপরি ঘর। পেছনের অন্ধকার ঘরে খুব হৈচৈ হচ্ছিল। রেবার দিদি তপতী, সেখান থেকে সামনের ঘরে এসে কিশোরকে দেখে খুব অবাক হলো।

ছাড়া পেলে কবে ?

তপতীর প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর।

তপতীকে আগের চেয়ে আরো শুকনো রোগা দেখাচ্ছে। পায়ে শ্বেত, থাকায় তার বিয়ে হয় নি। হয়তো হবে না। ভারী মিষ্টি চেহারা। একমাথা ঘন কালো চুল পিঠে ছড়ানো। তপতীর দুচোখের দৃষ্টি গভীর।

ফিসফিস করে তপতী বলল, রেবা মজা দেখাবে তোমাকে।

কথাটা বুঝতে না পেরে কিশোর তাকাতে তপতী বলল, খবর দাওনি কেন? এখানে তোমাদের পার্টির মধ্যে তোমাকে নিয়ে নানা আলোচনা গুজব রটেছে। অনেকে বলছে, পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়েছো তুমি।

কিশোরকে চুপ করে থাকতে দেখে সামান্য হেসে তপতী বলল, রেবার মুখেই এসব শুনেছি।

কী বলবে কিশোর ভেবে পেল না।

তপতী আবার বলল, তোমাদের পার্টির ভেতরে কেন এতো সন্দেহ, অবিশ্বাস, আমি বুঝতে পারি না। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। এদিকে গণপতি আবার রেবাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল। আমার ধারণা, তোমার নামে গণপতি আজেবাজে কথা বলে নেতাদের কান ভারি করেছে।

কিশোর কিছু বলতে যাচ্ছিল। তখনই কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে ভেসে এলো ভাঙচুরের শব্দ।

কান খাড়া করে শব্দ শুনে তপতী বলল, মারামারি লেগেছে।

অন্যমনস্ক কিশোর ফিরলো মাসীর ঘরে। ঘরের ঠিক পাশ থেকে আসছে ঝগড়া, গোলমালের শব্দ। উত্তেজিত কথা কাটাকাটি, অনেক গলা রাগে ফুঁসছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাসী বলল, জিতেন সাঁতরার ঘরের দখল নিয়ে কাল সকাল থেকে যা শুরু হয়েছে, কখন লাঠালাঠি লেগে যাবে, কে জানে!

মাসীর ঘরের ঠিক দুটো ঘর পাশে জিতেন সাঁতরার বন্ধ ঘরের সামনে মানুষের জটলা। সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত জিতেন সাঁতরার জীবন বৃত্তান্ত জেনে গেল কিশোর। কোনো এক বেসরকারী কোম্পানীর ক্যান্টিনে বিশবছর রাঁধুনি ছিল জিতেন। সাতকুলে কেউ না থাকায় গতকাল বস্তির জোয়ান ছেলেরা চাঁদা তুলে দাহ করেছিল তাকে। এখন জিতেনের ঘর দখল করে বস্তিকমিটির একটা অফিস বানাবে তারা। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিতেন সাঁতরার ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল কিশোর। পায়রার খোপের মতো ঘর, আবছা অন্ধকারে পুরো দেখা না গেলেও কিশোরের নজরে পড়লো ঘরে একটা খালি তক্তাপোষ। চারটে পায়ার তলায় একাধিক ইট দিয়ে তক্তাপোষ এতো উঁচু করা হয়েছে যে, তলায় বসে নানা কাজ অবলীলায় করা যায়। তক্তাপোষের তলায় জিতেন সাঁতরার কিছু পুরোনো বাসন, টিনের ট্রাঙ্ক, দু'তিনটে ছোট বড়ো পুঁটলি। ঘরে একপলক উঁকি দিতে কিশোরের নাকে ঢুকলো ভ্যাপসা গন্ধ।

গলায় করাতের ধার, গাছকোমর বেঁধে আকাশ ফাটিয়ে ঝগড়া করছিল পুঁটি। জিতেন সাঁতরাকে না দেখলেও তার ঠিক পাশের ঘরে পুঁটিদের পরিবারের সকলকে চেনে কিশোর। পুঁটির সঙ্গে কিশোর কথা বলেছে দু'একবার। বছর পনেরো, যোলোর মেয়েটা যে এমন দজ্জাল, ঝগড়ুটে, ভাবতে পারেনি। পুঁটি বলছিল, জিতেন কাকা মানুষ করেছে আমাকে। তার ঘর, জিনিসপত্রে আমার হক। কাকাকে বাবার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করতুম আমি।

পুঁটির কপালে লুটিয়ে পড়া রুক্ষ চুল, ফুলে ওঠা নাকের পাটা, দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে থতমত খেলো কিশোর। শাড়ির আঁচলে গলা, মুখের ঘাম মুছে পুঁটি বলল, এ ঘর আমার।

মাইরি আর কি, খেঁকিয়ে উঠে বিশু বলল, চাঁদা তুলে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তার মুখে আগুন দিয়েছি আমি। কোনো শালাকে জিতেনদার ঘরে ঢুকতে দেবো না। ঘরে বস্তিকমিটির অফিস হবে।

বিশুর কথায় আরো এক ধাপ উঁচুতে গলা তুলে পুঁটি এমন খেঁকিয়ে উঠল যে, তার কথার একটা বর্ণ'ও বুঝতে পারলো না কিশোর।

দু'পক্ষের মারমুখী চেহারা দেখে, আর দাঁড়াল না কিশোর। থকথকে ময়লা, নর্দমার পাশ দিয়ে হেঁটে নিঃশব্দে জটলার বাইরে সরে এলো। জিতেন সাঁতরা নামে

লোকটা আড়াল থেকে এই মজার ঘটনা দেখে হয়তো মুখ টিপে হাসছে, এরকম এক চিন্তা কিশোরের মাথায় খেলে গেল। জিতেন সাঁতরার ঘর, জিনিসপত্রের দাবীদারদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ চড়ছে। মাথার ঠিক ওপরে কাঁকিয়ে ডেকে উঠলো একটা চিল। কিশোর ঘরে ঢুকতে মাসী প্রশ্ন করল, মা, বাবার সঙ্গে দেখা করেছিস ?

রাতে যাবো, কিশোর বলল।

কিশোরকে দেখলেই স্নেহে, বিষাদে ভিজে ওঠে মাসীর দুচোখের পাতা। হয়তো নিজের খ্যাপা ছেলেটার কথা মনে পড়ে মাসীর। কিশোরের কাঁধে হাত রেখে মাসী বলল, কী চেহারা হয়েছে তোর ?

জবাব না দিয়ে আবছা হাসলো কিশোর। ঘরের মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে মেসোমশাই ঘুমোচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষটার মুখ সামান্য খোলা। হাঁ মুখ থেকে অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে।

চাপা গলায় মাসী বলল, দু'দিন রাতে পুলিশ গিয়েছিল তোদের বাড়িতে। তোকে খুঁজছে।

ঘরের বাইরে বিকট চিৎকারে, বিরক্ত উত্যক্ত মাসী বিড়বিড় করল, নরক নরকের মধ্যে আছি। আর থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু পাগল ছেলেকে রেখে মরেও যে শান্তি নেই।

মাসী ডুকরে কেঁদে উঠতে জেগে উঠলো মেসো। বাইরের হৈচৈ, মাসীর কান্না, সবকিছু তার গা সহা। ফাঁকা চোখে একপলক মাসীর দিকে তাকিয়ে বালিশের পাশে রাখা চশমাটা চোখে লাগালো মেসো। কিশোরকে দেখে মেসোর দুচোখের শূন্যতা মুছে গেছে।

কখন এলে, মেসো প্রশ্ন করল কিশোরকে।

কিশোর জবাব দেওয়ার ঠিক পরের মুহূর্তেই বাইরে থেকে কেউ ডাকলো, কিশোরদা !

খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে কিশোর দেখল, দ্যুতি দাঁড়িয়ে আছে। মাসী বলল, ভেতরে এসো।

ঘরে ঢুকে কিশোরের পাশে বসলো দ্যুতি। অবাক চোখে সে দেখছে কিশোরকে। কিশোরও তাকিয়েছিল দ্যুতির দিকে। রোগা, ছিপছিপে চেহারা, শক্ত, ধারালো চোয়াল, মুখে কাঁচ দাড়ি গোঁফ, মাথায় এলোমেলো ঘন চুল, দুচোখে প্রখর বুদ্ধি, দ্যুতিকে দেখেই বোঝা যায়, এ ছেলে অনেকদূর যাবে। হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় দু'বছর আগে প্রথম দশজনের মধ্যে ছিল দ্যুতির নাম। গত বছর দ্যুতির ছোট ভাই দীপ্তও হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। দাদার মতো না হলেও ভালো রেজাল্ট করেছে দীপ্ত। দ্যুতি, দীপ্ত দুজনেই পার্টি করে। দ্যুতি, দীপ্তর মা প্রভাদি পার্টির দরদী, পার্টির জন্যে উজাড় করে দিয়েছে সব।

আমি কবে গ্রামে যাচ্ছি, দ্যুতি বলল, এখানে থাকা মুশকিল। পাড়া ঘিরে মাঝে মাঝে বোম্বিং করছে মিলিটারি। তোমাদের এলাকায় একটা শেলটার দাও আমাকে।

লম্বাটে, চোখা চোয়াল, দুচোখে গ্রামে যাওয়ার আকুতি নিয়ে দ্যুতি তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।

এই আকুলতা কিশোরের ভালো লাগছিল। দ্যুতির মতো কিছু কর্মী গেলে তাঁতিপাড়া থেকে তরুণীপাহাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় রাজনৈতিক কাজ, সংগ্রামের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু নিজের দায়িত্বে কিশোর নিয়ে যেতে পারবে না দ্যুতিকে। পার্টির অনুমতি চাই। কিশোর বলল, পার্টি অনুমতি দিলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারি আমি। কথা বলো পার্টির সঙ্গে।

ম্লান হয়ে গেল দ্যুতির মুখ। দ্যুতি বলল, পার্টি চাইছে শহরে রেডগার্ড এ্যাকশন।

শহরেও কাজ আছে, কিশোর বলল, গণসংগঠন গড়া, বাড়ানো। গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে টেনে আনতে হবে মানুষকে।

গণসংগঠন, গণসংগ্রাম উঠে গেছে, দ্যুতি বলল, জেলে ছিলে তাই জানো না তুমি। এখন শুধু এ্যাকশন। এ্যাকশনই প্রচার। গেরিলা যুদ্ধ শুরু, পার্টির নতুন লাইন।

কিশোরের অবাক দৃষ্টি দেখে দ্যুতি বলল, সম্প্রতি প্রকাশিত পার্টির কয়েকটা দলিল পড়লেই বুঝবে। নিয়ে আসছি।

দ্যুতি বেরিয়ে গেল। তার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিশোর।

একই স্কুলে, কিশোরের চেয়ে, চার, পাঁচ ক্লাস নিচুতে পড়তো দ্যুতি। পাশের পাড়াতে দ্যুতিদের বাড়ি। দ্যুতি যে বছর স্কুল শেষ করবে, তখন য়ুনিভার্সিটিতে যাতায়াতের পথে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হতো কিশোরের। পাজামা, সিল্কের পাঞ্জাবি পরতো দ্যুতি। পাঞ্জাবিতে সেন্টের গন্ধ। খুব শৌখিন হয়ে উঠেছিল দ্যুতি। কিন্তু সে এতো মেধাবী ছাত্র ছিল যে, তার শৌখিনতা নিয়ে হাসার সাহস ছিল না কারো। ভালো ক্রিকেট খেলতো। পাড়ার পাঁচ সাতজন বন্ধু নিয়ে গোটা শীতকাল সকালে ব্যাট বল নিয়ে মাঠে নামতো। দ্যুতিকে নিয়ে অনেক গল্প ছিল স্কুলে। ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ার সময়ে এ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়ে কাঁদতে শুরু করল দ্যুতি। হেডমাস্টার, ক্লাসটিচার, স্কুলের অন্য মাস্টারমশাইরা প্রশ্ন করল, তুমি তো ফার্স্ট হয়েছো, কাঁদছো কেন?

আমি ফার্স্ট হতে চাইনি, সেকেন্ড হতে চেয়েছিলাম, কান্নাভেজা গলায় জবাব দিয়েছিল দ্যুতি।

সে কি, হেডমাস্টার হতবাক।

শ্যামলকে ফার্স্ট করিয়ে দিন, দ্যুতি বলেছিল, গতবছর শ্যামল ফার্স্ট হয়েছিল। ওর বাবা মারা গেছে। ওর বই নেই, বাড়িতে পড়া দেখাবার কেউ নেই, ওর ফার্স্ট হওয়া উচিত।

কয়েকটা চটি বই নিয়ে ঘরে ঢুকে দ্যুতি বলল, এখন এই বস্তিতে নারানদার ঘরে রাতে ঘুমোই আমি। নারানদার মুখে তোমার আসার খবর পেলাম।

দুপুরে দেখা নারানমুদির ঘুমন্ত মুখ চোখের ওপর ভেসে উঠতে কিশোর বলল, নারানদার দোকানের সামনে দিয়ে আসার সময়ে পিঁড়িতে বসে ঢুলতে দেখেছিলাম

তাকে।

কিশোরের কথা শুনে দ্যুতি বলল, নারানদা ঘুমোয় না। ঘুমের ভাণ করে রাস্তার ওপর নজর রাখে।

দ্যুতির বইগুলো উল্টে দেখছিল কিশোর। গত সাত-আট মাসে পার্টির লাইন যে এতো পাল্টে গেছে, বুঝতে পারেনি সে। গণসংগঠন নয়, গণআন্দোলন নয়, গেরিলা যুদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সত্তর দশককে মুক্তির দশকে রূপান্তরিত করতে হবে।

দিন শেষ হয়ে অন্ধকার নামছে। কিশোর আর রেবা মুখোমুখী বসে আছে। পার্টির সঙ্গে কিশোরের যোগাযোগ করিয়ে দেবার জন্যে বিকেল শেষ হতে বেরিয়ে গেছে দ্যুতি। ক্লান্ত, রোগা দেখাচ্ছিল রেবাকে। গায়ের রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। গত সাত, আট মাসের কাহিনী শেষ করে কিশোর থামতে চুপচাপ হয়ে গেল চারপাশ। জিতেন সাঁতরার ঘর নিয়ে ঝগড়া সন্ধ্যের আগে থেমে গেলেও সমস্যা মেটেনি। মুলতুবী ঝগড়া আবার শুরু হবে কাল।

ঘোষালকাকার দুটো ঘর এখন ফাঁকা। সাত মেয়ের মধ্যে রেবা এবং সবচেয়ে ছোট বোন দুটো ছাড়া ঘরে কেউ নেই। তোলা উনুনে আগুন দিতে বাইরে গেছে ঘোষালকাকীমা। কিশোরের রাজনীতি না জেনেও এ বাড়ির সকলে, এমনকি ঘোষাল-কাকাও কিশোরকে পছন্দ করে। পার্টিতে ঢোকার আগে দক্ষিণদেশ গোষ্ঠীতে ছিল বলেই তার রাজনৈতিক পরিচয় এখনো গোপন আছে। গোপন পার্টি এবং প্রচ্ছন্ন কাজ, এই ছিল দক্ষিণদেশ গোষ্ঠীর মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিপ্লবী রাজনীতি করার শুরু থেকে তাই নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পেরেছিল সে। পার্টি তৈরী হওয়ার পর কিশোর বুঝেছিল, ভারতবর্ষের বিপ্লবী সংগ্রামের মূল ধারা হলো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি। তখনই ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মী বন্ধুকে নিয়ে দক্ষিণদেশ ছেড়ে পার্টিতে যোগ দিল সে।

টুইশানি থেকে উত্তেজিত মুখে ঘরে ফিরে তপতী বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিশু আর তার দলের ছেলেদের সঙ্গে বেহায়াপনা করছে আলো। আমি ডাকলাম, এলো না।

তপতীর কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রেবার মুখ। ঘোষালকাকার চতুর্থ মেয়ে আলো, বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী নয়, একটু বারমুখো, বেপরোয়া। বিশুকে পছন্দ করে সে। বিশুর বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করে, আড্ডা দেয়। বাবা, দিদিদের শাসন মানে না। বিশুর ভয়ে আলোর গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না ঘোষালকাকা।

বাইরে বিশু, তার দলবলের কথা, হাসির শব্দ ক্রমশ বাড়ছে। ঘরের একচিলতে জানলা দিয়ে রাস্তায়, বিশুর পাশে আলোর মুখ দেখতে পেল কিশোর। খোলা চুল, টগবগে চেহারা, কী একটা কথা শুনে হাসতে হাসতে বিশুর কাঁধের ওপর ভেঙে পড়লো আলো। কথাটা শুনতে পেল না কিশোর। তার সঙ্গে রেবাও দেখলো আলোকে।

বাইরের কথা, হাসাহাসি শুনে ভেতরের ঘর থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তপতীর পাশে এসে দাঁড়ালো রন্টু। একলহমা শূন্য চোখে দেখলো কিশোরকে। রন্টুর মুখ দিয়ে নাল পড়ছে। শরীর, স্বাস্থ্য, কিশোর যা দেখে গিয়েছিল, সেরকমই আছে। উন্নতি হয়নি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে পেচ্ছাব করে ফেলল রন্টু। প্যান্ট ভিজে গেলেও ভ্রূক্ষেপ করল না সে। ভাইকে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল তপতী। মাসী এসে ডাকতে কিশোর বুঝল, মাসী কোনো খাবার বানিয়েছে। রেবাকে মাসী বলল, তুইও আয়। আপত্তি থাকলেও মাসীর আদরের ডাক এড়াতে পারলো না রেবা। কিশোরের সঙ্গে মাসীর ঘরে রেবাও এলো।

ঘরে ঢুকে কিশোর দেখল, একটা কলাই-এর থালায় গরম হালুয়া। সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে বদ্ধ অন্ধকার ঘরের বাতাসে। দুটো প্লেটে, কিশোর ও রেবাকে হালুয়া দিয়ে মাসী বলল, চা ভিজিয়ে দিয়েছি।

মেসোমশাই বেরোবার জন্যে তৈরী। কিশোরকে প্রশ্ন করল, আজ রাতে তুমি এখানে থাকবে তো?

নাহ, কিশোর বলল, মার কাছে যাবো।

মেসো বেরিয়ে যেতে ফাঁকা হয়ে গেল ঘর। কিশোর, রেবাতে ছাড়াছাড়া কথা হচ্ছিল। বহু বছরের পরিচয়। সামান্য দু' চার কথাতে অনেক কিছু বুঝতে পারে তারা। একদিন তাদের বিয়ে হবে, স্বামী স্ত্রী হবে তারা, মুখে না বললেও দুজনেই জানে। প্রেমের কথা কিশোর কখনো বলেনি রেবাকে। রেবাও শুনতে চায়নি। রেবা জানে, তার জন্যে কিশোরের মনের মধ্যে আলো হাওয়ার মতো ছড়িয়ে আছে ভালোবাসা। কিশোর তখন কলেজে পড়ে। রেবা, তার পরের তিন বোন স্কুলের ছাত্রী। এ বাড়িতে এলেই তাদের পড়াতো কিশোর। তরতর করে মিলিয়ে দিত কঠিন অঙ্ক। রেবার মায়ের একবার কলেরা হয়েছিল। তপতী, রেবার সঙ্গে কিশোরও জেগেছিল তিন চার রাত। রেবার ছোট তিন বোনকে নিজের বাড়িতে, মায়ের কাছে সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে রেখে এসেছিল কিশোর। পঙ্গু রন্টুকে নিয়ে হাসপাতাল, ডাক্তারের কাছে বাবার সঙ্গে কিশোরও কম দৌড়ঝাঁপ করেনি। বাবার ফিটের রোগ সারাতে অনেক চেষ্টা করেছে কিশোর। বাবার রোগ না সারলে, কিশোরের দোষ নয়।

শুধু রেবাদের কেন, এই বস্তির অনেকের আপদে বিপদে কিশোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তির পুরোনো বাসিন্দারা তাই কিশোরকে যথেষ্ট ভালোবাসে, খাতির করে। রেবার জীবনে কিশোর যেভাবে মিশে গেছে, তা শুধু নির্ভরতা নয়, অন্য এক অনুভূতি, বলে বোঝানো মুশকিল। কিশোরকে দেখলেই রেবার মনে হয়, কিছু একটা করার আছে, করতেই হবে।

রেবার মনে পড়লো, অনেকদিন আগের এক ঘটনা। আলো, জ্যোৎস্নাকে ঠেঙিয়ে অজ্ঞান করে দিয়ে সেই সন্ধ্যেতে বেহুঁশ হয়ে গেল বাবা। অসুস্থ রন্টু তখন হাসপাতালে। তাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা বাবা তখনও ছাড়েনি। ডাক্তার, পথ্য, ওষুধ, হাসপাতালে হু হু করে টাকা খরচ হচ্ছিল। টাকার ব্যাপারে অফিসে

কিছু গোলমাল করেছিল বাবা। সৎ, আদর্শবান মানুষ হিসেবে অফিসে যার সুনাম ছিল, তার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল বিভাগীয় তদন্ত। রেবার মাথার ওপর মাঝরাতে হঠাৎ মড়মড় করে উঠতো বাড়ির ছাদ। ঘুম হতো না রাতে। বুকের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কঠিন বরফ, হিমশীতল দীর্ঘশ্বাস।

সেই সন্ধ্যেতে আলো, জ্যোৎস্নার মাথায় জল ঢেলে তাদের জাগিয়েছিল কিশোর। বেহুঁশ বাবার নাকে স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে, মাথা ধুয়ে দিয়ে চাঙ্গা করে তুলেছিল। এই হলো কিশোর। হৈচৈ, অশান্তিতে ঘরে আলো জ্বলে নি সেদিন। বস্তিতে ইলেকট্রিক নেই। এখানে আলো মানে, হ্যারিকেন, কেরোসিন ল্যাম্প। নিকষ অন্ধকারে জ্বলন্ত উনুনে ভাতের হাঁড়ির সামনে পাথরের মূর্তির মতো বসেছিল মা। হাঁড়ির আড়াল থেকে কয়লার উনুনের লালচে আভা ছড়িয়ে ছিল মায়ের মুখে। ম্লান আলোয় ঘরের ভেতরটা শ্মশানের মতো থমথম করছিল। হঠাৎ জ্ঞান ফিরতে মাথার পাশে বসে থাকা কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরে গোঙাতে লাগলো বাবা।

বিপর্যস্ত মানুষটার হাতে গভীর সমবেদনায় অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিয়েছিল কিশোর। সে সন্ধ্যেতেও টুইশানিতে গিয়েছিল তপতী। বাড়ীর সকলে চুপ। ভয়ে টুঁ শব্দ করছিল না কেউ।

শুকনো চোখ, ফ্যাকাসে মুখ, রেবাকে সাহস দিয়ে কিশোর বলেছিল, ভয় পেও না। মানুষের অনেক কষ্ট। একদিন থাকবে না এ কষ্ট, ঠিক হয়ে যাবে সব।

বস্তির রাস্তায় একটানা কাঁদছিল কেউ। খোলা দরজা দিয়ে তারায় ভরা একচিলতে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বসেছিল রেবা। কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল সে। বুকের ভেতরে জমাট বরফ গলতে শুরু করেছিল। নিজের অজান্তে রেবা প্রশ্ন করেছিল, মানুষের এতো কষ্ট কেন ?

সেদিন রেবাকে অনেক কথা বলেছিল কিশোর। মানবসভ্যতা, শ্রেণীসমাজ, তার বিকাশ, বিবর্তন এবং অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণামে নতুন এক পৃথিবীর জন্মের কাহিনী শুনিয়ে কিশোর মন্তব্য করল, সেখানে বৈষম্য নেই কষ্ট নেই, মানুষের জয়যাত্রাকে ঠেকাতে পারবে না কেউ।

জ্ঞান ফিরে আসার পরে মাদুরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো ঘোষালকাকা। অন্ধকার ঘরে নড়াচড়া, নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে কিশোর বুঝতে পারছিল, তার কথাগুলো রেবার বোনেরাও শুনছে !

কয়েক জোড়া অদৃশ্য চোখের আগ্রহী দৃষ্টির কথা ভেবে আরো গভীর, নরম হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠস্বর। অন্ধকারে তার দু' চোখের ঝিকমিক আলোর দিকে তাকিয়ে, কথা শুনে, রেবার বুকের বরফ হয়েছিল স্রোতস্বিনী। সাঁইসাঁই শব্দ তুলে ঝড় উঠলো বস্তির আকাশে। কষ্টকর শীতলতা মুছে বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল এক মনোরম উষ্ণতা। নিবিড় সুখে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তার। কিশোরের আসল পরিচয়, তার চরিত্রের চাবিকাঠি সেই প্রথম খুঁজে পেল রেবা। অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়েছিল তার। তখন সে শিশু, সবে জ্ঞান হয়েছে। দেশের বাড়িতেএকজন মানুষ এসেছিলো।

গেরুয়া পরা দশাসই চেহারার সেই মানুষটার মাথায় জটা, এক মুখ দাড়ি গোঁফ। রেবা শুনেছিল, সেই সন্ন্যাসী তাদের কুলগুরু। রেবাদের বাড়িতে সাতদিন ছিল কুলগুরু। রোজ সান্ধ্যাহ্নিক সেরে বাড়ীর সকলকে বসিয়ে শান্তির জল ছিটোতো। বাড়ির সকলে দুপা ঢেকে এমনভাবে বসতো, যাতে এক ফোঁটা জল পায়ে না লাগে। শান্তির জল পায়ে পড়া মহাপাপ, দুঃখ দুর্ভোগের শেষ থাকবে না। এক সন্ধ্যাতে দু' চার ফোঁটা জল ঠিক পায়ের পাতায় পড়তে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল সে। দারুণ অশান্তিতে রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বারবার।

অনেক বছর পরে, বোধহয় কিশোরের কথার টানে, ডুবো স্মৃতি রেবার মনে জেগে উঠলো। কিশোর বলছিল, ইতিহাস নিজের নিয়মে চলবে, কিন্তু মানুষেরও কিছু ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা পালন করতে হবে। ইতিহাস এক মহাশক্তিশালী গাড়ি। থামে না। কিন্তু গাড়িতে তেল দিয়ে, যন্ত্রপাতি ঝেড়ে মুছে তাকে সচল রাখার দায়িত্ব মানুষের। এ দায়িত্ব ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে মানুষ কষ্ট পায়। ঈশ্বর আছে কি নেই, আমি জানি না। কিন্তু পৃথিবীকে বাঁচার মতো করে গড়ে তোলার দায় মানুষের। কাজ খুব কঠিন, জীবনের ঝুঁকি আছে। মানুষই ঝুঁকি নিতে পারে।

রেবার হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বিঁধছিল কিশোরের কথা। দুরদুর করে অবিরাম কাঁপছিল তার বুক। সামনে বসা রোগা, শ্যামলা মানুষটা, ধারালো দু চোখের মায়া, সাহসে জড়িয়ে ধরছিল তাকে।

কিশোর বলছিল, ন্যায্য সম্মানের সঙ্গে মানুষ বাঁচবে। পশুর মতো বেঁচে থাকার চেয়ে মানুষের মতো মরা অনেক ভালো। পৃথিবীর কোনো সভ্য, উন্নত দেশে মানুষ এভাবে বাঁচে না।

হালুয়া খেয়ে ডিশ চেটে ঝকঝকে করে ফেলল কিশোর। রেবা তখনও খায়নি। রেবার ডিশের দিকে তাকিয়ে জলের গ্লাসে চুমুক দিল কিশোর। ফেলে আসা সময় ওঠাপড়া করছে রেবার মনে। কিশোরের সুবাদেই জীবনের কাছাকাছি এসেছে, পৃথিবীকে চিনেছে রেবা। অভাব অনটনে স্কুলের পড়া শেষ হয়নি। শৈশবের অনেক সাধ, আকাঙ্ক্ষা মাঝপথে মুছে গেছে। দুঃখ, কষ্টে ভেঙে পড়েনি সে। বাবা, মা, অদৃষ্টকে দোষ দেয়নি। শুধু ভেবেছে, কেন এমন হয়, কতো কাল এরকম চলবে?

রেবাকে তখন নানা বই এনে দিত কিশোর। ভাববাদ খণ্ডন, মার্কসবাদের অ আ ক খ, মজুরি মুনাফা, শ্রম, পড়ে পুরো বুঝতো না সে। দুর্বোধ্য এক-ঘেয়েমিতে মাথা ধরে উঠতো মাঝে মাঝে। তারপর ধীরে ধীরে বই পড়া সহজ হলো। মন এতো বদলে গেল যে, পড়ার নেশা পেয়ে বসলো তাকে। একটা বই হাতে নিলে ব্যক্তিজীবনের হতাশা, অতৃপ্তি কেটে গিয়ে চনমনে সজীব হয়ে উঠতো তার শরীর। নতুন বই মানে একটা নতুন চোখ। মেয়েদের সম্পর্কে লেনিনের লেখা পড়ে ভাবাবেগে তিনদিন বুঁদ হয়ে ছিল সে। নিজেকে প্রথম স্পষ্ট দেখতে

পেয়েছিল। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করতে না পারার জন্যে বাবা, মা, সংসারের ওপর যে ক্ষোভ, রাগ রেবার মনে জমেছিল, মুছে গেল। বাড়ির সকলের জন্যে, চারপাশের মানুষের জন্যে, সীমাহীন মমতায় আর্দ্র, নরম হতে থাকল মন। পাশাপাশি দামী জামা-কাপড়, বাড়ি গাড়ি, উগ্র বিলাসিতা দেখে ঘেন্নায়, রাগে, দপদপ করতো মাথা। কঠিন দারিদ্র্য আর উপচে পড়া বৈভব গায়ে গা লাগিয়ে থাকতে পারে না, এমন একটা কথা মনে হতো বারবার।

কিশোর তার এলাকার সংগ্রামের কথা, সাঁওতাল পরগণার মানুষের জীবনের কাহিনী, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিবরণ শোনাচ্ছে রেবাকে। গোটা জেলা অগ্নিগর্ভ। ভন্না জমি উদ্ধার, মিনিমাম ওয়েজের দাবীতে লড়াই শুরু হবে। পার্টির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতেই কলকাতায় এসেছে কিশোর। কথা বলার সঙ্গে বারবার তাকাচ্ছে দরজার দিকে। দ্যুতি না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

কিশোরের সব কথা রেবার কানে ঢুকছে না। চাপা রাগে ধিকধিক করছে তার বুক। আজ দুপুরে ভীষণ বেইজ্জত থেকে বেঁচে গেছে সে! ঘটনাটা কিশোরকে বলা ঠিক হবে কিনা, রেবা ভাবছিল।

আট

একটা কুপি জবলছে ঘরে। বাইরে নিথর অন্ধকারে টুপটাপ শিশির পড়ার শব্দ। অজিতের দু'পাশে শিবেন, রঞ্জন, বাবলু, সামনে মোতি, লখাই, বুধন বসে আছে। এটা ঠিক ঘর নয়, গোয়াল। আগে ছাগল থাকতো, এখন খালি। ছেলেবেলায় এই ঘরে ছাগলের সঙ্গে কয়েকটা হাঁস, মুরগি দেখেছে মোতি। সেই পোষা জীবগুলো অনেকদিন আগে হাটে চালান হয়ে গেলেও ঘরের বাতাসে ভ্যাপসা গন্ধ রেখে গেছে। অযত্নে পাতলা হয়ে এসেছে, ঘরের খোড়ো চাল। মাটি লাগানো ছিটে বেড়ার ফুটো দিয়ে হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরে।

শিবেন বলল, আগুন জেবলে উঠোনে বসলে আরাম হ'তো।

পাগল, রঞ্জন বলল, গাঁয়ের ওপর এখন অনেক চোখের নজর, হল্লা হয়ে যাবে।

চুপচাপ বসেছিল বাবলু। হাত ঘড়িতে দশটা বেজেছে দেখে বাড়ি ফেরার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল, কোনো কাজ আছে আজ রাতে ?

না, রঞ্জন বলল।

দরজার ঝাঁপ ঠেলে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বাবলু। সন্ধ্যের আগে রাজনগরে ডাক্তারদার কাছে মোতির ফেরার কথা ছিল। যেতে পারলো না মোতি। বুধনের সঙ্গে রক্তমাখা কাপড়ে লখাইকে দেখেই দুর্ঘটনার গন্ধ পেয়েছিল সে। বুধন লখাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকার এক ঘণ্টা পরে হাজির হলো অজিত। তাকে দেখে বিস্ময়ে চমকে গিয়েও ভরসা পেল মোতি। তার হিসেবে কিশোর আর অজিতের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় হয়েছিল। তাই হয়েছে। লখাই-এর পায়ের কাছে শুয়ে ল্যাজ নাড়ছে, মাটি শুঁকছে তার পোষা কুকুর! সানকি ভরে মুড়ি পেঁয়াজ এনে অজিত, বুধন, লখাই-এর সামনে রাখলো মোতি! তারপর গেল তাঁতিপাড়ার কর্মীদের খবর দিতে। রঞ্জন, শিবেন, বাবলু পার্টির এগিয়ে থাকা কর্মী। তাদের ডেকে এনেছিল মোতি। পার্টির নতুন লাইন নিয়ে আলোচনা ছিল এতোক্ষণ। নির্বাক বসে আছে মোতি, বুধন, লখাই। অজিত, বুধন মুড়ি চিবোলেও সানকিতে হাত দেয় নি লখাই। অজিতকে দেখে রঞ্জন, শিবেন, বাবলু দারুণ খুশী হয়েছিল। রঞ্জন বলল, ঝড়ের গতিতে কাজ হচ্ছে। এ পাড়ার ছেলেরা, সকলেই আমাদের সমর্থক। কিছুদিনের মধ্যে বন্দুক দখল শুরু করবো আমরা।

পার্টির নতুন লাইন, খতম, বিন্দুভাঙা, গরীব কৃষকের গেরিলা স্কোয়াড তৈরীর কথা, জেলে ঢোকার আগে অজিত শোনেনি। ভন্না জমি দখল, মিনিমাম ওয়েজের লড়াই, কৃষক সভা গড়া ছিল প্রাথমিক কর্মসূচী। তারপর গেরিলা যুদ্ধ। কয়েক মাসে বদলে গেছে সব। অবাক হয়ে অজিত শুনছে রঞ্জনের কথা।

রঞ্জন বলল, ধনী কৃষককে বাদ দিয়ে ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষকের নেতৃত্বে সংগ্রামী মোর্চা গড়তে হবে মধ্য চাষীও থাকবে সেখানে।

বাইরে থেকে একবার ঘুরে এসে, ঘরে ঢুকে, নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকছে লখাই-এর কুকুর।

রঞ্জন বলল, এ গাঁয়েও শ্রেণীশত্রু আছে।

কে, মোতি জানতে চাইল।

দিবাকর মাল।

রঞ্জনের জবাব শুনে শিউরে উঠলো মোতি। কলকাতায় খতমের লড়াই শুরু হয়ে গেছে, শিবেন বলল, শহরে, গ্রামে আর কোনো তফাৎ নেই। সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগে যেখানে খুশী গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা যায়।

আমরাও শুরু করবো, রঞ্জন বলল, খতম অভিযান ছাড়া এখানে লড়াই উঠবে না।

মোতির মাথায় ঝলসে উঠলো মাধুর মুখ। কী বলবে ভেবে পেল না। হুশ হুশ করে বিড়ি টানছে অজিত। মন দিয়ে রঞ্জন, শিবেনের কথা শুনছে। কথাগুলো নতুন, বুঝতে চেষ্টা করছে।

ঘণ্টাখানেক পরে রঞ্জন, শিবেন যখন গোয়ালঘর থেকে বেরোলো, চারপাশে ঘুটঘুটে, শব্দহীন অন্ধকার, ঘুমিয়ে পড়েছে তাঁতিপাড়া।

বিকেল থেকে মোতি দেখছে গুম হয়ে আছে লখাই। জ্বরে তড়কা লাগার মতো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে তার শরীর। তাঁতিপাড়ার ছেলেদের সামনে বুধন, লখাই মুখ খুলবে না, মোতি জানতো। অজিতও বুঝেছিল, কিছু গোলমাল হয়েছে।

রঞ্জন, শিবেন চলে যেতে একটু এগিয়ে এসে বুধনের গায়ে গা ছুঁয়ে অজিত প্রশ্ন করল, কী হয়েছে ?

উত্তেজনা, ক্লান্তিতে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল বুধন। অজিতের প্রশ্ন শুনে সোজা হয়ে বসলো সে। লখাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, তু বল।

ফ্যালফ্যাল করে একপলক বুধনকে দেখে লখাই বলল, ঝুমরি তু খাড়া থাক।

অজিত তাকালো মোতির দিকে। লখাই-এর কাঁধে জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বুধন বলল, বল, কী হয়েছে বল।

জোড়াতালি দিয়ে সকালের খবর লখাই যা বলল, সবটা বুঝতে পারল না অজিত, মোতি। তবে জানগুরু যে খুন হয়েছে, ধরতে পারলো দুজনে। কথা বলার সময় লখাই হাসছিল, কাঁদছিল, চোখের সামনে দুটো হাতের পাতা মেলে ধরে বলছিল, আমি গজ কিরিচি।

মুখচোরা, শান্ত ছেলেটা প্রবল ঝড়ে বিধ্বস্ত, এলোমেলো হয়ে গেছে।

অজিতকে লখাই বলল, তুই বল, আমি ঠিক করেচি কিনা ? জানের বংশ নির্বংশ করা কী পাপ ?

মোটেই নয়, অজিত বলল, ঠিক করেছিস তুই। ধীরে ধীরে সহজ, স্বাভাবিক হলো লখাই। সানকি থেকে নেতিয়ে পড়া কয়েক মুঠো মুড়ি পুরলো মুখে। একমুঠো দিল পোষা কুকুরকে। গাঁয়ের নানা খবর অজিতকে দিয়ে বুধন জানালো,

তার ঠাকুর্দার দশ টাকা দেনা সাত বছরে তেষট্টি টাকা হতে মহাজন সদাশয় সাহা গত হপ্তায় চড়াও করেছিল তাদের ঘর। ঠাকুর্দা টাকা দিতে না পারায় ঘরের চৌকাঠ খুলে নিয়ে গেছে সদাশয় সাহা।

বুধন একটু আবেগপ্রবণ। ঘটনা বলার সময়ে কান্নায় বুজে এলো তার গলা অনেকদিন আগে তার বাবাকে তেঁতুলগাছে বেঁধে এই সদাশয় সাহা একবার চাবকেছিল। ছেলের সামনে মার খাওয়ার লজ্জা ঢাকতে বুধনকে বাবা বারবার বলছিল, তু এখান থিকে চলে যা। চলে যা।

ব্যাপার টের পেয়ে সদাশয় সাহা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল বুধনকে। বুধনের দিকে একবার তাকিয়ে দুচোখ বন্ধ করেছিল বাবা। চাবুকের ঘায়ে রক্তে ভেসে গিয়েছিল বাবার শরীর। তবু মহাজন ছাড়েনি। তেঁতুল গাছে বাঁধা বাবার বেহুঁশ শরীর সেখানেই পড়ে থাকলো সারারাত। সদাশয় সাহার তাই হুকুম ছিল। পরের দিন আহত মানুষটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির লোকেরা। সেই থেকে বুধনের বাবার শরীরে নানা রোগ। বুধনের বাবা এখন গ্রামের মাঝিহারাম, মোড়ল।

বুধনের মুখে এ কাহিনী আগেও অজিত, কিশোর শুনেছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই নতুন করে সেই ভয়ংকর স্মৃতি রোমন্থন করে বুধন। তখন তার গলার স্বর, চোখের রঙ বদলে যায়, গনগনে তাপ ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। বুধনের পুরোনো গল্প তাজা, নতুন, প্রথম শুনছে অজিতের মনে হয়।

রাত বাড়ে। চারপাশ নিঝুম, নিঃশব্দ। ঘরের মধ্যে চারজন চুপচাপ।

অজিতের হাত চেপে ধরে লখাই হঠাৎ প্রশ্ন করল, তু সাচ বল, ঝুমরিকে আমি মিলবেক কিনা?

কুপির তেল কমে আসায় হলুদ শিখায় চারপাশে বেড়ে উঠছে ছায়া। ছায়া কাঁপছে। বাইরে অন্ধকারে পায়ের শব্দ শুনে মোতি বুঝতে পারলো, দিবাকর কাকা থানায় রুটিন হাজিরা দিতে যাচ্ছে। কুপির শিখা থেকে একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে অজিত দেখলো, বুধন ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে আছে লখাই। ফাঁকা চোখে সে দেখছে অজিতকে।

রঞ্জন, শিবেনের মুখে শোনা নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে ভাবছিল অজিত। হাওয়া ঘুরে গেছে। অনেক নতুন মানুষ এসেছে পার্টিতে। বিপ্লবী রাজনীতি ছাড়া বিপ্লব হয় না। শক্তিশালী চুম্বকের মতো হাজার হাজার মানুষকে আকর্ষণ করে নির্ভুল রাজনীতি। রাজনীতি বোঝাতে হবে সকলকে! দিগন্ত ভাসানো এক ঢেউ এগিয়ে আসছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজে বুঝলেও অন্যকে রাজনীতি বোঝাতে দিশেহারা হয়ে যায় অজিত। এ কাজে কিশোর ওস্তাদ। পাঁচজনের আঁতের কথা, তাদের ব্যথা, বেদনা, আকাঙ্ক্ষা কিশোর যেমন খুঁচিয়ে বার করে আনতে পারে, তেমনি তাদের সজাগ, উদ্বুদ্ধ করে তোলাতেও জুড়ি নেই তার। অজিত ঠিক করল, বাহেরদয় ফিরে কিশোরের জন্যে অপেক্ষা করবে সে।

লখাই-এর রক্তমাখা কাপড় দেখে তাকে জন্মযোদ্ধা মনে হলো অজিতের। বুধনও তাই।

কিশোর ফিরলে শুরু হবে সংগ্রামের নতুন পর্ব। তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় দপ করে নিভে গেল কুপি। ঘরের মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মোতি, বুধন, লখাই কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে ধিকধিক করে জ্বলছে একবিন্দু বিড়ির আগুন।

তাত্ত্বিক কচকচিতে আজকাল অজিতের রুচি নেই। এতো সভা, আলোচনা বৈঠক হয়েছে, যে এখন এসব শুনলে অজিতের ভয় করে। মনে হয়, কোনো ভ্রান্তি প্রতারণা জনসমক্ষে সঠিক, নির্ভুল প্রমাণ করতে কিছু চতুর লোক মতলব ভাঁজছে! আর সভা নয়, কাজ চাই। গা গতর নাড়াতে হবে। পার্টির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে কতো নিষ্ঠাবান কর্মী, মজুর, কিষাণ জীবন দিয়েছে। ফল কি দাঁড়িয়েছে? শহীদবেদী, ফুলের মালা, ভোট, ফাঁকা তর্জন গর্জনে যাবতীয় আত্মত্যাগের সমাপ্তি। অজিতের ধারণা, তত্ত্ব মানেই বিপ্লব ঠেকাবার ষড়যন্ত্র, প্রতিবিপ্লবী ধান্দা। বিস্তর গণ-সংগঠন গণ-আন্দোলনের পরেও বিপ্লবী শিবির আজও সমান পলকা, দুর্বল, ছত্রভঙ্গ। আর নয়। বন্দুক হাতে সব প্রশ্নের ফয়সালা করতে হবে। গণ আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকের আত্মাহুতির বিনিময়ে কিছু নপুংসক, ভণ্ড, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক নেতা, জোতদার দখল করেছে পার্টি নেতৃত্ব! তারাই পার্টির নীতি নির্ধারক পরিচালক। নিচুতলার অসংখ্য সৎ বিপ্লবী কর্মী অসহায় দেখে যাচ্ছে এই খেলা। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা দেশের নিকৃষ্ট লোকেদের নেতৃত্বে চলছে। ভেবে অজিতের কষ্ট হয়।

তবে সে জমানা শেষ। তৈরী হয়েছে গরীব মানুষের সংগঠন, বিপ্লবী পার্টি। ঝড় উঠবে। বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস, প্রচার হয়ে গেলে, খুব জব্দ হবে তত্ত্ববাজরা। বন্দুক হাতে সমস্ত বিতর্কের ফয়সালা করা, চুরুট ফোঁকা, আরামকেদারার বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ, শক্তি, সাহসের কাজ। পাথরের মতো ঠাণ্ডা অন্ধকারের হিমেল নিঃশ্বাস হাড়ে ঢুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে অজিতকে। ঘুমোতে না পারলেও তার বুকে ছড়িয়ে পড়ছে খুশী।

জেলে বন্দী জীবনের দিনগুলো মনে পড়লো অজিতের। ছাড়া পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল সে। চাপা অধৈর্যে গুমরে উঠতো, বদলা নিতে হবে, বদলা চাই।

পার্টির নতুন লাইন সে সুযোগ করে দিয়েছে। হিংসার জবাবে হিংসা, সরাসরি যুদ্ধ শুরু হবে।

গত আটমাস জেলে কিশোরের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে তার! ইতিহাস, রাজনীতির শেকড়ে গিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে কিশোর। বন্দুকের নল রাজনৈতিক শক্তির উৎস জেনেও রাজনীতি যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কিশোর বিশ্বাস করে। বিপ্লবী যুদ্ধে সৈন্যবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিপ্লবের নেতা হলো পার্টি। পার্টি নেতৃত্ব ছাড়া বন্দুকবাহিনী সন্ত্রাস আনে, ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। কলেজ জীবন থেকে কিশোরের সঙ্গে অজিতের বন্ধুত্ব। কখনো ছাড়াছাড়ি হয় নি। অজিত যখন সংশোধনবাদবিরোধী গোষ্ঠীতে, কিশোর দক্ষিণদেশে, তখনও একসঙ্গে ছাত্র আন্দোলন করেছে। ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে, তারা পাশাপাশি থেকেছে, লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিশোরের শরীরে রাগ,

উত্তেজনা কম। মতের অমিল মেনে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনায় বসতে পারে সে। এক লাফে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সতর্ক, মাপা পায়ে সে বাড়তে চায় শক্ত সমর্থ পদক্ষেপে সে যে লক্ষ্যে পৌঁছোবে, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কিশোরের সঙ্গে তার চরিত্রের তফাৎ, অজিত জানে। রাজনীতি, যুক্তির চেয়ে আবেগ, উত্তেজনা তার চরিত্রে বেশী। হঠাৎ রেগে যায়, সামান্য কারণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুশীতে। রাগলে এক ক্ষুধার্ত বাঘ তার রক্তের মধ্যে এমন দাপাদাপি করে যে সে বেসামাল হয়। খুশী হলে বিশ্বসংসার অবলীলায় দান করে দিতে পারে।

তিনজন মানুষের গভীর নিঃশ্বাসের ওঠাপড়ার শব্দ শুনে অজিত বুঝলো, একা জেগে আছে সে। মোতির বাড়িতে বুধনকে দেখে খুশী হয়েছিল অজিত। এখানে তার প্রথম ক্যাডার বুধন! নিরীহ মুখ দেখে বোঝা মুশকিল যে, বুধন একজন দুরন্ত বিপ্লবী কর্মী। মোতির পরামর্শে, এক ঝাঁকা মনিহারী জিনিস, বিড়ি, সস্তা সিগারেট, দেশলাই, রঙিন ফিতে, চুলের কাঁটা, লাল-নীল লজেন্স, বেলপাতি সিঁদুর, দেশগাঁয়ে ফিরিওলা যা বাউরি করে, ঝাঁকায় ভরে নিয়ে অচেনা সাঁওতাল পল্লীর দিকে পা বাড়িয়েছিল সে। মোতি বুদ্ধি দিলেও জিনিসপত্র নিজে সওদা করেছিল অজিত। গ্রামের গরীব মানুষদের মধ্যে আশ্রয় খোঁজার জন্যে শহরের কর্মীদের তখন দারুণ ব্যস্ততা, তাড়াহুড়ো। পার্টির নির্দেশ, শহর ছেড়ে এখনি গ্রামে গিয়ে গরীবদের মধ্যে কাজ করতে হবে। বন্ধুরা অনেকেই গ্রামে যাচ্ছে। মাথায় বাউরি নিয়ে ফিরিওলা সেজে অজিতও গ্রামে ঢুকেছিল। কলকাতার আকাশে তখন একটাই আওয়াজ, গ্রামে চলো, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো।

আসলে ভারতবর্ষ তো একটা বড়োসড়ো গ্রাম। শতকরা আশিজন ভারতীয় গ্রামের মানুষ। সামন্ত অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে তারা ডুবে আছে। এই জনসমাজকে জাগাতে গ্রামে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? কিশোরও শহর ছাড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। শহুরে কর্মীদের নিয়ে পার্টিতে মজা, রসিকতা চালু হয়েছিল। শহরবাসী বড়োনেতাও শহরবাসের অপরাধে হারিয়ে ফেলছিল নিজের গুরুত্ব।

গণসংগঠন, গণ-আন্দোলন বয়কটের লাইন তখনও পার্টিতে আসেনি। বিপুল উদ্দীপনায় শ্রমিক, ছাত্র, যুবকরা গণসংগঠনে কাজ করছে। স্লোগান বক্তৃতার ভাষা বদলে গেলেও মিছিল, সমাবেশের কামাই ছিল না। মিছিল করার কৌশলও বদলে গিয়েছিল। আনুষ্ঠানিক পোস্টার হ্যান্ডবিলের বদলে গোপনে, মুখে মুখে গেরিলা কায়দায় শুরু হয়েছিল প্রচার অভিযান। কয়েক হাজার তরুণের একটা মিছিল হঠাৎ আকাশ থেকে রাস্তায় নেমে নির্দিষ্ট পথ পরিক্রমার পরে নিমেষে মিলিয়ে যেত।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের পর নিয়মতান্ত্রিক বামপন্থীদের অবস্থা খুবই কাহিল হলো। সমাজতন্ত্রে পৌঁছোনোর সংসদীয় রাস্তা বেকসুর মার খেয়েছে। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না বুঝে রেজিস্টার্ড বামদলগুলো দিশেহারা। কিছু করার নেই তাদের। দলে লোভ, সন্দেহ, ভাঙন। ঘর সামলাবার জন্যে বিপ্লবীদের গাল দিতে শুরু করেছে। বিপ্লবীদের বলছে, পুলিশের চর। তাদের কেন পুলিশ গুলি করে মারছে না, রেজিস্টার্ড বামপন্থীরা প্রশ্ন তুলছে। বন্দুকের নলে জন্মনিয়ন্ত্রণের

নিরোধ লাগানো আছে, এমন সন্দেহও সংসদীয় বামপন্থীরা করল। গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও কীভাবে একজন কর্মী গ্রামে ঢুকবে, পার্টি বলল না। যে গ্রামে যাবে দায়িত্ব তার। তাকেই উদ্যোগ নিতে হবে। গাঁয়ের সবচেয়ে গরীব মানুষের ঘরে আশ্রয় দিয়ে গতরে খেটে খেতে হবে। এর নাম পেশাদার বিপ্লবী। সব কিছু পণ করে আমৃত্যু বিপ্লবের জন্যে লড়বে সে। জমির লড়াই, মজুরীর লড়াই, দিয়ে শুরু করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে গরীব কৃষকদের টেনে নিয়ে যেতে হবে। প্রচারের তাপে, গাঁয়ে যাওয়ার জন্যে উসখুস করছিল অজিত। তখনই কিশোরের ব্যাংকে মোতির সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দেখা হলো তার। ব্যাংকের ক্যান্টিনে কাজ করতো মোতি। উর্দি পরে টেবিলে চা, খাবার দিত। তার সম্পর্কে অনেক খবর কিশোর শুনিয়েছিল অজিতকে।

মোতি পোড় খাওয়া ছেলে, অনেক দেখেছে, কিশোর বলেছিল। অল্প সময়ে মোতির সঙ্গে অজিতের ঘনিষ্ঠতা হলো। হরতুকীবাগানের একটা বস্তিতে তখন থাকতো মোতি। লিভারের রোগে মোতি ভুগছে শুনে তার চিকিৎসা শুরু করেছিল অজিত। হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে প্রায়ই মোতির ঘরে চলে যেতো সে। হোমিওপ্যাথি বই পড়ে উপযাচক হয়ে চিকিৎসা করার নেশা পেয়ে বসেছিল তাকে। সে গেলে ভারী খুশী হতো মোতি।

দশাসই চেহারা, গমগমে কণ্ঠস্বর, অজিত পাশে থাকলে দশগুণ বেড়ে যেতো মোতির সাহস। মোতি দেখতো, পাড়ার মস্তানরাও সমীহ করে অজিতকে। তুলনায় কিশোর ঠাণ্ডা, গম্ভীর, কম কথার মানুষ। এতো নিচু গলায় কিশোর কথা বলে যে, অনেক সময় তার সব কথা মোতি শুনতে পায় না। তবু নতুন জীবন পৃথিবী, সমাজের নানা জটিল হেঁয়ালি তার কাছে কিশোর প্রাঞ্জল করে দিয়েছিল। ভয়, লজ্জা, হীনম্মন্যতা মনের মধ্যে আজন্ম পুষে রেখেছিল মোতি, কিশোরের সঙ্গে মিশে সব কেটে গেল। দামী পোশাক বিত্তবান মানুষের সামনে দাঁড়ালে আগে ঘাড় নুয়ে, দু'হাত কচলাতো মোতি। এখন শিরদাঁড়া সোজা করে যে কোনো লোকের সামনে সটান দাঁড়াতে পারে সে। পৃথিবীর ধাঁধা রহস্য তার চোখে স্পষ্ট, পরিষ্কার।

একটু ঘুমোতে চাইছিল অজিত! কাল থেকে অনেক কাজ। জেলখানায় কয়েকমাস আলস্যে কাটাবার পর হঠাৎ ছাড়া পেয়ে তার স্নায়ু, শিরা উত্তেজিত, চঞ্চল, ঘুম ছুটে গেছে। অন্ধকারে তিনজনের নিঃশ্বাসের শব্দ, কীটপতঙ্গের হাঁটাচলার আওয়াজ।

জানগুরু নিধনের কাহিনীও অজিতকে চঞ্চল করেছে! আকস্মিক হলেও পার্টির নতুন ভাবনার সঙ্গে মিলে গেছে এ খতম। লখাইয়ের কাজের তারিফ করে অজিত বলেছিল, সাবাস, ঠিক করেছো। শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে।

তার কথা শুনে আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসেছিল লখাই। তার চোখ মুখের রঙ বদলে গিয়েছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নেতা সিধু-কানুর কাহিনী লখাইকে শুনিয়েছিল অজিত। বিপ্লবের জন্যে সেই দুই বীরের আত্মত্যাগের গল্প শেষ করে অজিত বলেছিল, তাদের

অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হবে আমাদের। জানগুরু, মহাজন, দিখু, জমিদাররা একই দলের লোক। দুষমণ, তাদের খতম করায় তাই কোনো অপরাধ নেই। সিধু-কানুর যোগ্য সন্তানের কাজই করেছে লখাই। মারাই সবে শুরু, জয় না হওয়া পর্যন্ত লড়তে হবে।

অজিত, কিশোর ধরা পড়ার পরেও কাজ থামেনি। তাঁতলুই, বাহেঙ্গা, চারপাশের গাঁয়ে অনেক সভা বৈঠক হয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের বুদ্ধিমতো আলোচনা করেছে।

হোমিওপ্যাথির বাক্স বুধনের ঘরে আছে শুনে স্বস্তি পেয়েছিল অজিত। কিশোর ফিরলে অঞ্চল পার্টি কমিটির সম্পাদককে ডেকে রাজনগর, রানীশ্বর থানা পার্টি কমিটি গড়তে হবে। ফরাক্কায় অঞ্চলকমিটির সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

অন্ধকার ঘরে দু চোখ বুজে শুয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবছিল অজিত। এলাকায় ঢোকার গোড়ার দিকে ফিরিওলা সেজে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি সে। ঠাঠা দুপুর রোদে লালচে পাথুরে মাটি যখন গরম হলকা ছড়াচ্ছে, মাঠের পর মাঠ, গ্রাম, মাথায় বোঝা, নিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্তিতে বেরিয়ে আসতো তার জিভ। রোজ প্রায় বিশ, পঁচিশ মাইল হেঁটেও নির্ভর করার মতো একটা যোগাযোগ তৈরী করতে পারলো না। সাঁওতালরা সাবধানী, সতর্ক জাত। তাদের চোখে মহাজন ব্যবসায়ী, উটকো, অচেনা লোকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সাঁওতাল গ্রামে তাই পাত্তা পেল না অজিত। ফাঁকা মাঠ, একটা গাছ নেই। বুক ফাটা তৃষ্ণায় ফটিক নদীর জল খেত। চানও করেছে নদীর জলে। মাইলের পর মাইল ধুধু মাঠ। মাঝে মাঝে শাল, মহুয়া, পলাশের জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুমে জড়িয়ে আসতো দুচোখ। প্রায় একমাস ঘোরাঘুরি করে কোনো গাঁয়ে আশ্রয় না পেলেও একটা বড়ো লাভ হয়েছিল তার। বাংলা, বিহার সীমান্তে ছড়ানো গ্রাম, গ্রামের মানুষদের ধীরে ধীরে চিনতে শুরু করেছিল। একদিকে হতভাগ্য, গরীব মানুষের পাড়া, অদূরে বর্ধিষ্ণু, সম্পন্ন গ্রাম। ভদ্রপাড়ার বাইরে আদিবাসী, উপজাতিদের বসতি। বেশীরভাগ সাঁওতাল, তারপর পাহাড়িয়া, মুহুলি, ঘাটোয়াল সম্প্রদায়ের মানুষ। সংখ্যায় কম, সবচেয়ে গরীব হলো ঘাটোয়ালরা। ভদ্রপাড়া আর আদিবাসীদের মাঝখানে থাকে ডোম, বাউরি, মাল, নীচুজাতের মানুষ। নীচুজাতের মানুষরা মহাজন, ধনী চাষীর ঘরে মুনিষ খাটে, মাহিন্দারি করে, গোরু ছাগল চরায়। তাদের বলা হয় বাগাল। ক্ষেতখামারের কাজ ছাড়া আদিবাসীরা আর কোনো সুযোগ পায় না। তাদের ছায়া মাড়ালে ভদ্রলোকদের নাইতে হয়।

বিড়ি কেনার জন্যে দু'চারজন সাঁওতাল পুরুষ ছাড়া মেয়েদের কেউ ফেরিওলা অজিতের কাছে ঘেঁসলো না। দুমকাবাসী সে পুরোনো ফিরিওলা অজিতকে দেখে রেগে টং। চৌকিদারকে ঘুস দিয়ে সে লেলিয়ে দিল অজিতের বিরুদ্ধে। অজিতও পালটা ঘুস, এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে বশ করেছিল চৌকিদারকে। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করতে পারলো না সে।

দুর্যোগময় এক সন্ধ্যের স্মৃতি মনে পড়লো তার। ডাক্তারদা আর মোতির সঙ্গে

রাজনগরে বৈঠক করার জন্যে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে বাগজোগরা থেকে ফিরছিল অজিত। দুপুর থেকে আকাশে ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। মাঝেরপাড়া ছাড়তেই অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। আবছা, ধূসর রাজনগর হাঁটাপথে তখনও দশ বারো মাইল! অনেক পেছনে বাঁশবনা গ্রাম। সামনে উধাও খোলা মাঠ। আরো কিছু এগোতে বাঁ দিকে ঘন জঙ্গল। অজিতের চেনা মনে হলো। এই জঙ্গলের ওপারে বাশকুলি গ্রাম। সেখানে একবার পৌঁছোলে, মেঠো পথে রাজনগর ছ' মাইল। অন্ধকারে শাল, কেঁদুর জঙ্গল ভেদ করে খানিক হেঁটে অজিতের মনে হলো, ভুল হয়েছে পথ। নির্জন, স্তব্ধ বনভূমি, জন-মানুষের সাড়া নেই। মাথায় বোঝা, বুকে উদ্বেগ, দরদর করে ঘামছিল অজিত। রাজনগরে যাবার তাড়া না থাকলে এখানে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে রাত কাটাতো। আগেও এরকম হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু সেদিনের জরুরী বৈঠকে না গিয়ে উপায় ছিল না। অন্ধকার জঙ্গলে পথ হারিয়ে নিজের বোকামিতে আপশোস করছিল অজিত। বিদ্যুৎ চমকাতে দুর্ভেদ্য অরণ্যে এক ঝলক আলো নেচে গেল। তখনই উঠলো ঝড়। ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতো ছুটে এলো সাঁইসাঁই হাওয়া। দমকা ঠাণ্ডা বাতাসে একরাশ শুকনো পাতা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার শরীরে। শাল কেঁন্দুর বনে হুড়োহুড়ি লেগে গেল। মাথার ঝাঁকা মাটিতে রেখে আঁকড়ে ধরে বসে থাকলো অজিত। চারপাশের শালগাছগুলো পাঁচ সাত ফুটের বেশী লম্বা নয়। ডালপাতায় ঠাসা। ঘনঘন বিদ্যুতের আলোয় থরথর করে কাঁপছে। সামান্য দূরে বিশাল চেহারার লম্বা একজোড়া তেঁতুল গাছ। তাদের ঝুঁটি ধরে মাটিতে পেড়ে ফেলতে চাইছে খ্যাপা ঝড়। পাতায় পাতায় গোঙানি। কান ফাটানো বাজের শব্দে চমকে উঠলো নির্জন, গম্ভীর অন্ধকার। এমন মত্ত ঝড়, ঘন অন্ধকার আগে দেখেনি অজিত। বন, গাছগাছালি, মাঠ ঝড়ের দাপটে উড়ে যেতে চাইছিল। বড়ো বড়ো, ভারী ফোঁটায় নামলো তুমুল বৃষ্টি। চোখে দেখা না গেলেও অন্ধকার গাছ, পাতার ছাদ ফুঁড়ে বৃষ্টি পড়বে। সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনতে পেল অজিত। হঠাৎ নিজেকে খুব অসহায়, একা লাগলো তার। ঠিক ভয় নয়, অন্য এক অনুভূতি। অন্ধকার রাত, ঝড় বৃষ্টি, দেশ কাল, ইতিহাস, আত্মীয় বন্ধু প্রলয়ের ঝঞ্ঝনায় একাকার হয়ে গেল। মৃত্যুকে ভয় পায় না সে। মৃত্যুকে আটকাবার মতো দরজা আজও তৈরী হয় নি সে জানে। বেশীর ভাগ মানুষ বাড়িতে বসে মারা যায়। বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুদের সামনে সে মৃত্যুতে অনেক আরাম। সে মরায় অহমিকা তৃপ্ত হয়। কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে, আত্মীয় বন্ধুবিহীন এই নিঃসঙ্গ অপঘাত মৃত্যু নিরর্থক, বেদনাদায়ক অপচয়। মাথার ওপর গাছপালার ছাতা থাকলেও বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গিয়েছিল সে। হাত দশ দূরে একটা তেঁতুল গাছের ডাল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে কেঁপে উঠলো অজিত। একগাদা কাদা জল ছিটকে এসে লাগলো তার শরীরে, মুখে, কপালে। বিরাট, ঝাঁকড়া ডাল। আর একটু হলে ঘাড়ের ওপর পড়তো। ভয়ে সামান্য পেছিয়ে গিয়েছিল সে। অন্ধকার জঙ্গলে সপসপে ভিজে শরীরে আতঙ্কে মুহূর্তের জন্যে কাবু হলেও ধীরে ধীরে সাহস ফিরে পেয়েছিল। নেতিয়ে পড়া মন চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল দুর্জয় আত্মবিশ্বাসে। মরার ভয় সে কখনও পায় নি। তবে বুক

ফুলিয়ে বীরের মতো মরতে চায় সে। জীবন এবং মৃত্যু, প্রথমটায় তার হাত নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে। জ্যান্ত মানুষ তাই মৃত্যুকে পরোয়া করে না। তুমুল বৃষ্টিতে ঘণ্টাখানেক ভিজে, দাঁতে দাঁত টিপে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। গায়ে সাপটে ধরা ভিজে গেঞ্জি, লুঙ্গি ভেদ করে হিলহিলে ঠাণ্ডা হাওয়া রক্তে ঢুকে যাচ্ছিল। গেঞ্জি খুলে নিংড়ে বিঁড়ে পাকানো গামছা দিয়ে গা মুছল সে। কাঁপুনি লেগেছিল শরীরে।

মাঝ রাতে বৃষ্টি কমে যাওয়ার পর কালো মেঘ উড়ছিল আকাশে। ঘন অন্ধকারে চারপাশে ছলছল, কলকল জলের শব্দ। উঁচু নিচু ঢাল বেয়ে সমভূমিতে, ফটিক নদীর দিকে ছুটে চলেছে জলস্রোত। পাথরের টুকরোয় বাধা পেয়ে বেড়ে যাচ্ছে স্রোতের বেগ। বড়ো বড়ো পাথরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়, বহু বছর আগে পাহাড় ছিল এখানে। সময়ের ধাক্কায় পাথরের কিছু টুকরো রেখে সে পাহাড় আজ উধাও। অন্যরকমও হতে পারে। বৃষ্টি, বন্যার তোড়ে দূরের কোনো পাহাড় থেকে টুকরো-গুলো ভেসে এসেছিল। মাইল দশ দূরে তরণী পাহাড় থেকেও আসতে পারে। কিন্তু ওদিকটা অনেক গড়ানো, ঢালু। তরণী পাহাড়ের টুকরো এগুলো নয়। চারপাশের গভীর নীরবতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে জলস্রোতের শব্দ। হাওয়ার দাপাদাপি বন্ধ হতে গুমোট নেমেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে উঠে দাঁড়ালো অজিত। বৃষ্টি থেকে অনেক কষ্টে বাঁচানো বিড়ির বাণ্ডিল খুলে বিড়ি ধরালো একটা। রাস্তা খুঁজে কাছাকাছি কোনো গ্রামে পৌঁছোতে চাইছিল সে।

জলে ভিজে ঝাঁকার ওজন বেড়েছিল। সব ফিরিওলার ঝাঁকাতে যেমন চটের ঢাকা থাকে, অজিতেরও ছিল। ভেজা চটেই ভার বেড়েছে। খালি পায়ে পিছল, শক্ত মাটিতে পা টিপে টিপে হাঁটতে শুরু করলো সে। পায়ের মসমস শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালো একলহমা। ভালুক নাকি? কান খাড়া করে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর অন্ধকার হাতড়ে আবার শুরু করলো হাঁটা। ডাইনে বাঁয়ে জল পড়ার শব্দ। সব স্রোত ফটিক নদীতে ছুটে চলেছে। ফটিক নদীর কাছাকাছি এলে পথ চিনতে ভুল হবে না। অনেকটা হাঁটার পর অজিত দেখলো, সামনে ফটিক নদী! সরু, শীর্ণ নদী একরাতের বৃষ্টিতে দিগ্বিজয়ীর মতো ফুলে ফেঁপে ছুটে চলেছে। ঢেউ আর হাওয়ার হা হা শব্দ। এখানে, ওখানে ধসে যাওয়া তটভূমির হাঁমুখ। অদূরে শ্মশান, ফাঁকা মাঠ, বনকলমীর ঝোপ। একপলক দেখেই জায়গাটা চিনতে পারলো অজিত।

নয়

এই সময়ে বস্তির ঘরের মধ্যে কালচে ধোঁয়া জমে থাকে। ঘরে ইলেকট্রিক নেই। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় কিশোরের মনে হচ্ছে, এক টুকরো কালো আকাশ নেমে এসেছে ঘরে। স্যাঁতসেঁতে ভিজে আকাশ। অসহায় কণ্ঠে রেবা মুখ গুঁজে বসে আছে। কিশোরও চুপ। তার কথা শেষ। সকালের ঘটনাটা কিশোরকে বলা উচিত কিনা ভাবছিল রেবা। সেই লম্বা চওড়া কালো লোকটার মুখ ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

আজ সকালে নিউ আলিপুরে ডিউটি ছিল তার। ভোরবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুপুর যখন বারোটা, চারপাশে রোদ ঝাঁঝাঁ, তখনও কয়েকটা বাড়ির টেলিফোন সাফাই করা বাকী ছিল। গেটওলা একটা তিনতলা বাড়ির সামনের চাতাল পেরিয়ে কাঠের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল রেবা। কলিং বেলের বোতাম টেপার আগে একটু থমকে দাঁড়ালো। এই ভরদুপুরে এ বাড়িতে কেমন অভ্যর্থনা পাওয়া যাবে কে জানে। বেশীরভাগ বাড়িতে যে ব্যবহার পায়, তা মোটেই ভদ্র নয়। এই অভদ্রতা কখনও স্পষ্ট, কখনও প্রচ্ছন্ন। এক মহিলা তো আজ বাড়িতেই ঢুকতে দিলো না। কী মেজাজ! চড়া গলায় বললো, আগে খবর না দিয়ে আসবে না।

অবাক রেবা বলেছিল, অফিস থেকে আপনাদের জানিয়ে রাখার কথা ছিল। খবর পাননি ?

আরো তিরিক্ষি গলায় মহিলা প্রশ্ন করল, আমি কি মিছে কথা বলছি ?

না না, তা নয়, ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি রেবা বলেছিল, ঠিক আছে, আমি পরে আসবো।

প্রায় পালিয়ে এসেছিল রেবা। এক ফোনেই তার চাকরি এই মহিলা খেয়ে দিতে পারে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে রেবার মনে হয়েছিল, চটার ভান করে মহিলা কিছু লুকোতে চাইছিলো। রেবাকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে না দেবার জন্যে এই বানানো মেজাজ!

এরকম রোজ হয়। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে কেউ বলে, কাল আসুন। কোনো বন্ধ ফ্ল্যাটের বেল টিপে আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর দরজা খুলে একজন বলল, ঘণ্টাখানেক পরে এসো।

দু' একজন ছাড়া সকলেই তুমি বলে। যারা আপনি বলে, মাসিক পাঁচ টাকা সার্ভিস চার্জ দেবার আগে সাতবার ঘোরায় তারা।

ঝিমুনি লাগা শীতের দুপুরে, রাস্তায় লোকজন কম। রেবা বেল টিপতে বাড়ির

ভেতরে মিঠে গলায় পাখি ডাকলো। শব্দটা খুব আবছা শুনলো রেবা। দু' তিন মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও দরজা খুলছে না দেখে আবার বোতাম টিপেছিল সে। পাখির গলার মিঠে ডাক। মিনিট খানেক পরে অল্পবয়সী একটি ছেলে, সম্ভবত বাড়ির চাকর, দরজা খুলে রেবাকে প্রশ্ন করল, কী চাই ?

টেলিফোন পরিষ্কার করতে এসেছি, রেবা বলেছিল।

দাঁড়ান।

কথাটা বলে ভেতরে চলে গিয়েছিল ছেলেটা। আরও মিনিট দুই বাদে এসে সে বলল, চলুন।

ছেলেটার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো রেবা। ঝকঝকে পালিশ, আবলুস কাঠের এক পাল্লার খোলা দরজায় দামী পর্দা ঝুলছে!

পর্দা অল্প সরিয়ে আঙুল তুলে ঘরের ভেতরে একটা টিপয়ের ওপর রাখা লাল রঙের টেলিফোনটা রেবাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল ছেলেটা। এই বাড়িতে আগে আসেনি সে। গা ছমছম করছিল তার। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো সে। বেশ বড়ো শোবার ঘর। ছড়ানো ইংলিশ খাটের পাশে কাশ্মীরী কাজ করা বেড্‌সাইড টিপয়ের ওপর টেলিফোন। ফাঁকা ঘরে মানুষজন নেই। হাওয়ায় মিশে থাকা সিগারেটের হাল্কা গন্ধ এবং আরো কিছু লক্ষণ দেখে রেবার মনে হয়েছিল, ঘরে কেউ আছে। ভয়ের সঙ্গে অস্বস্তি হচ্ছিল তার। ধবধবে চাদরে ঢাকা খাটের দিকে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল তার দৃষ্টি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে শুয়ে আছে কেউ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সাদা চাদরের ওঠানামা লক্ষ্য করল সে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ছোট হাতব্যাগটা মেঝেতে রেখে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কাজে লেগে গিয়েছিল। তুলোয় ক্রিম লাগিয়ে রিসিভার পরিষ্কার করল। চাদরের নিচে মানুষের ফিসফিস গলা, নড়াচড়া স্পষ্ট টের পাচ্ছিল। হঠাৎ মেয়েলি গলার খিলখিল হাসি শুনে ছলাৎ করে উঠেছিল বুকের রক্ত। খাটের ওপর যে অল্পবয়সী একজন মেয়েও আছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার। ভয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে রিসিভারের ওপর ঘাড় গুঁজে কাজ করে গিয়েছিল সে।

চাদর ফাঁক করে গম্ভীর গলা এক পুরুষ, হিন্দিতে রেবাকে বলেছিল, একটু চোখ বুজে থাকুন। বেবি টয়লেটে যাবে।

চওড়া থুতনি, সরু গোঁফ, বিশাল এক মুখ পলকের জন্যে দেখে চোখ বুজেছিল রেবা। চোখ বুজে আবার সেই প্যাঁচানো মেয়েলি হাসি শুনেছিল। হাল্কা পায়ে ছুটে রেবার পাশ দিয়ে কেউ চলে গিয়েছিল। রেবার চোখের সামনে অন্ধকার, কপালে ঘাম, পায়ের নিচে পৃথিবী ঘুরছিল। মিনিট দুই চোখ বুজে অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর সেই পুরুষকণ্ঠ হুকুম করল, চোখ খুলুন।

চড়া আলোয় ধেঁধে গেল রেবার দুচোখ। অপমান, রাগ, ঘেন্নায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল শরীর। মনে হচ্ছিল, কান্নায় ভেঙে পড়বে সে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে, চামড়ার ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ গুছিয়ে রাস্তায় এসে ঠিক করেছিল, অফিস পাড়ায় ডিউটি না পেলে চাকরী ছেড়ে দেবে সে। দু'মাস আগেও ডালহৌসির অফিসে অফিসে

সে কাজ করতো। অফিসে অনেক লোক, নিয়মমাফিক কাজ, ঝামেলা ছিল না। মাস দুই না যেতে রেবাকে অফিসপাড়া থেকে সরিয়ে যখন নতুন জায়গায় পাঠানো হলো, শিবানী বলেছিল, এর নাম মাড়োয়ারি বুদ্ধি। ফুটফুটে, সুন্দরী মেয়েদের এরা সবসময়ে বড়োলোক পাড়ায় ডিউটি দেয়। রেবাদের প্রতিষ্ঠানের মালিকও মাড়োয়ারি, নাম প্রকাশ সোমানী। সোমানীর প্রতিষ্ঠানের সুনাম আর পসার হুহু করে বাড়ছে।

এ কাজ ছেড়ে একটা নতুন চাকরী কীভাবে পাওয়া যায়, কিশোরের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছে হলেও, রেবা চুপ করে থাকলো। কিশোরের ওপর অভিমানে তার ভাষা, স্মৃতি জমাট বেঁধে গিয়েছিল। কলকাতা ছেড়ে গাঁয়ে যাবার পর এক বছরেরও বেশী কিশোর যোগাযোগ রাখেনি তার সঙ্গে। একটা চিঠি, খবর পর্যন্ত পাঠায় নি। খবর এলো, কিশোর পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে মুচলেকা লিখে ছাড়া পাওয়ার পর, তার কোনো হদিশ নেই। কলকাতায় নানা মুখে কথাটা শুনে উদ্বেগে, হতাশায় ভেঙে গিয়েছিল রেবা। কিশোর এরকম করবে, রেবা ভাবেনি। একা থাকলেই তার দুচোখের পাতা ভিজে উঠতো।

গণপতি হয়তো টের পেয়েছিল রেবার মনের কথা। রেবাকে এক বিকেলে সান্ত্বনা দিয়ে গণপতি বলেছিল, জীবন অনেক বড়ো। একজন বেইমানী করলেও জীবনের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ফুরোয় না। আমি গ্রামে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পারো তুমি।

গণপতির কথাগুলো রেবা বুঝতে পারছিল না সেদিন। গণপতি পার্টির আঞ্চলিক নেতা, রেবার শুভার্থী। গণপতির কথার মধ্যে কিশোরের মুখ, তার প্রতিশ্রুতি, রেবা শুনতে পাচ্ছিল। গ্রামে, গরীব কৃষকদের মধ্যে মেয়েদের কতো কাজ, দায়িত্ব, কিশোর শুনিয়েছিল রেবাকে। গরীব কৃষক ঘরের মেয়েদের সচেতন করতে পারলে গ্রামের আবহাওয়া, পরিবেশ বদলে যাবে।

কিশোরের কথাগুলো সেদিন মন্ত্রের মতো উদ্বুদ্ধ করেছিল রেবাকে। আত্মবিশ্বাস, সাহসে ভরে উঠেছিল তার মন। কারো চেয়ে সে কম নয়, গ্রামে আমৃত্যু থাকতে পারে সে।

মুখচোরা রেবা সেদিন কিশোরকে মনের কথাগুলো বলতে পারেনি। কিশোরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে গণপতি যখন অভয় দিচ্ছিল, তখনও কী বলবে ভেবে পায় নি রেবা। কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে না পড়ার হীনম্মন্যতা, সংকোচ চিরকাল জড়িয়ে আছে তাকে। মনের কথা কখনও স্পষ্ট বলার সাহস পায় না সে।

অনেকদিন পর কিশোরের পাশে বসে নিজেকে আজ রেবার ভারী সাহসী, সবলা মনে হলো। কিশোর পার্টি ছাড়ে নি, কিশোর বেইমান নয়, কিশোরের সম্পর্কে তার ধারণা, মূল্যায়ন নির্ভুল, আবিষ্কার করে গর্বে, অহংকারে ফুলে উঠলো তার বুক। এখন রেবার মনে শুধু মেয়েলি অভিমান,ক্ষোভ! কেন এতোদিন এভাবে ভুলে থাকলো কিশোর?

ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে কিশোর আবার কথা শুরু করেছিল। দুই বৃহৎ শক্তি ভারতের মাটিতে ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ভারতবর্ষকে নতুন ধাঁচের

উপনিবেশ বানাবার জন্যে তাদের প্রতিযোগিতা। তৃতীয় বিশ্বের ছোট বড়ো সমস্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আলোচনার মধ্যে একবারও একটা ব্যক্তিগত কথা, রেবাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে না কিশোর। তাকে গ্রামে নিয়ে যাবার কথা কী কিশোর ভুলে গেল?

কিশোরের ব্যবহারে ব্যথিত হচ্ছিল রেবা। আশ্চর্য মানুষ! গ্রামে যাবার, গাঁয়ের মহিলাদের সংগঠিত করার ভাবনা, রেবার মাথায় কিশোর ঢুকিয়েছিল। কলকাতা শহরে মহিলা সমিতির কাজে কিশোরই টেনে এনেছিল রেবাকে। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন সর্বস্ব ত্যাগের জন্যে সে প্রস্তুত, তখন কেন কাজে লাগানো হচ্ছে না তাকে? জীবন নিয়ে, সংগ্রাম আর ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো বাঁচিয়ে রাখতে চায় রেবা। কিশোরের সঙ্গে গ্রামে না গেলে তার স্বপ্ন, আশা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

মহিলা সমিতির কয়েকজন কর্মী, নিজেদের যোগাযোগে যারা গ্রামে গিয়েছিল, তাদের অনেকে শহরে ফিরে এসেছে। গ্রাম থেকে ফিরে এসে ললিতা বলেছিল, একটাই অসুবিধে, বাথরুম পায়খানা নেই। নদীর ধারে পুরুষ কমরেডদের পাশাপাশি বসে।

কথা শেষ না করে ললিতা বলেছিল, পারলাম না।

বিভাসের বৌ নীপা, য়ুনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে, সে কিন্তু টিঁকে গেছে। গ্রাম-জীবনের অসুবিধে পরোয়া করে নি। গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সে। চালচলন বদলে গেছে তার। বিয়ের পর সিঁদুর, শাঁখা, নোয়া, স্পর্শ করেনি। সামন্ততান্ত্রিক এই প্রথাগুলোর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ বিভাসও সমর্থন করেছিল। কিন্তু গ্রামে গিয়ে অন্য অভিজ্ঞতা হলো নীপার। সাদা সিঁথি, হাতে শাঁখা, নোয়া না থাকায় গাঁয়ের লোকেরা ঘর পালানো মেয়ে বলে সন্দেহ করছে তাকে। যে গরীব কৃষকের ঘরে বিভাস, নীপা আশ্রয় পেয়েছিল, বিভাসকে মেনে নিলেও নীপাকে নিয়ে তাদের খুঁতখুঁতুনি কাটছিল না। বিপদ বুঝে নীপা এখন সিঁথিতে খুব মোটা করে সিঁদুর দেয়। শাঁখা, নোয়া পরে।

রেবা জানে, বিপ্লব ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সাধারণ মানুষের চেতনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একজন বিপ্লবীকে এগোতে হয়ে। তাতে বিপ্লবীর চেতনার ধার বাড়ে, সাধারণ মানুষের চেতনার মান উন্নত হয়। দু'চারজন পাকা মাথার মানুষ নিজেদের খেয়ালখুশি মতো এগিয়ে যেতে পারে না। সেটা উচিতও নয়। পিছিয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষের সংস্কার, অনুভূতি এ ঘটনায় আহত হয়। তারা ভয় পায়। পুরোনো ধ্যানধারণা, আচরণবিধি গায়ের জোরে উড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। হাতে শাঁখা, নোয়া, কপালে সিঁদুর, আর কিছু না হোক, প্রসাধন বা অলঙ্কার হিসেবেও খারাপ নয়।

অনেক কথা ভাবলেও সেগুলো বলার শক্তি রেবার নেই। বলতে গেলে শব্দের অভাবে কথা জড়িয়ে যায়। সভায়, বৈঠকে সহজে মুখ খোলে না সে। আরও একটা কথা, সে বস্তিতে থাকে, স্কুলের পড়া শেষ করেনি, ভুলতে পারে না। সংকোচ, জড়তায় রেবার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অভিজাত বাড়ির নন্দিতা, ভারতী যা বলতে পারে, সেকথা বলার অধিকার, যোগ্যতা তার নেই। প্রাসাদের মতো বিরাট নন্দিতার

বাড়িতে একদিন গিয়েছিল রেবা। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ভয় পেয়েছিল সে। অথচ লাটখাওয়া কাপড়, এলোমেলো রুক্ষ চুল, প্রসাধনহীন নন্দিতাকে দেখে সে যে খুব বড়োলোকের বাড়ির মেয়ে, ধরা মুশকিল। কিন্তু নন্দিতা কোথাও যাবার আগেই জানাজানি হয়ে যায় তার পারিবারিক পরিচয়। চারপাশের লোক অবাক, মুগ্ধ চোখে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। রেবার মনে হয়, বামপন্থী আন্দোলনে মূল্যবান, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে হলে উজ্জ্বল পারিবারিক ইতিহাস থাকা দরকার। সর্বহারারা নিজেদের জাতভাইদের চেয়ে বিত্তবানদের অনেক বেশী বিশ্বাস করে, মর্যাদা দেয়। অসহায়তা, গ্লানি, অভিমানে ভারী রেবার মন। গ্রামে যাবার ইচ্ছে আরো ধারালো গভীর হয়। লড়াইয়ের মাঠে নন্দিতা, ভারতীদের যে সে টেক্কা দিতে পারবে, এমন এক বিশ্বাস আলোড়িত করে তাকে।

কিশোরের বিরুদ্ধে পার্টির প্রচার, গণপতির সমালোচনা, শুনেও তার জন্যেই দিন গুণছিল রেবা। কিন্তু কিশোর একবারও গ্রামে যাবার কথা না বলায় ভারী আহত হলো সে। অদ্ভুত এই পুরুষমানুষেরা! কথায়, বক্তৃতায় মেয়েদের মাথায় তুলে নাচানাচি করে। অথচ সমাজে, সংসারে মেয়েদের সীমাহীন তুচ্ছ, খেলো করে দেয়। মেয়েদের সমানাধিকার, সমমর্যাদা, পুরুষদের সাজানো কথা, ফাঁকা বুলি। পার্টি বলেছে, গাঁয়ে মেয়েদের অনেক কাজ, শিশুপালন, নারীশিক্ষা, আদর্শ প্রচার, আরো কতো কি। কিন্তু কোনো মেয়ে গাঁয়ে যেতে চাইলেই নানা অসুবিধের কথা তুলে পার্টি ঠেকিয়ে রাখতে চায় তাকে। কিশোরও কী পার্টির সেই মানসিকতাকে প্রতিফলিত করছে ?

রাজনীতির জগৎ থেকে আবার নিজের সাংসারিক জীবনে ফিরে এলো রেবা। মাথার কোষগুলো অকেজো হয়ে যাওয়ায় আজকাল ঘনঘন বেহুঁশ হচ্ছে বাবা। যখন জ্ঞান ফেরে জ্বরে পুড়ে যায় শরীর। লক্ষণ দেখে ডাক্তার একদিন বলল, অজ্ঞান অবস্থাতেই যে কোনো দিন। শরীর, মন অচল, বিকল হওয়ার সঙ্গে অফিসে বাবার অনুপস্থিতি বাড়ছে। মাসের মাইনে কাটা যায়। ছোট বোনেরা স্কুলে গেলেও লেখাপড়া যে কী হচ্ছে, রেবা জানে না। অসুস্থ রুণ্টু কোনোদিন সারবে না। ভীতু না হলেও রেবার পায়ের তলার মাটি আজকাল মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। মনে হয়, এই বস্তি, চারপাশের মানুষজন, যে কোনো মুহূর্তে তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দশ

স্বপ্ন দেখছিল মোতি। বরফে তৈরী তক্তাপোষের চারটে পায়ার সঙ্গে তার হাত পা দড়ি দিয়ে এমন শক্ত করে বাঁধা যে নড়াচড়ার উপায় নেই। বরফে জুড়ে গেছে পিঠের নুনছাল। উঠতে গেলে ফুলকো লুচির মতো ফরফর করে ছিঁড়ে যাচ্ছে পিঠের ছাল। হাড়ে, মজ্জায় বরফের স্থির হিমশীতল ঢেউ। শরীরের রক্ত, মাথার ঘিলু জমাট বেঁধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। দারুণ কষ্টে ঘুম ভেঙে যেতে দুচোখ মেলে তাকালো সে। জানালার বাইরে মেটে রঙের আকাশ। বাঁশবনে, বুনো ঝোপে সিরসির শব্দ। শিশিরে ভেজা গাছপালা, পৃথিবী থেকে খেজুর রসের আবছা অন্ধ বেরোচ্ছে। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। কনকনে ঠাণ্ডার কামড়েই যে ঘুম ভেঙেছে, বুঝতে পারলো মোতি। বুধন, লখাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের পাশে এক টুকরো চটের ওপর শুয়েছে অজিত। চটের নিচে খড়। অজিত পাশ ফিরতে মুড়মুড় শব্দ হলো। অন্ধকারে দেখা না গেলেও বিশাল চেহারা অজিতের গোঁফ দাড়ি ঢাকা কচি মুখের আদল চোখ বুজেও মোতি দেখতে পেল। বিশেষ করে অজিতের দুটো নিরীহ চোখের দিকে তাকিয়ে খুব অবাক হয় মোতি। অজিতের সঙ্গে আলাপের শুরুতে তাকে খুব ভয় পেত মোতি। অজিতের গম্ভীর গলা, পিলে চমকানো হাসি শুনে আঁতকে উঠতো সে। অল্পদিনে সঙ্কোচ, ভয় কেটে গেল। অজিতের ন্যাওটা হয়ে গেল সে। তবে অজিত রাগলে তাকে ঠেকানো ছিল কঠিন কাজ। বন্ধুদের ওপর, বিশেষ করে মোতির ওপর কখনো রাগেনি অজিত। কলকাতা ছাড়ার মাস দুই আগে অজিতকে শেষবার রাগতে দেখেছিল সে। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ক্যান্টিনের কাজ শেষ করে ঘরে ফেরার জন্যে মোতি তৈরী। অজিত এসে বলল, হ্যানিমানের দোকান থেকে হোমিওপ্যাথির একটা বই কিনবো। তুই আয় আমার সঙ্গে। কচুরি খাওয়াবো।

দুটো বই কিনে মোতিকে নিয়ে রূপম সিনেমার সামনে বিকেল চারটে নাগাদ দাঁড়িয়েছিল অজিত। বাসে চেপে শ্যামবাজারে সভায় যাবে। শ্যামবাজার গিয়ে কচুরি খাওয়াবে মোতিকে। রাস্তায় লোকজন কম। ভ্যাপসা গরম রোদে। তাপে গলে গেছে পিচের রাস্তা। দুজন জওয়ান সওয়ারী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা রিক্‌শা। গরমে, শ্রমে, ক্লান্তিতে দরদর করে ঘামছিল বুড়ো, রোগা রিক্‌শাওয়ালা। তার দুচোখের মণি ঘোলাটে, হাঁসফাস করছে বুক। কাঁধের ময়লা গামছায় মুখ, কপাল মুছে গামছার হাওয়ায় একটু জুড়োতে চাইছিল সে। অজিত, মোতি বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল বাসস্টপে। খেয়াল করেনি, রিক্‌শাওলার সঙ্গে তাগড়া দুই যাত্রীর তর্ক লেগেছে। ভাড়া নিয়ে শুরু হয়েছিল কথা কাটাকাটি। সওয়ারীদের একজন বলল, যা দিচ্ছি না নিলে এক পয়সাও দেবো না। যা ভাগ!

অসহায় বুড়ো রিক্‌শাওলা কী বলল, অজিত শুনতে পেল না। রিক্‌শাওলার কাঁধ থেকে গামছা তুলে নিয়ে বন্ধুর দিকে ছুঁড়ে দিল দ্বিতীয় যাত্রী। গামছাটা লুফে নিল সে। গামছা নিয়ে দুজনে শুরু করলো লোফালুফি খেলা। বেকুব রিক্‌শাওলা গামছার জন্যে দুজনের মাঝখানে ছোটাছুটি করছিল। মজা দেখার জন্যে জড়ো হয়ে গেল জনাকয় লোক। অজিতের মুখ দেখে মোতি বুঝেছিল, মারাত্মক গোলমাল হবে। আকাশে চড়া রোদ। রাস্তার পিচ থেকে ঝিরঝিরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঘণ্টা বাজিয়ে দ্রুত চলে গেল ফাঁকা একটা ট্রাম। দৌড়ঝাঁপে দম ফুরিয়ে যেতে বুড়ো রিক্‌শাওলার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল শ্লেষ্মা জড়ানো আবছা গোঙানি। কয়েক পা এগিয়ে অচেনা দুই যুবকের মাঝখানে দাঁড়ালো অজিত। দুজনের কেউ এটা ভাবেনি। লোফালুফি থামিয়ে অজিতের দিকে তাকালো তারা। আশঙ্কায় গুড়গুড় করে উঠলো মোতির বুক। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। চোখের পলকে মোতি দেখলো, অচেনা সেই দুই মূর্তিকে বাঘের থাবার মতো দু হাতে পাশাপাশি টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অজিত। ঘটনা বোঝার আগেই ছাল ছাড়ানো দুটো ঝুনো নারকেলের ঠোকাঠুকির শব্দ, আর্ত চিৎকার শুনতে পেল মোতি। শিউরে উঠে সে দেখলো, অচেনা দুই যুবকের কপাল ফেটে কানের পাশ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরছে। মজা দেখার জন্যে যারা ভীড় করেছিল, তাড়াতাড়ি সরে পড়লো তারা। রিক্‌শাওলা ভয়ে কাঁপছিল। ভাড়া না নিয়ে কাঁধে গামছা ফেলে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল সে। অজিতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আহত দুই যুবক, এখনি আসছি, বলে রাস্তা পেরিয়ে সামনের গলিতে গিয়ে ঢুকলো। একটা দোতলা বাস এসে দাঁড়াতে মোতি বলল, অজিতদা উঠুন।

এখন নয়, অজিত বলেছিল, ফিরে আসুক ওরা।

উদ্বেগে, আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেলেও মোতি কিছু বলতে পারলো না। আরো পাঁচ-সাত মিনিট পরে শ্যামবাজারের বাসে মোতিকে নিয়ে অজিত উঠেছিল।

তীক্ষ্ন গলায় বাইরে অন্ধকারে মুরগী ডেকে উঠলো। উঠোনে পায়ের শব্দ শুনে মোতি বুঝলো, ঘুম থেকে উঠে পড়েছে মা। কাকভোরেই মায়ের দিনের কাজ শুরু হয়ে যায়। মোতির ওঠার তাড়া নেই। অন্ধকার চালাঘরে চোখ বুজে পুরোনো দিনের কথা ভাবছে। বড়োবাজারের মেলা থেকে ফিরে এক সন্ধ্যেতে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে মাধুর মুখে তার বিয়ের কথা শুনে ভীষণ উতলা হয়েছিল মোতি! ভালো পাত্র পেয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে দিবাকরকাকা। মোতির কিছু করার ছিল না। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগে মাথায় কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে বাবার সঙ্গে বড়োবাজারের মেলায় গিয়েছিল সে। সাতদিনের মেলা, কতো দোকান, পসার, ভিড়, কেনাবেচার শেষ নেই। অবিনাশ কুণ্ডুর পসরা নেড়েচেড়ে দেখলো লোকজন। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ধুলো জমলো, বিক্রিবাটা বিশেষ হলো না। চোখ মুখ বসে তিরিক্ষি হয়ে ছিল বাবার মেজাজ। মেলার মধ্যেই মোতিকে একদিন চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটালো অবিনাশ।

বেধড়ক মারে পিঠ, হাত কেটে গিয়েছিল। কিন্তু শারীরিক কষ্টের চেয়ে অনেক বেশী অপমানিত হয়েছিল মোতি। মেলা শেষ হওয়ার দুদিন আগে এক ভোরে বাবাকে না

জানিয়ে বাসে চেপে সিউড়ি স্টেশনে চলে এলো মোতি। সকালের প্রথম বাস। ধূসর আবছা আলোয় আদিগন্ত ছমছম করছে। পরিচিত জনপদ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারপাশ ভালো করে দেখে নিচ্ছিল মোতি। দুচোখে জল এসে গিয়েছিল তার।

সিউড়ি শহর দেখে মোতির মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সেই প্রথম শহর দেখলো মোতি। কতো দোকান, বাড়ি, গাড়ি, গিজগিজ করছে মানুষ, এক আশ্চর্য বিরাট পৃথিবী। পকেটে দশ-পনেরো টাকা ছিল। দু'বেলা দুমুঠো খেয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, কোর্টের চাতালে, হাসপাতালের বাইরে বাঁধানো রকে কয়েকটা রাত শুয়ে কাটালো সে। কিন্তু অনেক খুঁজেও একটা চাকরের কাজ পর্যন্ত জোটাতে পারলো না। পাতলা চাদর ফুঁড়ে রাতের বেলায় হাড় কাঁপানো শীতে শরীর যখন কুঁকড়ে গিয়ে জ্বালা জ্বালা করতো, মোতির মনে পড়তো বাড়ির কথা, মাধুর মুখ। অসুস্থ বাবাকে মেলায় ফেলে পালিয়ে আসা কি ঠিক হয়েছে, মোতি ভাবতো। মাধু কী এখনো শেষ বিকেলে পুকুরের জলে পেতলের কলসি ভাসিয়ে মোতির জন্যে অপেক্ষা করে? করুণ, গভীর কান্নার মতো নানা প্রশ্নে মোতির বুকের ভেতরটা ভিজে উঠতো। গ্রাম ছেড়ে চলে আসার আগে মাধুর সঙ্গে একবার দেখা না করার আফশোসে ভারী হয়ে থাকতো মন। গাঁয়ের স্মৃতি মনে হলেই কী তাড়াতাড়ি সবকিছু বদলে গেল, একথাই বেশী ভাবতো সে। চোখের পলকে মুখ থুবড়ে পড়লো তাঁতিপাড়ার জীবন। কোথা থেকে একদিন গাঁয়ে এলো ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল কোম্পানি। তাদের আচরণে দাতাকর্ণের ভঙ্গী। নিজেদের বন্ধু বলে জাহির করল তারা। কাজের চুক্তি করে অভাবী তাঁতিদের ঢালাও ঋণ দিল তারা। উপোসী তাঁতিরা ভীড় করল কোম্পানীর দরজায়। বস্তা বস্তা তসর এলো, নাটায় ভরা হলো সোনালী সুতো। দু' হাত-পায়ের তৎপরতায় জেগে উঠলো অলস তাঁত। ঠকাচু চং, ঠকাচু চং শব্দে তাঁতিপাড়ার আকাশ ভরে গেল। নতুন উদ্যমে তাঁতিপাড়ায় কাজ শুরু হলেও তাঁতের সঙ্গে তাঁতিদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। দাদন আর অগ্রিমের সুবাদে স্বাধীন তাঁতশিল্পীরা হলো বেতনভোগী মজুর।

পাঁচ বছর পরে আবার গ্রামে ফিরে মোতির মনে হয়েছিল, তার আজন্মের চেনা তাঁতিপাড়া অনেক বদলে গেছে। এখন মোতির প্রায়ই মনে হয় যে, বাড়ি ছেড়ে পালানো ভুল হয়েছিল। পালিয়ে বাঁচা যায় না, সেটা বোকামি। সিউড়িতে কয়েকদিন থেকে হঠাৎ একদিন কলকাতার ট্রেনে উঠে বসেছিল সে। সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে পরদিন সকালে হাওড়া স্টেশনে নেমে চারপাশের চেহারা দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল। এমন একটা জায়গা যে পৃথিবীতে আছে, ধারণা ছিল না তার। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোথায়, কোনদিকে যাবে, ঠাহর করতে পারলো না। আতঙ্ক, অসহায়তায় শুকিয়ে গিয়েছিল বুক। তবু যে কি করে এই শহরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এখানে পাঁচ বছর কাটালো, ভেবে পায় না মোতি। পাঁচ বছরে প্রায় রোজই দেশ ঘরের কথা, মা-বাবা ভাই-বোন, বিশেষ করে মাধুর মুখ মনে পড়েছে। তীক্ষ্ম তীব্র, অস্থির বেদনাময় এই স্মৃতি। সবকিছু

ফেলে দিয়ে মোতি দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবতো। অচেনা শহরের রাস্তায় কয়েকদিন এলোমেলো ঘুরে বেলেঘাটায় একটা বাড়িতে চাকরের কাজ পেয়েছিল সে। দোতলা বাড়ির একতলায়, সিঁড়ির নিচে একফালি অন্ধকার জায়গায় একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে ময়লা বালিশে মাথা রেখে রাতে ঘুমোতো। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরেও ঘুম আসতো না রাতে। মাথায় ভাসতো গ্রামের ছবি, প্রিয়জনদের মুখ, হাজারীবাগের জঙ্গলে পাতার ছাউনি দেওয়া পোককলাপীর অন্ধকার ঘরে কুঁকড়োর তেলের প্রদীপ থেকে ঝাপসা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চাষ-আবাদ, তসর পোকার হালচাল, মেলা, নিয়ে কয়েকজন মানুষ মশগুল আলোচনা করছে। সিঁড়িরতলায় অন্ধকারে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতো মোতি। যে বাড়িতে মোতি কাজ পেয়েছিল, তারা বেশ বড়োলোক। দুটো গাড়ির একটা নিয়ে কাজে বেরোতো গৃহকর্তা, অন্যটা থাকতো বাড়ির জন্যে। রাতে কর্তা বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকতো মোতি। অনেক রাতে টলমল পায়ে ঘরে ফেরা কর্তাকে সদর দরজা খুলে দিয়ে ছুটি হতো তার। বেঁটে, কালো, মোটা শরীর, কর্তার বয়স, বছর চল্লিশ। কেনাবেচার ব্যবসা। প্রায় ফি রাতে কর্তা বাড়ি ফেরার পরেই দোতলায় শুরু হতো তুমুল অশান্তি। গিন্নীমা চেঁচাতো, ছোটলোক, ইতর।

কর্তাও অকথ্য গাল দিতো। টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া নেটের মশারি, কাচের ভাঙা প্লেট, ডিশ, ফুলদানি অনেকবার সকালে মোতিকে পরিষ্কার করতে হয়েছে। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দে পাঁচ বছরের ডবলু, কর্তার একমাত্র ছেলে, ঘুম থেকে জেগে কঁকিয়ে কেঁদে উঠতো। তাকে শান্ত করার জন্যে মোতির ডাক পড়তো। ওই শিশুটির সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার। ডবলুকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, তাকে খেলানো, এগুলো করে ভারী আনন্দ পেত সে।

গিন্নীর পেটের অসুখ ছিল। মাঝে মাঝে দাঁতকপাটি লেগে বেহুঁশ হয়ে যেতো মহিলা। বাড়িতে কর্তা না থাকলে গিন্নীর মাথায় জল ঢেলে, সেবা করে জ্ঞান ফেরাতো মোতি। এক নিঝুম দুপুরে বাইরে তখন ঘন রোদ, রোদেসেঁকা একটা কাক ক্লান্ত গলায় ডাকছে, গিন্নীমার লম্বা, এলো চুল খাটের বাজু টপকে ঘরের মেঝে স্পর্শ করেছে। সকালে ফিট হওয়ার জন্যে' শরীর কাহিল, দুচোখ লাল, গয়না ভর্তি হাত তুলে মোতিকে ডেকে নিচু গলায় গিন্নীমা বলেছিল, তোকে একটা কাজ করতে হবে। কেউ যেন জানতে না পারে।

কাজটা কী না শুনেও গিন্নীমার বলার ভঙ্গিতে দুরদুর করে উঠলো মোতির বুক। একটা সিনেমা হলের নাম করে গিন্নীমা বলল, বিকেল পাঁচটায় ওই হলের সামনে আসবে দাদাবাবু। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাদাবাবুর ওপর নজর রাখতে হবে। দাদাবাবু কতোক্ষণ দাঁড়ায়, কার সঙ্গে কথা বলে, সব জানাবি আমাকে।

গিন্নীমার কথা শুনে কাঁপছিল মোতির শরীর। তার কাঁধে হাত রেখে চাপা গলায় গিন্নীমা যোগ করল, সাবধান, দাদাবাবু যেন টের না পায়।

মোতির হাতে একটা টাকা দিয়ে কিভাবে সিনেমা হলের সামনে যেতে হবে বুঝিয়ে দিল গিন্নীমা। সেই প্রথম মেট্রো সিনেমা দেখল মোতি।

সিনেমা হলের তলায় গিজগিজ করছিল লোক। রাস্তার দুপাশে লাইন বন্দী মোটর গাড়ি। হুস করে ছুটে যাচ্ছে বাস, ট্যাক্সি। গাড়ির হর্ন, মানুষের কথা, ফেরিওলার হাঁকডাকে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল তার। আকাশের রোদ মোলায়েম, আবছা লাল হয়ে উঠছিল। অদৃশ্য পিচকিরিতে ধোঁয়া ছিটিয়ে পশ্চিম আকাশ ময়লা, ধূসর করে দিচ্ছিল কেউ। এই খোলামেলা রাস্তায়, দিনের আলোয় কোথায় লুকিয়ে কর্তার ওপর নজর রাখবে, ভেবে পেল না সে। ছুটন্ত গাড়ির মিছিল কাটিয়ে রাস্তা পেরোতেই অনেক সময় চলে গেল। মোতি ভাবছিল, এই শহরে বাবা-মা এলে হার্টফেল করতো। হঠাৎ মাধুর মুখ মনে পড়লো মোতির। মাধুকে যদি একবার কলকাতায় আনতে পারতো সে! রাস্তার উল্টোদিকে এসে সিনেমা হলের সামনের চাতাল, ফুটপাথ নজরে রাখতে সুবিধে হলো তার। কিন্তু ট্র্যাফিকে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লেই হলের সামনেটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল! অচেনা মানুষের জটলা, মুখ চাওয়া-চাওয়ি, সবকিছু খুব অদ্ভুত। মানুষগুলো যেন অনেক গোপন কথা বুকে নিয়ে ঘুরছে।

ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যেতে পায়ের তলা থেকে মুছে গেল ছায়া। গাছপালার ফাঁক দিয়ে তখনও ফিকে ঝিলমিল রোদ ছড়িয়ে পড়ছে। পাঁচটা যে কখন বাজবে, বুঝতে পারছিল না মোতি। তখনই তার চোখে পড়লো সামনের ফুটপাথে, সিনেমা হলের ঠিক তলায় এক পরিচিত মুখ, কর্তা এসে গেছে। কর্তার চোখে রঙিন চশমা, হাতে দামী সিগারেটের সোনালী বাক্স, ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছিল কর্তা। ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্কে ধড়ফড় করছিল মোতির বুক। পাশে একটা কাঠের ঘর, জলছত্র। সেই ঘরের আড়ালে গা ঢাকা দিল সে। আবার সামনে বাস, ট্যাক্সির মিছিল। প্যাঁ প্যাঁ হর্নের শব্দ, চোখের আড়ালে চলে গেল কর্তা। অস্বস্তিতে কাঠের ঘরের পাশ থেকে বেরিয়ে এলো মোতি। ট্রাফিক সংকেত পেয়ে গাড়ির লাইন চলতে শুরু করেছে। ক্রমাগত এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে জমাট ভীড়। কর্তাকে আগের জায়গায় না দেখে মোতি হতবাক! মানুষটা চোখের পলকে উবে গেল নাকি? রাস্তা পেরিয়ে কর্তার হদিশ করার জন্যে মোতি পা বাড়াতেই সিনেমা হলের সামনে বদলে গেল ভীড়ের নক্সা। ঠিক আগের জায়গাতেই সে দেখতে পেল কর্তাকে। দারুণ সাজগোজ করা এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে কথা বলছে কর্তা। সত্যিকারের রূপবতী মহিলা। ঝলসে গেল মোতির দুচোখ। মহিলার সঙ্গে কথার মাঝখানে চারপাশে নজর চালিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছিল কর্তা। মোতির একবার মনে হলো, কর্তা দেখে ফেলেছে তাকে। কিন্তু না, তা নয়। মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলেও বোধহয় তাকে চিনতে পারলো না কর্তা। সিনেমা হল ছেড়ে সামান্য এগিয়ে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল কর্তার গাড়ি। সেই মহিলাকে নিয়ে কর্তা গাড়িতে উঠতে গাড়িটা চিনতে পারলো মোতি। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিতে বোকার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো সে। রাস্তায় ভীড় বাড়ছিল, গাদাগাদি মানুষ, একটা লম্বা মিছিল এসে অনড় করে দিল চারপাশ। আরো প্রায় এক ঘণ্টা পরে রাস্তায় ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার, ইলেকট্রিক পোস্টের আলোগুলো সবে জ্বলেছে, বাড়ি ফিরলো মোতি। গিন্নীমাকে কী বলবে, সারা

পথ ভেবেও ঠিক করতে পারেনি সে। সত্যি কথা বলাটা কি ঠিক হবে? মানুষ হিসেবে কর্তা দিলখোলা, উদার। মোতিকে কখনও খারাপ কথা বলেনি। সাংসারিক জীবনের কোনো শূন্যতা থেকে জটিল, এলোমেলো হয়ে গেছে মানুষটা। ঠিক এভাবে চিন্তা না করলেও কর্তার বিরুদ্ধে গিন্নীমাকে কিছু বলল না মোতি। বরং গিন্নীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলল সে। সিনেমা হলের সামনে, রাস্তায় এতো ভীড় যে কিছুই নজরে পড়েনি তার। মোতির কথা শুনে গিন্নী রেগে বলল, তুই একটা গেঁয়ো ভূত, কিচ্ছু হবে না তোকে দিয়ে।

গিন্নীর অভিযোগ চুপচাপ হজম করেছিল মোতি। রাত আটটা নাগাদ খোসমেজাজে শিস দিতে দিতে বাড়ি ফিরলো কর্তা। একটা নতুন গেঞ্জি মোতিকে দিয়ে ডবলুকে কোলে তুলে আদর শুরু করল। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে দেখে, শুঁকে কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিল গিন্নী। কিন্তু সেরকম কিছু না পাওয়া যেতে সে রাতে কোনো অশান্তি হলো না।

দিন সাত পরে মোতিকে ডেকে আবার একই কাজের দায়িত্ব চাপালো গিন্নীমা। সেদিন বিকেল পাঁচটার বদলে তিনটের সময় সিনেমা হলের সামনে আসবে কর্তা। দুপুর একটার মধ্যে মোতিকে খাইয়ে গিন্নীমা বলল, তাড়াতাড়ি যা। খুব সাবধানে নজর করবি।

একই সঙ্গে বিরক্ত আর অবাক হচ্ছিল মোতি। কাজটা যে সে ভালো করছে না, এমন এক ধারণা মাথার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। তাছাড়া এই নজরদারিতে ঝুঁকিও আছে। কর্তা যদি জানতে পারে, গিন্নীমার কথা বলে রেহাই পাবে না সে। কিন্তু গিন্নী যে কী করে কর্তার চলাফেরার সব খবর পাচ্ছে, বুঝতে পারলো না মোতি। বাড়িতে ফোন আছে। মোতির মনে হলো, ফোনে গিন্নীমাকে খবরটা জানায় কেউ। দুপুর দুটোর মধ্যেই একটা বাস ধরে সিনেমাহলের সামনে পৌঁছে গেল সে। আকাশে ঝাঁঝা রোদ, রাস্তায় গলা পিচ, হলের সামনে হৈহৈ করছে মানুষ। জল, কাদায় কাঠের জলছত্রের চারপাশ এতো নোংরা যে মোতি সেদিকে গেল না। কালো রঙের একটা মোটর গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সিনেমা হলের সদরের ওপর নজর রাখলো। সিনেমা হলের তলায় মানুষের গুলতানি থাকলেও মাঝদুপুরে রাস্তায় লোকজন কম, গাড়ির স্রোত পাতলা। রোদের তাতে ঝলসে যাচ্ছিল মোতির শরীর। তাছাড়া কী এক অপরাধবোধ খোঁচাচ্ছিল তাকে। এভাবে লুকিয়ে একজন মানুষকে দেখা, তার ওপর নজর রাখা, গোয়েন্দাগিরি খুব খারাপ কাজ, করা উচিত নয়। কালো গাড়িটার বনেটের ছায়ায় শরীর রেখে বন্ধ দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কর্তার প্রতীক্ষা করছিল মোতি। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে পালোয়ান চেহারার কয়েকজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কুৎসিত একটা গাল দিয়ে পালোয়ানদের একজন মোতির ঘাড়ে এমন এক রদ্দা লাগালো যে অন্ধকার দেখলো সে। উর্দি পরা তিন পুলিশ এসে দাঁড়াতে যে লোকটা রদ্দা মেরেছিল, বলল, আর একটাকে পাকড়েছি।

উর্দিধারী পুলিশদের পেছনে দাঁড়ানো বিটকেল চেহারার এক পালোয়ান শক্ত

মুঠোয় একটা হ্যাংলা গোছের ছেলের কব্জি ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেই ছেলেটা মোতিকে দেখিয়ে এক পুলিশকে বলল, স্যার, এ আমাদের ওস্তাদ।

তার কথা বুঝতে পারলো না মোতি। পালোয়ানদের একজন মোতির কোমরে জোরে এক লাথি কসাতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

আন্তঃরাজ্য গাড়িচোরদের দলের একজন মাতব্বর হিসেবে লালবাজার লকআপে পুরে দেওয়া হলো তাকে। লালবাজারের খাতায় তার নাম উঠে গেল। অপরাধ দমন শাখা ছবি তুললো, হাত পায়ের ছাপ নিল। এক সকালে হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বেঁধে বেলেঘাটায় কর্তার বাড়িতে পুলিশ নিয়ে গেল মোতিকে। লজ্জায় ঘাড় তুলে কারো দিকে তাকাতে পারছিল না সে। ভয়ে গিন্নী অস্থির, মোতিকে চিনতে চাইল না। কর্তা বলল, খুব অল্পদিন আমার বাড়িতে কাজ করছে। ওর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। সেই প্রথম মোতি শুনলো কর্তার নাম বিশ্বরূপ রায়।

পুলিশ অফিসার বলল, মিঃ রায়, এ ছোকরা সাংঘাতিক এলিমেন্ট, দাগী গাড়ি চোর। রায়ের বাড়িতে কাজ করার সময় পাশাপাশি বাড়িতে সমবয়সী তিনচারজনের সঙ্গে মোতির পরিচয় হয়েছিল। তারাও চাকর। পুলিশ পাহারায় মোতিকে দেখে বেশ মজা পেল তারা। নানা রকমের মন্তব্য করছিল। লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল মোতি। হঠাৎ কোথা থেকে ডবলু এসে মোতির জামা ধরে প্রশ্ন করল, তোমার কী হয়েছে মোতিদা ?

ডবলুর চোখে বিস্ময়, সহানুভূতি, সরল কৌতূহল। প্রশ্ন শুনে তার দুচোখের পাতা ভিজে উঠলো। মোতির পাশ থেকে ডবলুকে প্রায় ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল গিন্নীমা।

দিন দশ লালবাজার পুলিশহাজতে থেকে দুনিয়া সম্পর্কে মোতির অরুচি ধরে গেল। পুলিশের বিপুল ঠেঙানি খেয়ে শরীরে, হাতে পায়ে যখন টাটানো ব্যথা, বন্দীদেরই দু একজন সেবা করেছিল তাকে। গা হাত পা টিপে দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল কলতলায় যেতে। তাদের একজন মাখন, ছিঁচকে চোর আর দুজন ওয়াগন ব্রেকার। লকআপ থেকে জামিন নিয়ে যাওয়ার সময়, মাখন ঠিকানা দিয়ে গেল মোতিকে। প্রায় নেশা ধরানো ভঙ্গিতে মাখন তার পেশার কাহিনী শোনাতো। অন্ধকার রাতে সারা গায়ে তেল, মুখে কালি মেখে পাইপ বেয়ে নিঃশব্দে কোনো বাড়ির দোতলা, তিনতলার কার্নিসে গিয়ে দাঁড়ানো, তারপর হাতের কাজ। চোর মাখনকে, তার বর্ণনা শুনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল মোতি। দুই ওয়াগন ব্রেকার রঘু আর সাচ্চু বলল, দ্যাখো ভাই, যদি বাঁচতে চাও, আমাদের সঙ্গে ভিড়ে যাও।

কাজটা কী, জানতে চেয়েছিল মোতি।

কাজের যা বিবরণ রঘু দিল, তা শুনে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তার। মাঝরাতে চিৎপুর রেলইয়ার্ডে মালগাড়ির তালাবন্ধ দরজাগুলো বাদামের খোসার মতো মুটমুট করে ভেঙে যায়।

ওয়াগন ভাঙার বর্ণনায় উত্তেজনার ঝোঁকে রঘুর মুখের ভাষা বদলে গেল। রঘু

বলল, একবার চিচিং ফাঁক হলেই লে দনাদ্দন, দে দনাদ্দন। দামড়ির ফোয়ারা।

রঘু, সাচ্ছুর সঙ্গে দিন কয়েক কথা বলে অনেক কিছু শিখলো মোতি। দামড়ি মানে একশো টাকার নোট, প্রথম শুনলো সে।

বাইরে তখন কি যেন একটা আন্দোলনের জন্যে রোজ দুপুরে লালবাজারের পুলিশ লকআপে নানা বয়সী বন্দীদের ধরে আনা হচ্ছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা আসতো, আর বেরিয়ে যেতো। কিন্তু কয়েকজন ছাত্রকে ছাড়লো না পুলিশ। মোতি শুনলো, তারা ছাত্রনেতা। একই সেলে পাশাপাশি থাকার ফলে কিশোর আর অজিতের সঙ্গে মোতির আলাপ হলো। কি অদ্ভুত আন্তরিকতায় যে কিশোর কথা শুরু করেছিল, সে কথা মনে পড়লে আজও ভিজে যায় মোতির বুক। নিজের ঘর-বাড়ির বাইরে এই শহর কলকাতায় এতো ভালোবাসা, দরদ ছড়িয়ে আছে, জানতো না সে। সেই প্রথম এক অচেনা কথা, কমুনিস্ট পার্টির নাম প্রথম শুনলো। কমুনিস্ট শব্দটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভেতরে ঢুকে গেল। সেলের মধ্যে দশ-বারোজন কমুনিস্টকে নিয়ে বন্দী ছিল মোট ত্রিশজন। বেশীরভাগ তরুণ ছাত্র। চমৎকার মানুষ তারা। সেলের সাধারণ কয়েদীদের মতো বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি ছাত্র-বন্দীদের ওপর ছিল না। বাড়ি থেকে তাদের জন্যে কাচানো জামা-কাপড়, সিগারেট, বিড়ি খাবার দাবার আসতো। লক-আপের ডিউটি সিপাইও ফরমাস খাটতো, সমীহ করতো তাদের।, অবাক মোতি দেখলো বাড়ির খাবার সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাচ্ছে ছাত্রবন্দীরা। মোতির সঙ্গে ডিউটি সিপাইও ভাগ পেত। সেলের সাধারণ কয়েদীরা অল্পদিনে কিশোর, অজিতের ন্যাওটা হয়ে উঠলো।

মোতিকে পছন্দ হয়েছিল কিশোরের। অন্যদের চেয়ে মোতির সঙ্গে বেশী সময় কথা বলতো কিশোর। এমন আশ্চর্য সব কথা, গল্প সে শোনাতো, যা আগে মোতি কখনও শোনেনি। কিশোরের সহজ সরল ভাষা বুঝতে অসুবিধে হতো না মোতির। খুঁটিনাটি সাধারণ প্রশ্ন করে তাকেও কথা বলাতো কিশোর। নিজের দেশ, গাঁ, সংসার পেশার সব খবর শুনিয়েছিল কিশোরকে। তাঁতিপাড়ার মানুষ রেশম তৈরী, গুটি-সংগ্রহের কাহিনী, ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল, খাদি কমিশন, হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং তাদের দালাল, ফোড়েদের দাদন ধরাবার চক্রান্তের কথা কিশোরকে শুনিয়েছিল সে। মোতির তথ্য জুড়ে জুড়ে সংকটাপন্ন এক প্রাচীন কুটিরশিল্পের দুর্দশা, হাজার হাজার মুমূর্ষু তাঁতির জীবনবৃত্তান্ত তৈরী করে নিতে কিশোরের অসুবিধে হয়নি। কিশোরকে বলার আগে বুকের মধ্যে যে এতো ক্ষোভ অভিমান জমে আছে, মোতি জানতো না। সে বুঝতে পারলো, তার আবেগ অভিজ্ঞতা উসকে দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলছে কিশোর। এ জাগরণের ছটফটানিও অনুভব করল মোতি।

পুলিশ হাজতে দশ দিন কাটিয়ে জামিনে বেরিয়ে গেল ছাত্রবন্দীরা। মোতি গেল জেলে। কিশোরকে কিন্তু ভুললো না সে। কিশোরও যে তাকে ভোলেনি, দেড় মাস পরে প্রমাণ পেল মোতি। টাকা, উকিল আয়োজন করে তার জামিন নিল

কিশোর। জেল থেকে বেরিয়ে সে জড়িয়ে ধরেছিল কিশোরকে। কিশোরের প্রভাবে চারপাশের পৃথিবীকে চারপাশে নতুন চোখে দেখতে শিখলো সে।

খোসা ছাড়ানো ফলের মতো পৃথিবীকে খেয়ে হজম করার এক অসম্ভব ইচ্ছে পেয়ে বসলো তাকে। মাথায় ঘুরেফিরে সারাদিন একটা প্রশ্ন, কেন, কেন, কেন, জেগে থাকলো। শহর কলকাতার সঙ্গে দেশ গাঁ, তাঁতিপাড়া মিলে নতুন আদলে তৈরী হলো ভারতবর্ষ, স্বদেশ, পিতৃভূমি। আকাঙ্ক্ষার বাস্তবকে চিনতে পারলো মোতি। পাশাপাশি এই জনপদের ষাট কোটি মানুষ, যাদের আশিজন নিরন্ন, গেঁয়ো, গরীব, বাঁচা মরার নিরর্থক প্রক্রিয়ায় যারা টিকে আছে, তাদের পাশে দাঁড়াবার তীব্র তাগিদ বোধ করল সে। তার চোখের সামনে থেকে একটা করে ধূসর পর্দা সরে যাচ্ছিল রোজ। বেদনায়, ক্ষোভে অস্থির হয়ে উঠছিল সে।

জেল থেকে বেরিয়ে কিশোরের পরামর্শে কিছুদিন কাঁচা সব্জির ব্যবসা করেছিল মোতি। শিয়ালদার ব্যাপারীদের কাছ থেকে সব্জি কিনে শ্যামবাজারে বিক্রী করতো। শেষ রাতে ঘুম থেকে জেগে সন্ধ্যে পর্যন্ত জান কবুল খাটুনি। নাওয়া খাওয়ার জন্যে আধ, একঘণ্টার বেশী সময় মিলতো না। বৌবাজারের এক বস্তিতে তখন থাকতো সে। এক সন্ধ্যেতে ঘরে ফিরে সে দেখলো সব্জির ব্যবসাতে জমানো দু' দশ টাকা, টিনের সুটকেস ভেঙে উধাও। বাক্সের পলকা তালা অন্ধকার মেঝেতে পড়ে আছে। দড়িতে রাখা একটা ময়লা জামা গেঞ্জি আর ধুতি চোর নেয়নি। কাল সকালে তরকারি কেনার পুঁজিটুকু হাতছাড়া হতে উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় কেঁপে উঠলো মোতির বুক। চুরির খবর অল্প সময়ে রটে গেল বস্তিতে। ঝাঁক বেঁধে দেখতে এলো সকলে। দুপুরে বস্তিতে যখন পুরুষমানুষ থাকে না, সারাদিনের খাটুনিতে মেয়েরা ক্লান্ত, নেতিয়ে পড়ে, অল্পবয়সীরা রাস্তায় খেলাধুলো করে, তখনই মোতির ঘরে ঢুকে কাজ সেরেছে কেউ। এসব অনুমান করেছিল প্রতিবেশীরা। বস্তির দুই মাঝবয়সী মাতব্বর খোঁজখবর করে বলল, পুলিশ ডেকে আর ঝামেলা পাকিও না। বস্তির লোকেদেরই ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ। হয়তো তোমাকেই ফাটকে পুরে দেবে। সে আর এক ভোগান্তি!

কথাটা মিথ্যে নয়! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা বস্তির আরো অনেকের সঙ্গে দুই মাতব্বরের উপদেশে সায় দিয়েছিল মোতি। জমানো টাকা হারিয়ে তার মনে যেমন শূন্যতা তৈরী হয়েছিল, তেমনই এক গভীর আরাম অনুভব করেছিল সে। রোজ রাত তিনটেতে উঠে আব শিয়ালদা স্টেশনে দৌড়োতে হবে না। ব্যাপারীদের সঙ্গে দরদাম, কথা কাটাকাটি, পুলিশের গালাগাল, হুমকি শুনে সকালগুলো ফুরিয়ে যাবে না। কিছু না খেয়ে হাল্কা মাথায় শুয়ে পড়লো মোতি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই, ঘুম ভাঙতে চার্চের ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ শুনতে পেল সে। শেয়ালদা স্টেশনে ছোটার তাড়া নেই, ব্যবসা শেষ, ভেবে সে মুহূর্তে কষ্ট হয়েছিল তার।

দুর্ঘটনার খবর কিশোর শুনেছিল অনেকদিন পরে। কোমরের গেঁজেতে দু' দশ টাকা বেঁধে ডালহৌসীতে তখন ডাব বেচতো মোতি। ডাব বিক্রি পাঁচ মাসের ব্যবসা।

গরম ফুরোলেই ব্যবসা শেষ। সে ব্যবসাতেও চোট খেলো মোতি। একদিন মোতিকে হল্লাগাড়িতে তুলে লালবাজারে নিয়ে এলো পুলিশ। একশো ডাবের মধ্যে তখন দুটো ডাব বেচেছে সে। আটানব্বইটা বাকী। মনে মনে মোতি হায় হায় করছিল। সাদা পোশাকের এক পুলিশ মোতিকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলো, গাড়ি চোর না?

ফ্যালফ্যাল করে মোতি তাকাতে লোকটা বলল, শালা, পুরানো চোর।

কাঠফাটা গরমে চারপাশ অসাড়। একগাদা কচি ডাব দেখে অনেক পুলিশ জুটে গেল। গোঁফ, দাড়ি, বুক, পেট ভিজিয়ে একটা দুটো করে ডাব খেল তারা। ডাবে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে খাওয়ার জন্যে লম্বা শ্বাস ফেলছিল কেউ কেউ। খেতে ভারি কষ্ট! চোখের নিমেষে ডাব শেষ হয়ে গেল আটানব্বইটা।

কিশোরের সঙ্গে তখন মোতির দেখা হতো হপ্তায় দু' তিন দিন। মোতির শুকনো মুখ ক্লান্ত, চেহারা দেখে তার যে কিছু বিপদ হয়েছে, টের পেয়েছিল কিশোর। একদিন রাত প্রায় দশটার সময়, এক বৈঠকের পর মোতিকে আড়ালে ডেকে কিশোর বলেছিল, আমাদের ব্যাঙ্কের ক্যান্টিনে কাল বারোটায় চলে এসো।

কী ব্যাপার না বুঝেও ব্যাঙ্কে গিয়েছিল মোতি। ব্যাঙ্কের ক্যান্টিনে সেদিনই কাজে বহাল হলো সে।

এগারো

অন্ধকার ফিকে হয়ে বাইরে আলো ফুটলেও ফের ভারী হয়ে আসছে মোতির দুচোখের পাতা। কাছাকাছি কোনো বাড়ি থেকে ভেসে এলো মোরগের ডাক। বুধন, লখাইয়ের ফিসফিস কথা শুনে চোখ খুলে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো মোতি। বাইরে মায়ের কথা, ইন্দুর গলা শুনে তার মনে হলো, আর শুয়ে থাকা উচিত নয়। উঠে বসলো সে। বুধন, লখাইকে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে পুকুরে যেতে হবে। কাছেই রিলিফের ঝিল। কিন্তু মাঝিপাড়ার লোকেদের সেখানে নামার নিয়ম নেই। রিলিফের ঝিলে বুধন, লখাইকে নিয়ে যেতে সাহস পেল না মোতি। বনকলমি, তেকাঁটা, আশ শ্যাওড়ার ঝোপ পেরিয়ে একটু এগোতেই শিশিরে ভেজা মাটির রাস্তা। সদর রাস্তা নয়, পায়ে চলা সরু পথ। ভিজে রাস্তায় ছড়িয়ে আছে কুঁচফল। রঙের কি জৌলুস! একফোঁটা ঘন কালো কাজলের ওপর একবিন্দু জমাট লাল রক্ত। সদর রাস্তায় লরি যাচ্ছে। তাঁতিপাড়ার কারিগরদের তৈরী লরি বোঝাই কাপড় যাবে ইণ্ডিয়ান টেকস্‌টাইলের হেড্ অফিস ভাগলপুরে। সেখানে, বিলিতি মেশিনের ধোলাই-এ হাজার শিল্পীর ঘাম আর চোখের জলের দাগ বেমালুম মুছে গিয়ে ঝকঝকে, জেল্লাদার হয়ে উঠবে কাপড়ের বাণ্ডিল। তাঁতিপাড়ার পণ্য তখন চেনা যাবে না। কোম্পানির তকমা আঁটা কাপড়ের গাঁট জাহাজে চেপে আলো করবে ইউরোপ, আমেরিকার দোকান, বাজার। দুচার পিস্ দেশী বাবুদের শরীরে শোভা পাবে। জিনিসপত্রের দামের উর্ধ্ব-গতির সঙ্গে মেলালে তাঁতিদের মজুরী অনেক কমেছে। তাঁতিপাড়ার ঘর-বাড়ি মানুষের মুখে ভয়াবহ সংকটের ছাপ। রাস্তার বাঁদিকে ভক্ত বুড়ীর পোড়ো বাড়ি এই সংকটের সাক্ষী। বাড়িটার চাল নেই। বকেয়া দেনার দায়ে টেক্‌স্‌টাইল কোম্পানি ভক্ত বুড়ীর ছেলে, নারান কুণ্ডুর বাড়ির টিনের চাল খুলে নিয়ে গেছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে বাড়িটা। নারান কুণ্ডু মারা গেছে। ছেলের মৃত্যুর পরেও বেঁচে ছিল বুড়ী। ভিটে পড়ে যেতে বুড়ী যে কোথায় গেল, কেউ জানে না।

আজকাল এক কাহন গুটিতে বারোশো গ্রামের বদলে চোদ্দশো গ্রাম সুতো চাইছে সব কোম্পানি। তাঁতিরা রাজী না হলে কোম্পানী পুটি দেবে না। না খেয়ে মরতে হবে তখন। কোম্পানির শর্তে কাজ করেও অবশ্য তাঁতিরা দুধেভাতে নেই। আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছে। কোম্পানির দরে একটা বারো মিটার থানের মজুরী বিয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। তিনজনের একটা পরিবার তিনটের বেশী থান মাসে বুনতে পারে না। তার মানে পরিবার পিছু মাসে রোজগার একশো সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। খরচ পনেরো টাকা বাদ দিলে জীবনধারণের জন্যে সামান্যই থাকে! এ হিসেব মোতি জানে। হিসেবের বেশী যা জানে, তা হলো, তাঁতিপাড়ায় তিনজনের পরিবার একটাও নেই। গরীব পরিবার ছোট হয় না। ছোট করার উপায় নেই। তাঁত চালানো ছাড়া আছে ঘরগেরস্থালির কাজ। কাজের লোকের প্রয়োজনে সংসার বাড়ে।

ক্যাপ্টেনের চাকরী ছেড়ে অনেক আগেই রাজনগরের কাছাকাছি কোনো আদিবাসী গ্রামে মোতির বসে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। নানা কারণে হয়নি। কিশোরের সিউড়িবাসী ডাক্তারবন্ধু অনুপ রাজনগর হাসপাতালে রেসিডেণ্ট সার্জেনের চাকরী পেতে গ্রামে ফেরা সহজ হলো মোতির। কিশোরের রাজনীতিতে অনুপও বিশ্বাসী। ডাক্তারি

পাশের পর চাকরী নিয়ে গ্রামে যাওয়া ঠিক করেছিল সে। চাকরীর সঙ্গে গ্রামের মানুষের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে ঢুকে পড়ার বাসনা ছিল অনুপের। সব কাজ ছেড়ে পেশাদার বিপ্লবী হওয়ার আগের পর্বের ঘটনা এটা। অনুপের উদ্যোগকে তখন মদত দিয়েছিল কিশোর। অনুপের সঙ্গে মোতির আলাপ করিয়ে এক সন্ধ্যেতে কিশোর বলেছিল, তুমি গ্রামে গিয়ে বসলেই হাজির হবো আমরা।

কলকাতায় অনুপের মেসে একটু পরে অজিত এসে আলোচনায় যোগ দিতে মোতির গ্রামে যাওয়ার পরিকল্পনা পাকা হলো। সরাসরি তাঁতিপাড়ায় নিজের বাড়িতে না উঠে অনুপের কম্পাউন্ডার সেজে রাজনগরে যাবে মোতি। রাজনগর থেকে তাঁতিপাড়া পিচের রাস্তায় দু' মাইল। মেঠো পথে মাইল চারের বেশী নয়। হাসপাতাল থেকে বাড়ির সঙ্গে সময় সুযোগ বুঝে যোগাযোগ করবে মোতি।

কিশোরের পরামর্শে সায় দিয়ে অজিত বলেছিল, সেই ভালো। পাঁচবছর পরে গাঁয়ের বাড়িতে হঠাৎ হাজির হওয়ার চেয়ে কম্পাউন্ডারের চাকরী নিয়ে বাড়ি ফিরলে সন্দেহ করবে না কেউ।

অজিতের কথা কিশোর, অনুপ চুপচাপ মেনে নিলেও অন্যরকম ভাবছিল মোতি। নিজের দেশ গাঁ সে চেনে। সেখানে কম্পাউন্ডারও ডাক্তারের সমান শ্রদ্ধা, খাতির পায়। গরীব মানুষ হয়তো কম্পাউন্ডার মোতির কাছে ভয়ে ঘেঁসবে না। কম্পাউন্ডারের চেয়ে ডাক্তারের চাকর সেজে রাজনগরে গেলে সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি থাকা যাবে। কথাটা মোতি বলতে হা হা করে হেসে অনুপ বলল, কমরেডকে চাকর বলে চালাতে পারবো না আমি।

কিশোর চুপ। অজিত বলল, কম্পাউন্ডার পরিচয়েই যাবে মোতি।

প্রায় পাঁচ বছর পরে, প্রবল উত্তেজনা, দাপাদাপি বুকে নিয়ে দেশে ফিরলো মোতি। কম্পাউন্ডার মোতিকে সচল রাখার জন্যে হাসপাতালের বাইরে একটা ঘর নিয়ে ডাক্তারখানা খুললো অনুপ। অনুপের কোয়ার্টার, ডাক্তারখানা গুছিয়ে সাজিয়ে রাজনগরে আসার প্রায় একমাস পরে তাঁতিপাড়ায়, বাড়িতে যাওয়ার সময় পেল মোতি। এক বিকেলে তাঁতিপাড়ার চেনা রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় মোতির সারা শরীর কাঁপছিল। আজন্মের চেনা গ্রাম, রাস্তা, গাছপালা, রহস্যময়, অচেনা লাগছিল। চারপাশ ভীষণ চুপচাপ। দু' একটা জীর্ণ বাড়ি, দোকান ঘর, সরু সদর রাস্তা দেখে খুব পুরোনো মনে হচ্ছিল। রাস্তায় একজন মানুষ নেই। মোতির মনে হলো এক ভয়ংকর মহামারীতে উজাড় হয়ে গেছে তাঁতিপাড়া। ঢিপঢিপ করছিল তার বুক। হঠাৎ ঠকাচ চং, ঠকাচ চং তাঁতের চেনা আওয়াজ কানে ঢুকতে শিউরে উঠলো তার শরীর। সামান্য এগিয়ে মেঠো রাস্তা ছুঁয়ে পিচের রাজপথে নতুন বাস স্টপ্। এক বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সুতো ধরে টানা হাঁটা করছিল দুজন। তাঁতে সুতো চড়াবার আগে টানা হাঁটা করাতে হয়। ছেষট্টি হাত সুতো টানা হাঁটায় বেড়ে হয় পঁচাত্তর হাত। ঘরের দাওয়ায় যারা সুতো টানা হাঁটা করাচ্ছিল, মোতিকে দেখে চিনতে পারলো না তারা। মুখ দুটো মোতিরও অচেনা লাগলো। ঘাড় গুঁজে নাটায় সে সুতো গোটাচ্ছিল, সে মুখ তুলতে চিনতে পারলো মোতি। মানিক কুণ্ডুর ছেলে শিবু।

তখনও বাবা তাঁতে বসতো। মোতি যখন বাড়ির সদরে পা দিল বাবা তাঁত চালাচ্ছে। ময়লা, তেলচিটে শাড়ি, ফ্যাকাসে, রোগা শরীর, দাওয়ায় বসে পাকানির কাজ করছিল মা। মোতি দেখল, কুঁজো হয়ে গেছে বাড়িটা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মোতি ডাকলো, মা।

চমকে উঠে মা তাকিয়ে থাকলো মোতির দিকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র! তারপর ছুটে এসে ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো। মোতির ফেরার খবর ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়লো তাঁতিপাড়ায়। জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, প্রতিবেশীতে ভরে গেল বাড়ির দাওয়া, উঠোন। মোতি ফিরবে কেউ ভাবেনি। সকলে দেখতে চাইছিল মোতিকে। শীর্ণ কাঁপা কাঁপা দুহাতে মোতির একটা হাত ধরে ভক্ত বুড়ি বলেছিল, ধন্যি ছেলে, এভাবে মাকে কাঁদালি কেনে?

কী জবাব দেবে ভেবে পেল না মোতি। তাঁতঘর শব্দহীন। কাজ ছেড়ে উঠোনের এককোণে এসে বসেছিল বাবা। শেষ বিকেলে ভিড় পাতলা হতে মোতি দেখলো দুটো নতুন মুখ এসেছে সংসারে। শুধু দুটো মুখ নয়, রোগা, জিরজিরে দুটো শরীরে দুটো ক্ষুধার্ত পেট জেগে আছে। ইন্দু এতো বড়ো হয়েছে, যে তাকে চিনতে মোতির কষ্ট হচ্ছিল। নতুন, অপরিচিত লাগছিল সব। ঢেঁকিশালের পাশে চট লাগানো একচিলতে অন্ধকার ঘর। অনেক বছর আগে, মোতি তখন ছোট, ঠাকুমা বেঁচে, এক সন্ধ্যেতে বাবার পুরোনো একটা ধুতি পরে ওই ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল মা। সে রাতে ঠাকুমার কাছে ঘুমিয়েছিল মোতি। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখলো, চটের ঘরের বাইরে একটা জ্যান্ত পুতুল কোলে মা বসে আছে।

ঠাকুমা বলেছিল, বোন হয়েছে তোর।

পুতুলের মতো সেই মেয়ে কোন জাদুতে এমন বড়োসড়ো যুবতী হয়ে উঠলো, হদিশ পেল না মোতি। ইন্দুর পর ভাই কদম। তার কথা মোতির স্পষ্ট মনে আছে। তিন বছর বয়সে কদম মারা গেল।

উঠোন থেকে দাওয়ার ওপর বসে চাপা উত্তেজনায় একনাগাড়ে হুঁকো টানছিল বাবা। শক্ত সমর্থ, সাবালক ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দ, আত্মবিশ্বাসে বাবার বুকে যে ঝড়তুফান উঠেছে, আঁচ করেছিল মোতি। ডুবন্ত একটা মানুষ দাঁড়াবার জমি পেয়েছে পায়ের নিচে।

গ্রামের বাইরে ছোট একটা ডোবায় অল্প জল। কেউ খায় না এ জল। দু'একজন বাগাল চান করে এখানে। ডোবার জলে হাত মুখ ধুয়ে মাঠে বসলো বুধন, লখাই। ঘুম থেকে অজিত উঠলে তাকে নিয়ে বাহেঙ্গায় ফিরবে বুধন। অজিতের সঙ্গে মোতিরও বাহেঙ্গায় যাবার ইচ্ছে ছিল। তা সম্ভব নয়। আচমকা সে চলে গেলে দুশ্চিন্তা করবে ডাক্তারদা। রাজনগরে ফেরা ঠিক করলো মোতি।

বুধন, লখাইকে মাঠে রেখে বাড়ি ফিরে মোতি দেখলো, তখনও ঘুমোচ্ছে অজিত। কুয়াশা জড়ানো ফিকে লাল রোদ উঁকি দিচ্ছে অন্ধকার ঘরে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছে অজিত। আবছা ঘুমের মধ্যে কয়েক বার চোখ খুলে অন্ধকার ঘরে অজিতের বিড়ির আগুন দেখেছিল মোতি।

বারো

হাঁপাতে হাঁপাতে দ্যুতি এসে কিশোরকে বলল, এখনি চলুন, সূর্যদা অপেক্ষা করছে।

দিন শেষ হলেও ঘন হয়নি অন্ধকার। দ্যুতির সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো কিশোর। রাস্তায় পা দিয়ে কিশোর দেখলো সামনে একটা ছোট জটলা। হাসাহাসি, হৈ হৈ হচ্ছে সেখানে। দু' পা এগোতে ভীড়ের মধ্যে ঘোষালকাকা আর আলোকে দেখলো কিশোর। আলোর একটা হাত ধরে ঘোষালকাকা টানছে। বাড়িতে আনার চেষ্টা করছে তাকে। আলোর অন্য হাত ধরে তাকে আটকে রাখতে চাইছে বিশু। ঘোষালকাকাকে তড়পাচ্ছে সে।

ছেড়ে দিন, বিশু বলল ঘোষালকাকাকে, মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলে কিন্তু যাচ্ছেতাই কেস্ হয়ে যাবে।

রাগে অপমানে ঘোষালকাকার মুখ লাল। মেয়েকে বলল, বাড়ি চল।

ঘোষালকাকা আর বিশুর টানাটানিতে আলোর নড়ার শক্তি নেই। বস্তিবাসীরা ভীড় করে মজা দেখছে। প্রত্যাশা করছে আরো উচ্চাঙ্গের মজা। একটা অল্পবয়সী মেয়েকে ঘিরে ঝগড়া চেঁচামেচি দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াচ্ছে পথচারী মানুষ। কারণ আন্দাজের চেষ্টা করে ছোটলোকের কাণ্ডকারখানা ভেবে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

বিশুর এক চেলা চেঁচিয়ে নোংরা একটা কথা বলল। ঘোষালকাকাকে বিশু বলল, আমাকে জামাই না মানলে আপনার মেয়েকে হাপিস করে দেবো কিন্তু।

বিশুর কথায় হা হা করে হাসছে তার সঙ্গীরা। আলোও হাসলো। ঘটনা কোথায় গড়াচ্ছে, বুঝতে পারলো না কিশোর। তার পেছনে দ্যুতিকে দেখে খাপছাড়া হয়ে গেল ভিড়। আলোর হাত ছেড়ে সরে দাঁড়ালো বিশু। তার চেলারা ছিটকে গেল দূরে। চোখের নিমেষে রঙ, আদল, ছবি বদলে যাবার কারণ, কিছুটা আন্দাজ করতে পারলো কিশোর। তেজে, সাহসে এলাকায় পরিচিত হয়েছে দ্যুতি। বিশু এবং তার সঙ্গীদের দিকে একপলক কঠিন, হিমেল দৃষ্টি ফেলে হাঁটতে শুরু করেছে দ্যুতি। মেয়েকে নিয়ে বস্তির মধ্যে চলে গেল ঘোষালকাকা। সামনে চায়ের দোকানে দলবল নিয়ে বিশু ঢুকে যেতে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তা। খালধারের সরু গলিপথে দ্যুতির সঙ্গে হাঁটছিল কিশোর। আগে সে এখানে আসেনি। অন্ধকার রাস্তার দুপাশে শুয়ে বসে থাকা গরু মোষের নিঃশ্বাসের ফোঁসফোঁস শব্দ। গোবর চোনার দুর্গন্ধে সিসের মতো ভারী হয়ে আছে বাতাস। বাঁশের পাহাড়, খড়ের স্তূপ রাস্তায় এলোমেলো ছড়ানো। খালের কালো জলে আবছা রেখার মতো দু' একটা নৌকো। একটা কুপিও জ্বলছে না কোথাও।

কিছুটা এগিয়ে ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে দ্যুতি বলল, এসে গেছি। বাঁদিকের চতুর্থ বাড়ির বন্ধ সদর দরজায় তিনটে টোকা দিলো সে। পেছনে কিশোর। বন্ধ দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ শোনার জন্যে কান পেতে আছে সে। বাড়ির ভেতরটা নিস্তব্ধ। কোনো আওয়াজ নেই। ব্যাপার কী? তখনই বন্ধ দরজা খুলে যেতে আবছা আলোয় কিশোর দেখলো গণপতির মুখ। দরজার কাছে এমন নিঃশব্দে গণপতি এলো কীভাবে? কিশোর, দ্যুতি ভেতরে ঢুকতে গণপতি দরজা বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বলল, এসো।

গণপতির পেছনে দ্যুতি, তারপর কিশোর, চুপচাপ দোতলায় উঠে এলো। বাঁদিকে অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে মাঝারি সাইজের ঘর। গণপতির সঙ্গে ঘরে ঢুকলো কিশোর, দ্যুতি। ঘরের তিন দেওয়ালে কাচের আলমারিতে বই ঠাসা। ফিকে আলোয় চেনা, অচেনা আট দশটা মুখ দেখতে পেল কিশোর। খাটের ওপর বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছে সূর্যদা। বালিশের পেছনে অক্সিজেন সিলিণ্ডার। লালচে, সরু রবারের নল সূর্যদার বালিশের পাশে পড়ে আছে। তার মানে যখন তখন অক্সিজেন লাগছে সূর্যদার। মুখ দেখে সূর্যদা খুব অসুস্থ বোঝা যায়। সূর্যদার গায়ের চামড়া রোদ বৃষ্টি, দুর্যোগে কুঁকড়ে তামাটে হয়ে গেছে। সরাসরি পরিচয় না থাকলেও সূর্যদার ছবি একাধিকবার দেখেছে কিশোর। চেনা মুখ। গেরিলা যুদ্ধের নীতি, কৌশল আলোচনা করছিল সূর্যদা। শ্রোতাদের মধ্যে একজন সুসজ্জিতা মহিলা, একজন সাদা চামড়ার সাহেবকে দেখে অবাক হলো কিশোর। সূর্যদা বললো, খতম মানে খুন নয়, শ্রেণীঘৃণার চরম প্রকাশ। চেয়ারম্যানের নাম করে খতম অভিযানের যারা বিরোধিতা করছে, ইতিহাস ক্ষমা করবে না তাদের।

কথা শেষ করার আগে শ্বাসকষ্টে বুজে গেল সূর্যদার গলা, দুচোখ। ঘরের দরজা পর্যন্ত কিশোরের সঙ্গে এলেও ভেতরে ঢোকেনি দ্যুতি। অন্য কাজে গেছে সে। ঘরের সকলকে দেখছিল কিশোর। মেঝেতে সতরঞ্চির ওপর কিশোরের পাশে তমাল, পেছনে বাঁকুড়ার এক কমরেড বসেছে। কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় নানা খবর বলছে তমাল। অচেনা একজনকে দেখিয়ে তমাল বললো, ও অশ্বিনী মুর্মু, গুরুদাস মুর্মুর দাদা। জোতদারদের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতে গতমাসে ভেবরায় শহীদ হয়েছে গুরুদাস। অশ্বিনী মুর্মুর কালো পাথরের মুখের ওপর থেকে কিশোর চোখ সরাতে তমাল বলল, গোপীবল্লভপুরে প্রথম দিকে কৃষক সংগ্রাম যে বেগে ছড়িয়েছিল, এখন তা নেই, ঝিমিয়ে পড়েছে। পার্টি তৈরীর আগে থেকে গোপীবল্লভপুরে কৃষকদের মধ্যে কাজ করছে তমাল। কিশোর ঠিক করলো, সূর্যদার সঙ্গে কথা শেষ করে তমালের অভিজ্ঞতা শুনবে সে। বব্ চুল, ঠোঁটে গাঢ় লাল রঙ, সোফাতে বসা সুসজ্জিতা সেই মহিলা, তার পাশের শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে দেখিয়ে তমাল বলল, ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির দুই প্রতিনিধি। ভদ্রমহিলা বাঙালি, ভদ্রলোক ইংরেজ। আমাদের পার্টির সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছে ওরা।

ববচুল মহিলা সূর্যদার কথার ইংরিজী তর্জমা শোনাচ্ছে সঙ্গীকে। মহিলার ইংরিজি উচ্চারণ নিখুঁত। সম্ভবত তিনি আজন্ম ইংল্যাণ্ডবাসিনী ভারতীয়। মন

দিয়ে সঙ্গিনীর কথা শুনে ফিসফিস করে পুরুষ প্রতিনিধি কিছু বলল। নিচু গলায় মহিলা জবাব দিতে নোটবুকে লিখে নিল সাহেব। উজ্জ্বল চোখ, চশমা, ছিপছিপে চেহারা, ধীর, স্থির সাহেবের কথা লেখা, চাহনিতে বিচক্ষণতা আছে।

সঙ্গিনীর কথাতে সাহেবের কপালে ভাঁজ পড়লো। সবিনয়ে সামান্য গলা তুলে সূর্যদাকে সাহেব প্রশ্ন করলো, খতম বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি ?

ইংরিজিতে তুখোড় সূর্যদা প্রশ্নের জবাব দিলো বাংলায়। বলল, শাসকশ্রেণীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাপট মুছে ফেলাই হলো খতম।

সূর্যদার জবাবের ইংরিজী তর্জমা সঙ্গিনীর মুখে শুনে সাহেব প্রশ্ন করল, একজন ব্যক্তিকে খতম করলে কি শ্রেণীর দাপট শেষ হয় ?

সাহেবের প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত মনে হলো কিশোরের। প্রশ্ন শুনে চোখ তুলে তাকালো সূর্যদা। মাথায় কাঁচাপাকা সজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া চুল, কপালে মুখে সীমাহীন ক্লান্তি, পেন্সিল টর্চের মতো দপ করে জ্বলে উঠলো সূর্যদার দুচোখের মনি। সূর্যদা বললো, হয়। শ্রেণীর বাইরে ব্যক্তি নয়। ভারতবর্ষে খতম ছাড়া পথ নেই।

সূর্যদার কষ্ট, ক্লান্তি দেখে আলোচনার খেই ধরলো পুণ্যদা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগ্রামী গ্রামাঞ্চলের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এই সভায় বিনা নোটিসে এসে বসার সুযোগ পেয়ে খুশী হয়েছিল কিশোর। কথা বলার, অভিজ্ঞতা লেনদেনের এমন সুযোগ সহজে মেলে না।

ছোটোখাটো চেহারা, বছর পঞ্চাশ বয়স, পরনে ট্রাউজার্স, বুশ শার্ট, শার্টের পকেটে তিনটে কলম, চশমার আড়ালে কোটরে ঢোকা দুটো চোখ, দেখে মনে হয়, অনেক রাত ঘুমোয়নি পুণ্যদা। আলোচনার জন্যে খাটের সামনে পুণ্যদা এগিয়ে আসতে নড়েচড়ে বসলো সকলে। পুণ্যদা কম্যুনিস্ট পার্টি করছে ত্রিশ বছর। উদ্দীপনায় সব সময়ে টগবগ করে ফুটছে। পুণ্যদার আলোচনায় আলাদা মজা আছে। কঠিন তত্ত্ব সরল হয়ে যায়। পুণ্যদা কম্যুনিস্ট তরুণদের মাইডিয়ার, কাছের মানুষ। পুণ্যদা শুরু করলো ইংরিজিতে। আসল কথা শ্রেণীঘৃণা। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশের চল্লিশ কোটি গরীব মানুষ ঘৃণায় ফুঁসছে। কিন্তু ঠিক কোথায় ঘা মারতে হবে, তারা জানে না। আমরা বলছি, মারের বদলা মার ছাড়া পথ নেই। এতোকাল শাসকেরা মেরেছে। এখন নিপীড়িত মানুষের পাল্টা মার দেওয়ার সময়। সেই মার, শ্বেত সন্ত্রাসের জায়গায় লাল সন্ত্রাস, গরীব মানুষ শুরু করতেই খুন, জখম, বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলছে শাসকেরা। কিন্তু তাদের অভিযোগে শ্রমিক কৃষকেরা কান দিচ্ছে না।

পুণ্যদা থামতে কিছু বলতে চাইল সাহেব। তার আগেই সূর্যদা বলতে শুরু করল, কমরেডস্, কৃষক সংগ্রামের নেতৃস্থানীয় কর্মী আপনারা, এ মুহূর্তে আপনাদের গুরু দায়িত্ব। আপনারা ভুলবেন না পার্টির হাজার হাজার কর্মী বিপ্লবের জন্যে জীবন দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন। একজন বিপ্লবীর মৃত্যু এক হাজার বিপ্লবীর জন্ম দেবে, সত্তরের দশক হয়ে উঠবে মুক্তির দশক। এই মুক্তির দশকে আপনারাই অগ্রবাহিনী।

এক অলৌকিক আলোয় মুছে গেছে সূর্যদার ক্লান্তি, অসুস্থতা। ভারতীয় ইতিহাস, রাজনীতি, বিপ্লবী যুদ্ধের ব্যাখ্যা নতুন উদ্যমে শুরু করেছে সূর্যদা। বাংলার বদলে প্রাঞ্জল ধারালো ইংরিজিতে সূর্যদার ভাষণ শুনে কিশোরের ধাঁধা, বিভ্রম কেটে যাচ্ছে। সূর্যদা বলছে নিজেদের সফলতাকে যেন ছোট করে না দেখি আমরা। শহীদ বাবুলাল, পণ্ডাদ্রি, সুদেব, শশী, গুরুদাস তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

গলা বুজে গিয়ে দুচোখের পাতা উপচে জল পড়ছে সূর্যদার মুখে। রোমাঞ্চে থমথম করছে ঘর।

বিদেশী মহিলা প্রতিনিধির পালিশ করা মুখ চোখের জলে ভিজে গেছে। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে মহিলা প্রশ্ন করল, বিলেত থেকে আমি ফিরে এলে এখানের লড়ায়ে কি জায়গা হবে আমার ?

মহিলার গলার স্বর আবেগে ভেঙে গেছে। অন্যমনস্কে মুখ মোছার জন্যে ধেবড়ে গেছে লিপস্টিক্।

প্রশ্ন শুনে একপলক তাকিয়ে সূর্যদা বলল, ইংল্যাণ্ডে, য়ুরোপেও গরীব মানুষ, শ্রমিক আছেন, তারাও বিপ্লব চান। তাদের মধ্যে মাও-সে-তুং চিন্তাধারা প্রচার করুন।

বিদেশী কমরেডরা চলে যেতে দরজার দিকে একপলক তাকিয়ে ট্রাউজার্স, বুশ শার্ট খুলে আরামের শব্দ করলো পুণ্যদা। ট্রাউজার্সের তলায় লুঙি। এই পোশাকে নিজের বাড়িতে পুণ্যদাকে বছর দুই আগে কিশোর একবার দেখেছিল। লুঙি গেঞ্জি পরা পুণ্যদাকে কিশোরের খুব চেনা লাগলো। পুণ্যদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সূর্যদা। পুণ্যদা বললো, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা যে কোথায় পৌঁচেছে, দেখে অবাক লাগে। ভবানীপুরে দেওয়াল লিখন হয়েছে, শুয়োরের বাচ্চা ধরমবীর ও তার জারজ সন্তান বি. বি. ঘোষের মুণ্ডু চাই।

এ স্লোগান পার্টি শেখায়নি। অনেক দুঃখ, লাঞ্ছনা সহ্য করে নিজেদের অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষ শিখেছে এ ভাষা। নীতি, রুচির নামে নাক কুঁচকালে এখন চলবে না। এর নাম অভ্যুত্থান।

পুণ্যদা এক সময়ের নামী সাংবাদিক, কবিতাও লিখতো। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পুণ্যদার খুব নাম ডাক। পুণ্যদার মুখে শোনা দেওয়াল লিখনের ভাষার বিরুদ্ধে ইচ্ছে থাকলেও তাই কিছু বলতে পারলো না কিশোর। তাছাড়া পুণ্যদার কথায় এমন ধার যে শ্রোতাদের মনে গভীর দাগ কাটে। নাড়িয়ে দেয়। এখন কিশোর কিছু বললে অবাক হয়ে সকলে দেখবে তাকে।

পাতলা হচ্ছে ঘরের ভিড়। তমাল উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরকে বলল, চললাম। পরে দেখা হবে।

তমালের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেল না কিশোর। বাড়ির ভেতর থেকে একটা থালায় কিছু সন্দেশ সাজিয়ে এনে সূর্যদার সামনে টেবিলের ওপর রেখে গণপতি বলল, আপনার জন্যে শিবুদা পাঠিয়েছে।

থালার দিকে একপলক তাকিয়ে সূর্যদা প্রশ্ন করল, তামাক কোথায় ? সন্দেশের চেয়ে তামাক জরুরী।

কিশোরের দিকে সূর্যদা তাকাতে পুণ্যদা বলল, এ কিশোর, বীরভূম পার্টি।

পুণ্যদা শেষ করার আগে সন্দেশের থালা কিশোরের দিকে এগিয়ে দিয়ে সূর্যদা বলল, সন্দেশ খান, তারপর কথা।

একটা সন্দেশ কিশোর তুলে নিতে তাকে কাছে ডেকে সূর্যদা বলল, আপনাদের এলাকার কাজের রিপোর্ট পেয়েছি। লড়াই-এ জয়-পরাজয় আছে, পুলিশের হাতে ধরাও পড়তে হয়। মন খারাপ করলে চলবে না।

কিশোর বুঝতে পারলো, তাদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে পার্টিতে। নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক মনে হচ্ছিল তার। সূর্যদা বলল, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার সহজ উপায়, শত্রুর এলাকায়, শহরে, গঞ্জে না যাওয়া। জোতদার, ধনী কৃষকের পাড়ায় যাবেন না। তারা যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে সে পথ মাড়াবেন না আপনি। তারা যা খায়, পরে, যেভাবে থাকে, ঠিক তার উল্টো হবে আপনার জীবনযাপন। তারা দিনে কাজ করে, রাতে ঘুমোয়। আপনি দিনে ঘুমিয়ে রাতে কাজ করবেন।

কিশোরের ভালো লাগছিলো সূর্যদার কথা। একাগ্র হয়ে সূর্যদার কথা শুনছে সকলে। সূর্যদা বললো, দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদের বিপ্লবের স্বপ্ন দেখান। গুরু মানুন তাদের। চেয়ারম্যানের তিনটি লেখা গ্রামের গরীবদের কাছে পেঁৗছে দিন।

পার্টি গড়া, দু লাইনের লড়াই, গেরিলা স্কোয়াড, গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি, চেয়ারম্যান মাওয়ের চারটে নীতি, প্রতিটা ধাপ বুঝিয়ে দিলো সূর্যদা। সূর্যদার সঙ্গে এই প্রথম কিশোরের আলাপ, মুখোমুখি কথা। খুশির ঝড় বইছে তার বুকে। কিশোরের মনে হলো, সূর্যদার মতো একজন নেতার অপেক্ষা করছিল ভারতীয় বিপ্লব।

উৎসাহে তার মনে হচ্ছে, এখন সে অনেক কাজ করতে পারে।

এই মুহূর্তে বিন্দু ভাঙা সবচেয়ে বড়ো কাজ, সূর্যদা বলল, মজুরী. জমি, ফসলের জন্যে অর্থনৈতিক আন্দোলন করার যুগ শেষ। একটা গ্রাম, একটা গেরিলা স্কোয়াড, একটা খতম, তিনে মিলে এক, গেরিলা যুদ্ধের শুরু।

খতম শব্দটা মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না কিশোর। খটকা লাগছিল। শব্দটাব সঙ্গে পাপ, অপরাধ, অন্যায় যেন মিশে আছে। বিপ্লব, বিপ্লবী সংগ্রাম হচ্ছে, শ্রেণী যুদ্ধ, দুই বিরুদ্ধ বাহিনীর লড়াই। তার সঙ্গে খতম, খুনজখমের কী সম্পর্ক ?

কিশোরের মুখ দেখে সূর্যদা বলল, একটা ছোট বটের বীজ যেভাবে বিশাল মহীরুহ হয়ে ওঠে, সেভাবে গেরিলা যুদ্ধের বীজ খতম থেকে জনযুদ্ধের দাবানল তৈরী হয়। গরীব কৃষক, খেতমজুরদের জাগাতে, তাদের উদ্যোগের দরজা খুলে দিতে, খতম অভিযান একমাত্র পথ।

শ্রেণীশত্রু খতমের সময় বেশী কষ্ট দেবে না, পুণ্যদা বলল, গোড়ালির ওপরে পায়ের শিরা কাটারির একটা কোপে কেটে দিলেই ব্যস, খেল খতম। আর উঠতে হবে না জোতদারকে। শরীরের কোথায় মারলে অব্যর্থ ফল, আমাদের ডাক্তার বন্ধুরা এ নিয়ে গবেষণা করছে।

চারপাশ নিস্তব্ধ। এদিকটা এমনিতে নিরিবিলি, মানুষজন কম। শীতের রাত বাড়তে আরও শব্দহীন, ফাঁকা হয়ে গেছে। বাইরে ধোঁয়া, কুয়াশার জড়াজড়ি।

কনভেনশনাল, প্রচলিত হাতিয়ার, যেমন কাটারি, কুড়ুল, কাস্তে নিয়ে শুরু হবে গেরিলা এ্যাকশন। বন্দুক, রিভলবার এখন ব্যবহার করা চলবে না। কিছু পাইয়ে দেবার আশ্বাস দেবেন না কৃষকদের। বিপ্লব ছাড়া তারা কিছু পাবে না, একথা তাদের বোঝাতে হবে। শ্রেণীশত্রু খতমের তালিকা গরীব মানুষেরাই বানাবে। গাঁয়ের অত্যাচারী, বদ লোকগুলোকে স্থানীয় গরীব মানুষ হাড়ে হাড়ে চেনে। এ তালিকায় দু চারটে এমন নাম হয়তো থাকবে, জমি, সম্পত্তি বা টাকাকড়ির হিসেবে শোষক না হলেও বংশমর্যাদা, বর্ণের পরিচয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে তারা।

অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকলে কি শোষণ চালানো সম্ভব, সূর্যদার ব্যাখ্যা শুনে প্রশ্নটা জিভের ডগায় এলেও চুপ করে থাকলো কিশোর। তার যুক্তি, বুদ্ধি, ধারণা গুলিয়ে গেছে। খতম মানে খুন নয়, বিপ্লবী যুদ্ধের শুরু, কথাটা খচখচ করছে মাথায়।

নিজের গোপন ডেরায় সূর্যদার ফেরার সময় হতে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ঘরের বাইরে রাখলো গণপতি। চেপে রাখা একটা প্রশ্ন লজ্জা, সংকোচে কিশোর তুলতে পারেনি সূর্যদার কাছে। সূর্যদা চলে যাচ্ছে দেখে মরিয়া কিশোর বলে ফেললো কথাটা। রেবাকে বিয়ে করে নিজের এলাকায় নিয়ে যেতে চায় সে। প্রস্তাব শুনে এক মুহূর্ত চুপ থেকে সূর্যদা বলল, শহুরে মেয়েদের এখন গাঁয়ে পাঠাতে চাইছি না আমরা। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, সংগঠন গড়ার এই প্রাথমিক পর্বে মেয়েরা গাঁয়ে গেলে, অসুবিধে হয়। মেয়েদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে সংগঠকদের সময় চলে যায়। তাছাড়া শহরের মেয়ে গ্রামে গেলে, জোতদার, মহাজনেরা গন্ধ পায়। গরীব মানুষের পাড়ায় ঘুরঘুর করে তারা। গত কয়েক মাসে এরকম তিনটে কেস হয়েছে। মুক্ত এলাকা গড়ে উঠলে গ্রামে মেয়েদের যাবার কোনো অসুবিধে হবে না। অনেক কাজও সেখানে করতে হবে তাদের।

এ মুহূর্তে শহরে মহিলা কর্মীদের খুব দরকার, গণপতি বলল, শহরেও খতম অভিযানে নামছি আমরা।

গণপতির কথায় সায় দিয়ে সূর্যদা বলল, গ্রাম, শহর এখন একাকার। দু জায়গাতেই খতম লাইন চালাতে পারি আমরা। এটা মুক্তির দশক। লড়াই-এর অভিমুখ আমরাই ঠিক করবো।

সূর্যদার শেষ কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলো না কিশোর। প্রশ্ন করার সুযোগ নেই, সূর্যদার জন্যে ট্যাক্সি এসে গেছে। গণপতির কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে গেল সূর্যদা। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী মুমুর্ষু। সূর্যদাকে একতলায় নামতে গণপতিকে সাহায্য করছে অশ্বিনী। কিশোর ভাবছে, কলকাতাতেই থাকতে হবে রেবাকে। তাকে কলকাতায় রাখার পরিকল্পনা তাত্ত্বিক মোড়কে সভায় তুলে পয়লা চালে মাত করেছে গণপতি। পার্টিতে ঢুকে গণপতি হঠাৎ নেতা হয়ে গেছে। কোথা থেকে সে এলো, কিশোর জানে না। বিগত বছর-

গুলোতে কোনো আন্দোলন, সংগ্রামে তাকে দেখেনি কিশোর।

পুণ্যদা ছাড়া ঘরে কেউ নেই। কিশোরকে পৌঁছে দ্যুতি সেই গেছে, ফেরেনি। দ্যুতি এলে তার সঙ্গে যাবে কিশোর।

সূর্যদার কথা বলতে গিয়ে আবেগে বুজে গেল পুণ্যদার গলা। পুণ্যদা বলল, এবার আমরা পেয়েছি, ভারতীয় বিপ্লবের যোগ্যতম নেতা। চোখ বুজে জড়িয়ে ধরো নেতাকে। সাধন ভজন, সিদ্ধির জন্যে ভক্ত যে ভাবে গুরুর কাছে নাড়া বাঁধে, আমিও বেঁধেছি। সূর্যদার হাতে সঁপে দিয়েছি নিজেকে।

গভীর বিশ্বাসে কথা বলছে পুণ্যদা। সূর্যদার ওপর আস্থা থাকলেও পুণ্যদার গুরুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী মানতে পারছে না কিশোর। নিজের জীবনের গল্প বলছে পুণ্যদা।

বুঝলে, পুণ্যদা বললেন, খবরের কাগজে রিপোর্টারের চাকরি করতাম তখন। অফিসে মালিকদের একনায়কতন্ত্র। ইউনিয়ন গড়ে স্ট্রাইক শুরু করে দিলাম। চাকরিতে নিয়মকানুন ছিল না। সাংবাদিকদের মাইনে ছিল খুব কম। চাকরের মতো খাটুনি। মালিকদের দাপটে টুঁ শব্দ করার সাহস ছিল না কারো। ভয়ে স্ট্রাইকের বাইরে থেকে গেল কেউ কেউ। স্ট্রাইক ভাঙতে দালাল লাগালো মালিকপক্ষ। তার মধ্যে ঠিক হলো আমার বিয়ে। অফিসগেটে সারারাত পাহারার পরে গায়ে হলুদের জন্যে বাড়ি ফিরলাম সকালে। সন্ধ্যেবেলায় যখন বিয়ে করতে যাচ্ছি, তখনও ধর্মঘটের জন্যে দুশ্চিন্তা। মাথা ভার হয়ে আছে। ধর্মঘটীরা কেমন আছে? মাঝরাতে গুন্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়লে কী হবে? নানা প্রশ্নে মন এতো বিচলিত যে, বিয়ের মন্ত্র শুনতে পাচ্ছিলাম না। পরদিন নতুন বউ নিয়ে গাড়ি চেপে বাড়ি ফেরার পথে অফিসের সামনে গাঁটছড়া খুলে নেমে পড়লাম। জরিপাড় ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি পরা আমাকে দেখে সহকর্মীরা অবাক। আনন্দে ফেটে পড়লো তারা। বিয়ের পোশাকে বক্তৃতা করলাম। গাড়িতে বৌ আত্মীয়রা ফুঁসছে। শেষে সহকর্মীরা ঠেলে গাড়িতে তুলে দিল আমাকে। ফুলশয্যার রাতে তোমাদের বৌদি অভিমানে কেঁদে ফেলেছিল।

ত্রিশ বছর আগের স্মৃতি মন্থনে অচেনা হয়ে গেল পুণ্যদার গলার স্বর। কিশোর অবাক হয়ে তাকাতে পুণ্যদা হেসে বলল, দুটো কবিতা লিখেছি। শুনবে?

জলচৌকির ওপর রাশি রাশি কাগজ, পাশে ছোট সেলফে রোগা, মোটা নানা সাইজের ফাইল। এ ঘরে পুণ্যদার দপ্তর, কাগজের গোপন আস্তানা। কিশোরের সম্মতির অপেক্ষা না করে কাগজের স্তূপ থেকে দুটো চিরকুট বার করে পড়তে শুরু করল পুণ্যদা। বাইরে মোষের মতো কালো অন্ধকার। ফাঁকা ঘরে পুণ্যদার গলায় গমগম করে বাজছে কবিতা।

বৈশাখের মধ্যদিনে অগ্নিদাহে মূর্চ্ছাতুর আমি
চাহি জল, চাহি ছায়া চাহি বৃষ্টিধারা
সকলি আনিবে যবে মহামেঘ কালবৈশাখীর
পাতার কুটিরে আমি উৎকণ্ঠায় হবো দিশেহারা।

অন্ধকার ফুটিফাটা হচ্ছে পুণ্যদার কবিতা পাঠে।

দুটো কবিতা পড়ে পুণ্যদা থামতে ঘন নীরবতা নামলো ঘরে। কিশোরকে নিতে এলো দ্যুতি।

আরো কিছু কথা পুণ্যদার সঙ্গে বলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো কিশোর, দ্যুতি। নির্জন রাস্তা। কুয়াশা, ধোঁয়ায় জ্যামিতিক চেহারা নিয়েছে অন্ধকার।

খুব দেরী হলো ?

দ্যুতির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে ?

ফার্স্ট এড্ ট্রেনিং নিতে, দ্যুতি বলল, তিনমাসের কোর্স। আর পনেরো দিন বাকী। এটা শিখে রাখা খুব দরকার।

সব কাজে মৌলিকতা আছে দ্যুতির। খুশী হলো কিশোর।

রেবাদি কবে যাচ্ছে, দ্যুতি জানতে চাই'লা।

যাচ্ছে না, কিশোর বলল।

মানে ?

দ্যুতির প্রশ্নে এক মুহূর্ত চুপ থেকে কিশোর বলল, মেয়েদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া বারণ। পার্টির নির্দেশ।

কিছু ভাবছিল দ্যুতি। কিশোর বলল, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। পার্টির নির্দেশ রেবাকে জানিয়ে দিও তুমি।

মুখ না দেখেও কিশোরের জন্যে দ্যুতির কষ্ট হচ্ছে। বাতাসে পাঁকের গন্ধ। দুটো মোষ রাস্তার ধারে বসে জাবর কাটছে। অন্ধকারে তাদের জাবর কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বড়ো রাস্তায় এসে আলাদা হওয়ার আগে দ্যুতিকে কিশোর বলল, রেবাকে ব'লো কলকাতায় এলে দেখা করবো।

তেরো

দাওয়ায় বসে দিবাকর ভাবছিলো, চারজন গেল কোথায়? থানা থেকে ফেরার সময় মোতি এবং তিনজনকে গাঁয়ের উত্তর-পশ্চিমে যেতে দেখার পর থেকে কথাটা ভাবছে দিবাকর। তিনজন অচেনা মানুষ গত রাতে মোতির বাড়িতে ছিল। মাধুকে ডেকে মোতির খবর জানতে পারে দিবাকর। কিন্তু দিবাকর ডাকলো না মেয়েকে। মাধু হয়তো জিজ্ঞেস করবে মোতির মাকে। মোতির মা কথাটা অবিনাশ তাঁতিকে বললে, অসুস্থ লোকটা ভয় পাবে। দিবাকরকে এখন ডরাচ্ছে গাঁয়ের মানুষ। খনখনে গলায় উঠোনের বাইরে থেকে কেউ ডাকলো, দিবাকর আছিস?

সুমতি বামনীর গলা চিনতে পেরে যতোটা সম্ভব বিনয়ে দিবাকর সাড়া দিল, যাই বামুনমা!

দিবাকরের গলা শুনে সদর দরজা খুলে ঘেন্নায় মুখ বেঁকিয়ে সতর্ক পায়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালো সুমতি বামনী। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, বুড়ি যেন নরকের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। বামনীর নাক মুখ বেঁকে গেছে। ভাঙা কাঁসার মতো গলায় বুড়ি বলল, দ্যাখ দিবাকর, মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। রোজ বলছি, ঘরটা খানিক জুৎ করে দে। আগাম টাকাও দিলাম। কিন্তু বলে বলে আমার মুখের ফেকো উঠে গেল। সময় হলো না তোর। নিজের দরকারে চাঁদপানা মুখ করে হাজির হতে অসুবিধে হয় না তোদের। এখন আমাকে হাজারবার তোর দরজায় ধর্না দিতে হচ্ছে। আমার না আছে ছেলে, না আছে কেউ।

হাত কচলাচ্ছিল দিবাকর। বুড়ি শেষ করতে দিবাকর বলল, আপনাকে আর আসতে হবে না বামুনমা। কাল সকালেই দেখবেন আপনার সদরে হাজির হয়ে গেইচি আমি। বাড়ি যান আপনি।

দিবাকরের কথায় খুব একটা ভরসা পেল না সুমতি। নিজের মনে গজগজ করতে থাকলো সে। তোদের পাড়ায় আসার কতো ঝামেলা! বাড়ি ফিরে চান করতে হবে আবার।

পায়ের তলার নানা জিনিস বাঁচিয়ে, টপকে সাবধানে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল বুড়ি।

দাওয়ার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর। অনেক দিন আগেই সুমতি বামনীর ঘরের চাল ছাওয়ার কথা দিয়েছে সে। নানা কাজে সময় হয় নি। মাধু ডাকলো, বাবা ঘরকে এসো।

দিবাকর তাকাতে মাধু বললো, চান করতে যাও।

সুমতি বামনীকে দেখে চান করার কথা ভুলে গিয়েছিল দিবাকর। গামছা নিয়ে

ক্লান্ত পায়ে পুকুর ঘাটের দিকে হাঁটা দিল সে। বাবার আদুল রোগা শরীর, হাঁটার ভঙ্গি দেখে মাধু জিজ্ঞেস করল, শরীর খারাপ ?

সাড়া না দিয়ে উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো দিবাকর। শরীর যে খারাপ হয়েছে, দিবাকর নিজেও জানে। শরীরের দোষ কী ? এক লহমা বিশ্রাম নেই। কবে বিশ্রাম মিলবে, দিবাকর জানে না।

স্বাধীনকে কলেজে পড়াতে দিবাকর ফতুর। গাঁয়ে এরকম ঘটনা আগে হয়নি। দিবাকর নিজেও কখনো ভাবেনি সে, কলেজে পড়াতে পাঠাবে ছেলেকে। আরও দু'চার বছর সে কষ্ট করলে স্বাধীনের কলেজে পড়া শেষ হবে। ঘরে ফিরবে সে। তখন ছেলের রোজগারে দিবাকর খাবে। এই কালকাসুন্দা, অ্যাশশ্যাওড়া, ভ্যারেণ্ডার ঝোপঝাড়ের মধ্যে জিয়লগাছের মতো মাথা তুলে স্বাধীন দাঁড়ালে সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে মাথা নোয়াবে দেশ গাঁয়ের মানুষ। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অচেনা আনন্দে ভরে ওঠে দিবাকরের বুক। তাড়াতাড়ি ভেঙে যাচ্ছে তার শরীর। কষ্ট, অনিশ্চয়তার সঙ্গে আর দুচার বছর যুঝতে চায় সে। প্রথম ছেলেটা বেঁচে থাকলে কতো বড়ো হতো আজ। তার পয়সায় পায়ের ওপর পা তুলে ঘরে বসে খেতো দিবাকর। মাধু মেয়ে না হয়ে ছেলে হলেও অনেক সুবিধে হতো। তা হবার নয়। মাধুর জন্যেও দিবাকরের মনে দুঃখ আছে।

আর বেশীদিন নেই চাকরী তার। খুব বেশী হলে তিন-চার বছর। তারপর ছুটি। চাকরীতে ছুটি হলেও এ কাজকে ঘেন্না করবে না দিবাকর। এ চাকরী থেকে সে সংসার বাঁচিয়েছে, লেখাপড়া শেখাচ্ছে ছেলেকে।

থানার বড়োবাবুর তদ্বিরে শুধু বিনি মাইনেতে পড়া নয়, হোস্টেলে নিখরচায় থাকার সুযোগ পেয়েছে স্বাধীন। কলেজের মাইনে, থাকার খরচ না লাগলেও ছেলের জলখাবার, বই কেনা, হাতখরচ কম নয়। সে টাকা দিবাকরকে দিতে হয়। স্বাধীন হিসেবী, বাবার অবস্থা জেনে খুব টিপে খরচ করে সে। তবুও মাইনের চল্লিশ টাকার মধ্যে পঁচিশ টাকা দিবাকর ফি মাসে পাঠিয়ে দেয় ছেলেকে। নিজের কষ্ট দিবাকর গায়ে মাখে না। টাকার অভাবে বিদেশ বিভুঁই-এ ছেলের যেন অসুবিধে না হয়, এ বিষয়ে দিবাকর সজাগ। লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মাথা তুলে ছেলেটা দাঁড়ালে দিবাকরকে মুখ্যু, ছোটলোক বলতে পারবে না কেউ।

গলা জলে নেমে টুপটুপ করে দু' তিনটে ডুব দিল দিবাকর। মিনিট পনেরো পরে খেতে বসে যমুনাকে না দেখে মাধুকে দিবাকর প্রশ্ন করলো, তুর মা কুথায় ? ভাতের সানকি বাবার সামনে এগিয়ে দিয়ে মাধু বলল, তাঁতি পিসির ঘরে চাল কুড়তে গ্যালো।

সানকির দিকে একপলক তাকিয়ে দিবাকর বলল, এ্যাতোগুলান ভাত আমি খেতে লারবো। আদ্দেক তুলে রাখ।

মাধু বলল, যা পারো খাও। এখনো খাওয়া হয় নাই আমার, তোমার পাতে খাবো আমি।

মেয়েকে ভালো করে দেখলো দিবাকর। শান্ত, নিরীহ মেয়েটা এক সময়ে সুন্দরী ছিল। এখন রঙ কালো হয়ে গেছে গায়ের। হবেই তো। এতোটুকু মেয়ে, কিছুই

পেল না জীবনে। দিবাকরের আজকাল মনে হয়, যমুনাই ঠিক বলেছিলো। মোতির সঙ্গে বিয়ে দিলে সুখী হতো মাধু। একই গাঁয়ের ছেলে, প্রতিবেশী, মোতি প্রায় রোজই আসতো দিবাকরের বাড়ি। ছেলেবেলায় মাধুর সঙ্গে কতো খেলেছে, ঝগড়া, খুনসুটি করেছে। কিন্তু বিয়েটা হবার ছিল না। দিবাকর জানে, সে নমোজাত, মাল, তাঁতির ঘরের সন্তানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে অপরাধ হতো তার। জেনেশুনে পাপ করতে পারবে না দিবাকর। মোতি ছেলে ভালো। বিনয়ী, বাধ্য, দিবাকরকে কাকা বলে। আজও তাকে শ্রদ্ধা মান্য করে মোতি। ঘরে বোনা একটা কাপড় দিয়েছিল তাকে। পুকুরে, ঝিলে ছিপে মাছ ধরে প্রায়ই দু' একটা মোতি দিয়ে যেতো দিবাকরের ঘরে। দিবাকর বুঝেছিল, মোতির উদারতার কারণ মাধু। তবু ছেলেটা খারাপ নয়। এতো বুঝেও সাত মাইল দূরে মেয়ের বিয়ে দিল দিবাকর। বাড়ি ছেড়ে আগেই পালিয়েছিল মোতি। মাধুর বিয়ে পাকা হতে বুকের মধ্যে উসখুস টের পেয়েছিল দিবাকর। মোতির পালানোর খবরে মন একটু হাল্কা হলেও, অস্বস্তি ছিল তার। কিন্তু কী করার ছিল? জাতের কথা ছেড়ে দিলেও মোতির মতো একটা কচি ছেলেকে জামাই করা যায় না। আরো দু' পাঁচ বছর মেয়েকে ঘরে রাখার অবস্থা দিবাকরের ছিল না। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর কাঁপতো। দিবাকরের ধারণা ছিল, বিয়ের পর মাধু ভুলে যাবে মোতিকে। স্বামী, সংসার, ছেলেমেয়ে পেলে পুরোনো কথা মেয়েরা মনে রাখে না। কপাল মন্দ। তা হলো না। মুখ বুজে মাধু সব মেনে নিলেও তাকে তাড়িয়ে দিল জামাই। মাধুকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিবাকরের মুখে ফুটেছিল জয়ের হাসি। অল্প দিনে হাসি মিলিয়ে গেল। বাচ্চা কোলে বাপের বাড়ি মাধু ফিরে আসতে দিবাকরের মনে হলো, হিসেবে গোলমাল হয়েছে, হেরে গেছে সে।

টগবগে জোয়ান মোতিকে এখন রাস্তায়, দোকানে, বাজারে দেখে দিবাকরের আর শিশু মনে হয় না। মোতি এখন ষোলআনা সাবালক। আজও মোতি যথেষ্ট সম্মান করে, কাকা বলে দিবাকরকে। নিজের দোষে কিছু একটা হারিয়ে ফেলার কষ্ট বহন করছে দিবাকর। এ সব মুহূর্তে অচেনা জেদ, গোঁয়াতুমি ভর করে দিবাকরকে। তার মনে হয়, সে হারেনি। হারা জেতা মানুষের হাতে নেই, সবই নিয়তি। এই যে বামুনপাড়ার নিবারণ খুড়োর মেয়ে মিনতি বিয়ের দু' মাসের মধ্যে সিঁদুর শাঁখা ঘুচিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলো, কার দোষ?

কি হলো বাবা খাও, আর একটু লাগে দেবো।

মাধু খোঁচাতে দিবাকর বলল, নাহ, আর নয়। খেতে বড্ডো অবেলা হয়ে গেল, খিদে নাই।

আরও দু গ্রাস ভাত মুখে গুঁজে উঠে পড়লো দিবাকর। দিবাকরের মাথায় আজকাল বড়ো বেশী চিন্তা। আগে এরকম হয়নি। চেষ্টা করেও দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পায় না সে। দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে দুনিয়া। গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা উল্টোরকম, উদ্ধত, বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বড়োদের তারা মানে না, ইজ্জত দেয় না। সব ব্যাপারে কৈফিয়ত চায়, ব্যাখ্যা খোঁজে। বয়স্ক, গুরুজনদের কথায়

ছিটেফোঁটা বিশ্বাস নেই। তাদের চোখে সব খারাপ, নষ্টামি। বড়োলোক আর ভদ্র লোকদের ওপর এই ছেলেগুলোর সবচেয়ে বেশী রাগ। ভদ্রলোক, বড়োলোকদের কেউ না হয়েও একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা সব সময়ে জড়িয়ে থাকে দিবাকরকে। মনে হয়, খাঁকি পোশাকে এখানে থাকার দিন শেষ। সে আর তাঁতিপাড়ায় বাস করতে পারবে না। আগে কখনও দিবাকরের ভয়ডর ছিল না। মাঝরাতে গাঁয়ের অন্ধকারে, নির্জন কুলিতে কেরোসিনের ভুষোপড়া টেমি, লম্বা লাঠি হাতে হাঁক দিয়ে গর্বে ফুলে উঠতো তার বুক। মনে হতো, গ্রামবাসীদের সজাগ রাখছে সে। মহল্লায় সে একমাত্র পাহারাদার। তার ওপর নির্ভর করে কতো মানুষ ঘুমিয়ে আছে আরামে। গভীর দায়িত্ববোধে অহমিকা জাগতো তার। এখন সে সবের বদলে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, কুলিতে কুলিতে অন্ধকারে কারা লুকিয়ে আছে ভেবে ভয়ে কাঁপতে থাকে তার বুক।

কিছুদিন আগে এক রাতে পুলিসের গাড়ি এসে তাঁতিপাড়া থেকে হাবুল, টিঙ্কু আর মনাকে তুলে নিয়ে গেল। যেভাবে হোক, আগে থেকে খবর পেয়ে শিবেন, রঞ্জন, বাবলু বাড়ি ছিল না। পুলিস পার্টির সঙ্গে ছিল দিবাকর। পুলিশকে গাঁয়ের বাড়ি চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব চৌকিদারের। বাড়ি চিনিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল দিবাকর। তার হাজির থাকার খবর রঞ্জন জেনেছিল। দিন দুই আগে, চারপাশে অন্ধকার জমছে তখন, কুলিমুড়োয় হঠাৎ রঞ্জনের মুখোমুখি হয়ে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল দিবাকর। রঞ্জন পথ আগলে দাঁড়াতে নড়তে পারেনি সে।

কাজটা ভালো করো নি দিবাকরদা, রঞ্জন বলেছিল। দিবাকরের কিছু বলার ছিল না। চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সে।

তুমি আমাদের শত্রু নও, রঞ্জন বলেছিল, তুমিও একজন খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ, আমাদের বন্ধু। আমাদের শত্রু, জমিদার, জোতদার, সুদখোর, মহাজন, দালাল। তুমি কেন?

রঞ্জনের কথার শেষাংশ বুঝতে পারছিল না দিবাকর। রঞ্জন যে ভয়ংকর এক পরিণামের ইঙ্গিত দিয়ে শাসিয়ে ছিল, দিবাকরের মনে আছে। দালালী শব্দটাও বলেছিল রঞ্জন। সব দায়, অভিযোগ অস্বীকার করার জন্যে কয়েকবার না, না শব্দটা উচ্চারণ করেছিল দিবাকর। আর কী বলবে, বলার আছে, ভেবে পায়নি। রঞ্জন চলে যাওয়ার পরেও রাস্তার চৌমাথায় অন্ধকারে নিথর দাঁড়িয়েছিল সে। অস্বস্তিতে ঘুম না আসায় মাঝরাত পর্যন্ত জেগেছিল। আমি কী সত্যি ভুল করছি, এ প্রশ্ন জেগেছিল তার মনে। কাজটা যদি ঠিকই হয়, তাহলে এতো ভয় কেন? রঞ্জনের মুখের ওপর একটা কথাও বলতে না পারার কারণ অনুসন্ধান করেছিল সে। দিবাকরের মনে পড়লো, ব্রিটিশ আমলেও থানায় খবর দিতো সে। স্বাধীনতার পর জেল থেকে ফিরে রাজনগরের অমরবাবু একদিন দিবাকরকে বলেছিল, তুমিই পুলিশে ধরিয়ে ছিলে আমাদের। এখন কী করবে?

অমরবাবুর প্রশ্নে না ঘাবড়ে হাসতে হাসতে দিবাকর বলেছিল, এজ্ঞে, এই দিবাকর মাল এখন সেবা করবে আপনাদের। আপনাদের শত্রুদের ওপর নজর রাখবো আমি।

অমরবাবু সেদিন যা বলেছিলো বিশ বাইশ বছর পরে সে কথাগুলো দিবাকর কেন রঞ্জনকে শোনাতে পারলো না? বড়োরকম কিছু বদল হয়েছে। দিবাকরের সাহস, আত্মবিশ্বাসে ধ্বস নেমেছে। রঞ্জন আর তার দল খুন করবে না কি আমাকে? ভয়ে শিউরে উঠলো দিবাকর। তার মনে হলো, আগুন নিয়ে খেলছে সে। আগুন লেগেছে তার ঘরের চালে।

হাত মুখ ধুয়ে বসলো দাওয়ায় ওপর। চেষ্টা করেও সে তাড়াতে পারছে না দুশ্চিন্তা। হাওয়ায়, লোকমুখে রোজ যে কতো খবর থানায় আসছে, সীমা সংখ্যা নেই। থানার মধ্যে সবসময়ে থমথমে গম্ভীর ভাব। হাসিঠাট্টা ভুলে থানার বড়োবাবু, মেজোবাবু তিরিক্ষি হয়ে আছে। গামছায় মুখ মুছে দিবাকর ঠিক করল, যে ভাবেই হোক, রঞ্জন আর তার দলের ছেলেদের ধরিয়ে দেবে। নিজেও নিরাপদ, নিশ্চিন্ত হবে। দিবাকরের ধারণা, মোতি, রঞ্জন, বাবলুকে জেলে ঢোকালেই শান্তি ফিরবে গাঁয়ে। মা-মরা রঞ্জনের মুখ মনে পড়তে দিবাকর ভাবলো, ছেলেটা কেন এমন হয়ে গেল? কম্পাউণ্ডার সেজে কী করছে মোতি?

হঠাৎ স্বাধীনের কথা ভেবে দিবাকরের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো হিমেল আশঙ্কা। এখন কী করছে স্বাধীন? সেও কি এসবের সঙ্গে জড়িয়েছে নিজেকে? পুজোর ছুটিতে ফি বছর এলেও পরীক্ষার অজুহাতে এবছর পুজোয় বাড়ি আসেনি স্বাধীন। কলেজ ছুটির আগে দু' তিন দিনের জন্যে এসে পুজোয় কেন আসতে পারবে না, বলে গিয়েছিল। দিবাকরের মনে হলো, কয়েক দিনের জন্যে এলেও খুব অল্প সময় বাড়ি থেকেছে স্বাধীন। কোথায় যেত, কাদের সঙ্গে মিশতো, খেয়াল করেনি দিবাকর। মাঝেরপাড়ার শিবেনের সঙ্গে স্বাধীনকে একদিন চাপা গলায় আলোচনা করতে শুনেছিল দিবাকর। ভয়ে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে দিবাকর বিড়বিড় করল, হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার স্বাধীন যেন মোতি, রঞ্জন, বাবলু শিবেনের মতো না হয়। যে যাই করুক, সে সবের বিচার, ভালোমন্দ নিয়ে স্বাধীন যেন মাথা না ঘামায়। কী দরকার তার? গরীবের ছেলে সে। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে চাকরী বাকরী করতে হবে তাকে।

কপাল থেকে দু'হাত নামিয়ে দিবাকর টের পেল, ঘুমে ভারী হয়ে আসছে দুচোখের পাতা। তাড়াতাড়ি বিশ্রাম, ছুটি চাই।

চোদ্দ

পুরোনো চেনা পাড়ায় যা হয়, বেশীরভাগ পরিচিত মুখ। তাদের নজর এড়িয়ে সতর্ক কিশোর যখন বাড়িতে ঢুকলো, খাওয়ার পাট মেটেনি। বিছানায় আধশোয়া বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। মেঝেতে সতরঞ্চি পেতে পড়ার বই খুলে বসে আছে ছোট বোন রেণু। রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কৌশিক কথা বলছে সকলের সঙ্গে। কিশোরের চেয়ে বছর পাঁচের বড়ো কৌশিক। তার ওপরে এখন সংসারের সব দায়। মায়ের কথা শুনতে পাচ্ছে কিশোর। তাকে এখনও কেউ দেখেনি। প্রথম দেখলো রেণু। অবাক চোখে বোনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কিশোর হেসে প্রশ্ন করলো, ভয় পেলি?

কিশোরের গলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো কৌশিক। ম্যাড়মেড়ে ইলেক্‌ট্রিক আলোতেও কৌশিকের মুখ কালো হয়ে যেতে দেখলো কিশোর। বিছানার ওপর বাবাও যেন একটু কেঁপে উঠলো। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কিশোরকে দেখে খুশিতে অভিভূত হলো মা।

তার খোঁজে এ বাড়িতে মাঝে মাঝে পুলিশ আসার খবর বিকেলে পিসির মুখে কিশোর শুনেছে। বাড়ির সকলে যে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, বাবা, দাদার মুখ দেখে টের পেল সে। কিশোর জানে নিজেদের নিরাপত্তার সঙ্গে তার জন্যেও বাড়ির লোকেরা উদ্বিগ্ন। উদ্বেগের আরও কারণ আছে।

এ বাড়ির তেরো-চোদ্দ ঘর ভাড়াটের সকলেই উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল। নানা পেশা, ধান্দায় লেগে থাকলেও তারা অনেকে নিয়মিত ভাড়া দিতে পারে না। পায়রার খোপের মতো স্যাঁতসেঁতে, নোনাধরা, অন্ধকার একটা বা দুটো ঘরে মাথা গুঁজে পড়ে আছে তারা। দু'এক ঘর ভাড়াটে আছে, যাদের এক বছরের ভাড়া বাকী। এ বাড়ি নিয়ে তাই বাড়িওলারও মাথাব্যথা নেই। জীর্ণ, বিবর্ণ বাড়িটা ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় আছে সে। সে রকম কিছু ঘটলে বাড়িওলা হয়তো মা কালীকে জোড়া পাঁঠা উপহার দেবে।

কিশোরের বাবা নিশানাথ চক্রবর্তী অবশ্য দুটো ঘরের ভাড়া মাসের প্রথম হপ্তায় মিটিয়ে দেয়।

প্রতিবেশীদের কেউ কেউ তাই নিশানাথের ওপর ক্ষুব্ধ। কিশোরদের ঘরে পুলিশ আসার খবর তারা জানে। কিশোর এসেছে শুনলে পুলিশে খবর দিতে পারে।

ছাতের ঘর থেকে হৈচৈ, হাসাহাসি, অনেক গলার শব্দ শুনে অবাক হলো কিশোর। ঘরটা খালি পড়ে ছিল এতোদিন। বাড়িওলা তালা দিয়ে রেখেছিল। সেখানে কারা এলো? কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, ছাতের ঘরে মাস তিন হলো নতুন ভাড়াটে এসেছে। যুব কংগ্রেস নেতা পল্টন দাসকে ঘরটা দিয়েছে বাড়িওলা।

পল্টন দাস কিশোরের চেনা। কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে গুণ্ডামিও করে সে। দুটোই তার পেশা। কৌশিক বলল, পল্টনকে দিয়ে বাড়ি খালি করাতে চায়

বাড়িওলা। খালি বাড়ি চড়া দামে বিক্রী হবে। খদ্দের ঘুরছে।

ছাতের ঘরে হল্লা, হাসি বাড়ছে। কী করছে ওরা, জানতে চাইলো কিশোর। মদ, জুয়ার আসর বসেছে, কৌশিক বলল, রোজই বসে।

পরীক্ষার একগাদা খাতা দেখতে শুরু করেছে বাবা। কিশোরের মনে হলো, গত কয়েক মাসে আরো মলিন, জীর্ণ হয়েছে ঘরের চেহারা। চাকরী ছেড়ে সে চলে যেতে সংসারে অনটন বেড়েছে। স্কুল মাস্টারি থেকে একবছর হলো রিটায়ার করেছে বাবা। এক্সটেনশনে ছিল তারপর। বাবা কি এখনও স্কুলে যাচ্ছে? মুখে এলেও প্রশ্ন করতে ভরসা পেল না সে। দু'কাপ চা হাতে ঘরে ঢুকে রেণু বলল, কালো চা, দুধ ফুরিয়ে গেছে।

চায়ে দুধ ছেড়ে দিয়েছি আমি, হেসে কিশোর বলল।

দু' কাপ দুই দাদাকে ধরিয়ে দিল রেনু। তোর কলেজের পরীক্ষা কবে, প্রশ্ন করল কিশোর।

বি.এ. সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে রেণু। খুবই সাধারণ ছাত্রী! কিন্তু ভারী নম্র, বিনয়ী। সংসারের নানা কাজ আর কলেজের পড়ার চাপে সব সময়ে হিমসিম খেলেও রেণুর মুখের হাসি মরেনি।

কিশোরের প্রশ্নে কালো হলো রেণুর মুখ। বলল, পরীক্ষার দু'মাস বাকী। কিছুই পড়া হয়নি।

বোনকে সাহস জোগাতে কিশোর বলল, পরীক্ষা যতো এগিয়ে আসে, ওরকম মনে হয়। শেষ পর্যন্ত দেখবি, তৈরী হয়ে গেছে সব।

কিশোরের আশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রেণুর মুখ। ছোট ভাই তরুণ টুইশনি থেকে ফিরে কিশোরকে দেখে দারুণ খুশী। উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করল, কখন এলি মেজদা?

একটু আগে, কিশোর বলল।

এবছর বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে তরুণ। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। সরাসরি না হলেও কিশোরদের পার্টির নিষ্ঠাবান সমর্থক সে। ফ্যাকাসে আলোর নিচে পরিবারের সকলে অনেকদিন পরে ছড়িয়ে বসেছে। খাতা দেখা থামিয়ে বাবাও শুনছে ছেলেমেয়েদের কথা।

কৌশিক সরকারী চাকুরে। অফিসের কথা বলতে গিয়ে সঙ্কোচে জড়িয়ে যাচ্ছে তার গলা। কৌশিক বলছে, শুধু ফাঁকি আর ঘুস। আমাকে নিয়ে হাসাহাসি, ঠাট্টা করে সহকর্মীরা।

অফিসে গোবেচারা, নিরীহ কৌশিকের লাঞ্ছনা বুঝতে কিশোরের অসুবিধে হয় না। আলোচনার মধ্যে রেণু একসময়ে কিশোরকে বলল, তোদের পার্টির ছেলেরা আমাদের কলেজ লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়েছে।

বেশ করেছে, তরুণ বলল।

নাহ্, এটা ঠিক নয়, রেণু বলল, লাইব্রেরী কেন পোড়াবে? সাধারণ ছেলে-মেয়েরা খুব চটে গেছে।

কী বলবে ভেবে পেল না কিশোর।

কিশোরকে তরুণ বলল, মেজদা, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।

এখন কোনো কথা নয়, ছেলেমেয়েদের তাড়া দিয়ে মা বলল, খেয়ে নাও আগে। তারপর কথা।

একতলার অন্ধকার চাতালে গঙ্গাজলের কল থেকে অবিরল জল পড়ে যাচ্ছে। বছর দুই আগে কলের ট্যাপ চুরি হয়ে যাওয়ার পর নতুন একটা লাগায়নি কেউ। গঙ্গায় জোয়ার এলে উপচে পড়ে কলের জল। কিশোর যখন চাকরী করতো, বাড়ি বদলের কথা হয়েছিল একবার। দু'একটা বাড়ি দেখাও হয়েছিল। ব্যস, ওখানেই শেষ। নতুন বাড়িতে যাবার কথা তারপর কেউ ভাবেনি। ছাতের ওপর ঝনঝন করে কিছু ভাঙতে হাসির ছররা উঠলো।

এবার শুরু হবে নাচ, তরুণ বলল।

পঞ্চাশ জন মানুষ বাড়িতে থাকলেও সাড়া করছে না কেউ। পল্টন দাসের ভয়ে সকলে চুপ। একমাসের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার জন্যে প্রতিটি ভাড়াটেকে নোটিশ দিয়েছে পল্টন। বাড়ি না ছাড়লে।...

কোথা থেকে লোকটা এতো টাকা পায়, মা ফিসফিস প্রশ্ন করল তরুণকে।

টাকা দেবার অনেক লোক আছে, তরুণ বলল, লোহাপট্টির কালোয়ার ব্যবসায়ী, বাজারের দোকানদার, সকলেই দেয়। থানাকে ভাগ দেয় পল্টন। পাকা ব্যবস্থা। কারো কিছু বলার নেই।

চুপচাপ বসে আছে কৌশিক। রেণু হঠাৎ বলল, মেজদা, তোর সঙ্গে গ্রামে যাবো আমি।

ছোট বোনের মুখে গ্রামে যাবার কথা শুনে খুব অবাক হলো কিশোর। করুণ মুখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে রেণু। চাপা স্বরে মা বলল, একদিন রেণুর বিনুনি ধরে টেনেছিল পল্টন।

কিশোরের মাথাটা ঝাঁ করে তেতে উঠলো। নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল কৌশিক। দাঁতে ঠোঁট টিপে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে তরুণ।

খাওয়া দাওয়ার পর রাতে সকলে যখন শুয়ে পড়েছে, বাবার সঙ্গে কথা শুরু করলো কিশোর।

এক চিলতে অন্ধকার রান্নাঘর ধোয়ামোছার মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছে মা আর রেণু। বাবার মাথায় ধবধবে সাদা চুল। অল্প বয়সে চুল পেকে গিয়েছিল বাবার। বাবার কালো, কাঁচা চুল, কিশোর দেখেনি। ধীর, নিচু গলায় কথা বলছে বাবা। বাবার কথা বলার এই ভঙ্গি। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী ছিল বাবা। পাঁচ, সাত বছর জেল খেটেছে। এখন বাবা নিছক শিক্ষক, রাজনীতিতে নেই। কিন্তু বাবার চালচলন, কথা, আচরণে এমন এক সততা, সংযম আছে, যা মুগ্ধ করে কিশোরকে। তার মনে হয়, কংগ্রেসী সংস্কৃতি, আদর্শের মূল্যবান, শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির বাবা প্রতিনিধি। আজও সযত্নে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে বাবা।

কিছুই করতে পারলাম না আমরা, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বিছানায় আধশোয়া বাবা বলল, এ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করিনি আমরা। এখন আমার প্রায়ই মনে হয়, স্বাধীনতা শব্দটার কোনো মানে নেই, স্বাধীনতা অলীক কল্পনা। ইংরেজ শাসনে, পরাধীন আমলেও মানুষের এতো দুর্গতি দেখিনি আমি। দুবেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সুযোগ সকলের না থাকলেও মানুষের মতো মানুষ তখন অনেক বেশী ছিল। খেয়ে পরে বাঁচা, অথবা খালি পেটে বক্তৃতা শোনা, অধঃপতিত হওয়া, কোনটা স্বাধীনতা ? আমার কাছে স্বাধীনতা শব্দের তাই কোনো মানে নেই।

যন্ত্রণার রেখা জেগেছে বাবার কপালে। দাড়ি বিজবিজ তীক্ষ্ম সরু চোয়াল, লম্বাটে দেখাচ্ছে। ঘরের দেওয়ালে কাঁপছে বাবার ভাঙাচোরা ছায়া। একতলায় জল পড়ার শব্দ। কিশোরের মনে হলো, কাছাকাছি কোথাও বয়ে চলেছে একটা জলপ্রপাত।

এর নাম স্বাধীনতা, নিজের মনে বিড়বিড় করল বাবা, ভিখিরী হয়ে গেল দেশ। খাবার নেই, বাসস্থান নেই, ঘরের ছেলেরা চোখের সামনে গুণ্ডা, বদমাস, জোচ্চোর হয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হয়, এটাই স্বাভাবিক। তাদের কী দিয়েছি আমরা ? কিছুই নয়। যে জীবন, সমাজ তাদের দিয়েছি, তার সঙ্গে স্বাধীনতা শব্দটা মেলে না।

ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছে মা, রেণু। চোখের ওপর হাত রেখে আলো নেভার অপেক্ষা করছে মা। মায়ের পাশে দুচোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে থাকলেও রেণু ঘুমোয়নি। পাশের ঘরে কৌশিক, তরুণ একটা তক্তাপোষের ওপর পাশাপাশি শোয়। সে ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে রাতে ঘুমোবে কিশোর। কয়েকবার কেশে তরুণ জানিয়েছে যে, কিশোরের সঙ্গে কথা বলার জন্যে জেগে আছে সে। কিশোরের মনে হলো, রাত বাড়ার সঙ্গে কমে আসছে ঘরের আলো।

বাবা বলছে, দেশ ভাগ মেনে নেওয়া ছিল সবচেয়ে বড়ো পাপ। ধিক্কারে কুঁকড়ে থাকি দিনরাত। অবশ্য চেষ্টা করেও দেশভাগ কি আটকাতে পারতাম ? পারতাম না। কিন্তু একটা জোরালো প্রতিবাদ, অসহযোগ, অনশনে আত্মবিসর্জনও তো করতে পারতাম! পারলাম না। টুঁ শব্দ করলাম না। কেন ? আসলে নিজেকে যতো পণ্ডিত ভাবি না কেন, কী সর্বনাশ যে ঘটছে, বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম, তখন কিছু করার নেই। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে। তবু অন্যায় স্বীকার করলাম না। ভুলকে নির্ভুল প্রমাণের জন্য তত্ত্ব খাড়া করলাম। ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতার শেষ কোথায় ? উত্তর খুঁজতে হবে। তা না হলে কোথায় আমরা ভেসে যাবো, ঠিক নেই। ভাবালুতা দিয়ে স্বাধীনতা আসে না।

টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে এক চুমুক জল খেয়ে বাবা বলল, না বুঝে কোনো কাজে হাত নেওয়া ঠিক নয়। বুঝতে হলে চাই জ্ঞান আর যুক্তি। জ্ঞান, যুক্তির বিকল্প নেই। অন্ধবিশ্বাস, ভাবাবেগ মানুষের বড়ো শত্রু।

ভেতরে ভেতরে বাবা যে উত্তেজিত, তেতে আছে, শিরদাঁড়া সোজা করে বসা মানুষটাকে দেখে বোঝা যায়।

চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে কিশোরকে মা বলল, এবার ঘুমো, অনেক

রাত হ'লো।

চেয়ার ছেড়ে কিশোর উঠে দাঁড়াতে চাপা গলায় বাবা প্রশ্ন করলো, কেউ দেখে নি তো তোকে ?

নাহ্, কিশোর বলল।

পাশের ঘরে ঢুকে কিশোর দেখল, তার জন্যে অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়েছে তরুণ। গভীর ঘুমে ডুবে আছে সে। কৌশিকও ঘুমোচ্ছে। ঘরের আলো নিভিয়ে বাবার ঘরে কিশোর ফিরে এলো আবার। মায়ের পাশে একটা সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়লো। বাবা আলো নিভিয়ে দিতে ঘর অন্ধকার। কিশোরের বুকের ওপর হাত রাখলো মা। দুজনেই নিঃশব্দ! আবেগে কাঁপছে মায়ের হাত। জমে থাকা অনেক কথা, অনুভূতি বেরিয়ে আসার জন্যে দরকার ছিল এই অন্ধকার। অন্ধকারে মা কি কাঁদছে ? অথবা কান্নার মতো শোনাচ্ছে মার লম্বা নিঃশ্বাসের শব্দ ? অঘোরে ঘুমোচ্ছে রেণু। তক্তাপোষের ওপর বাবার নাক ডাকায় আবছা শব্দ। বাবাও ঘুমোচ্ছে।

কিশোর ডাকলো, মা !

মা সাড়া দিলো না। কিশোর বুঝলো, এখন মাকে ডাকার সময় নয়। আরো মিনিট পাঁচ পরে নিজেই কথা শুরু করলো মা। গত একবছরের খুটিনাটি ঘটনা শোনালো। তারপর শুরু করলো কলকাতার খবর, সংসারের নানা কাহিনী। তাম্রপত্র দেবার জন্যে দিল্লী থেকে ডেকেছিল বাবাকে। বাবা যায়নি। দিল্লীতে একটা কড়া চিঠি লিখে জানিয়েছে, তামার টুকরো, স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসনে দরকার নেই। স্বাধীনতার চেহারা দেখে বাবা লজ্জিত।

বাবার সততা, সাহসের কথা শুনে উদ্বেল হলো কিশোর। সে জানে, সমবয়সী মানুষদের সঙ্গে বাবার অনেক তফাৎ। রাজনীতির চেয়ে যুক্তি, উপলব্ধির নিকষে সবকিছু বিচার করে, সাজিয়ে নেয় বাবা। যুক্তি, উপলব্ধিই বাবার জীবনসত্য। পুরোনো দিনের সমৃদ্ধি, সস্তায় রুইমাছ, রাবড়ী খাওয়ার গল্প, বাবা কখনও শোনায় না। বাবা ভীষণ আধুনিক। এই সময়, এখনকার ছেলেমেয়েদের ওপর বাবার অগাধ আস্থা, ভালোবাসা। বকে যাওয়া গুণ্ডা, মস্তান ছেলেদের সম্পর্কেও মজুত আছে বাবার যুক্তি। শুধু নিজের বিরুদ্ধে একটা চাপা ক্ষোভ অভিমানে বাবা মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে। যাবতীয় স্খলন, নোংরামির জন্যে নিজেকে, নিজের অতীতকে দায়ী করে তখন।

রাত বাড়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা বাড়ছে। একটা পাতলা চাদর গলা পর্যন্ত টেনে দুচোখ বুজে কিশোর শুনছিল মার কথা। পুরোনো দিনের গল্প করছিলো মা। দেশের বাড়ির পেছনে যে নদীটা গরমকালে নিরীহ, ভালোমানুষের মতো শুয়ে থাকতো, বর্ষায় তার কী তেজ, স্রোতের গাঁ গাঁ আওয়াজ! বর্ষার দিনে তোরা খেলতে বেরোলে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত বুক কাঁপতো আমার। নদীর গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পেতাম না। গত কয়েক মাস সেই ভয়ংকর আওয়াজ রোজ রাতে এখানে শুনতে পাই। অথচ কাছাকাছি নদী দূরের কথা, একটা পুকুরও নেই। বোধহয় কানের রোগ হয়েছে আমার।

পনেরো

গ্রামের নাম তাঁতিলুই, ভদ্রভাষায় তন্ত্রেশ্বর। গরম জলের একটা কুয়ো আছে তাঁতিলুই গ্রামে। কলকাতা থেকে তাঁতিলুই ফিরে পুরোদমে কাজ শুরু করে দিয়েছে কিশোর। জেলখাটার জন্যে তার ওপর এলাকার গরীব আদিবাসী মানুষদের আস্থা, বিশ্বাস বেড়ে গেছে। কিশোরের প্রতিটা কথা মন দিয়ে শুনছে সকলে, কাজে লাগাতে চাইছে। বাহেঙ্গাতেও তাই। অজিতকে ঘিরে সাঁওতাল ছেলেদের উৎসাহ নাচানাচির শেষ নেই। দুপুর গড়িয়ে ঘন হচ্ছে বিকেলের ছায়া। রবি হাঁসদার সঙ্গে রাতের পার্টি মিটিং নিয়ে কথা বলছে কিশোর। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকের উপস্থিতিতে রবির বাড়িতে এলাকা কমিটির ঘরোয়া সভা হবে। অদূরে কুলি-মুড়োয় একদল ছেলেমেয়ে মাদল, লাগড়া, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচছে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে সমবয়সী একঝাঁক সাঁওতাল তরুণ তরুণী। গানে গলা দিয়েছে তারা।

রবি হাঁসদা এলাকার কমাণ্ডার। গানটা লিখেছে সে। রবির সঙ্গে আলোচনার মধ্যে গানের দুটো লাইন শুনতে পেল কিশোর।

—সিদু কানু চাঁদ ভৈরব হুল দেকিন নাজ মাটালে
মাও-সে-তুং চারু মজুমদার হুল দোকিন রক্ষা রুয়েরকে।

সিদু কানু, চাঁদ, ভৈরবের আরব্ধ বিপ্লব আজ মাও-সে-তুং আর চারু মজুমদারের নেতৃত্বে শেষ হবে।

গান শুনে রবিকে তারিফ করে কিশোর বলল, দারুণ!

প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে রবি হাসলো। শান্ত, নিরীহ মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে, রবি একজন বড়ো মাপের আদিবাসী নেতা। তার এক ডাকে সুদূর পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে যে কোনো সময়ে হাজার হাজার সাঁওতাল জড়ো হয়ে যায়। সিদু কানুর নতুন অবতার হিসেবে রবিকে ভাবতে শুরু করেছে আদিবাসী সমাজ। আশপাশের গাঁয়ের জোতদার মহাজনরাও জেনেছে এ খবর। রবির নামে আতঙ্কে ধড়াস ধড়াস করে তাদের বুক।

কলকাতার কাজ সেরে একমাস আগে তাঁতিলুইতে কিশোর পা দিতে তাকে দেখার জন্যে ভেঙে পড়েছিল সারা গ্রাম। অজিতের কাছ থেকে কিশোরের তাঁতিলুই ফেরার দিনটা জেনে ভোজের জোগাড় করেছিল রবি। কিশোর আসতে গাঁয়ের মোস্তাগীর কুলিতে সভা ডেকে নাচ, গান, ভোজের খবর জানিয়ে দিয়েছিল গ্রামবাসীকে। তারপর সে কী হৈচৈ, আনন্দ। তাঁতিলুই-এর মানুষের ভালোবাসা পেয়ে আত্মবিশ্বাসে ভরে গিয়েছিল কিশোরের মন। এলাকার মানুষের সঙ্গে এখন সহজেই একাত্ম হতে পারবে ভেবে তৃপ্তিবোধ করেছিল সে।

রাতের সভা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে দাওয়া থেকে নেমে গেল রবি। ধান কাটা শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে। মাঝিপাড়ায় যাদের সামান্য জমি আছে, তাদের খামারে ধান চাল ঝাড়া, খড়ের গাদা বানানোর কাজ চলছে। ধনীকৃষক, জোতদারের খামারে কাজ করছে ভূমিহীন সাঁওতাল। ধান চাল ঘরে ওঠার জন্যে আলগা খুশির হওয়া বইছে সকলের মনে। এককাড়া চাল ঘরে থাকলেই সুখ, আনন্দ উপচে পড়ে এখানে। পাড়ায় পাড়ায় গভীর রাত পর্যন্ত মাদল, লাগড়া বাজিয়ে গানবাজনা হয়।

রবি চলে যেতে দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দুচোখ বুজে একটু ঘুমোতে চাইলো কিশোর। কাল মিটিং করেছে সারারাত। ঘুমোবার সময় পায় নি। আজও রাতের সভা শেষ হতে সকাল হয়ে যাবে। এক, দেড়ঘণ্টা এখন ঘুমিয়ে নিলে রাতে জাগতে কষ্ট হবে না।

এক মাস আগের এক রাতের স্মৃতি মনে পড়লো কিশোরের। নাচ, গান, ভোজ শেষ হতে সেদিন কাবার হয়ে গিয়েছিল রাত। মাদলের শব্দ থামতে বোঝা গেল, অন্ধকারে, শীতে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকে। খড়ের বিছানায় রবির পাশে শুয়ে অনেকক্ষণ জেগেছিল কিশোর। ক্লান্ত শরীর, দুচোখে ঘুম, তবু ঘুমোতে পারছিল না সে। মনে পড়ছিল, তাঁতিলুইতে প্রথম আশ্রয় পাবার ঘটনা।

বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে তন্দ্রার মধ্যে কিশোরের মনে পড়ছে বাঘা সোরেনের মুখ। মোতির যোগাযোগে তিলাবুনির বাঘা সোরেনের বাড়িতে প্রথম থাকার জায়গা পেয়েছিল কিশোর। তিলাবুনিতে থাকার সময়ে রাজনগর আর রাণীশ্বর, এ দুটো থানার বিস্তীর্ণ এলাকা সরেজমিনে দেখে নিয়েছিল সে। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে মশানজোড় বাঁধের জল, মাঝে মাঝে শাল মহুয়ার জঙ্গল, কেন্দু, কুঙ্গার ঝোপ, আদিবাসী জনপদ। আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী সাঁওতাল। পাশাপাশি আছে পাহাড়িয়া আর মুহুলি সম্প্রদায়। কিছু লোকের জমি থাকলেও জমি বিক্রীর অধিকার সাঁওতালদের নেই। বিহারে আদিবাসীদের জমি বিক্রী করা আইনত নিষিদ্ধ। মহাজনের কাছে নিজের নামে দু' দশ বছরের জন্যে চাষের জমি বন্ধক রাখে আদিবাসীরা। এই বন্ধকীর নাম ভন্না। ভন্না মানেই জমি বিক্রী, পাকাপাকি বেহাত হওয়া। ভন্না বাবদে পাওয়া টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদে যা দাঁড়ায়, তা শোধ করা গরীব চাষীর অসাধ্য। সারাজীবনে পারে না। ফলে ভন্না জমি গ্রাস করে মহাজন। পাহাড়ী আর মুহুলিদের জমি নেই। মুহুলিরা করে বাঁশের কাজ। ঝুড়ি, চুপড়ি, শৌখিন জিনিস বানায়। তাদের তৈরী বাঁশের কারুশিল্প বিদেশেও চালান যায়। পাহাড়িয়া, মুহুলি ছাড়া আরো এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছে কিশোর। আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে গরীব, ভূমিহীন এই সম্প্রদায়ের নাম ঘাটোয়াল। এরা চাষ আবাদ করে না। আজও ঘাটোয়ালদের পেশা শিকার। জঙ্গল পাতলা হাওয়ার সঙ্গে বিপন্ন, কোণঠাসা হচ্ছে এই সব আদিম জনগোষ্ঠী। কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায় সংখ্যাগতভাবে মুছে যাচ্ছে। আদিবাসী ছাড়াও আরো অনেক গরীব মানুষ আছে। কিশোরের ধারণায় ডোম, বাউরি, মালোরাও খুব গরীব। বেশীরভাগ ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর। মাসখানেকের চেষ্টায় এলাকাটা মোটামুটি

চিনেছিল কিশোর। খুব সহজে এগোয়নি চেনাজানার কাজ। নতুন জায়গা, অচেনা ভাষা, কথা বলতো না কেউ। বললেও বুঝতে পারতো না সে। কিশোর ভাবতো, বলার ঝক্কি এড়াতেই স্থানীয় মানুষ বোবা হয়ে আছে। কিশোরকে দেখলে ভয়ে লুকিয়ে পড়তো মেয়েরা। দরকার থাকলেও দিনে জঙ্গলে যেতো না। প্রবল অস্বস্তিতে আড়াল ভাঙার চেষ্টা করেছে কিশোর। কেন এই ব্যবধান, কেন এখানকার মানুষ বুঝতে পারছে না তাকে, নিয়ত ভেবেছে একথা। ভরসা, ধৈর্য জুগিয়েছিল বাঘা। বলেছিল, ঠিক হঁইয়ে যাবেক।

মাসখানেক যেতেই ফলতে শুরু করেছিল বাঘার কথা। তিলাবুনি গাঁয়ের মানুষ ধীরে ধীরে মুখ খুলেছিল, ঘনিষ্ঠ হয়েছিল কিশোরের। বাঘা সাহায্য করেছিল। বাঘাকে যতো দেখছিল, অবাক হচ্ছিল কিশোর। ভূমিহীন, গরীব এই সাঁওতালী ছেলেটার সঙ্গে প্রথম পরিচয় মোতির। রাজনগরে অনুপের ডাক্তারখানায় মাকে দেখাতে এনেছিল বাঘা। মায়ের দু' হাতে দগদগে ঘা। জড়িবুটির চিকিৎসায় সারেনি। ফলে সদরের ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে বাঘা। পাথরে কোঁদা বলিষ্ঠ চেহারা। ভাঙা বাংলায় ডাক্তারকে মা'র রোগের বিবরণ বাঘা যখন দিচ্ছিল, নজর কেড়েছিল মোতির। বাঘাকে খুঁটিয়ে দেখছিল মোতি। হাড়-ভাঙা খাটুনির ছাপ পড়লেও মজবুত শরীরে হাত পায়ের পেশী সজাগ, জীবন্ত। বাঘার গলায় কালো সুতোয় বাঁধা এক টুকরো সিসে, হাতে একগাছা তেলচুকচুকে খেঁটো লাঠি।

দু' তিনবার অনুপের ডাক্তারখানায় বাঘা দেখাতে নিয়ে এলো মাকে। ওষুধ নিয়ে গেল। মার দু'হাতে যে কুষ্ঠ হয়েছে, মোতির বুঝতে অসুবিধে হলো না। অনুপও তাই বলল। পরিচয় একটু পাকতে বাঘাকে মোতি একদিন বলল, তোমার মাকে দেখতে যাবো।

ওষুধ নেওয়ার জন্যে ডাক্তারের কাছে সেদিন একা এসেছিল বাঘা। তার বাড়িতে মোতি যাবে শুনে অবাক বাঘা প্রশ্ন করেছিল, তু আমার ঘরকে যাবি কেনে?

মাকে দেখতে।

বাঘা বিশ্বাস করেনি মোতির কথা। ডাক্তারের সহকারী মোতিও বাঘার চোখে ডাক্তার, ভদ্রলোক, দিকু। মাঝিপাড়ায় যেতে চাওয়ার পেছনে নিশ্চয় মোতির কোনো মতলব আছে, বাঘা ভেবেছিল। মতলব বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি। দিনসাত পরে আবার মায়ের ওষুধ নিতে আসার সময় মোতির জন্যে একভাঁড় মহুয়া আনলো বাঘা। মোতির সামনে মহুয়ার ভাঁড় ধরে বলল, তোকে আর কষ্ট করে আমার ঘরকে যেতে হবেক লাই, মহুয়া লিয়ে এসেছি।

ভাঁড় দেখিয়ে আবছা হেসে চোখ মারলো বাঘা।

বাঘার মুখের ওপর এক মুহূর্ত স্থির নজর রেখে অল্প হেসে মোতি বলল, আমি খাই না।

মোতির কথা শুনে অবাক হয়েছিল বাঘা। মুখের সামনে থেকে মহুয়ার ভাঁড় ঠেলে দিতে আগে কাউকে দেখেনি সে। বিস্মিত বাঘা প্রশ্ন করেছিল, তোর মতলব কি?

তোমার গাঁয়ে গিয়ে বলব, জবাব দিয়েছিল মোতি।

আচ্ছা, দেখি। কথা শেষ না করে ওষুধ নিয়ে বাঘা চলে গেল।

তারপর প্রায় একমাস বেপাত্তা থাকার পরে এক সকালে বাঘা এসে হঠাৎ মোতিকে বলল, তু চল আমার সাথে।

তৈরী ছিল মোতি। বাঘার সঙ্গে সে ঢুকল তিলাবুনিতে। রাস্তায় নানা কথার মধ্যে বাঘা বলল, তোকে গাঁয়ে আনার জন্যে মাঝিহারাম, আর সকলের মত করাইচি। তারা বলল, নিয়ে আয়।

সেই প্রথম তিলাবুনিতে এলো মোতি। পরে আরও কয়েকবার তিলাবুনিতে এসেছে সে। কম্পাউণ্ডার সেজে আসার অসুবিধেও টের পেল। কম্পাউণ্ডার মানী লোক, ডাক্তারের সমান, তার সঙ্গে রোগভোগ নিয়ে কথা বলা যায়। তার বেশী নয়। ফলে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় দূরত্ব একটু থেকেই গেল। অনেক চেষ্টাতেও সে দূরত্ব কমাতে পারলো না মোতি।

এ কাহিনী মোতির মুখে পরে শুনেছিল কিশোর। বাঘার সঙ্গে যোগাযোগের ইতিহাস, খুটিনাটি খবর জানালেও বাঘার মা'র কুষ্ঠরোগের কথা কিশোরকে বলেনি মোতি। নিজেই আবিষ্কার করেছিল কিশোর। তিলাবুনিতে বাঘার ঘরে কিশোর আশ্রয় নিয়েছে তখন। গরমকাল। এক দুপুরে বাড়ির দাওয়ায় বসে দিগন্ত ছোঁয়া, উঁচু নিচু, ঢেউখেলানো পাথুরে জমিতে ঝোড়ো হাওয়ায় নেচে বেড়ানো লাল মাটির ঘূর্ণি'র দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছিল কিশোর। দ্বিমুখী কাজ। গাঁয়ের নিরক্ষর সরল মানুষগুলোকে সচেতন করার সঙ্গে তাকেও গ্রামীণ জীবনের গভীরে পৌঁছাতে হবে। একাত্ম হতে হবে। পারস্পরিক দেওয়া নেওয়ায় গাঁয়ের মানুষ এবং সে বদলে যাবে।

ফাঁকা বাড়ির উঠোনে ধান খুঁটছিল একটা ঘুঘু। রোজ ভোরে কাটারি হাতে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতো বাঘার বুড়ীমা। কখনো মাঝদুপুরে, কখনো শেষ বিকেলে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরতো। রানীশ্বর, রাজনগরে মজুরের কাজে প্রায় রোজ সাত সকালে বেরিয়ে যেতো বাঘা। বাড়ির দাওয়ায়, উঠোনে একা ঘুরে বেড়াতো কিশোর। কোন গ্রামে কবে সভা, বৈঠক, প্রতি পদক্ষেপ কীভাবে ফেলবে, ছক বানাতো। মুখোমুখী দু লাইনে ছোট ছোট মাটির বাড়ি। ছিমছাম, পরিষ্কার। বাইরের দেওয়ালে লালমাটি, সাদা খড়িমাটির নিপুণ নক্সা দেখে জলছবি মনে হয়। দু' সারি বাড়ির মাঝখানে সরু কুলিতে, ধুলো শুঁকে ঘুরছে দু' একটা কুকুর।

দিন শেষে কাজের পর জোয়ান মরদেরা ঘরে ফিরলে আলোচনা, বৈঠক করার সুযোগ পেত কিশোর। বাঘার উদ্যোগেই তিলাবুনিতে কয়েকটা বৈঠক করল কিশোর। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ বিপ্লব ছিল সে সব সভার বিষয়। ঘেঁসাঘেসি শ্রোতাদের নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ, পাথরে ঢালাই মুখে কোনো দাগ পড়তো না। সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল ভাষা। কিশোরের কথার সাঁওতালি তর্জমা শ্রোতাদের শোনাতো বাঘা। সেই তর্জমার মূলানুগত্য সম্পর্কে সংশয় বোধ করতো কিশোর। গভীর

রাতে সভার শেষে ক্লান্ত শরীর, ভোঁভো মাথায় বাঘার সঙ্গে ঘরে ফিরে নিজের জন্যে একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিত কিশোর। গরম ভাতের সঙ্গে নুন, কখনো একটা শুকনো লঙ্কা, আধখানা পেঁয়াজ জুটতো। কখনো জুটতো না কিছুই। শুধু ভাত।

পাপের ভয়ে কিশোরের জন্য প্রথমে রাঁধতে রাজী ছিল না বাঘার মা। ভদ্রলোক, দিখু, উঁচুদরের মানুষরা সাঁওতালদের ছায়া মাড়ালে চান করে। তাদের বাড়ির দরজায় সাঁওতালরা দাঁড়ালে গোবর ছড়া দেয়। এটাই নিয়ম, ভগবানের নির্দেশ। জীবনের দীর্ঘ সময় এসব দেখে শুনে, বাঘার মা এগুলোকেই সত্য ধরে নিয়েছিল। এক হাঁড়িতে বাঘার সঙ্গে খাওয়াব জন্যে কিশোরের চাপাচাপিতে তাই কান দেয় নি মা। বাঘার মায়ের সঙ্গে তখনও নিবিড় হয়নি কিশোরের পরিচয়। তাই দু' একবার বলে চুপ করে গিয়েছিল কিশোর। বুঝতে পেরেছিল একাত্ম হওয়ার কাজে কোথাও ঠেকে যাচ্ছে সে। সমস্যা ধরতে পারছে না। ফলে জনগণকে জাগানো, জনসমাবেশ, জনযুদ্ধের প্রথম ধাপে আটকে যাচ্ছে সে। অন্ধকার উঠোনে কাঠের চুলোয় ভাত বানাতো মা। আগুনের লাল আভা উঠোনে, মায়ের রোগা শরীরে লেগে থাকতো। কিশোরের সামনে নির্বাক বসে থাকতো বাঘা। সে কী ভাবছে, ধরতে পারতো না কিশোর।

বাহেঙ্গায় অজিত জমিয়ে বসেছে, খবর পেয়েছিল কিশোর। গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে, হোমিওপ্যাথির বাক্স বাজিয়ে লোকসঙ্গীত গেয়ে বাহেঙ্গার তরুণদের মাতিয়ে তুলেছিল অজিত। দু' চারজন গোদের রুগীকে সুস্থ করেছিল সে। লাঙল কাঁধে চাষাবাদেও নেমে পড়েছিল। অজিতের সফলতায় ঈর্ষা বোধ করেছিল কিশোর। অজিত যা পেরেছে, সে পারবে না কেন? দশাসই কালো অজিতের চেহারায় আদিবাসী ছাপ আছে। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অজিতের এটা বাড়তি সুবিধে। কিন্তু অজিতের অসুবিধেও জানে কিশোর। গরীব আদিবাসীদের নিজের চেতনায় তুলে আনার বদলে হয়তো তাদের স্তরে নেমে যাবে অজিত। দ্বিমুখী প্রক্রিয়ার একাংশ হবে, বাকীটা হবে না।

সাঁওতালী ভাষা শিখতে তখন উঠে পড়ে লেগেছিল কিশোর। ভাষার আড়াল না ভাঙলে এগোনো মুশকিল। নিজের ফর্সা, ফ্যাকাসে, টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত চেহারা নিয়েও দুর্ভাবনা ছিল তার। সর্বস্ব ত্যাগ করেও এই চেহারায় শ্রমিক, কৃষক হওয়া যায় না। শ্রমিক বা কৃষক বলে কেউ বিশ্বাস করবে না তাকে। এই রোগা, ফর্সা চেহারা এক অভিশাপ। মানুষের চেহারায় শ্রেণী, সংস্কৃতির পরিচয় থাকে। শ্রমিক পরিবারে মধ্যবিত্ত চেহারা হলো কাকের ঘরে কোকিল। সন্দেহজনক। বাঘার কাছে সাঁওতালী ভাষার তালিম নেবার সময়ে আরো একটা কথা মনে হয়েছিল তার। স্কুল, কলেজে ইংরিজি শিখে অনেক বছর অপচয় করেছে সে। ইংরিজির বদলে সাঁওতালী, ভোজপুরী বা গুরুমুখী শিখলে উপকার হতো। তা হয়নি। তবে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র সে নয়। জেদের বশেই ধীরে ধীরে সাঁওতালী ভাষা রপ্ত করে নিল। দুমকাজেলে বন্দীজীবনে ভাষা শেখায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিল সে। অজিতের বিরুদ্ধে হিংসা কেটে যাচ্ছিল ক্রমশ। বিনা পরিচয়ে, যোগাযোগহীন, উটকো অজিত বাহেঙ্গায় গিয়েছিল। মাঝিপাড়ার মানুষ ভয় পেয়ে

পাত্তা দেয়নি তাকে। তবু অজিত নাছোড়, দমেনি। উপোস করে দিনের পর দিন গাছতলায় পড়ে থেকে গাঁয়ের অল্পবয়সী ছেলেদের হাত করেছিল সে। এক, আধদিন নুন ভাত জুটতো। বাহেন্সায় টিবি, গোদ, কুষ্ঠ রোগের ছড়াছড়ি। বাক্স খুলে দু' একজনকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিত অজিত। প্রথমে কেউ খায় নি। তারপর দু একজন খেল। খেতেই ভোজবাজী। সকলের রোগ না সারলেও আরাম, উপশম পেল অনেকে। অজিতের কাছে লেগে গেল রুগীর ভীড়। বাহেন্সায় প্রায় জানগুরু হয়ে গেল অজিত।

দুমকা জেলের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে উত্তেজিত অজিত মাঝে মাঝে বলতো, রেগে গিয়েছিলুম আমি। সাধু, মুনি, ঋষিরা তপস্যা করে যদি স্বর্গে হানা দিতে পারে, আমি পারবো না কেন? তখন আমার হাঁড়ির হাল। আশ্রয় না পেলে হয়তো মরে যেতুম। কিন্তু তা হবার নয়। পাথর গললো। পেয়ে গেলুম বুধনকে। তার বাড়িতে মিললো আশ্রয়। এখন ওদের চেয়ে আমি বড়ো সাঁওতাল, বেহুদ্দ মাঝি!

ষোল

দাওয়ার খুঁটিতে পিঠ দিয়ে পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল কিশোর। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে ঘুম ছুটে যেতে সজাগ হলো সে। সারাদিনে বিশ-পঁচিশ মাইল হেঁটেছে আজ। কয়েকমুঠো চালভাজা, মুড়ি খেয়ে মিটিং-এর খবর সকলকে দেবার জন্যে ভোরে বেরিয়েছিল। একটা গ্রাম থেকে পাশের গ্রামের দূরত্ব তিন-চার মাইলের কম নয়। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে গেলে আঁচলাভরে সিধ নদীর জল খেয়েছে। সিধ নদীর জল দারুণ হজমী। জল খেয়ে খিদেতে মোচড়াচ্ছিল তার পেট। দুপুরের পর রোজ কিছুক্ষণ এরকম হয়। তারপর অসাড় পেট, খিদে মরে যায়। জোর খাওয়া-দাওয়া আছে আজ রাতে। গাঁয়ের দশজন, আর তিনটে কুকুর শিকারে গিয়েছিল। পাঁচটা খরগোশ, দুটো বনমোরগ, আর মেঠো ইঁদুর মেরেছে কয়েকটা। মাংস কাটার পর তিনটে কুকুরকে ধরে সমান তেরোটা ভাগ হয়েছে। রবিও গিয়েছিল শিকারে। সে একটা ভাগ পেয়েছে। তার বাড়িতেই সভা, মেহমান আসবে। তাই রবির মিলেছে বড়ো ভাগ। বুধন, মোতি, বাঘা হৈ হৈ করে যখন রবির বাড়িতে ঢুকলো, দিন প্রায় শেষ। তিনজনের পেছনে রবির সঙ্গে আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ব্রজদা। ব্রজদার দিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর। ঘন গোঁফ দাড়ি ঢাকা ব্রজদার মুখে রেখা জাগলো না। দূরে তরণীপাহাড়ের ওপর ছেঁড়া ছেঁড়া আলো ঝুলে আছে। লাল মাটিতে সূর্যাস্তের আলোর আয়ু দীর্ঘ হয়। তাই সন্ধ্যের অনেক পরে অন্ধকার নামে এখানে। অজিত কোথায়? কিশোর প্রশ্ন করতে বুধন বলল, কুলিতে নাচছে।

বুধনের জবাব শুনে আরও গম্ভীর হলো ব্রজদা। অজিতের ওপর রাগ হলো কিশোরের। নেতাদের সামনে কেন অজিত এমন করে, ভেবে পায় না কিশোর। গাছপালা, লাল মাটি থেকে দিনের আলো মুছে অন্ধকার নামছে। কনকনে শীত। উঠোনে প্রায় শুয়ে পড়ে একটা বাঁশের নল দিয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে পুঁইশা। ভিজে কাঠ থেকে গলগলে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ধোঁয়া লেগে জলে ভেসে যাচ্ছে পুঁইশার চোখ, মুখ। হঠাৎ দপ করে আগুন জ্বলে উঠতে হাসি মুখে উঠে বসলো পুঁইশা। শীত থেকে বাঁচতে উনুনের কাছে গিয়ে গোল হয়ে বসলো সবাই। মাঝখানে পুঁইশার জায়গা। তিজেল হাঁড়িতে জল ভরে উনুনের ওপর চাপিয়ে দিল পুঁইশা। পরিষ্কার, ঝকঝকে মাটির উঠোন। এক কণা কুটো, ময়লা নেই। মনে হয় সিমেন্টের তৈরী। পোষা মুরগী, ছাগলরাও উঠোন নোংরা করে না।

চিমনজান খুন হবার পর পুলিশ কয়েকবার হানা দিয়েছে বাহেঙ্গায়। তোলপাড় করে খুঁজেছে লখাইকে। বুড়োবুড়ি, বাচ্চাদের গাঁয়ে রেখে, পুরুষরা গা ঢাকা দিয়েছে

জঙ্গলে। এখানে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার এই রীতি। ঝুমুরির বাবা কুঞ্জ মাঝিকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তার কি হলো গাঁয়ের কেউ জানে না। থানায় গিয়ে কুঞ্জ মাঝির খোঁজ করার সাহস কারো নেই। বুধনের বাবা গাঁয়ের মাঝিহারাম, মোড়ল। কুঞ্জকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার সময় কুলিতে চুপ করে একা দাঁড়িয়েছিল সে। দলবল নিয়ে চলে গেল দারোগা। সঙ্গে মহাজন ভরতরাম। উঁচু গলায় ভগতরাম তড়পেছিল বুধনের বাবাকে। শুধু বাহেঙ্গায় নয়, পাশাপাশি গ্রাম, মাদারপুর, কালকাপুর, টোংরাতেও জোর তল্লাসী চালালো দারোগা। এ গ্রামগুলো রানীশ্বর থানার মধ্যে। মাঝখানে সিদ্ধেশ্বরী, লোকমুখে সি নদী। তরল রুপোর মতো টলটলে নদীর জল।

চিমনজান খুন হতে রানীশ্বর থানার দারোগা ধরে নিয়েছিল, এটা উগ্রপন্থীদের কাজ! মাথা গরম লখাই যে উত্তেজনার ঝোঁকে জানগুরুকে কোতল করেছে, পাঁচ-জনের মুখে রিপোর্ট শুনেও মেনে নিতে পারলো না দারোগা। দুমকা জেল থেকে দুই বন্দীর ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে খুনের ঘটনা জড়িয়ে উগ্রপন্থা দমনে তৎপর হয়ে উঠলো। প্রতি গাঁয়ের চৌকিদার, দফাদারদের ডেকে কিশোর, অজিতের ছবি দেখিয়ে বড়োবাবু বলল, ভয়ংকর লোক এরা। জেল থেকে খালাস পেয়েই মানুষ কাটা শুরু করেছে।

বাহেঙ্গা এবং প্রতিবেশী গাঁগুলোতে পুলিশী হামলার খবর তাঁতলুই পেঁছে শুনেছিল কিশোর। হামলায় ভয় পায়নি গাঁয়ের লোক। বরং চিমনজানের শাস্তিতে বেশীর ভাগ মানুষ খুশি হয়েছিল। বাহেঙ্গা থেকে তাঁতলুই এসে বুধন একদিন কিশোরকে বলেছিল, শালা জানের উপর গুটা গাঁ চটেছিল।

জানগুরুকে কোতল করে ঘাবড়ে গিয়েছিল লখাই। অজিত বাহেঙ্গায় ফিরতে সাহস পেল লখাই। ছায়ার মতো দিনরাত সে লেগে আছে অজিতের সঙ্গে। অজিত বলেছে, ঝুমুরীর সঙ্গে আগামী হপ্তায় লখাই-এর সাঙ্গা দেবে সে।

অন্ধকার কুলি থেকে মাদলের ধ্বনির সঙ্গে ভেসে আসছে সমবেত গলার গান।

সিদাই দয়েম সেনকেদা সোনাকসই সাংকা কমই ময়রি হো …।
তকোর ময়রি চিত্রম এমাদিঞ হোময়রি - হোময়রি…হোময়রি…
আমাকে সোনা, শাঁখা দেবে বলে, তুমি দিলে কোথায় হে?

গানের জোরালো শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারে। ব্রজদা বলল, সভা শুরু হোক।

উনুনের আগুনের তাপ লাগছে সকলের গায়ে। হাঁড়িতে মাংস ফুটছে। মশলা বলতে গোলমরিচ, হলুদ আর নুন, বুলেঞ, রাবিন, শশাং ছাড়া মাংসে কিছু পড়েনি। তবু হাঁড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়া উষ্ণ সুবাসে ভরে যাচ্ছে কিশোরের বুক। বাঁদিকের ঘরে চাল কোটার শব্দ। এক কাড়া চাল রান্নার আগে দ্বিতীয়বার কুটে নিলে ভাত নাকি মিষ্টি হয়। তাই এই অসময়ে ঢেঁকিঘরে ঢুকেছে পুইশা।

অজিতকে নিয়ে রবি ঢুকতে কিশোর দেখলো, এই শীতেও অজিতের কপালে ঘাম। অজিত যে এতোক্ষণ নাচছিল, বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। গায়ের চাদরে কপাল, মুখ মুছে একটা বিড়ি ধরালো অজিত। আলোচনা শুরু করে ব্রজদা

বলল, এ মুহূর্তে প্রধান কাজ বিন্দু ভাঙা, একটা এ্যাকশন চাই। একটা ফুলকি দাবানল তৈরী করবে।

গরীব কৃষকদের স্কোয়াড গড়ে গাঁয়ের অত্যাচারী, ঘৃণিত জোতদারকে কীভাবে খতম করতে হবে, ব্যাখ্যা দিচ্ছে ব্রজদা। খতম মানে শ্রেণীঘৃণা। একটা খতম হলেই এলাকার গরীব মানুষ সাহস, আত্মবিশ্বাস পাবে। অত্যাচারী জোতদার, মহাজন গ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালাবে। ফলে গ্রামাঞ্চলে জোতদার, মহাজন শ্রেণীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক প্রতিপত্তি যেমন কমতে থাকবে, তেমনই তৈরী হবে গরীব মানুষের নিজস্ব মুক্ত অঞ্চল, লাল এলাকা। অজিত মন দিয়ে শুনছে ব্রজদার কথা। এই লড়াই, মুক্তাঞ্চলের কল্পনা মাথায় নিয়ে সে ঘুরছে অনেকদিন। কিন্তু কীভাবে মুক্তাঞ্চলের শুরু, বিস্তার ঘটবে, এতোদিন বুঝে উঠতে পারেনি সে। তার চোখের সামনে একটা লাল এলাকা আজ স্বচ্ছ, স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চিমনজান খতমের পর বাহেঙ্গার যে উত্তেজনা, ফুর্তি অজিত দেখেছে, ব্রজদার ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। লখাই শুরু করে দিয়েছে খতমের লড়াই। সাতগাঁয়ের মানুষ বাহবা দিচ্ছে লখাইকে। এরকম আরো কিছু খতমের জন্যে তারা তৈরী। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ব্রজদার আলোচনায় সায় দিয়ে অজিত বলল, ঠিক, ঠিক।

অজিতের মুখে হাঁড়িয়ার গন্ধ। কিশোর চাইছে, ব্রজদার নাকে এ গন্ধ যেন না যায়।

কিশোরের গায়ে গা লাগিয়ে বসেছে অজিত। পকেট থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বার করে অজিত বলল, বুধন, গরম জল লাগা, চা হোক। দ্যাখ, একটু গুড় যদি পাওয়া যায়!

চায়ের কথায় খুশি হয়ে ব্রজদা বলল, তোফা, এককাপ চা খুব দরকার।

অজিত বলল, মাসখানেক আগে মশানজোড় থেকে গুঁড়ো চায়ের এই প্যাকেট এনেছিল বুধন। প্যাকেট শেষ হয়নি। ভালোই হয়েছে। সভার কাজে লাগলো।

বুধন হাসছে। দুপাটি সাদা দাঁত ঝকঝক করছে উনুনের আলোয়। সমবেত গলার গমগমে গানে, নাচের তালে দুলছে অন্ধকার। এক ছায়ামূর্তি বাইরে থেকে দাওয়ায় এসে অজিতের চাদর টেনে ফিসফিস করে বলল, তু চল্, ধামসা বাজাবি।

অজিত কিছু বলার আগে কমবয়সী সেই ছেলেটা রবির ধমকে পালিয়ে গেল।

একটা পুরোনো হাঁড়িতে জল গরম করল পুঁইশা। গুড় পাওয়া গেল না। পেতলের কাঁসিতে নুন চা বানালো মোতি। অন্ধকার ঢেঁকিঘরে বসে হাঁড়িয়া খাচ্ছে রবির বুড়ো ঠাকুর্দা। বাটি বাজিয়ে সে গান শুরু করল, পান দিলি, বিড়ি দিলি, সুপুরি দিলি না। কলকাতায় যাবো, ও মন, হাওয়া গাড়ি মেলে না।

বাংলা গান, এই একটাই বুড়ো জানে। বাঙালী বেটারা বাড়িতে এসেছে টের পেলে বুড়ো এ গান গায়। গান শেষ করে বুড়ো অজিতকে বলল, বিড়ি দে।

ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বুড়োকে দিল অজিত। নিজের জ্বলন্ত বিড়ি সে এগিয়ে দিল বাঘাকে। দু'টান মেরে সেই বিড়ি বাঘা চালান করল মোতিকে। কলকাতার খবর, সূর্যদার

সঙ্গে আলোচনার রিপোর্ট দিয়ে কিশোর বলল, শ্রীকাকুলাম, গোপীবল্লভপুরে লড়াই চলেছে। দিল্লী কাঁপছে। ইউরোপ, আমেরিকায় পৌঁছে গেছে নকশালবাড়ির খবর। ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা আমাদের পার্টির সঙ্গে আলোচনার জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। তাদের একজন বললেন, লণ্ডন টাইমস-এ নকশালবাড়ি সম্পর্কে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। নকশালবাড়ির সমর্থনে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সভা, শোভাযাত্রা করছে ইউরোপের নানা দেশের শ্রমিক।

বুধন, বাঘা অবাক হয়ে শুনছে কিশোরের রিপোর্ট। এতো দেশ, এতো ঘটনা, খুব স্পষ্ট নয় তাদের কাছে। সব বুঝতে পারছে না তারা। তাদের দুচোখের তারায় লাগছে তীব্র, তীক্ষ্ম আলোর ঝলক।

সহজ, সরল ভাষায় সুর্যদার আলোচনা, নির্দেশ সভায় রাখলো কিশোর। আগে এ নিয়ে আলোচনা করলেও আজ বক্তব্য রাখার সময় মনের গভীরে অন্যরকম প্রেরণা পেল কিশোর। কিশোর বলল, পৃথিবীতে যেমন তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, স্থলভূমির তেমনি তিনভাগ গ্রাম একভাগ শহর। আফ্রিকা, এশিয়া, লাটিন আমেরিকা নিয়ে পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল, আর ইউরোপ, আমেরিকা হলো শহর এলাকা। পৃথিবীর এই এক ভাগ, ইউরোপ, আমেরিকা, বহু বছর ধরে তিন ভাগ পৃথিবী শোষণ করছে। এভাবে ধনী হচ্ছে। আফ্রিকা, এশিয়া, লাটিন আমেরিকা ভিখিরী, ফতুর হয়ে যাচ্ছে। তবে সময় বদলাচ্ছে। পৃথিবী জুড়ে বইছে সমাজতন্ত্রের হাওয়া। পৃথিবীর এক ভাগ, বাকী তিন ভাগের ওপর আর বেশীদিন ছড়ি ঘোরাতে পারবে না। ইউরোপ, আমেরিকাকে ঘিরে ধরবে বঞ্চিত তিন মহাদেশ। শুরু হয়ে গেছে সে ঘেরাও। পৃথিবীর তিন ভাগ গ্রাম ঘিরে ধরছে একভাগ শহরকে। এ হলো বিশ্ব বিপ্লবের যুগ। পৃথিবীর সমস্ত নির্যাতিত মানুষ এবার মুক্তি পাবে। ভারতীয় বিপ্লব সফল করা আমাদের কাজ। ভারতবর্ষ মূলত গ্রাম। কয়েক টুকরো শহর শুষে খাচ্ছে সারা ভারতবর্ষ। এ চলতে পারে না। এখানেও মূল কাজ গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও। ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষকের মুক্তির সঙ্গে পৃথিবীর সব দেশের, এমন কি ইউরোপের মেহনতী মানুষের মুক্তি জড়িয়ে আছে।

সহজ ভাষায় এসব কথা আগেও বলেছে কিশোর। এ তত্ত্ব বাঘা, রবিকে আলাদা শুনিয়েছে সে। প্রথমে বুঝতে অসুবিধে হলেও তার ব্যাখ্যা ক্রমশ ঢুকে গেছে বাঘা, রবির মনে। কিন্তু গ্রুপ মিটিং-এ চেতনার নানা ধাপের মানুষ থাকে। রাজনীতি বোঝানো সেখানে শক্ত কাজ। এই তরণী পাহাড়, তাঁতলুই, বাহেঙ্গা, তিলাবুনির বাইরে যে পৃথিবী তার পরিচয় দিতে নাজেহাল হয়েছে সে। দুমকা, ভাগলপুর, কলকাতার নাম শুনলেও ভারতবর্ষ কেমন দেশ, কোথায়, আগে কেউ শোনেনি।

কিশোরের বক্তৃতার পর পার্টির সামরিক কর্মসূচী ব্যাখ্যা করছিল ব্রজদা। শক্ত ব্যাখ্যা। ব্রজদা বলছে, একটা খতম হলে গড়ে উঠবে গেরিলা স্কোয়াড্। স্কোয়াড্ শুরু করবে এ্যামবুশ, অতর্কিত, চোরাগোপ্তা আক্রমণ। সেই সঙ্গে চলবে বন্দুক দখল। শত্রুদের অস্ত্র কেড়ে গড়ে উঠবে জনগণের বাহিনী, শুরু হবে জনযুদ্ধ। এই যুদ্ধ দুধরনের—পোজিশনাল ওয়ার আর মোবাইল ওয়ার। শত্রুর মুখোমুখী

মুক্তি বাহিনীর যে মোক্ষম লড়াই, তার নাম পোজিশনাল ওয়ার। হঠাৎ, অতর্কিতে এলোমেলো যুদ্ধে শত্রুকে জড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা হলো, মোবাইল ওয়ার। জনযুদ্ধে এই দু'ধরনের যুদ্ধ-কৌশলই নিতে হয়। পুকুরে মাছ ধরার জন্যে খ্যাপলা জাল ফেলার মতো এই যুদ্ধ-কৌশল। জলের নিচে ছড়িয়ে পড়া জাল দিয়ে ধরবে মাছের দঙ্গল। তারপর ধীরে ধীরে জাল গুটিয়ে তোলা হবে বন্দী মাছ। জাল ফেলা, জাল গুটোনো, দুটো মিলেই যুদ্ধ।

মাংস রান্নার পর ভাত ফুটছে উনুনে। চ্যালা কাঠের আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠছে হাঁড়ির চারপাশে। উনুনের আলো, তাপে সকলের রক্তে ছড়াচ্ছে আবেগ, উত্তেজনা।

শেষদিকে সভা জমে উঠতে ব্রজদা প্রশ্ন করল, প্রথম শ্রেণীশত্রু কে কাটবে?

বুধন বলল, আমি।

বাঘা বলল, আমি।

মোতি বলল, আমি।

তিনজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রবি।

পুঁইশা এসে বলল, ভাত, মাংস তৈরী, তুরা খেয়ে নে।

কাঁচা শাল পাতা চুলোর সামনে পেতে খেতে বসলো সকলে। চুলোর কাঠ নিভে ধিকধিক জ্বলছে আগুন। কেরোসিনের অভাবে নিভন্ত উনুনের অল্প আলোয় খাওয়া শেষ করতে হবে। শাল পাতায় গরম ভাত থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পেতলের কাঁসিতে মশলাহীন ফ্যাকাসে ঝোলে জেগে আছে আধসেদ্ধ মাংসের টুকরো। মাংসের ঝোল মেখে মুখে এক গ্রাস ভাত তুলে কিশোরের মনে হলো, এমন সুস্বাদু খাবাব জীবনে খায়নি সে। প্রচুর ভাত খেলো সকলে। গরম ভাত, মাংসের ঝোলের সঙ্গে কাঁচা শাল পাতার গন্ধ মাখামাখি হয়ে কিশোরের বুকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। জম্পেশ শীত। কিশোরের মনে পড়লো, গতবছর এসময় তিলাবুনিতে বাঘার বাড়িতে ছিল সে। বাঘার ঘরে তখনও সে নিজে রেঁধে খেত। বোঙ্গার অভিশাপের ভয়ে বাঘার মা রাঁধতে রাজী হচ্ছিল না কিশোরের খাবার। অনেক বুঝিয়েও অনিচ্ছুক মাকে বাগে আনতে না পেরে বাঁকা পথ ধরেছিল কিশোর। মাঝে মাঝে রাতে উপোস দিত সে। দিনে খাওয়া নেই, রাতে উপোস, কষ্টে জল এসে যেত চোখে। নজর রাখতো বাঘার মা। একে অতিথি, তার ওপর কচি ছেলে, রাতের পর রাত সে না খেয়ে থাকবে, হয় না। ভয়, দুশ্চিন্তা ঝেড়ে কিশোরের জন্যে শেষ পর্যন্ত রাঁধতে রাজী হয়েছিল মা। বাঘাও অনেক বুঝিয়েছিল মাকে। বলেছিল, তুর কোনো পাপ হবেক নাই।

বাঘাকে নিয়ে তিন চারটে গ্রাম ঘুরে এক রাতে বাড়ি ফিরে কিশোর দেখলো, নিভে আসা চুলোর সামনে দুটো শালপাতা বিছিয়ে ভাঁতের হাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে মা।

তর সইছিল না বাঘার। উঠোনে পা দিয়ে মাকে বলল, ভাত দে।

বাঘার পাশে মাটির ওপর বসেছিল কিশোর। তার দিকে তাকিয়ে মা হাসলো।

গরম ভাতের হাঁড়ি দু'হাতে বেশ জোরে কয়েকবার নেড়ে হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দু'জনকে ভাত তুলে দিল মা। পাতে তেঁতুলের কাই, নুন। উনুনের আবছা আলোয় কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে কষ্টে ডান হাতের পাতায় ফুঁ দিচ্ছিল মা। প্রথমে কিশোর দেখেনি। আড়চোখে একপলক নজর করে দেখলো গরম ভাতের তাপে মায়ের হাতের তিনটে আঙুলের দগদগে ঘা লাল হয়ে উঠেছে। নিমেষে কিশোর বুঝলো, এ কুষ্ঠ, কুষ্ঠরোগে মা ভুগছে। আড়ষ্ট, হিম হয়ে গিয়েছিল কিশোরের শরীর। মা, বাঘা কেউ জানলো না কিশোরের অস্বস্তি। তেঁতুলের কাই, নুন মেখে গপাগপ খাচ্ছিল বাঘা। মোটা লাল ভাত ধোঁয়া ছাড়ছে। দু' এক গ্রাস মুখে তুলে ঘামছিল কিশোর। মাটির খুরি থেকে দু' আঙুলে তেঁতুলের কাই তুলে কিশোরের পাতে দিল মা। পেটে ঢুকছে না জেনেও জোর করে খাচ্ছিল কিশোর। এককণা ভাত, এক ছিটে তেঁতুল ফেলে রাখলো না সে। খেয়ে গেল। এ-এক ভীষণ পরীক্ষা। পাশ করতে হবে।

প্রবল বমির চাপে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেতে চ্যাটাই থেকে নিঃশব্দে উঠে মতির দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো। বমির ধাক্কায় গোটা শরীর কাঁপছে। দৌড়ে চলে গেল অন্ধকার বাঁশবনে। দাঁত মুখ টিপে, সামান্য আওয়াজ না তুলে বমি করল। কেউ যেন শুনতে না পায়। নাক মুখ দিয়ে হুড়হুড় করে বেরিয়ে গেল রাতের খাবার। ঘুমে বেহুঁশ তিলাবুনি। গ্রামের দু' একটা কুকুর ছাড়া আর কেউ জানলো না এই গোপন সমাচার। নিরুপদ্রবে বমির পর স্বস্তি পেয়েছিল কিশোর। খবর পাঁচকান হলে এ বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না সে। কিন্তু ব্যস্, এই একবারই বমি করেছিল সে। তারপর যে ক'দিন তিলাবুনিতে ছিল, রোজ রাতে মায়ের নিজের হাতে তুলে দেওয়া ভাত, আচার, নুন মেখে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছে সে। কোনো অস্বস্তি, অসুবিধে হয়নি। শেষদিকে বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিল সে। তিলাবুনি ছেড়ে তাঁতলুইতে রবি হাঁসদার বাড়িতে কিশোর চলে আসার সময় মা কেঁদে অস্থির। বলেছিল, এই বেটা, তু কুথা যাবি? এখেনে থাক।

অনেক চেষ্টায় মাকে শান্ত করেছিল কিশোর।

খাওয়া শেষ হতে আর এক দফা আলোচনায় বসলো সকলে। উনুন নিভে যেতে খোলা উঠোনে ঠাণ্ডা বাড়ছে। ঢাকা দাওয়ার ওপর ঠাণ্ডা কম, অনেক আরাম। দাওয়ায় উঠে এলো সভা। ভোররাতে মশানজোড় ছুঁয়ে ফরাক্কায় যাবে ব্রজদা। কাল ফরাক্কায় রিজিওনাল কমিটির সভা। উঠোন মুছে, নিকিয়ে এক পাঁজা বাসন ধোয়ার জন্যে খিড়কির দিকে এগিয়ে গেল পুঁইশা। পুঁইশার বয়স বিশ-বাইশ, আঁটোসাঁটো মজবুত শরীর, ঝকঝকে কালো রঙ। সারাদিন মাটি কাটার হাড়াভাঙা খাটুনির পরেও এতোটুকু ক্লান্তি নেই তার। হাতে কাচা পরিষ্কার ডুরে শাড়ি, ভারী খোঁপায় একগোছা লেসফুল সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। পুঁইশার মুখে হাসি।

আলোচনা চলছে। ব্রজদা বলল, এলাকার শ্রেণীপরিচয় নির্ভুলভাবে জানতে হবে। কে বন্ধু, কে শত্রু, খুঁজে বার করা মূল কাজ।

ব্রজদার কথা শেষ হতে রানীশ্বর থানার অত্যাচারী জোতদার, মহাজনদের নাম আলোচনায় এসে গেল। কীভাবে গ্রামের মানুষের শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে হবে কিশোর, অজিত আর মোতির রাজনৈতিক প্রচারে সে শিক্ষা বাঘা, রবি, বুধন পেয়েছে। শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত করায় তাই অসুবিধে হলো না। কিন্তু শত্রুরা বেশীরভাগ গাঁয়ের বাইরে শহরে থাকে। বুধন বলল, বড়ো জোতদার, মহাজন এখেনে নাই। তবে বদমাশ লোক বহুৎ আছে।

কিশোরও জানে এ তথ্য। এ অঞ্চলের বেশীরভাগ জোতদারের একফসলি একশো, দেড়শো বিঘের বেশী জমি নেই। তাদের আর্থিক শোষণ খুব জোরদার না হলেও সামাজিক শোষণ ভয়ঙ্কর। জাতপাত বর্ণের ভিন্নতায় তৈরী হয়েছে এক হৃদয়হীন সামাজিক কাঠামো। শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন, অন্ধ কুসংস্কারের জাঁতাকলে ছিবড়ে হচ্ছে গরীব মানুষ। বাংলা বিহার সীমান্তের এই গ্রামাঞ্চলে আর্থিক শোষণের ভিত জাতপাতের শাসন, নির্যাতন। সে অত্যাচারও কম সাংঘাতিক নয়। পুলিশের সঙ্গে যোগসাজসে গরীব কৃষককে বেগার খাটায় জোতদার। জেল, জরিমানা করে। আর আছে মহাজনী শোষণ। ব্রজদা বলল, একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। কৃষকদের কিছু পাইয়ে দেবার, জমি, ফসল, বাড়তি মজুরীর লোভ দেখানো চলবে না। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, বিপ্লবী যুদ্ধের প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ করতে হবে তাদের। অপমান, লাঞ্ছনার স্মৃতি উসকে দিয়ে গরীব মানুষের ঘুমন্ত ইজ্জতবোধ জাগাতে পারলেই আগুন জ্বলে উঠবে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মনে সম্ভ্রমবোধ ফিরিয়ে আনা হলো এ মুহূর্তের রাজনীতি।

এলাকার গরীব আদিবাসীদের সম্ভ্রমবোধ কোনো কালে কম ছিল না। আত্মরক্ষা, আত্মসম্মানের জন্যে রবি হাঁসদার নেতৃত্বে গতবছর লড়াই হয়েছিল এখানে। সেই সংগ্রামের দিনে রবির সঙ্গে কিশোরের যোগাযোগ। ফসল নিয়ে তাঁতলুইতে জোতদার বনাম গরীব চাষীদের লড়াই পেকে ওঠার খবর কিশোরকে প্রথম শোনালো বাঘা। বাঘা বলল, তাঁতলুই-এর রবি হাঁসদা মরদের বাচ্চা। ভন্না জমির সাথে মহাজনের জমিরও ধান কেটে গ্রাম গোলা বনাইছে। গুণ্ডাদের নিয়ে কৃষি উন্নয়ন সমিতি বনাইছে জোতদারেরা। পুলিশের সঙ্গে মিলে কৃষি উন্নয়ন সমিতির লোকেরা তাঁতলুইতে যে কোনোদিন হানা দেবে। রক্ত ঝরবে। ফিবছরই ঝরে।

তাঁতলুই-এর রবি হাঁসদার সঙ্গে কিশোরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বাঘা। দু' একবার দেখা, সামান্য কথাবার্তা হলেও রবির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়নি কিশোরের। তাঁতলুইতে সংগ্রামের ঝোড়ো বাতাস বইছে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিশোরের।

তারপর এক সন্ধ্যেতে লড়াই-এর নানা খবর কিশোরকে শুনিয়েছিল বাঘা। শুধু মাঝিরা নয়, ঘাটোয়াল, মহুলিরাও রবির পাশে আছে। রবি হাঁসদাকে সমর্থনের প্রশ্নে বাউড়ি, মালপাড়াতেও শলাপরামর্শ চলছে। তাঁতলুই-এর খবরে তিলাবুনির উত্তেজনা নিজের চোখে দেখেছে কিশোর। পুরোনো দিন, বীর পূর্বপুরুষ, সিদু, কানু, চাঁদ, ভৈরবের কাহিনী কখন যেন সত্য হয়ে উঠেছিল। সেই বীর সন্তানদের আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে বোঙ্গা। সন্তানদের একজন রবি হাঁসদা ইংরেজদের যারা ঘায়েল করতে চেয়েছিল,

এবার সফল হবে তারা। হাওয়ায় ধামসা, মাদলের দ্রিমদ্রিম শব্দে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিল কিশোর। সে রাতের ঘটনা আজও মনে করতে পারে সে। চাপা গলার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। কুলিতে খসখস পায়ের শব্দে, কুকুরের ডাকে কাঁপছিল তিলাবুনির অন্ধকার নিশুত রাত।

এতেই হো, কেউ ডাকলো।

কিশোরের ঘুম ছেলেবেলা থেকেই পাতলা। পাতা পড়ার শব্দে জেগে ওঠে। পয়লা ডাকে ধড়ফড় করে উঠে বসে বাঘাকে ধাক্কা দিয়ে তুললো সে। ঘুম চোখে বাইরের শব্দটা বুঝতে চেষ্টা করলো বাঘা।

এতেই হো, অদেখা গলা ফের হাঁকিলো। গলার স্বর চেনা লাগতে বাঘা প্রশ্ন করেছিল, কে কৈ কানা?

ইএ রবি হাঁসদা।

বাঘা আর কিশোর বাড়ির বাইরে কুলিতে এসে দেখলো রবি হাঁসদার সঙ্গে মোতি, অজিত। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন।

অজিত বলল, তোর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় রবি। আমার কাছে গিয়েছিল। মোতি ছিল আমার কাছে। দুজনে বুদ্ধি করে রবিকে নিয়ে এলুম এখানে।

বাড়ির দাওয়ায় বসেছিল পাঁচজন। অজিত বলল, রবির নেতৃত্বে আজ দুপুরে জোতদারের দুগাড়ি ধান দখল করেছে গাঁয়ের মানুষ। গাঁয়ের গরীবদের মধ্যে বিলি করে বাকী দখলি ধান জমা পড়েছে ধর্ম গোলায়। দু'ঘণ্টা পরেই বিশাল পুলিশবাহিনী তাঁতলুই ঘিরে বেমক্কা ধড়পাকড়, মারধোর শুরু করেছে। বহু নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে গেছে, খুঁজছে অনেককে। যারা জঙ্গলে পালিয়েছিল, তারা তীরধনুক নিয়ে তৈরী। গাঁয়ে পুলিশ ঢুকলে তীর চালাবে তারা।

পাকানো লাঠি হাতে রবি। বলেছিল, সাতষট্টিতে বন্ধকী জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা। ক্যানে নিব না? পাঁচ বছরে দু' পয়সার হয় সাড়ে বারোটাকা সুদ। সুদ দিতে না পারায় আমার গরমবার ছাগল লিয়ে গেল গাঁয়ের মুরুব্বি মহাপ্রসাদ সাহা।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রবি প্রশ্ন করল, ধান লুঠে কি কোনো ভুল করেছি আমরা?

নাহ্, কোনো ভুল হয়নি, কিশোর বলল, খুব ভালো কাজ করেছো তোমরা। এই তো চাই।

কৃতজ্ঞতায়, আবেগে কিশোরের দুহাত জড়িয়ে ধরে রবি বলেছিল, আমি টের পেয়েছিলাম, তুই আমাদের দোস্ত, আমাদের পাশে দাঁড়াবি।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না চারপাশের পৃথিবী। আবছা দেখাচ্ছিল রবিকে। কিশোর বুঝতে পারছিল, এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মাঝিপাড়ার লোকেরা তীর হাতে লড়তে, পুলিশ মুরুব্বিদের জবর সাজা দিতে তৈরী, রবি বলেছিল। রবির কথাতে সায় দিয়ে কিশোর বলেছিল, নিশ্চয়ই লড়বে,

সাজা দেবে। চিরকাল একতরফা মার খাবে কেন ?

তু আমাদের গাঁয়ে চল্, কিশোরকে রবি বলেছিল, আমার ঘরকে থাকবি।

এক মাস পরে, জানিয়েছিল কিশোর। রোদ ওঠার আগে রবি, অজিত, চলে গেল। একটু পরে কাজে গেল বাঘা। মোতিকে আলাদা পেয়ে একসময় কিশোর বলেছিল, তীরধনুক চালিয়ে এ লড়াই বেশীদূর এগোবে না।

কেন, জানতে চেয়েছিল মোতি।

সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি ছাড়া অর্থনৈতিক আন্দোলন বাঁচে না।

মোতি বলেছিল, তাঁতলুই গেলে পারতে তুমি।

সেটা ঠিক হতো না, কিশোর জানিয়েছিল, এ আন্দোলনের শিক্ষা ওরা পাবার পরে আমি যাবো।

কয়েক মাসের মধ্যে প্রমাণ হলো কিশোরের কথার সত্যতা। ফসল, ধান দখলের লড়াই তাঁতলুইতে প্রতিরোধ যুদ্ধের চেহারা নিল না। রবি হাঁসদা সমেত গাঁয়ের চুয়ান্নজন সাঁওতাল দুমকা কোর্টে আত্মসমর্পণ করে সাতদিন হাজতবাসের পর জামিন পেয়ে ঘরে ফিরলো। সি. পি. আই-র কর্মী রবি। দলের সঙ্গে তার পুরোনো সম্পর্ক। দুমকার পার্টি নেতার পরামর্শে সারেন্ডার, হাজতবাসের পরে গাঁয়ে ফিরে এক সকালে তিলাবুনি থেকে কিশোরকে নিজের বাড়িতে প্রায় ধরে নিয়ে গেল রবি।

শ্রেণীশত্রু বাছাই করার পদ্ধতি আলোচনায় ব্রজদা বলল, গরীব কৃষকের কানে কানে চলবে এ প্রচার। লোকটা কেমন, এ প্রশ্ন ছুঁড়ে জবাবের প্রতীক্ষা করতে হবে। লোক যদি খারাপ হয়, তখন প্রশ্ন, তাকে খতম করলে কেমন হয় ?

পরপর প্রশ্ন তুললে গাঁয়ের গরীব মানুষ শ্রেণীশত্রু নিয়ে ভাববে, সচেতন, সজাগ হবে। গেরিলা যুদ্ধের এই হলো কৌশল।

অন্ধকারে কিশোরের দিকে একটা ছাপা পুস্তিকা এগিয়ে দিয়ে ব্রজদা বলল, এই বইটা, নাম, গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা, পার্টির গাইড্‌লাইন। সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোতে আঁকড়ে ধরতে হবে এই বই।

মুখ না দেখে, গলার আওয়াজে ব্রজদার ঘুম পেয়েছে, বুঝতে পারছে কিশোর। কয়েকবার হাই তুললো ব্রজদা। সামনে সরহাই পরব। পৌষের শেষ পাঁচ দিন, সাকরাজ, সংক্রান্তির উৎসবে মেতে উঠবে সাঁওতাল পরগণা। উৎসবের জন্যে চাল বাটা শুরু করেছে পুঁইশা। শিল, নোড়া পেতে অন্ধকার উঠোনে চাল কুটতে কুটতে রবির দিকে তাকিয়ে হাসলো পুঁইশা। কুলিতে নাচ গান চলেছে। কমবয়সী সেই ছেলেটা চুপিচুপি এসে ধামসা বাজাবার জন্যে অজিতকে ধরে নিয়ে গেল। অজিত উঠে দাঁড়াতেই ব্রজদার দিকে সসংকোচে তাকিয়ে কিশোর দেখলো, বয়স্ক মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

সতেরো

ঝগড়া, ঝামেলা দিবাকরের সংসারে লেগে আছে। আগেও ছিল। কিন্তু এতো নয়। যমুনার সঙ্গে ঝগড়া, কথা কাটাকাটি হলে চুপচাপ থাকতো মাধু। তবু মেয়ে যে মায়ের পক্ষে বুঝতো দিবাকর। এখন কে কার পক্ষে, বিপক্ষে বুঝতে না পেরে অস্থির হয় দিবাকর। পাড়ার নানা বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে গত কয়েকমাসে দিবাকর হানা দিয়েছে। চাকরি বাঁচাতে না গিয়ে উপায় নেই তার। বাড়ির কেউ একথা বুঝছে না। যমুনা রোজ বলে, এ চাকরি না ছাড়লে গলায় দড়ি দেবো আমি।

যমুনার মুখ আতঙ্কে কালো। যে কোনোদিন দিবাকর খুন হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবে, যমুনা জেনে গেছে। কথা বলতে কান্নায় গলা বুজে যায় তার। থানার বড়োবাবুও আজকাল অবিশ্বাস করছে দিবাকরকে। তাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে দু'চোখ ছোট করে তাকিয়ে থাকে বড়োবাবু। তারপর প্রশ্ন করে, কী খবর?

বড়োবাবুর মুখ, চোখ কথার ভঙ্গী দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায় দিবাকর। কী খবর সে দেবে? খবর বানানো যায় না। বিড় বিড় করে দিবাকর বলে, খবর নাই।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে আরও ঠাণ্ডা মসৃণ হয় বড়োবাবুর কণ্ঠস্বর। বড়োবাবু বলে, খবর চেপে যাচ্ছিস তুই। রঞ্জন, শিবেন, বাবলু, তোর গাঁয়ের ছেলে। তোর গাঁ হলো উগ্রপন্থীদের হেড অফিস। তুই জানিস না, কেমন করে হয়?

সন্ধ্যে হতে দেরী নেই। বুকচাপা ভয়, অনিশ্চয়তায় থানায় ঢুকলো দিবাকর। বড়োবাবুর ঘরে পা দেবার আগেই কাঁপছে সে। তবু ঢুকলো। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের ছায়া লুটিয়ে আছে ঘরের মেঝেতে। ঘাড় গুঁজে একটা ফাইল পড়ার উপর চোখ তুলে দিবাকরকে দেখলো বড়োবাবু। দিবাকরের মুখের ওপর ঘুরছে বড়োবাবুর দু'চোখ। সেলাম ঠুকে অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সে।

বড়োবাবু বলল, খবর পেলাম, খুনে লখাই মাঝি তোর গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গেছে। আর একজন সঙ্গে ছিল তার। তোর পাড়াতেই হয়তো এখনও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে তারা।

টেবিলের তলা দিয়ে দু পা লম্বা করে নাচাতে লাগলো বড়োবাবু। ভয়ে ঘামছে দিবাকর। মনে পড়লো, এক বিকেলে তার ঘরের সামনে দিয়ে মোতিদের বাড়ি গিয়েছিল অল্পবয়সী দুজন সাঁওতাল। তারা কে? একজন কি লখাই?

সব খবর বড়োবাবু জানে। সিরসির শীতভাব ছড়িয়ে পড়লো দিবাকরের শরীরে। রঞ্জন আর তার বন্ধুরা রাতে বাড়ি না থাকলেও সারাদিন তাঁতিপাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে মোতি, এ খবর বড়োবাবু জানে। কিন্তু মোতি কেন আসে,

বড়োবাবু এখনও হদিশ পায়নি।

মোতিকে চিনিস?

বড়োবাবুর প্রশ্নে চমকে উঠলো দিবাকর। একমুহূর্ত চুপ থেকে দিবাকর বলল, হ্যাঁ, হুজুর। অবিনাশ তাঁতির ছেলে। বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরে ছিল। বছরখানেক ফিরেছে। রাজনগরে কম্পাউণ্ডারি করে।

আমার সন্দেহ, সেই ছোঁড়াটা নষ্টের গোড়া, বড়োবাবু বলল।

কী জবাব দেবে, ভেবে পাচ্ছে না দিবাকর। জবাবের অপেক্ষা না করে বড়োবাবু বলল, আলোটা জেবলে দে।

দিবাকর সুইচ্ টিপতে জোরালো আলোয় ভরে গেল ঘর। বড়োবাবু বলল, মোতিকে চাই। গতকাল তার খোঁজে রাজনগরে ডাক্তারের বাড়ি, ডাক্তারখানায় গিয়েছিলুম আমরা। মোতিকে পাইনি। ডাক্তারও পরিষ্কার কিছু বলল না। মনে হচ্ছে, এসবের মধ্যে ডাক্তারও আছে।

পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর। রাতভর দশ গাঁয়ের কুলিতে হেঁকে হেঁকে চোর, ডাকাত তাড়িয়ে বেড়ায় সে। তার জন্যে এলাকায় চুরি, ডাকাতি হয়নি অনেকদিন। বিস্তর চোর, ডাকাতকে সে চেনে। তাদের নাড়ি নক্ষত্রের খবর রাখে। এর বেশী সে জানবে কোথা থেকে? তাঁতিপাড়ায় চেনা ছেলেগুলের নাম শুনে সিঁটিয়ে যায় দিবাকর। মোতি আর ডাক্তারকে বড়োবাবু সন্দেহ করছে শুনে বোবা হয়ে গেল দিবাকর। পাড়ার লোক জানে দিবাকর চৌকিদার, গ্রামসেবক।

তার বেশী নয়। এতোদিন চালু ছিল এ ধারনা। এখন বদলাচ্ছে। রঞ্জন, তার বন্ধুরা দিবাকরকে ইন্‌ফরমার, দালাল বলতে শুরু করেছে।

সে যে কতো অসহায়, কিছু করার নেই তার, বোঝাবে কী করে? বাইরের মানুষকে বোঝানো কঠিন, কিন্তু ঘরের লোক যমুনা কেন বোঝে না স্বামীর অসহায়তা? কেন গলায় দড়ি দেবার ভয় দেখায় সে? আসলে দুনিয়ায় কেউ বিশ্বাস করে না, বুঝতে চায় না তাকে। কিন্তু সে খাঁটি। কাজে কোনো গলদ, ফাঁকি নেই তার। রঞ্জন, শিবেন, বাবলু সম্পর্কে যা বলার, সে বলেছে বড়োবাবুকে। বড়োবাবু খুশি নয়। সকলের হাঁড়ির খবর জানতে চায়।

রঞ্জন, তার দলবল ভাবছে, তাদের পেছনে ছায়ার মতো লেগে আছে দিবাকর। হয়তো তাদের হাতে যে কোনোদিন খুন হয়ে যাবে সে। কিন্তু কী করবে সে? পেটের দায়ে মরতে সে রাজী। চাকরি ছাড়ার উপায় নেই তার।

আবার ফাইল পড়তে শুরু করেছে বড়োবাবু। আরও দুটো ফাইল টেবিলে রেখে গেল এক কনস্টেবল্। দু'পা জুড়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দিবাকর ভাবছে, আগে পাড়ার লোক, তাঁতি, বামুন, কায়েত, সকলে ভালোবাসতো তাকে, খাতির করে কথা বলতো কেউ কেউ। বড়োলোকদের ঘরে গেলে কোঁচড় ভরে চাল দিত তারা। এখন সব বদলে গেছে। ছেলে, বুড়ো, কেউ পাত্তা দেয় না, এড়িয়ে চলে তাকে। ছাপোষা নরেন মাইতি, জগাই তিলির চোখেও দিবাকর, গোয়েন্দা, দালাল। বড়ো লোকরা ঘরে ডেকে অন্য মতলবে দিবাকরের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলে। তার কাছে

গোপন খবর জানতে চায়। কে ধরা পড়লো, পড়লো না, কার বাড়ি পুলিশ কবে গেল, এসব খুটিনাটি খবরে তাদের বেশী আগ্রহ। বলে, দেখিস দিবাকর, প্রাণে বাঁচাস আমাদের।

রাজনগর থানার আর এক চৌকিদার শুকলাল দিনকয় আগে দিবাকরকে প্রশ্ন করল, উপরি কেমন হচ্ছে?

শুকলালের সঙ্গী ওয়াচার রামদয়াল বলল, দফাদার হচ্ছো কবে? এখন তোমারই সময়। যে এলাকায় ঘনঘন পুলিশ যায়, সেখানকার চৌকিদারকে পায় কে? দু'হাতে আমদানি।

ফাইলে চোখ বড়োবাবুর মুখের চেহারা প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। শুকলাল, রামদয়ালের কথাগুলো মনে পড়তে দিবাকর ভাবলো, সত্যি কি খুব সুখে আছে সে? সুখ কী? তার জীবনে সুখ কবে আসবে?

ক্লান্তিতে দাঁড়াতে পারছে না দিবাকর। তার মনে হলে হলো, পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে অনেক হাঁটাহাঁটি, পরিশ্রম করে দুঃখ, দুর্ভোগে গুঁড়ো হয়ে গেছে সে। এবার রেহাই চায়। সে বড়ো একা, অসহায়। হাজার গাল দিলেও যমুনা একদিন বুঝবে যে, তার স্বামী খুব খারাপ লোক ছিল না। সংসারের জন্যে জীবন সঁপে দিয়েছিল সে। মোতি যে আজকাল তার ঘরে প্রায় আসে, দিবাকর অনুমান করতে পারে। কখন আসে, কেন আসে, না জেনেও মাধুকে একদিন খুব ধমকে দিয়েছিল সে। মাধুর হয়ে যমুনা এগিয়ে এসে বলল, মোতি পাড়ার ছেলে। এলে দোষ কী?

কথা শুনে দুঃখ পেয়েছিল দিবাকর। মা হয়ে পেটের মেয়েকে কি তাঁতির ছেলের হাতে তুলে দিতে চায় যমুনা? দুশ্চিন্তায় গরম হয়েছিল দিবাকরের মাথা। খেঁকিয়ে উঠে যমুনাকে বলেছিল, তোমরা যা চাইছো, বেঁচে থাকতে হতে দেবো না আমি।

দিবাকরের কথায় কেঁদেছিল মাধু। মেয়ের কান্নায় যমুনা বেখাপ্পা গালাগাল করেছিল দিবাকরকে। স্বামী-খেদানো রোগা মেয়েটার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে হু হু করে উঠেছিল দিবাকরের বুক। প্রচণ্ড ধমকে যমুনাকে থামিয়ে ভাঙা গলায় দিবাকর বলেছিল, মরার আগে শান্তি নেই আমার।

ফাইল থেকে চোখ তুলে বড়োবাবু বলল, তোর ছেলে নকশাল, একথা আগে বলিস নি কেন?

প্রশ্নটা ঠিকঠাক না বুঝে বড়োবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো দিবাকর।

তোর ছেলে স্বাধীন ধরা পড়েছে। সে এখন সিউড়ির পুলিশ হাজতে।

খবরটা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো বড়োবাবু।

বড়োবাবুর কথা, স্বাধীন ধরা পড়েছে, পুলিশ হাজতে স্পষ্ট শুনলো দিবাকর। এক ফুঁয়ে নিভে গেল জ্বলন্ত প্রদীপ। চারপাশ অন্ধকার! দিবাকর টের পেল ধড়ফড় করছে পায়ের তলার মাটি, আকাশ ভেঙে পড়ছে মাথার ওপর। স্বাধীন হাজতে, সে উগ্রপন্থী, রঞ্জনদের দলের ছেলে, বিশ্বাস করতে পারছে না দিবাকর। কিন্তু এই

মুহূর্তে এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই। দিবাকরের যুক্তি, চিন্তা, গুলিয়ে যাচ্ছিল। দিবাকরের চোখে স্বাধীন, চিরকাল দূরের মানুষ, আবছা। কলেজে পড়া এ ছেলের চালচলন, কথা, কখনো স্পষ্ট বুঝতে পারেনি দিবাকর। স্বাধীনের সঙ্গে কথা বলতে জিভ জড়িয়ে যেতো তার। দু'তিন কথায় নিজেকে গুটিয়ে নিত সে। তবু স্বাধীন যে এভাবে ভেসে যাবে, দিবাকর ভাবেনি। হঠাৎ বড়োবাবুর পায়ে লুটিয়ে আর্ত গলায় দিবাকর ডুকরে উঠলো, বাবু, আমার ছেলেটাকে বাঁচান। সাতটা নাই, পাঁচটা নাই, ওই একটাই ছেলে আমার। কোনোরকমে ওকে ছাড়িন এনে দ্যান বাবু!

পায়ের ওপর দিবাকর এমন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, ধারণা করেনি বড়োবাবু। দু' পা মেঝে থেকে টেনে সরিয়ে দিবাকরকে তুলে বড়োবাবু বলল, এ বড়ো সাংঘাতিক কেস্ রে দিবাকর। জানিস তো বাঘে ছুঁলে আঠারো, আর পুলিশ ধরলে চুয়ান্ন ঘা। দু'একদিনের মধ্যে একবার সিউড়ি যাবো আমি। দেখি, কী করতে পারি!

বড়োবাবুর আশ্বাস শুনতে পেল না দিবাকর। তার মুখে একটাই কথা, আমার ছেলে এসব করতে পারে না। বিশ্বাস করুন বাবু।

দিবাকরের কথায় আমল না দিয়ে বড়োবাবু বলল, তুই একটু গবেট, কে কি পারে, না পারে, বোঝার ক্ষমতা নেই তোর। রঞ্জন, শিবেন, বাবলু, ভোলা, পলাশ, নিতাই, পটল, তোর পাড়ার এতোগুলো ছেলে কী করছে, কী করতে পারে, খবর রাখিস?

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে দিবাকর। তার খ্যাপাটে চোখের দিকে তাকিয়ে বড়োবাবু বলল, তেলা সিকির মতো অচল হয়ে গেছিস্ তুই। এলাকার কোনো খবরই রাখিস না। তোর গাঁয়ের সবকটা ছেলে ডেঞ্জারাস্। তাদের না ধরলে চাকরি থাকবে না আমার।

বড়োবাবুর কথা, আচরণ দুর্বোধ্য ঠেকছে দিবাকরের। বড়োবাবু জিজ্ঞেস করল, মোতি কোথায়?

কী বলবে ভেবে পেল না দিবাকর। সে ভাবছে স্বাধীনের কথা। কবে জেল থেকে ছাড়া পাবে সে, বাড়ি ফিরবে, এইসব। স্বাধীনের ধরা পড়ার খবর কীভাবে যমুনাকে জানাবে, এ চিন্তা মাথায় এলো তার। জমে যেতে থাকলো বুকের রক্ত।

দিবাকরের শব্দহীন মুখের দিকে তাকিয়ে বড়োবাবু বলল, কিরে, চুপ করে আছিস কেন? ব্যাটার কাছে গুরুমন্তর নিয়েছিস নাকি?

বড়োবাবুর কথার খোঁচায় মেঝেতে বসে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো দিবাকর।

আঠারো

চেপে বর্ষা নেমেছে। সিধ নদীর জল এখন ঘোলাটে। দিনরাত ফুঁসছে।

সারাদিন অঝোর বৃষ্টি। লালমাটির শক্ত রাস্তা খুব পিছল। ভাঙাচোরা জলে ঢাকা পথে চোরা গর্তে পা পড়লে রেহাই নেই। পা ভাঙবেই। রাত নামার একটু পরে বাগজোগরায় একটা মিটিং শেষ করে ঝিরঝির বৃষ্টিতে বাহেঙ্গায় ফিরছিল অজিত, মোতি। সাবধানে, পা টিপে হাঁটার জন্যে বাহেঙ্গায় পেঁছোতে রাত হয়ে গেল। অন্ধকারে ঢেকে আছে চারপাশ। কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনেকদিন পরে বেলেঘাটার বরুণের সঙ্গে আজ বাগজোগরায় দেখা হয়েছে অজিতের। অন্ধকার রাস্তায়, সারাক্ষণ বরুণের কথা ভাবছিল অজিত। মাস তিনেক হলো বাগজোগরায় এসেছে বরুণ। বরুণের সঙ্গে কলেজ জীবনে অজিতের বন্ধু। বরুণ মেধাবী ছাত্র। হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্ট্যাণ্ড করেছিল সে। ফিজিক্স অনার্স কিছুদিন পড়ে ফিলসফি অনার্স পড়লো দু'বছর। ফিলসফি ছেড়ে ঢুকলো ইকনমিকসে। ইকনমিকস্ অনার্সে মাঝারি রেজাল্ট হলো তার। তারপর এম. এ. পড়তে ঢুকেছিল বরুণ। এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়ে বদলে গেল সে। ক্লাস লেখাপড়া ছেড়ে নানা নেশায় মেতে উঠলো। সকাল থেকে গাঁজার আসর শুরু করে। আরো কী খেতো, অজিত জানে না। ছন্নছাড়া, ভবঘুরে হয়ে গেল কিছুদিন। তারপর বদলে গেল। জীবন নিয়ে সবটাই যে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বুঝতো অজিত। বরুণের মতো ছেলেকে সমবয়সী কোনো বন্ধু ভালো, বা, খারাপ করতে পারে না।

কয়েক মাস বাদে নেশাভাঙ, ভবঘুরেপনা ছেড়ে য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে আবার লেখাপড়ায় বসে গেল বরুণ। এম. এ পরীক্ষার মাস দুই আগে একদিন লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিতে গিয়ে অজিত দেখল, রিডিং রুমের শেষ মাথায় একগাদা বই খাতায় ঘাড় গুঁজে বরুণ লিখছে। নিঃশব্দে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অজিত। বরুণ টের পেল না। তার লেখার ওপর একপলক চোখ বুলিয়ে অজিত বুঝেছিল, কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল অনুবাদ করছে বরুণ। পেছনে তাকিয়ে অজিতকে দেখে মুচকি হেসে বরুণ প্রশ্ন করল, অনুবাদে ভুল হচ্ছে ?

অজিত বলেছিল, মূল বই, তোমার অনুবাদ, কিছুই পড়িনি আমি।

ছ'মাস পরে রাজনীতিতে সরাসরি এল বরুণ। দীর্ঘদিন বরুণের খবর রাখত না অজিত। বাগজোগরায় দেখে, কথা বলে বুঝেছে, আমূল বদলে গেছে বরুণ। অবাক হয়নি অজিত।

অন্ধকার পিছল রাস্তা। দেখা যাচ্ছে না কিছু। মোতি বলল, সাবধান।

ঝড়বাদলের রাতে হ্যারিকেন নিয়ে লাভ নেই। নিভে যাবে। টর্চ রাখা

বিলাসিতা। তাছাড়া যত্রতত্র বসেছে পুলিশ ক্যাম্প। আলোর চেয়ে অন্ধকার অনেক নিরাপদ।

কালো মেঘে গুম হয়ে আছে আকাশ। আবার বৃষ্টি নামবে। সামনে ফাঁকা ধুধু ডাঙা। তারপর নাবাল জমি, ধানক্ষেত। ধানক্ষেত ভেদ করে সরু সিঁথির মতো আলপথ, বৃষ্টি কাদায় মজে আছে। এই এলাকার দায়িত্ব দিয়ে পার্টি যে বরুণকে বাগজোগরায় বসিয়েছে, তার রিপোর্ট শুনে বুঝেছে অজিত। বরুণ বলল, বীরভূম জেলা জুড়ে এখন সাজ সাজ আওয়াজ। পার্টি কর্মীরা সব থানাতে শিকড় চারিয়েছে। আগামী দু'তিন মাসের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধে ফেটে পড়বে জেলা। রাজনগর, রাণীশ্বর ছাড়া জেলার প্রায় সব জায়গায় এক বা একাধিক খতম হয়েছে। রামপুরহাট থানার সতেরো কিলোমিটার পশ্চিমে ঘীরা গ্রামের গরীব কৃষকরা গেরিলা অ্যাকশনে খতম করেছে একজন কুখ্যাত জোতদারকে। রামপুরহাট কলেজের ছাত্ররাও পেছিয়ে নেই। রেডগার্ড অ্যাকশন করে তিনশো একাশি আপ অণ্ডাল-আজিমগঞ্জ ট্রেন জ্বালিয়ে দিয়েছে তারা। গোলাবারুদ যাচ্ছিল সে গাড়িতে।

জেলার আলোচনার সঙ্গে কলকাতায় যে তুলকালাম কাণ্ড চলেছে, সে খবরও কিছু দিল বরুণ। স্বয়ং বি. এম. বিড়লা নাকি কাগজে বিবৃতি দিয়েছে যে, যৌবন থাকলে নকশালপন্থী হত সে। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলার জন্যে কলকাতায় এসে রাজ্যে চল্লিশ হাজার সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছে জেনারেল মানেকশ। বোলপুরে ইতিমধ্যে এক সভা করে গেছে ইন্দিরা গান্ধী। এসব খবর বাহেঙ্গা, তাঁতলুইতে আসে না। ফারাক্কায় রিজিওনাল কমিটির সভাতে শুনেছে বরুণ।

বরুণের সঙ্গে অজিতের আলোচনায় অনেক বিষয়ে অমত হয়েছে। অজিতের মনে হয়েছিল কিছু দরকারী কাজ জোড়াতালি দিয়ে পার্টি মেটাচ্ছে। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে সিউড়িতে নব কংগ্রেস নেতা যদুগোপাল রায় খুন হলেও সে খুনের দায়িত্ব পার্টি কেন যেচে ঘাড়ে নিল, অজিত জানে না। দুই হবু এম. এল. এর ঝগড়ায় যদুগোপাল খুন হলেও সংবাদপত্র খুনের দায় চাপিয়ে দিল পার্টির ওপর। এ অভিযোগ চুপচাপ মেনে নেওয়া পার্টির উচিত হয়নি। বিবৃতি দিয়ে এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

অজিতের মতামত শুনে বরুণ বলেছিল, রোজ এরকম ডজন ডজন অপবাদের প্রতিবাদে পার্টিকে বিবৃতি দিতে হলে বিবৃতি লেখার জন্যে পার্টিকে একটা আলাদা দপ্তর রাখতে হয়। তা সম্ভব নয়।

কিন্তু এটা দরকারী কাজ, অজিত বলেছিল।

আমার মনে হয় না সে রকম, বরুণ বলেছিল, বরং অপপ্রচারেও পার্টির প্রচার হচ্ছে।

বরুণের কথা শুনে হতবাক হয়েছিল অজিত। তার মুখ দেখে নিজেকে শুধরে নিয়ে বরুণ বলেছিল, যদুগোপালকে যে আমাদের পার্টি খতম করেনি, পুলিশ জানে। পুলিশের এক ওপরওলা দিন কয় আগে সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে। সিউড়ি এবং কলকাতার যাদবপুরে নিতাই মুখার্জির খুন যে

নকশালদের কাজ নয়, পুলিশ খুনের সব ঘটনার সঙ্গে সি. পি. আই (এম. এল.) নেই বিবৃতিতে উল্লেখ আছে।

অজিত চুপ করে থাকতে খয়রাশোলের মানব বলল, পুলিশের স্টেটমেণ্ট আর পার্টির বিবৃতির গুরুত্ব সমান নয়। যদুগোপাল রায়ের ঘটনার মতো হেমন্ত বসু, পীযূষ ঘোষ, নেপাল রায় হত্যার অভিযোগও পার্টির ঘাড়ে চেপেছে। এ সবই কী পার্টির কাজ?

মানবের প্রশ্নে এক মুহূর্ত গম্ভীর থেকে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লো বরুণ। অজিতের হোমিওপ্যাথির বাক্স দেখে হালকা গলায় প্রশ্ন করল, ওষুধের লোভ দেখিয়ে রাজনীতি করছ নাকি? এটা কিন্তু অর্থনীতিবাদ!

নিছক রসিকতা হলেও বরুণের কথায় অজিতের খটকা লাগলো। পার্টি লাইন নিয়ে কিশোরের সঙ্গে তার আলোচনা হয়নি অনেকদিন। বাইরে থেকে কিশোরকে পার্টি রাজনীতির অন্ধ প্রচারক মনে হলেও এখন কী ভাবছে সে? জানা দরকার। আলোচনায় বসতে কিশোর যে দমে গেছে, বুঝতে পারে অজিত। আসলে দক্ষিণ দেশ গ্রুপ থেকে পার্টিতে আসায় ইচ্ছে থাকলেও অনেক প্রশ্ন তুলতে সাহস পায় না কিশোর। পার্টির আস্থা বিশ্বাস অর্জনের জন্যই হয়তো কিশোরের এই কঠোর নীরবতা।

কিন্তু খতম লাইন সম্পর্কে অজিতের আজও দ্বিধা আছে। রক্তের মধ্যে হামলে পড়া ঘৃণা, রাগে চিমনজানকে খুন করেছিল লখাই। এ ঘটনার একটা তাৎপর্য, মানে আছে। কিন্তু শুধু খুন, একটা রাজনৈতিক দলের একমাত্র কর্মসূচী হতে পারে না। অজিতের নির্দেশে এখনই তার এলাকায় গরীব মানুষরা দু দশটা খতম করতে পারে। কিন্তু তারপর? অজিতের ওপর বিশ্বাস, ভালোবাসায় যারা খতমে নামবে, কী হবে তাদের? গরীব মানুষের স্নেহ, ভালোবাসা আন্তরিক। অনেক ভেবেচিন্তে কাজে লাগাতে হয়। বিশ্বাসের দাম দিতে এলাকায় তাই এখনও খতম শুরু করেনি অজিত। পাকা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আরো কিছু সময় চায় সে। কয়েকবার অজিতকে বুঝিয়েছে কিশোর। রাজি করাতে পারেনি। অজিতের সঙ্গে কিছুদিন আগে এক আলোচনায় কিশোর বলেছিল, প্রতিক্রিয়া আর শোধনবাদকে শুধু তাত্ত্বিক বিতর্কে এ যুগে ঘায়েল করা যাবে না। তত্ত্বের সঙ্গে রক্তপাত, খতম হলে সাবালক হবে তত্ত্ব। গরীব মানুষকে জাগাতে, সংগঠিত করতে খতম ছাড়া পথ নেই।

ঠিক একই কথা, আজ বরুণও বলল। গত পাঁচমাসে জেলায় বত্রিশটা খতম হবার পরেও রাণীশ্বর, রাজনগরে এই নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা রিজিওনাল কমিটি বরুণের কাছে জানতে চেয়েছিল। বরুণ বলল, আমি নিজেও রাণীশ্বর থানার একটা গ্রাম, বাগজোগরায় আছি। রিজিওনাল কমিটির সে সভায় কোনো ব্যাখ্যা না দিতে পেরে লজ্জায় হেঁট হয়ে গিয়েছিল আমার মাথা।

বরুণ কী বলতে চাইছে, বুঝে চুপচাপ বসেছিল অজিত। বাগজোগরা, বাহেঙ্গা, তাঁতলুই, তিলাবনি কোথাও কিশোর, অজিত এবং রবি হাঁসদার নির্দেশ ছাড়া খতম অভিযান শুরু করা অসম্ভব। গত দু' তিন মাস বাগজোগরায় বাস করে এ সত্য টের

পেয়েছে বরুণ। তাই নানা ভাবে অজিতকে উত্তেজিত করতে চাইছিল সে। বরুণ বলল, সারা জেলায় দখল হয়েছে একশো ছাব্বিশটা বন্দুক। দখলের সে ফর্দে আমাদের নাম নেই। প্রচারের কথা বলে আঙুল চুষছি আমরা, নিষ্ক্রিয়তার রাজনীতি করছি। চিমনজানকে রাগের মাথায় কুপিয়ে আমাদের মান বাঁচিয়েছে লখাই। এ এলাকায় সেই প্রথম এবং শেষ খতম।

কিন্তু প্রচারও দরকার, মোতি বলল, গাঁয়ের শ্রেণী বিশ্লেষণ, কে বন্ধু কে শত্রু ঠিক করা।

অবিকল কিশোরের কথা মোতির মুখে শুনে ঝেঁঝে উঠে বরুণ বলল, কিন্তু শুধু প্রচার করে কী হবে?

আর কথা বলল না মোতি। যে কোনো কারণে কিশোরের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ আছে বরুণের। কবে, কেন কীভাবে এ বীতরাগ তৈরি হল, অজিত জানে না। কলকাতায় বরুণকে হয়ত গণপতি কিছু বলেছে। পার্টিতে ঢুকলেও দক্ষিণদেশ গোষ্ঠীর পরিচয় কিশোরের গা থেকে এখনও ওঠেনি। সে কারণে তাকে খতমবিরোধী বলে প্রচার করছে কেউ কেউ। বরুণ বলল, এত খোঁজখবর, তদন্ত, অনুসন্ধানের ফল কী দাঁড়াবে, আমি জানি। এলাকায় একজনও শ্রেণীশত্রু খুঁজে পাবে না আঞ্চলিক কমিটি। অজিতকে একপলক দেখে বরুণ বলেছিল, শুধু জমি, টাকার পরিমাণ দেখে শ্রেণীশত্রু বাছাই মস্তো ভুল। তার চরিত্রের নিষ্ঠুরতা, অন্য ধরনের শোষণ, লিপ্সার কথাও মাথায় রাখতে হবে। গরীব মানুষের ঘৃণা যে জাগায় সেই গরীবের শত্রু। উদাহরণ চিমনজান।

হয়ত তাই। বরুণের বিশ্লেষণ ঠিক বুঝতে পারছিল না অজিত। কিন্তু খতমের কথা শুনলেই কিছু প্রশ্ন ভীড় করে তার মাথায়। খতমের পর কীভাবে গড়ে উঠবে সৈন্যবাহিনী। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের সময় গরীব মানুষের ভূমিকা কি হবে? খাবে কী তারা? পুরনো ভূমিসম্পর্ক ভেঙে নতুন ভূমিনীতি চালু করার পদ্ধতিই বা কি? অসংখ্য জটিল প্রশ্নের সঠিক কোনো উত্তর খুঁজে পায় না অজিত। বরং আরো নতুন প্রশ্ন মাথায় জেগে ওঠে। কতদিন টিকবে এ লড়াই? এখানে, এই তরণী পাহাড়, দুমকা, ভাগলপুরের জঙ্গল, টিলায় লাল রাষ্ট্রশক্তি কি বাঁচবে?

এসব প্রশ্ন সভায় তুললে বন্ধুদের কেউ কেউ ভাবে লড়াই এড়াতে এত কথা বলছে অজিত। অনেকের ধারণা সাঁওতাল মেয়ের প্রেমে পড়ে তার এই দশা! লালমুনিকে বিয়ে করে গৃহী সেজে বসতে চায় সে।

অন্ধকার রাস্তায় নিজের মনে হাসলো অজিত। মধ্যবিত্ত বন্ধুরা, এমনকি কিশোরও চিনতে পারেনি সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী মানুষদের। অজিত চিনেছে। তাদের মুখের রেখা, বুকের স্পন্দন পড়তে পারে সে। নিরীহ শান্ত চেহারার আড়ালে তাদের রাগ, ঘৃণা, অভিমান, ভালোবাসা, বিদ্বেষ আলাদা করতে অসুবিধে হয় না তার। হাড়িয়া খেয়ে, মাদলের তালে তাদের নাচ, গান, হাসি, উচ্ছলতার রহস্য জেনে গেছে। আদিবাসী দুই তরুণ তরুণীর চাপা গলায় একান্ত কথা, অন্ধকার দাওয়া থেকে জ্বলন্ত উনুনের কয়েকজন বুড়োবুড়ির তাকিয়ে থাকা, আলোচনা, কানে না শুনেও

সে বুঝে যায়। লালমুনির সঙ্গে বসে আজ পর্যন্ত একডজন কথাও অজিত বলেনি। কথা যা বলেছে, তাও প্রেম, দুলহার বিষয়ে নয়। কীভাবে বেশি মাটি কাটা যায়, কোমরে, হাতে ব্যথা হলে ওষুধ কী, এমন কথাতেই সময় কেটে গেছে তাদের। অন্য কথা, কুঁচফল, ঘাসফুলের গল্প, বজরার ডাঁটা কেন খোঁপায় গোঁজে না, লালমুনি শুনিয়েছে অজিতকে।

মাঠ ছেড়ে আলপথ ধরে অজিত, মোতি হাঁটছে। চাপা গলায় বাড়ি ফেরার কাহিনী অজিতকে শোনাচ্ছিল মোতি। মোতি বলল, বাবা ভেবেছিলো, আবার বোধহয় হারিয়ে যাবো আমি। উঠোনের কোণে বসে হুঁকো খেতে খেতে চোরা চোখে দেখছিল আমাকে। সন্ধের পরে বাড়ি খালি হতে কয়েকদিনের বোনা কাপড় কাঁধে তুলে কোম্পানির ঘরে জমা দিতে যাবার সময় বাবা সঙ্গে নিল আমাকে। আমি বুঝতে পারলুম যে, বাবাও মজুরি নেওয়া তাঁতি হয়ে গেছে। থানগুলো এক লহমা দেখে কোম্পানির মাইনে করা এক কর্মচারী বাবাকে ধমকাতে শুরু করলো, এ কেয়া বানায়া তুম? অ্যায়সা হোনে সে তুমকো কাম নেহি মিলে গা।

আমার সামনে ধমক খেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল বাবা। অপমানে, সংকোচে মাটিতে মিশে যাচ্ছিলুম আমি। রাস্তায় বেরিয়ে ভারী গলায় বাবা বলেছিল, বুড়ো আঙুল বেচলে ইজ্জতও বেচতে হয় তাঁতিকে। বাবার কথা শুনে মনে হল, পুরনো দিনের সেই নামী তাঁতশিল্পী হঠাৎ ফতুর হয়ে গেছে। তারপর দু'দিন বাড়ি থাকলেও তাঁতে হাত দিলুম না। রাজনগরে ডাক্তারের কাছে যে আমি কম্পাউণ্ডারের কাজ করছি বাবা আগেই শুনেছিল। এমন সুখবর প্রথমে বাবা বিশ্বাস করেনি। খুশিতে বলেছিল, ভালোই হয়েছে তাঁতিদের সুতো শেষ, এখন অন্য ধান্দা করতে হবে সকলকে।

কথা বলার সময়ে বাবার গলায় এতটুকু কষ্ট ছিল না। অথচ আমাকে ছেলেবেলায় বাবা কতবার বলেছে, বড় শিল্পী হতে হবে তোকে। এমন নকসা বানাবি যে দেখে তাক লেগে যাবে।

অজিতের পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে আলের নরম মাটি। অন্ধকার, ভিজে পৃথিবী। বাতাস বেশ ঘন আর ঠাণ্ডা। মোতি বলল, রাজনগরে আর থাকা উচিত নয় আমার। তবু সংসারের জন্যে পড়ে আছি।

অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে মানুষকে চলতে হয়, মোতিকে সান্ত্বনা দিতে চাইল অজিত।

মোতি চুপ। অজিত বলল, তুমি রাজনগরে থাকলেও গাঁয়ে তোমার যথেষ্ট যোগাযোগ।

কিন্তু সকলের আগে গ্রামে বসার কথা ছিল আমার, মোতি বলল।

অজিত মন্তব্য করল না। চাপা গলায় মোতি বিড়বিড় করল, মাঝেমাঝে খুব কষ্ট হয় আমার। ভাবি, দেশ আর সংসারের মধ্যে কোনটা বড়? তখন দেশের কথা ভাবলে বাবা, মা, ভাই, বোনদের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আবার

সংসারের দায় মেটাতে যখন খাবি খাই, মনে হয়, দেশের জন্যে অনেক কিছু আমার করার আছে। সে কাজ না করা সাংঘাতিক অপরাধ। কেন এমন হয়, আমি মুখ্যু লোক, বুঝতে পারি না।

অজিত বলল, হতেই পারে। ঘরবাড়ি, মা, বাবা, ভাই, বোন মিলে আমাদের দেশ, দেশের শুরু, দেশের সঙ্গে পরিচয়।

প্রসঙ্গ বদলাতে অজিত প্রশ্ন করল, মাধুর কি খবর? আকাশে ঘন মেঘ। বিদ্যুৎ চমকালো। এক মুহূর্ত চুপ থেকে মোতি বলল, বেশ কয়েকদিন দেখা হয়নি।

মাধুকে বিয়ে করো, অজিত পরামর্শ দিল মোতিকে। সাড়া করলো না মোতি।

ধানক্ষেত ছেড়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে দুজনে হাঁটছে। সামনে বড়, ঘন একটা জঙ্গল। দানবের মতো অন্ধকার গুঁড়ি মেরে বসে আছে। বিড়ি ধরালো অজিত। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় সাবধানে হাঁটছে সে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে মোতি ডুকরে উঠলো। নিকষ অন্ধকার। মোতির যে ঠিক কী হয়েছে, অজিত বুঝতে পারলো না। ফস করে একটা দেশলাই কাঠি জেবলে অজিত দেখলো জলে ডোবা গর্তের মধ্যে পায়ের পাতা আটকে মোতি পড়ে আছে। সামান্য আর্ত শব্দ তুলে চুপ করে গিয়েছিল মোতি। সাবধানে মোতিকে দাঁড় করালো অজিত। নিজের পায়ে ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারছে না মোতি। অজিতের হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টলমল করছে সে। বেশ বড় গর্ত। মোতির পা ভেঙেছে কিনা বুঝতে পারলো না অজিত।

ব্যথা করছে?

অজিতের প্রশ্নে মোতি বলল, হুঁ।

কনকন না ঝনঝন?

এক মুহূর্ত ভেবে মোতি বলল, কনকন।

আবার একটা দেশলাই কাঠি জেবলে হোমিওপ্যাথির বাক্স খুলে আর্নিকার কয়েকটা গুলি মোতির মুখে ঢেলে দিল অজিত। দেশলাই কাঠি নিভে যেতে ফের নিপাট অন্ধকার। মোতির পায়ে হাত বুলিয়ে অজিত বুঝলো, পাতা ফুলে উঠেছে। বিলকান্দি গ্রাম এখনও য় দু'মাইল রাস্তা। বিলকান্দি ভদ্রলোকদের পাড়া। এড়িয়ে যেতে হবে।

হাঁটতে পারবে, অজিত প্রশ্ন করলো মোতিকে। অজিতের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো মোতি? পারলো না। দুহাতে মোতিকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে অজিত হাঁটতে শুরু করলো। মেঘ অন্ধকারে ডুবে আছে চরাচর। কোথাও ছিটেফোঁটা আলো নেই। অজিতের মনে হল অন্তহীন একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। পায়ের যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল মোতি। মোতিকে বয়ে ঘেমে যাচ্ছে অজিত। নিজের গভীর শ্বাসের শব্দ শুনতে পেল সে। কাল এরিয়াকমিটির জরুরী সভা। ভোরের আগে বাহেঙ্গায় পৌঁছোতে হবে।

উনিশ

ভূমিহীন, গরীব কৃষকদের নিয়ে গেরিলা স্কোয়াড তৈরি হতেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো আগুনের হল্কা। বাংলা বিহার সীমানা জুড়ে গেরিলা স্কোয়াডের চলাচল অবাধ হল। ঘন উত্তেজনায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিশোর। এখনও অ্যাকশন না হওয়ায় ব্রজদা অখুশি। এরিয়া কমিটির সভা শুরু হওয়ার আগে কেরোসিনের একটা টেমির সামনে ব্রজদা, কিশোর, রবি আলাদা বসেছিল।

কিশোর বলল, গেরিলা স্কোয়াড তৈরি, যে কোনোদিন অ্যাকশন হবে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গম্ভীর মুখে কথাটা বলে একটা ছাপানো পুস্তিকা কিশোরের সামনে ধরে ব্রজদা প্রশ্ন করলো, এ লেখাটা পড়েছো?

পাতাটা উল্টে বই-এর প্রথম নিবন্ধ, নাম, নতুন বছর আসছে আরও বড় জয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, কিশোর পড়ল। চার পাতার নিবন্ধের নানা অংশে লালকালির আন্ডার লাইন। টেমির আবছা আলোয় কিছু টুকরো অংশ, শব্দ, জীবন দেওয়ার প্রতিযোগিতা, শ্রেণীশত্রু ধ্বংস, বিপ্লবী জোয়ার, নজর করলো কিশোর। পুস্তিকার দ্বিতীয় রচনা, সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। এ লেখাটির নানা অংশ লালকালিতে দাগানো। শ্রীকাকুলামে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম, পিকিং রেডিওর বিপ্লবী সহযোগিতা, মানুষই শক্তির উৎস, এমন কিছু শব্দ কিশোরের মাথাতে আটকে গেল। পরের পাতায় আরো গভীর, মোটা লাল কালিতে দাগানো লাইনগুলো দ্বিধা নিয়ে পড়লো কিশোর। লেখায় চোখ রেখেও কিশোর বুঝতে পারছে, তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ব্রজদা। এই প্রবন্ধের দাগানো অংশটাই কিশোরকে হয়ত পড়াতে চেয়েছিল ব্রজদা। কিশোর পড়লো, চেয়ারম্যান মাও-এর নামে যে সব নকশালপন্থী গোষ্ঠী, গ্রুপ খতমের বিরোধিতা করছে, তারা চেয়ারম্যান বিরোধী, বিপ্লব বিরোধী। তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

পড়া শেষ করে বইটার দিকে এক মুহূর্ত ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, পড়লাম।

ব্রজদা বলল, শুধু পড়লে হবে না, খতম বিরোধী ভুল লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। এখনই খতম অভিযান শুরু করা হল লড়াই-এর প্রথম ধাপ।

প্রচার চালাচ্ছি, কিশোর বলল।

পুরনো ধাঁচের প্রচার নয়, কানে কানে ফিসফিস প্রচার, গেরিলা কায়দায় প্রচার।

ব্রজদার জবাবে কিশোর বলল, আমাদের প্রচারে কাজ হয়েছে। মুখিয়া নির্বাচনে আমাদের সাঁওতাল বন্ধুরা প্রায় সব জায়গায় জিতেছে।

মুখিয়া নির্বাচনে তোমাদের নামা ভুল হয়েছে, ব্রজদা বলল, তোমাদের এ কাজে আঞ্চলিক কমিটি খুশি নয়।

কী বলবে ভেবে পেল না কিশোর।

রবি বলল, গাঁয়ের লোকেরা মুখিয়া লড়ায়ে নাম লিখাতে চাইছিল।

রবির কথায় কান না দিয়ে কিশোরকে ব্রজদা জিজ্ঞেস করল, তুমি কী একসময়ে দক্ষিণদেশ গ্রুপে ছিলে?

প্রশ্ন শুনে কিশোর অবাক হয়েছে টের পেয়ে ব্রজদা বলল, একটা বৈঠকে বোলপুরের ছেলেরা খবরটা দিল আমাকে।

বোলপুরের ছেলেরা ঠিক কী বলেছে, শোনার ইচ্ছে থাকলেও কিশোর প্রশ্ন করলো না। কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করল। কিছু গ্রুপ খতমের বিরোধিতা করায় পার্টিতে সে যোগ দিলেও তার পুরনো গ্রুপ পরিচয় নিয়ে এখনও কথা হচ্ছে। অসহায় বোধ করল কিশোর। গ্রুপ ছেড়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে পার্টির কাজ করেও আজও সে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কেন হয়নি? কীভাবে হবে? তার মনে হল, খতম শুরু করেই পার্টির কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করবে সে। এছাড়া উপায় নেই।

সভা শুরু হল একটু পরে। রাত বাড়ার সঙ্গে ঘন হচ্ছে অন্ধকার। সারাদিন বৃষ্টি হওয়ায় চারপাশ ভিজে। ঝিরঝির ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। অন্ধকারে পাল্লা দিয়ে চলেছে ব্যাঙ, ঝিঁঝিঁর ডাকাডাকি। কেরোসিনের টেমি নিভিয়ে রাখায় এখন ঘরে বাইরে অন্ধকার। হাতে হাতে ঘুরছে দুটো জ্বলন্ত বিড়ি। গোটা জেলার খবর ব্রজদার মুখস্থ। পড়া দেবার মতো গড়গড় করে কাজের রিপোর্ট দিচ্ছে ব্রজদা। বীরভূম জেলার গ্রামে, শহরে সংগ্রামের ঢেউ উঠেছে। কৃষি বিপ্লবের রাজনীতি ভাসিয়ে দিয়েছে জেলাকে। গত পনেরোদিনে বোলপুরে খতম হয়েছে একজন ব্যবসায়ী, ইলামবাজারে জঙ্গলের বিট অফিসে হানা দিয়ে তিনটে বন্দুক দখল করেছে গেরিলা স্কোয়াড। কেন্দুয়ার ক্যানেলের কাছে একজন কনস্টেবলকে খতম করে পাওয়া গেছে একটা বন্দুক। লাইসেন্সধারীদের বন্দুক জমা দিতে বলেছে পুলিশ। লাইসেন্স করা বন্দুকের বেশিরভাগ আছে জোতদারদের কাছে। সামনে ফসল তোলার মরশুমের ঠিক আগেই বন্দুক ফেরত দিতে রাজি নয় তারা। ময়ূরেশ্বর থানার দক্ষিণগ্রামে দুই জোতদারকে পরশু খতম করা হয়েছে। রামপুরহাটের আদলপাহাড়ী গাঁয়ের কাছে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে সেদিন। কয়েকজন সাঁওতাল কমরেড কাজ থেকে বাসে বাড়ি ফিরছিল। মাঝরাস্তায় সেই বাসে উঠলো তিনজন বন্দুকধারী পুলিশ। সাঁওতাল কমরেডদের মধ্যে চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। আদলপাহাড়ীর কাছে বাস আসতেই পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা। তিনটে বন্দুক হাতে এসে গেল। রিপোর্ট শেষ করার আগে ব্রজদা বলল, আমরা জিতছি। শত্রুরাও বসে নেই। আগামী সাতদিন আমাদের অগ্নিপরীক্ষা। সাতদিনের মধ্যে আমাদের কর্মীদের নির্মূল করার পরিকল্পনা হয়েছে। পুলিশের বড়কর্তা, আই. জি বীরভূম ঘুরে গেছে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পেয়েছে পুলিশ। সরকার এবং রাজ্য প্রশাসনের উদ্যোগে

বীরভূম জেলায় নকশাল ঠেকাতে প্রতিরোধবাহিনী গড়ে উঠছে। অহিংসা, শান্তিতে বিশ্বাসী প্রতিরোধবাহিনীকে ছোরা, ভোজালি, সড়কি দেওয়া হবে।

রিপোর্টের এ অংশে হেসে উঠলো সবাই। ব্রজদা বলল, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, সি. আর দাশের নাতিকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সে তো প্রধানমন্ত্রীর ড্রাইভার, মোতি বলল।

মোতির কথার জবাব না দিয়ে ব্রজদা বলল, কমরেডস্ কঠিন সময় আসছে। গেরিলা যুদ্ধের এলাকা না বাড়ালে আমাদের টিঁকে থাকা মুশকিল হবে।

ব্রজদার রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে রাতের খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিল রবি। ব্রজদারও খিদে পেয়েছিল। রবির প্রস্তাবে কিছু সময়ের জন্য সভায় বিরতি হল।

খুদ আর ব্যাঙের ছাতা দিয়ে তৈরি খিচুড়ি খেয়ে আরো আধঘণ্টা পরে শুরু হল সভার দ্বিতীয় পর্ব।

লকলকে কচি ধানের চারায় ভরে গেছে চারপাশের মাঠ। তলা ফেলা শেষ। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এ বছর রেকর্ড ফসল হবে। বীরভূমের কিছু এলাকায় ঝামেলা, গোলমাল হলেও রাজনগর, রাণীশ্বর এখনও শান্ত। এখানে জোতদাররা ভয় পায়নি। ভয় পেলেও চাষাবাদ ফেলে তারা পালাতো না। খতম অভিযান সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে এল নারান তাপুরিয়ার নাম। তাকে দিয়েই এলাকার সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা হবে। বেশ বড় গেরিলা স্কোয়াড তৈরি হল। প্রথম অ্যাকশনের জন্যই ভারী করা হল দল। দলের কম্যাণ্ডার বুধন। হেঁসো, ভোজালি, দা, ডাণ্ডা নিয়ে বুধনের সঙ্গে তাপুরিয়ার বাড়ি ঢুকবে স্কোয়াডের চারজন সদস্য। মূল কাজ করবে তারা। বাইরে যারা থাকবে, ঘটনার ওপর নজর রাখা তাদের দায়িত্ব। দরকার হলে তাপুরিয়ার বাড়িতে ঢুকবে তারা।

অ্যাকশনের দিন সময় পাকা করে মাঝ রাতে সভা শেষ হল। তখনও কুলিতে মানুষের ভিড়। নারান তাপুরিয়াকে খতমের সিদ্ধান্ত শুনে হইহই করে আহ্লাদ প্রকাশ করছে তারা। নারান তাপুরিয়াকে খতমের সিদ্ধান্ত হবার আগেই পার্টি কর্মীরা ফিসফিস করে গাঁয়ের গরীব মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়েছে। প্রস্তাব শুনে কেউ আনন্দে আত্মহারা, চুপচাপ সায় দিয়েছিল কেউ। প্রস্তাবের বিরোধিতা একজনও করেনি। গরীব মানুষেরা কানে কানে তাপুরিয়াকে খতমের আলোচনা করলেও বড়লোকদের কানে এই গোপন খবর যায়নি। মাঝিপাড়ার উত্তেজনার কথা ওপর পাড়ার কাক-পক্ষীও জানে না।

তাপুরিয়াকে যে মারা যায়, এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না মানুষ। এতদিন হাতে এবং ভাতে মারার অধিকার তাপুরিয়ারা ভোগ করেছে। মাঝিরা কেঁদেছে, বাঁচার আশায় কিছুদিন জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে খিদেতে অস্থির হয়ে গাঁয়ে তাপুরিয়ার মুঠোয় ফিরে এসেছে আবার। উপোস, নির্যাতনে মুখ গুঁজে থেকেছে। রা কাড়েনি। দূরদূরান্তর—বোলপুর, নলহাটি, রামপুরহাট, সিউড়ি থেকে হুলের খবর আসছে আজ। হাতিয়ার তুলে মহাজন, বাবুভাইদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে

গরীব আদিবাসী মানুষ। জোতদার, মহাজন, সুদখোরেরা খতমের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। অন্ধকার উঠোনের কোণে পুঁটলি পাকিয়ে বসে থাকা লোকটাকে দেখিয়ে রবি বলল বুধনকে, ই নরহরি মাল, তাপুরিয়ার মুনিস। দুয়ার খুলে তাপুরিয়ার ঘরের পথ দেখাবে নরহরি।

বুধনের পাশে দাঁড়িয়ে অজিত, মোতি দেখলো, নরহরিকে। বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের নরহরিকে অন্ধকারে বেশি বুড়ো দেখাচ্ছে। দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে কনকনে শীত ঠেকাতে চাইছে নরহরি। সাঁওতাল, মাল বাউড়িদের গড় পরমায়ু কম। ওদের মধ্যে বুড়ো মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না। পঞ্চাশের আগেই বেশির ভাগ মারা যায়। যারা বাঁচে, তাজা, টগবগে যৌবন থেকে একলাফে বুড়ো হয়ে যায় তারা। অজিত, বুধনকে শ্রোতা পেয়ে নিজের দুঃখের কাহিনী বলছে নরহরি। আমার বাপ পেতামোও মুরুব্বির ঘরে মুনিষ খেটেছে, আমিও খাটছি, তাদের ঋণ শুধতেছি। উপায় নাই গো। না খাটলে ঘর-বাড়ি বেচে দিবেক, আদালতের কাগজে লিখা আছে সব।

ছায়ার মতো বসে থাকা নরহরির জীবনের কথা শুনে অবাক হল অজিত। তাপুরিয়ার বাড়িতে চাকরি রাখতে পরপর তিন বউকে হারিয়েছে নরহরি। নরহরির প্রথম বউ ছিল তার সমবয়সী। বেশ শক্ত সমর্থ মেয়েমানুষ। বাপ, ঠাকুর্দা দাঁড়িয়ে থেকে জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। মাত্র তিন মাসের মধ্যে প্রথমে নরহরির বাপ, তারপর ঠাকুর্দা মারা গেল। বছর ঘুরতেই পালালো বউ। তাপুরিয়ার বাড়িতে বাবার জায়গায় তখন রাতপাহারার কাজে ঢুকেছে নরহরি। বউ কেন পালালো নরহরি বুঝতে পারেনি। অবাক, আহত হয়েছিল সে। কষ্ট পেয়েছিল! তারপর সামলে নিয়েছিল নিজেকে। বছর ঘুরতে ঘরে আনলো দ্বিতীয় বউ। আবার বিপর্যয়। বিয়ের ছ' মাস বাদে এক রাতে ঘর থেকে দ্বিতীয় বউ উধাও হতে টের পেল, রাতে মুরুব্বির বাড়িতে পাহারা দিলে তার নিজের ঘর ভেঙে যাবে। কিন্তু কিছু করার ছিল না। দেখেশুনে ফের বিয়ে করলো নরহরি। চারবার বিয়ে করেছে নরহরি। আজও সংসার বাঁধতে পারেনি। নির্জন দুপুরে ঘরে একা বসে নরহরি ভাবে, বউগুলোকে ভালোবাসতে কসুর করেনি সে। মনিবের বাড়িতে ভালোমন্দ খাবার পেলে গামছায় বেঁধে ঘরে এনেছে। পুজো-পার্বনে গিন্নিমার পুরনো পোশাক। তার মালপাড়ার বন্ধুরা, জগাই, ফাগু, দীনু কেউ এত তোয়াজ বউকে করে না। বরং প্রায়ই বউকে বেধড়ক ঠেঙায়। গাঁয়ের মোড়ল ভবন্যথ পর্যন্ত বউ পেটাতে কসুর করে না। তবু মেনিমুখো বেড়ালের মত তাদের বউরা স্বামীদের গায়ে লেপটে থাকে। অথচ নরহরির একটা বউও ঘরে থাকলো না। কাজ ছেড়ে রাতে ঘরে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনিবের সবচেয়ে বিশ্বাসী লোক সে। তাকে ছাড়া মনিবের চলে না। তাপুরিয়ার গোপন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সে। অনেক অনুরোধ উপরোধেও তাই মালিকের রাত পাহারার কাজ থেকে ছুটি পায়নি নরহরি। তাকে নানা সময়ে মনিব বলেছে, তোর বাপ, কত্তাবাবা আমাদের ঘরে দিনে রাতে কিষেন খেটেছে। রাতে মনিবের ঘরে থাকার, শোবার সৌভাগ্য কজন কিষেনের হয়?

এখানেও নিজের ঘরের মতো ভোঁসভোঁস করে ঘুমোবি। অসুবিধে কী? দৈনিক দুখান বাড়তি রুটি, মুড়ি চা জুটছে। আর কী চাই!

তাপুরিয়া বলতো, মাঝে মাঝে বউকে এখানে বেড়াতে নিয়ে আসবি। নতুন বউ আন্নাকে মনিব-বাড়িতে বিয়ের ঠিক পরে একবার নিয়ে এসেছিল নরহরি। সেই প্রথম, সেই শেষ। মনিববাড়িতে আন্না দ্বিতীয়বার যেতে রাজি হয়নি।

হিমে ভেজা অন্ধকার উঠোনে নরহরির মুখে তার জীবনের রহস্যময় গল্প শুনেছিল অজিত। পায়ের ব্যথা ভুলে উবু হয়ে বসেছে মোতি। লম্বা শ্বাস ছেড়ে নরহরি বলল, ঘরে বন্দুক থাকতেও আমার তেজী মুনিব রেহাই দেয়নি আমাকে। একটু চুপ থেকে নরহরি বলল, সুমুন্দিরে ইবার জবাই করার সময় এসেছে। অনেক বছর ধরে রাতের বেলায় বরদাসোন্দরীকে মনিব-বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছি। গিন্নিমাও টের পায়নি।

আমার ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বরদাসোন্দরীকে নিয়ে কর্তা যখন নৌকাবিহার করেছে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে তখন গোয়ালে বসে থেকেছি আমি।

সারাদিনের খাটুনিতে শরীর নেতিয়ে গেলেও বরদাসোন্দরী না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমের হুকুম পাইনি। গোয়ালঘরে বরদাসোন্দরীকে নিয়ে কর্তা যখন মৌজ করছে অন্ধকারে বসে আমি ভাবছি আন্নার কথা। ঘরে একা কাঁচা বউ ভয়ে মরছে। লাঞ্ছনা নিগ্রহের কথা বলতে নরহরি যে জেগে তেতে উঠছে, তার গলার স্বর, বসার ভঙ্গিতে বুঝতে পারছে অজিত। নরহরির সঙ্গে অজিত, মোতি, বুধনকে কথা বলার জন্যে রেখে গেছে কিশোর। এখানে কাজ করতে এসে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে কিশোর, অজিত। গরীব মানুষের অপমানিত জীবনের দুঃখ, লাঞ্ছনার স্মৃতি বারবার উসকে দিলে তারা জেগে ওঠে। তাদের চেতনায় ভয়ঙ্কর রূপান্তর ঘটে যায়। বিপ্লবী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার এ এক মোক্ষম উপায়। নিজেদের জীবন কাহিনী বারবার বলার সুযোগ দিতে হবে তাদের। রাজনীতি প্রচারে এ পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে উপকার পেয়েছে কিশোর। মাঝ রাতে নরহরির সঙ্গে কথা বলার জন্যে তাই অজিত মোতি বুধনকে রবির বাড়িতে রেখে গেছে কিশোর। সে যা চেয়েছিল, তাই ঘটেছে। তাজা, তপ্ত হয়ে উঠেছে নরহরি। শুকনো ঠোঁট চেটে নরহরি বলল, এক রাতে মুনিবের বাড়ির পাঁচিল টপকে ঘরে গেলাম। বউকে অবাক করে দেবো ভেবে আনন্দে ধড়ফড় করছিল বুক। ডরও লাগছিল। ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম অন্ধকারে। ভেতর থেকে আন্না জিজ্ঞেস করলো, কে?

সাড়া দিলাম, আমি।

আন্না দরজা খুলে ডেকে নিল আমাকে। তারপর চোরের মতো পাঁচিল টপকে আমার আসার কথা শুনে কাঠ হয়ে গেল আন্না। বলল, লুকিয়ে আইছো তুমি। তোমার সাথে আমি শুবো না।

আন্নার কথায় মাথা ঘুরে গেল আমার। লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলাম। একটা এসপার ওসপার করার জন্যে এখন মুনিবের ঘরে পড়ে আছি আমি।

নরহরি চুপ করতে নীরব হয়ে গেল চারপাশ। লম্বা টান দিয়ে বিড়ির সুতো পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলল অজিত।

কুড়ি

দাঁতকপাটি লেগে একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বেহুঁশ হয়ে আর জাগলো না বাবা। সেদিন ছিল রবিবার, ছুটি। রেবা কাজে যায়নি। কাচাকুচির জন্যে সাবান জলে কাপড় জামা ভিজিয়ে বাইরের সরু চাতালে বসে রগড়ে, ঘসে কাপড় সাফ করছিল রেবা। রবিবার ছাড়া সময় পায় না সে। হঠাৎ জ্যোৎস্নার আর্ত চিৎকার। সে বলল, মেজদি কেমন করছে বাবা। কাচাকুচি ফেলে দৌড়ে ঘরে ঢুকে রেবা দেখলো, দু চোখ বুজে মেঝেতে শুয়ে আছে বাবা। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ, বাবার দু'কস দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। চটের আড়াল দেওয়া এক টুকরো স্নানঘরে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঘরে ঢুকে তপতী দেখলো ছোট দু' বোন কান্না জুড়েছে।

ডাক্তার ডাকলো প্রতিবেশীরা। মনীন্দ্র ঘোষালকে টিপেটুপে, চোখের বন্ধ পাতা টেনে খুলে পরীক্ষা করে ডাক্তার বলল, কিছু করার নেই। হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু রুগীর যা অবস্থা!

ডাক্তারের কথা ফলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মারা গেল মনীন্দ্র। বাড়ির সকলের আকাশ ফাটানো কান্নার মধ্যেও জল ছিল না রেবার চোখে। তার চোখের সব জল যেন শুকিয়ে গেছে। অসুস্থ রণ্টু ভ্যাবলা চোখে মৃত বাবার দিকে তাকিয়ে কাকের পালক চিবোচ্ছে। শোক, তাপ কিছুই স্পর্শ করেনি তাকে। মনীন্দ্রের সৎকারের জন্যে দলবল নিয়ে শ্মশানে গেল বিশু। বস্তির বয়স্ক দু' চারজন মানুষ এসে দাঁড়ালেও বিশুর ভয়ে শ্মশানে গেল না কেউ। তপতীকে বাড়ি আগলাবার জন্যে রেখে রেবা, আলো শ্মশানে গিয়েছিল। সাতদিনে অশৌচ শেষ হতে অষ্টম দিনে ব্যাগ ঝুলিয়ে কাজে বেরোলো রেবা। অনেক কাজ জমে গেছে।

দুপুর শুরু হওয়ার আগে গড়িয়াহাটার এক বাড়িতে তুলোয় ক্রিম লাগিয়ে রিসিভার মুছে স্পিকারে সুগন্ধি স্প্রে ছড়িয়ে দিল রেবা। পরিষ্কার সাদা কাপড়ে মুছলো টেলিফোনের কালো শরীর। ফোন সাফা করার সময়ে প্রায়ই রেবার শরীর মন প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়। সে ভাবতে থাকে এখনই ঝমঝম করে বেজে উঠবে টেলিফোন। অনেক দূর থেকে তাকে ডেকে কেউ বলবে, তুমি যা দেখেছিলে, এখন তা নেই, একদম বদলে গেছে পৃথিবী। সবুজ পাতায় হাসছে রাস্তার নেড়া গাছ। নোংরা, অস্বাস্থ্যকর বস্তি ভেঙে তৈরি হয়েছে আলো, হাওয়ায় ভরপুর ছিমছাম সুন্দর আবাসন। সেখানে মানুষ কাঁদে না।

মনোরম স্বপ্নে বুঁদ হয়ে টেলিফোন মুছতে মুছতে চোখ তুলে রেবা দেখলো, ঘরের এক কোণে ইজিচেয়ারে বসে মাঝবয়সী যে মানুষটা ইংরিজি খবরের কাগজ পড়ছিল, সে তাকিয়ে আছে। রেবার সঙ্গে চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি কাগজে মুখ ঢাকলো সে।

কাজে হাত লাগিয়েও রেবা বেশ বুঝতে পারছে, খবরের কাগজের পাশ থেকে তাকে লেহন করছে একজোড়া চোখ। হঠাৎ কিশোরের ওপর অভিমান হল তার। তার সঙ্গে দেখা না করে দ্যুতির কাছে একটা খবর রেখে কলকাতা ছেড়ে কিশোরের চলে যাওয়া উচিত হয়নি। এ যেন পালিয়ে যাওয়া। কান্নার মতো কিছু দলা পাকায় রেবার বুকে। বাবা মারা যাওয়ার পর মাথায় চেপেছে বিরাট পাহাড়। আর নড়াচড়ার শক্তি নেই তার। কোথাও যেতে পারবে না সে। পাহাড়ের চাপে পিষে যাবে সে। লম্বা জিভ দিয়ে তাকে শুষে নেবে ক্ষুধার্ত সংসার। রেহাই নেই, মুক্তি নেই তার। আর ভাবতে পারে না রেবা। মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। বাবা মারা যাওয়ার পনেরো দিন না পেরোতেই আলো নিখোঁজ। আলোর খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল বিশুও বাড়ি নেই। দিন দুই পরে রাত আটটা নাগাদ বিশুর এক চেলা এসে রেবাকে বলল, আজ গুরুব বিয়ে, ফুলশয্যে, জোড়া অনুষ্ঠান। আপনারা কেউ যাবেন নাকি ?

খবর শুনে বাজ পড়লো অন্ধকার ঘরে। সকলে বোবা কথা বলার শক্তি নেই। চাতালে দাঁড়িয়ে চারপাশের বাসিন্দাদের শুনিয়ে চেলা বলেছিল, ঠিক আছে, এখন না গেলে গুরুর বাচ্চার মুখে ভাতে যাবেন। খুব দেরি নেই।

লজ্জায় অপমানে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করলেও একটা কথা বলেনি রেবা। ছিন্নমূল, গরীব সংসার বোধহয় এভাবে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। হাজার চেষ্টায় সে ভাঙন ঠেকানো যায় না। মৃত মনীন্দ্র ঘোষালের পরিবার এ নিয়মের বাইরে নয়। সেই রাতে বোনেদের পাশে শুয়ে রেবা ভেবেছিল, আর কত নামতে হবে আমাদের ?

বিশু ভগ্নীপতি, আলোর স্বামী, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল রেবার। ব্ল্যাকে সিনেমার টিকিট বেচা, স্মাগলিং, ছিনতাই যার পেশা, কী ভাবে তার সঙ্গে ঘর করবে আলো ?

বাড়ি বাড়ি ঘুরে বকেয়া কাজ শেষ করতে সন্ধে হল। বাড়ি ফিরে রেবা যাবে প্রভাদির কাছে। প্রভাদির বাড়িতে সাতটায় পার্টির মহিলা শাখার সভা। পাঁচ, সাত মিনিট বাড়িতে কাটিয়ে সভায় পৌঁছে রেবা দেখলো, তখনও কেউ আসেনি। প্রভাদিও নেই। রেবার মনে হল থমথম করছে পাড়া। এ বাড়িতে আসার সময় রাস্তায় বিশেষ লোকজনও চোখে পড়েনি। একতলার বসার ঘরের ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে বসে অস্বস্তি হচ্ছে তার। মেয়েদের সভা, বৈঠক সাধারণত এ ঘরেই হয়। আজও হবে। সভা, বৈঠকে পার্টির অনিচ্ছা, ঢিলেঢালা ভাব কিছু দিন হল লক্ষ্য করছে রেবা। হপ্তা তিন আগে রেবাকে গণপতি বলেছিল, এত মিটিং ফিটিং কী দরকার ? মূল কাজ হল গেরিলা যুদ্ধ। গোপন পার্টির সভাও গেরিলা কায়দায় করতে হবে। সেভাবে কাজ করতে তৈরি থাকো।

রেবা তৈরি। কিন্তু কোনো কাজে ইদানীং ডাক পড়ে না তার। কয়েকমাস আগেও গোপন জরুরী চিঠি, দলিল লেনদেন, পলাতক কমরেডদের শেলটারে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ছিল তার ওপর। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে সব। পার্টি যেন ভুলে গেছে তাকে। অথচ চেনাজানা পার্টি কর্মীদের মুখ চোখের উত্তেজনা, সতর্ক চালচলন দেখে সে বোঝে, তার কাজ না থাকলেও বসে নেই কেউ। কোথায় কোন কাজ তারা

করছে, জানার আগ্রহ চেপে রেখেছে সে। প্রশ্ন না করা এখন পার্টিতে চালু রীতি। কেউ প্রশ্ন করে না অন্যজনকে। প্রত্যেকেই গেরিলা কাজে ব্যস্ত, এমন একটা ধারণায় সকলে চুপচাপ থাকে। গোপন কাজের যোগফল, হিসেব কী দাঁড়াচ্ছে রেবা জানে না। তবে হিসেব জানতে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কোনো দিক থেকে কিছু জানতে না পারলে দুঃখ হয়।

মাঝখানে একবার একটা চিঠি, দুটো প্যাকেট তাকে দু জায়গায় পেঁছে দিতে বলেছিল গণপতি। খুশি মনে দায়িত্ব পালন করেছিল রেবা। পার্টি পত্রিকার দপ্তরে পুলিশ তালা মেরে দেবার পর থেকে গোপনে, অনিয়মিত বেরোচ্ছে দেশব্রতী। অনেক চেষ্টায় দু' একটা সংখ্যা জোগাড় করতে পারে সে। প্রভাদি একদিন বলল, কিছু ভুঁইফোড় নেতা ক্ষমতাবান হচ্ছে পার্টিতে। তারা খেয়াল খুশি মতো কাউকে তুলছে, কাউকে ফেলছে।. পার্টি থেকে তাকে সরিয়ে রাখতেও তাদের হাত।

জংলা প্রিন্ট নাইলন শাড়ি, চোখে রঙিন চশমা, ঠোঁটে গাঢ় চকোলেট রঙ লিপস্টিক, শ্যাম্পু করা এলো চুল সুসজ্জিতা নন্দিতার সঙ্গে এক বিকেলে ধর্মতলায় রেবার দেখা হয়েছিল। নন্দিতাকে প্রথমে চিনতে পারেনি রেবা। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নন্দিতা। নন্দিতার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রেবা প্রশ্ন করল, কী খবর? ফিসফিস করে নন্দিতা বলল, খুব ভালো। ঝড়ের গতিতে কাজ হচ্ছে। জরুরী, গোপন সভা আছে। চললাম।

দ্বিতীয় প্রশ্নের সুযোগ রেবাকে না দিয়ে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা সাদা অ্যামবাসাডর গাড়িতে উঠে গেল নন্দিতা। হুস করে গাড়ি চলে যাবার পর নন্দিতার পোশাক, কথা, আচরণ, রেবার কাছে হেঁয়ালি মনে হয়েছিল। দিন কয় পরে নন্দিতার নাম শুনে গণপতি বলেছিল, ডেঞ্জারাস মেয়ে পুলিশের লোক।

গণপতির কথায় ধাঁধা লাগলেও রেবা কোনো প্রশ্ন করেনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও প্রভাদি না ফেরায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রেবা। নির্জন রাস্তায় ছায়ার মতো ছড়িয়ে আছে মৃদু আলো। অল্প এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরে হারুদার বাড়ি। হারুদার বাড়ির সামনে মানুষের জটলা। দূর থেকেই সে ভিড় নজর করেছে রেবা। টুকরো কথা শোনা যাচ্ছে। কাছাকাছি এসে জটলার সামনে প্রভাদিকে দেখতে পেল রেবা। উত্তেজিত প্রভাদি রেবাকে দেখে প্রশ্ন করলো, শুনেছো?

প্রভাদির মুখ শুকনো, দু চোখ বসে গেছে। ঠিক কী যে হয়েছে, রেবা বুঝতে পারলো না। প্রভাদি বলল, হারুবাবুর মেজদা খুন হয়েছেন। শিবপুরে গঙ্গার ধারে আরো দুটো ছেলের সঙ্গে তার লাশ দু' দিন আগে পাওয়া গেছে।

বিকেলে হারুবাবুর বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। ডেডবডি নেবার জন্যে বলে গেছে।

কারা কারা খুন করল?

মুখে এলেও প্রশ্নটা করতে পারলো না রেবা। ছাত্র, যুবক, তরুণদের কোন সংগঠিত শক্তি খুন করছে এ খবর এখন সকলে জানে। জেনেও মানুষ চুপ। ভয়ে

তাদের নাম মুখে আনে না। সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিপন্ন মুখে টাকে হাত বোলাচ্ছে হারুদা।

যাবেন তো, প্রভাদিকে প্রশ্ন করলো হারুদা।

হ্যাঁ চলুন, প্রভাদি বলল।

কাঁধে রাখা ঢলঢলে জামা শরীরে গলিয়ে নিল হারুদা। বিড়বিড় করলো, ডুবো জাহাজ নিয়ে হয়ত শত্রুতা করলো কেউ।

দেরি করে লাভ নেই।

হারুদার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে প্রভাদি বলল। সদর দরজার সিঁড়িতে বসে আছে হারুদার বড়দা। চোখে মোটা কাচের চশমা, আকাশের দিকে দৃষ্টি। মাথা থেকে মুছে গেছে সব অঙ্ক। প্রভাদির সঙ্গে থানায় যাবার জন্যে হারুদা ডাকতে শুনতে পেল না বড়দা। প্রভাদি ছাড়া আর কেউ সঙ্গী হল না হারুদার। থানায় যেতে এখন ভয় পায় সকলে। প্রভাদি চলে যেতে রেবার মনে পড়লো, দ্যুতি, দীপ্তির কোনো খবর অনেক দিন পায়নি সে। কিছু কেনাকাটার জন্যে বাজারের দিকে রেবা পা বাড়ালো।

একুশ

আকাশে মেঘ ছিল। হাওয়া বন্ধ হতে বোঝা গেল, যে কোনো সময়ে বৃষ্টি নামবে। ফ্যাকাসে আলোয় দূরে আবছা তরণী পাহাড়। দুপুর বারোটা। গাঁয়ের কুলিতে লোকজন কম। নরহরির ভিটে থেকে তাপুরিয়ার বাড়িতে যাবে গেরিলা স্কোয়াড। নরহরির ছোট্ট কুঁড়েতে আজ কাঠের উনুনে লোহার কড়ায় ছোলা ভাজছে নরহরির বউ আন্না। তাপুরিয়ার গোয়ালের গোরুগুলোকে এখন জাবনা দিচ্ছে নরহরি। স্কোয়াড বেরোবার সময় লখাই বলল, আমি যাবো তুমাদের সাথে।

লখাই-এর দুচোখ লাল। স্কোয়াডের কম্যান্ডার, দলপতি হল বুধন। তার অনুমতির অপেক্ষা না করে স্কোয়াডে ঢুকে গেল লখাই। শরীর জড়ানো চাদরের তলায় দা, ভোজালি, কাস্তে নিয়েছে রবি, বুধন, বাঘা। লখাইকে অজিত বলল, সদর দরজা দিয়ে ঢুকবো মোতি আর আমি। তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে।

রক্তাক্ত চোখে অজিতের দিকে তাকিয়ে কোনো জবাব দিল না লখাই। তাপুরিয়ার বাড়ির সদর এবং খিড়কির দুটো দরজা নরহরি খুলে রাখবে। স্কোয়াড রওনা হবার পর কিশোর বরুণ, গাঁয়ের কয়েকজন অপেক্ষা করতে লাগলো কুলিতে।

সদর দরজা পেরিয়ে ছড়ানো খামারের মাঝখানে চেয়ারে বসে নারান তাপুরিয়া একজন মুনিষের সঙ্গে কথা বলছিল। ভেজানো দরজা ঠেলে অজিত, মোতি, লখাই ভেতরে ঢুকতে অবাক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো তাপুরিয়া। তাপুরিয়ার বয়স বছর পঞ্চাশ, মোটা শরীর, কালো রঙ। মোতি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সে প্রশ্ন করল, কী চাই ?

তাপুরিয়ার চোখের ছলছল চাউনি, গলার স্বরে বোঝা গেল, ভয় পেয়েছে সে। জেলার নানা খবর শুনে ভয় পাবারই কথা। তখনই বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে রবি, বুধন, বাঘা খামারে হাজির হল। রবিকে দেখে কেঁপে উঠলো তাপুরিয়া। কিন্তু সে টু শব্দ করার আগেই বুধনের রামদার কোপ পড়লো তার ঘাড়ে। এক কোপে শেষ। ঘাড়ে খুব আলগা ভাবে লেগে আছে মাথাটা। রক্তে ভাসছে চারপাশ। দোতলা থেকে এই দৃশ্য দেখে আর্ত চিৎকার তুলে বেহুঁশ হয়ে গেল নারানের বউ। শান বাঁধানো মেঝেতে তার পড়ার শব্দ খামারে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল রবি। নেশার ঝোঁকে স্কোয়াডের সঙ্গে এলেও রক্ত দেখে ভয় পেয়ে গেল লখাই। দু'হাতে চোখ মুছে তাপুরিয়াকে একবার দেখলো সে। তারপর খেপাটে একটা আওয়াজ করে দরজা পার হয়ে দৌড়োতে শুরু করলো। অজিত ডাকতেও পেছনে তাকালো না লখাই।

গেরিলা স্কোয়াড মাঝিপাড়ায় ফেরার আগেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল খতমের

খবর। গাঁয়ে ঢুকতেই বুধন, বাঘা, রবি, মোতি, অজিতকে ঘিরে ধরলো উল্লসিত মানুষ। ধামা ভরা মুড়ি, ডেকচি ভরতি চা এল কুলিতে। গাঁয়ের মানুষের ভেট। মাদলের দ্রিম দ্রিম শব্দ শুনে কিশোরের মনে হল উৎসব শুরু হয়েছে। আশপাশের গ্রাম থেকে যারা এসেছিল, গেরিলা স্কোয়াডকে ভোজ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল তারা। আনন্দ হইচই নাচগানের মধ্যেও কিশোর ভাবছিলো, এখনই একবার বসা দরকার। চিমনজানের মৃত্যুর চেয়ে তাপুরিয়ার খতম অনেক বড় ঘটনা। বিন্দু ভেঙে এবার ঝড় উঠবে। পুলিশ, মিলিটারি, গোটা রাষ্ট্রশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তার আগে যতটা সম্ভব গুছিয়ে নেওয়া উচিত।

মাদলের সঙ্গে পা মিলিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে নাচ জুড়ে দিয়েছে অজিত। মুড়ি চিবোতে চিবোতে নাচ দেখছে মোতি। তার গোড়ালিতে এখনও সামান্য ব্যথা আছে। ঘরে ফিরতে চাইছে বাঘা।' কিশোরের হাত দু'হাতে চেপে ধরে বরুণ বলল, তোমাদের মতো প্রচারের কাজ জেলার কোনো ইউনিট করেনি। খতম শুরু হতে দেরি হলেও এখানের লড়াই মরবে না।

বরুণের প্রশংসায় তৃপ্তির পাশাপাশি অহমিকা বোধ করলো কিশোর। তার যোগা-যোগেই বাগজোগরায় এসেছে বরুণ। মশানজোড় থেকে তাঁতিপাড়া পর্যন্ত কিশোরের সঙ্গে কয়েকবার ঘুরে বরুণ বুঝেছিল যে, এলাকার গরীব মানুষের মধ্যে কিশোরের জনপ্রিয়তা সীমাহীন। এ জনপ্রিয়তা সাময়িক নয়, এর মূল অনেক গভীরে। রাজনীতির সূত্রে কিশোর অর্জন করেছে জনপ্রিয়তা তবু কিশোর সম্পর্কে বরুণের কিছু দ্বিধা ছিল। এখন মনে হচ্ছে, এই দ্বিধা, সংশয় ভিত্তিহীন। দক্ষিণ দেশ গোষ্ঠী ছেড়ে পার্টিতে এসে পার্টির রাজনীতিই চর্চা করছে কিশোর।

সভা শুরু হতে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামলো। নাচের আসর ভেঙ্গে যেতে রবির বাড়ির দাওয়ায় এসে বসলো অজিত। খতমের রিপোর্ট রবি করার সময়ে দেখা গেল, সভায় বুধন নেই। বুধন কোথায় বলতে পারলো না কেউ। বৃষ্টির সঙ্গে বইছে হু হু ঠাণ্ডা বাতাস। সামনে শালের জঙ্গল থেকে বৃষ্টির মধ্যে কেউ ছুটে আসছে। প্রবল বৃষ্টিতে ঝাপসা দেখাচ্ছে তাকে। কাছে আসতে কিশোর দেখলো লখাইকে। ভয় অথবা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে লখাই। বুধন কোথায়?

প্রশ্ন শুনে কিশোরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো লখাই। বৃষ্টির মধ্যে রবি, অজিত খুঁজতে গেল বুধনকে। লখাই বসেছে বাঘার গা ঘেঁসে। জান, ডানের ভয়ে লখাই এখন একা থাকতে পারে না। আরো একটা দুশ্চিন্তা, প্রশ্ন ঢুকেছে তার মাথায়। খুন করলে কতদিনে শুকিয়ে, খসে যায় হাত? প্রায়ই একাগ্র চোখে নিজের ডান হাত কতটা শুকোলো, বোঝার জন্যে তাকিয়ে থাকে লখাই। ভগতরাম মহাজনের দুমকার বাড়িতে বাসন মাজার কাজে ঝুমরিকে পাঠিয়ে জেল থেকে খালাস পেয়েছে কুঞ্জ মাঝি। খবর শুনে ভালোরকম বিগড়েছে লখাই-এর মাথা। তাকে ঠাণ্ডা রাখতে বুধন বলেছে যে, সে দুমকায় গিয়ে নিয়ে আসবে ঝুমরিকে। সরল লখাই বিশ্বাস করেছে বুধনের কথা। দুমকা থেকে ঝুমরি ফিরলে প্রথমে তিলকচুরি, তারপর সাঙার ব্যবস্থা হবে। গাঁয়ের মোস্তাগীর, আর বুধনের বাবা উদ্যোগ নেবে।

গাঁয়ের বাইরে ইট বাঁধানো প্রাচীন একটা শালগাছের তলায়, জাহির থানে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিল বুধন। বিরাট শালগাছের অসংখ্য বড়, ছোট ডালে ঝুলছে সুতোয় বাঁধা কয়েকশো ইটের টুকরো। রঙ করা পোড়া মাটির দু' তিন ডজন মালসা মোটা গুঁড়ির চারপাশে সাজানো। একটা শেকড়ের ওপর গুম হয়ে বসেছে বুধন। ঝরঝর করে মাথায় পড়ছে বৃষ্টির জল। বুধনের খেয়াল নেই। চারপাশ নিঝুম, ফাঁকা! অজিত ডাকতে ঘাড় তুলে তাকালো বধন। বুধনের দু' চোখ লাল। তার গায়ে হাত দিয়ে অজিত দেখলো, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। বুধনের কাঁধে হাত রেখে অজিত বলল, চল, ঘরকে যাই।

অজিতের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো বুধন। দু' হাতে বুধনের দু' কাঁধ ধরে জোর ঝাঁকুনি দিয়ে রবি বলল, এ্যাই মরদ, তুই কাঁদিস ক্যানে? ইস্কুলের ময়দানে কাঁদিলে চলবে না।

বুধনকে চাঙ্গা করতে নানা গল্প শোনাচ্ছে অজিত। বাহেঙ্গায় ফিরে এক ডোজ ড্যালক্যামেরা বুধনকে খাইয়ে দেবে সে। রবির বাড়ির দাওয়ায় বসে একটা ছোটো-খাটো সভা করলো তারা। গেরিলা স্কোয়াডের লুকিয়ে থাকা, যোগাযোগ, চলা-ফেরার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হল। সভার শেষে গামছার খুঁটে গরম ছোলাভাজা বেঁধে সভায় এল নরহরি। খুশিতে উত্তেজনায় ঝলমল করছে তার মুখ। সভার মাঝখানে মাটিতে ছোলাভাজা ঢেলে দিয়ে নরহরি বলল, তুমাদের জন্যে এগুলো পাঠিয়েছে বউ।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে নরহরি বলল, তুমাদের দলে আমাকে নিয়ে যাও। আমার বউ বলেছে, আমি না লড়লে সে ঘর করবে না আমার।

নরহরিকে কিশোর বলল, ঘরে থেকো না কয়েকদিন!

বিকেল শেষ হবার আগে মেঘে অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। তাঁতলুই গ্রাম সুনসান, শব্দহীন। হাওয়ায় মিশে গেছে গেরিলা স্কোয়াড।

বাইশ

শোভাবাজার পাড়ার চারটে বাড়িতে টেলিফোন সাফ করে প্রায় মাঝ দুপুরে গ্রে স্ট্রিট ধরে হাঁটছে রেবা। দুপুর দুটোয় জিপিওর নিচে শিবানীর সঙ্গে দেখা করার কথা। তার জন্যে শিবানী একটা পার্ট টাইম কাজের খোঁজ এনেছে। সেই অফিসে আজই তাকে নিয়ে যাবে শিবানী। দেখা যাক কী হয়! সামনে লম্বা রকের ওপর একদল ছেলে গুলতানি করছে। তাদের বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশ। সকলেরই পাট করা ভেজা চুল। কারো মুখে পান, সিগারেট টানছে কেউ কেউ। হেমন্তের দুপুরে খাওয়া শেষ করে অড্ডায় বসেছে তারা। রক থেকে ভেসে আসা টুকরো কথা শুনতে পাচ্ছে রেবা। একজন বলল, বাঙালীর মতো এমন কুঁড়ে জাত আর নেই। শুধু বড় বড় বাত আর রাজনীতি। মেড়ো, খোট্টারা চুষে খাচ্ছে রাজ্যটাকে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে রেবা হাঁটছে। জায়গাটা তাড়াতাড়ি পার হতে চায় সে। তাকে দেখে আড্ডাধারীদের গলা চড়ছে। নানা কথা বলে রেবার নজর কাড়তে চাইছে তারা। ওদের দিকে এখন একবার তাকালে আর রক্ষে নেই। এমন সব মন্তব্য করবে, যে আঙুল দিতে হবে কানে। ছেলেদের ওপর এমনিতে রেবার কোনো বিদ্বেষ নেই! মাঝে মাঝে শুধু মনে হয়, ছেলেরা আরও একটু সাহসী, রুচিবান হলে অনেক বেড়ে যেত তাদের এবং মেয়েদের মর্যাদা। তখন রেবার মাথায় ভেসে ওঠে কিশোরের মুখ। সকলে যদি কিশোরের মতো হত!

পায়ের কাছে এক ধাবড়া পানের পিক এসে পড়তে চমকে উঠল রেবা। তাড়াতাড়ি বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে স্বস্তি পায় সে!

কে যেন বলল, গোড়ালি দুটো দেখছিস?

খরায় ফেটে গেছে, আর একজন বলল।

খরা দিনির্মাণ, ফুট কাটলো একটা গলা! শীতের আগেই রেবার গোড়ালি ফাটতে শুরু করেছে। দাগগুলো কম বেশি থেকে যায়। ক্রিম গ্লিসারিন দিয়ে পা পরিচর্যার সামর্থ্য নেই তার। কথাগুলো শুনে লজ্জায় কুঁচকে যাচ্ছিল সে। কান্না পাচ্ছে। তার ফাটা গোড়ালি কিশোর কী কখনো দেখেছে? আড্ডা থেকে এক হেঁড়ে গলা হেঁকে উঠলো, হে ভারত ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ।

মেঘলা আকাশ, রাস্তায় মানুষজন কম। বাসস্টপে পৌঁছে লম্বা নিঃশ্বাস ফেললো রেবা। গুমোট আবহাওয়া, যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। বৃষ্টি শুরু হলে বাসে এমন ভিড় হয় যে তিলধারণের জায়গা থাকে না। তখন বাসে ওঠা মুশকিল। বাড়ির কথা মনে হল তার। ভাঙাচোরা সংসারের শরীর থেকে ছোবড়া বেরিয়ে পড়ছে। বাবার পেনসন আর প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের জন্যে তপতী রোজ বাবার

অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে। তদ্বির করছে। হয়ত বাবার অফিসে তপতীর একটা চাকরি হবে। কিন্তু সংসার যে আর চলে না! মা ভুগছে। একজন ভালো ডাক্তার দেখিয়ে এখনই মায়ের ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। রুণ্টু স্বাভাবিক মানুষ হলে দুশ্চিন্তা কমতো। রেবা জানে, তাদের মতো উপোসী আধমরা মানুষের সংখ্যা এদেশে কম নয়। কাগজে পড়েছে দেশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বেঁচে আছে। সেটা কীরকম? তারা যেভাবে বেঁচে আছে হয়ত তার চেয়ে আরো খারাপ। কত খারাপ অবস্থার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? দুটো ফুটোফাটা টালির ঘরের নিচে সকাল সন্ধ্যে তারা যা খায়, আস্তাকুঁড় ঘাঁটা খাবারের চেয়ে সেগুলো কী খুব উঁচুমানের? বরং তাদের বস্তিতে যে দু'তিনটে শ্রমিক পরিবার আছে, তাদের সংসার অনেক স্বচ্ছল। ছাপরা না ভাগলপুর থেকে এসেছে তারা। চটকলে, রঙকারখানায় বাড়ির মেয়ে, পুরুষ কাজ করে। তাদের ঘরে ফ্যান, ট্রানজিস্টার আছে। ঝকঝকে পেতলের কাঁসিতে সাদা দানার ভাত, ডাল আর লোটায় দুধ নিয়ে খেতে বসে তারা। ছুটির দিনে মাঝরাত পর্যন্ত কাওয়ালি গায়। তাদের হাসিতে জীর্ণ বস্তি মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। পাশাপাশি নিজেদের ম্লান মধ্যবিত্ত অবস্থানের তুলনা করে দিশেহারা হয়ে যায় রেবা। আশপাশের ঘরে ভালো কিছু, মাছ মাংস রান্না হলে সুগন্ধে বস্তির বাতাস ভারী হয়। তখন রান্নার কাছাকাছি ছোট দুই বোন ছুঁকছুঁক করে। এই ওদের অভ্যেস। বারো বছরের বাসনাকে একদিন পরেশ দাসের বউ এমন মারলো, যে ঠোঁট ফেটে গেল তার। মাংসের গন্ধে পরেশের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল বাসনা। উনুনের সামনে বসেছিল পরেশ। তার বউ গিয়েছিল তেল কিনতে। তেলের শিশি নিতে ভুলে যাওয়ায় মাঝরাস্তা থেকে ফিরে এসেছিল। ঘরে ফিরে সে কী দেখেছিল, রেবা জানে না। বাসনার কান্না, পরেশের বউ-এর চেঁচানি শুনে রেবা গিয়ে উদ্ধার করেছিল ছোট বোনকে। অকথ্য গালাগালির সঙ্গে পরেশের বউ যা বলেছিল, তার অর্থ হল, পরেশের সঙ্গে মাংসের লোভে বাসনা ঢলাঢলি করার চেষ্টা করেছে। ঢলাঢলি মানে কী? পরেশ কী মুখ বুজে বসেছিল? বাসনার ফ্রকের বুকের কাছটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। রক্তমাখা মুখে হাত চেপে ফোঁপাচ্ছিল সে। বস্তির মধ্যে সে এক হুল্লা কেলেঙ্কারি। এরকম প্রায় হয়। গায়ে মাখে না, মনে রাখে না কেউ। দিন দুই পরে ইলেকট্রিকের দোকানের কালুর কাছে অপমানিত হয়ে জ্যোৎস্নাও খুব কেঁদেছিল। তাকে শান্ত করতে অনেক বুঝিয়েছিল রেবা। পৃথিবীতে তাদের চেয়েও যে অনেক গরীবলোক আছে, তারা যে একবেলাও পেট ভরে খেতে পায় না, ঠিকে ঝি মানদা যে রাস্তার গাড়ি বারান্দার নিচে থাকে, বর্ষায় তার সংসার ভেসে যায়, তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে শীতের সময়ে সারারাত ঠকঠক করে কাঁপে, রেবা মনে রাখতে বলেছিল জ্যোৎস্নাকে।

দিদির কথা চুপচাপ শুনলেও জ্যোৎস্না মেনে নেয়নি। বলেছিল, তুই থাম মেজদি। মানদা ছাড়াও দেখার মানুষ অনেক আছে। তারা পাকা বাড়িতে থাকে, ভালো খায়, ভালো পরে। তাদের না দেখিয়ে তুই শুধু দুঃখী মানুষগুলোকে দেখাচ্ছিস কেন? আলোকে যখন আমরা গাল দিই, তখন বিশুদার চেয়েও অনেক

মেয়ের যে খারাপ বর আছে, একথা আলো বলতে পারে।

রেবা কথা বাড়ায়নি। জ্যোৎস্না খুব ঠাণ্ডা, বাধ্য মেয়ে। সংসারের জন্যে সে ভাবে। সেই মেয়েও ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, টের পেয়েছিল রেবা। জ্যোৎস্নার কথা সচকিত করেছিল তাকে। মানুষের চোখের মণি দুটো এমনভাবে তৈরি যে, ডাইনে, বাঁয়ে, ওপরে, নিচে সববিছু দেখে। দেখতে চায়। ভূলুণ্ঠিত একতরফা দৃষ্টি নিয়ে মানুষ জন্মায় না। কিন্তু ছাপোষা মধ্যবিত্ত সংসারে এভাবেই দেখতে শেখানো হয়। সবচেয়ে সস্তা একটা ফ্রক এনে বাবা বলতো, এ জিনিসও অনেকের জোটে না। কত ছেলেমেয়ে খালি গায়ে থাকে।

বাবার কথা যে মিথ্যে নয়, রেবা জানতো। এই বস্তির মধ্যে চোখের সামনে উদোম, উপোসী অনেক অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে আজও বড়ো হচ্ছে। তাদের তুলনায় রেবাদের সংসারের অবস্থা অনেক ভালো। কিন্তু জ্যোৎস্না সেদিন খোলাখুলি অন্যরকম এক দেখার কথা বলে সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল রেবাকে। জীবন যে একরঙা, একমেটে নয়, নানাভাবে জীবনকে দেখা যায়, দেখা উচিত, রেবা ধরতে পেরেছিল। জ্যোৎস্নাকে রেবা বলতে চেয়েছিল, এ সমাজে ভারী গরমিল, বেশিরভাগ মানুষই আমাদের মতো গরীব, অসহায়, তাদের দিকে তাকিয়েই আমরা বেঁচে থাকি। বড়োলোকদের ছবি মাথায় রেখে বাঁচতে গেলে মরে ভূত হয়ে যাবো আমরা।

কথাগুলো মনে এলেও বলেনি রেবা।

দুটো ভিড় বাস ছেড়ে দিয়ে খালি ভেবে যে বাসে সে উঠলো, সেটাতেও গাদাগাদি ভিড়। বাইরে হুহু ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। দুমদাম বন্ধ হচ্ছে বাসের জানলা। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে বাস। গণপতির কথা রেবার মনে পড়লো। সেদিন হারুদার মেজদার মৃত্যুর খবর শুনে রেবার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে হাঁটছিল সে। বাজারের সামনে হঠাৎ গণপতির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাঁধে একটা কিড্‌স্‌ ব্যাগ, মুখে কয়েকদিনের দাড়ি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গণপতি মাঝবয়সী এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। পেছন থেকে মহিলাকে চিনতে পারেনি রেবা। কাছে গিয়ে দেখলো মিঠুর মা, ঊষাদি। রেবাকে দেখে তার কাঁধে হাত রেখে ঊষা প্রশ্ন করলো, কেমন আছো?

কী বলবে ভেবে না পেয়ে হাসার চেষ্টা করলো রেবা।

তোমার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েছি, ঊষা বললো।

কল্যাণ কেমন আছে, রেবা প্রশ্ন করলো।

তার কথাই গণপতিকে বলছিলাম, ঊষা জানালো। কিছু খাবার বানিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে আজ বিকেলে জেলখানায় গিয়েছিলাম কল্যাণকে দেখতে।

দেখা হল?

রেবার প্রশ্নে ঊষা বলল, হল। কিন্তু এ দেখার কোনো মানে হয় না।

কল্যাণ ঊষার জামাই। তার মেয়ে মিঠুর সঙ্গে বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে কল্যাণের। পার্টির জঙ্গী কর্মী কল্যাণ। পার্টির মহিলা সংগঠনের কাজ করতো মিঠু। সক্রিয় সদস্য। তখনই কল্যাণ, মিঠুর পরিচয়, বিয়ে। বিয়ের একমাস পরেই

আত্মগোপন করেছিল কল্যাণ। ছ' মাস আগে সে ধরা পড়লো পুরুলিয়ার এক গ্রাম থেকে। মহিলা সংগঠন করার সময়ে মিঠুর সঙ্গে রেবার পরিচয় হয়েছিল। গড়পারে বয়স্কা মহিলাদের এক সান্ধ্য স্কুলে মিঠু, রেবা পড়াতো। খুব ঠাণ্ডা, ভালো মেয়ে মিঠু। নিজেকে নিয়ে কোনো জাঁক করতো না। বলতো, আমি এটুকুই পারি। পড়ানো, সেলাই শেখানো, এর বেশি আমাকে দিয়ে হবে না।

ঊষা বললো, কল্যাণ কিছুতেই নিতে চাইছিলো না খাবার। বলল, সকলের জন্যে রেঁধে না আনলে খাবার নেবো না।

রেবার দিকে তাকিয়ে ঊষা প্রশ্ন করেছিলো, প্রায় পঞ্চাশজন একসঙ্গে আছে। সকলের খাবার তৈরি, আমার পক্ষে কী সম্ভব?

রেবাকে দেখে হাসার চেষ্টা করে সেই যে গণপতি গম্ভীর হয়েছিল, আর মুখ খুললো না। ঊষা বলল, ইণ্টারভিউ-এর ঘরে টিফিন ক্যারিয়ার দিয়ে ভাগাভাগি করে খেতে বললাম। জেলে খাবার দেওয়া ভারী মুশকিল, অনেক বলে জেলার সাহেবকে রাজি করিয়েছিলাম। সবচেয়ে বড়ো অপমান কল্যাণ করলো ইণ্টারভিউ শেষ হবার আগে।

গলা ভারী হয়ে উঠলো, ছলছল করছিলো ঊষার দু' চোখ। সকলের সামনে কল্যাণ বলল, ওসব জামাই ফামাই ছেঁদো সম্পর্ক, ভুলে যান। আমাকে কমরেড ভাবতে পারলে আসবেন। তা না হলে আসার দরকার নেই।

রেবা অবাক হয়ে ঊষার মুখের দিকে তাকাতে গণপতি বলেছিল, ভুল কিছু করেনি কল্যাণ। রাজনীতি বাদ দিয়ে আত্মীয়তা হয় না। আমাদের পার্টি এ আত্মীয়তা বিশ্বাস করে না।

গণপতির ব্যাখ্যা বুঝতে না পেরে রেবা প্রশ্ন করেছিল, জামাইকে কমরেড বলতে হবে?

বিরক্ত হয়ে রেবার দিকে তাকালো গণপতি। প্রশ্নের জবাব দিল না। গণপতি পার্টির এরিয়া কমিটির সম্পাদক। পুলিশ খুঁজছে তাকে। রাস্তায় বেশি সময় থাকলে বিপদ হতে পারে তার। রেবা বলল, একটু তাড়া আছে, আমি যাই। রাস্তা পেরিয়ে ঊষাও বাড়ির দিকে এগোলো। রেবার পাশাপাশি হাঁটছিল গণপতি। কয়েক পা এগিয়ে ডান দিকে আমহার্স্ট রো। সরু গলিতে ঢুকে গণপতি বলল, পার্টিকে মানছে না কিশোর। পার্টির মধ্যে খতম বিরোধী উপদল বানিয়েছে সে। এই উপদলের কিছু লোক কলকাতায়ও আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কিশোর। তাকে যারা মদত দিচ্ছে, তাদের খুঁজে বার করার দায়িত্ব পার্টি চাপিয়েছে আমার ওপর। হদিশও পেয়েছি কয়েকজনের।

গণপতির সব কথা ঢুকছিল না রেবার কানে। ভয়ে ঠাণ্ডা, অসাড় হয়ে যাচ্ছিল সে।

হঠাৎ খুব ঘনিষ্ঠ গলায় গণপতি বলল, পার্টি বিশ্বাস করে তোমাকে। আমিও করি। আমার অনুরোধ কিশোরের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ রেখো না। কিশোরকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দিও।

গণপতির সঙ্গে নির্জন অন্ধকার, সরু গলি দিয়ে হাঁটার সময়ে কিশোরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল রেবা। কিশোর যেন পাশে আছে। তার শরীরের তাপ পাচ্ছিল রেবা। গণপতিকে রেবা প্রশ্ন করল, পার্টি কি বয়কট করেছে আমাকে?

থুতনিতে হাত বুলিয়ে সোজা রেবার দিকে তাকিয়ে গণপতি বলেছিল, পার্টির কাজ কিছুদিন দেওয়া হবে না তোমাকে। পার্টি সভাতেও ডাকা হবে না। আজ ভুল করে সভার খবর দেওয়া হয়েছিল তোমাকে। তাই সভা হল না।

কিশোরের জন্যে দুশ্চিন্তায় রেবার পায়ের নিচে মাটি দুলছিল। কিশোর কী এমন করছে, যে, পার্টির সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না তার? গণপতি নিশ্চয় বাজে কথা বলছে না। গণপতি এখন সূর্যদার খুব কাছের মানুষ। সূর্যদার সঙ্গে দেখা করতে গণপতির অনুমতি লাগে। কার দেখা করা জরুরী, কার নয়, ঠিক করে গণপতি। কিছুদিন আগে পার্টির পলিটব্যুরোর এক মেম্বারকে সূর্যদার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি গণপতি। পার্টির যেখানে যা ঘটছে গণপতি জানতে পারে। কিশোর সম্পর্কে গণপতির বাড়তি আগ্রহের রহস্য রেবা জানে। জিপিওর কাছে বাস থেকে রেবা যখন নামলো তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।

তেইশ

তাঁতলুইতে নারান তাপুরিয়া খতম হতে আশপাশের দু তিন থানায় গরীব কৃষকদের মধ্যে শুরু হল আলোড়ন। সম্রাটকে ঘোড়া থেকে মাটিতে নামিয়ে অন্যায়, অপমানের যে জবাব দেওয়া যায়, এ সত্য আবিষ্কার করে আত্মবিশ্বাস, ইজ্জতবোধ ফিরে পেল সাধারণ মানুষ। বাঘাকে কম্যাণ্ডার করে দ্বিতীয় অ্যাকশনের ছক বানালো রবি। লড়াই করার ইতিহাস থাকায়, এ বিষয়ে রবির মাথা খুব পরিষ্কার। দলমত নির্বিশেষে গাঁয়ের মানুষ জড়ো করে বিপ্লবী কমিটি গড়ায় হাত দিল সে।

বিপ্লবী কমিটি গড়ার পরামর্শ দিয়েছিল কিশোর। রবিকে একদিন বলেছিল, লড়াই শুরু হলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দলাদলি কমে যায়। তকমা খসে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, ডান, বাম গরীব মানুষ নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। মেকি রাজনীতি সহ্য করে না তারা। গরীবদের খণ্ড বিচ্ছিন্ন রেখে গোষ্ঠীতন্ত্র, চালাতে চায় নেতৃত্ব। কারা শত্রু, কারা বন্ধু গোপন রাখে। শত্রুকে বন্ধুর মর্যাদা দেয়। গাঁয়ের কৃষক সভা, কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব, ধনী চাষী, জোতদাররা এভাবে দখল করে। বাম এবং দক্ষিণপন্থী সব শিবিরে এক ঘটনা। বিপ্লবী কমিটি গড়লে এই সাজানো সংগঠনগুলো হাওয়ায় উড়ে যাবে। প্রকাশ পাবে কায়েমী নেতৃত্বের আসল চেহারা।

কিশোরের ব্যাখ্যা রবির মনে ধরেছিল। ফসল দখলের লড়াই করে সে বুঝেছিল, গাঁয়ের মানুষের সম্পর্ক, মেলামেশা, লড়াই-এর ওঠানামার সঙ্গে বদলে যায়। তাই খতম শুরু হতেই বিপ্লবী কমিটি তৈরির উদ্যোগ নিল সে। আমজোড়ায় বসলো কমিটি তৈরির প্রথম সভা। প্রতিবেশী গাঁ থেকে সভায় এল কয়েকশো গরীব মানুষ। সাঁওতালদের সঙ্গে এল বাউরি, বাগদী, দুলেরা। নারান তাপুরিয়ার খতমের পর তাঁতলুই-এর হালচাল বলছিল জিয়ন মুর্মু। তাকে এগিয়ে দিয়েছিল রবি। জিয়নের ঘর আমজোড়ায় হলেও তাঁতলুই-এর ওপর নজর রাখছে সে। জিয়ন বলল, দলবল নিয়ে ভ্যানগাড়ি চেপে দারোগা এল মুরুব্বির লাশ নিতে। গাঁয়ের কিষাণহরেরা ঘিরে দাঁড়ালো লাশ। কিছুতেই লাশ তুলতে দেবে না। তারা বলছিল, আগে কুকুর আনো বটে, খুনীদের পাকড়াও, তবে লাশ পাবে। বন্দুকধারী সিপাইরা ঘিরে ধরলো কিষাণহরদের। দারোগা বলল, কুকুর তোমাদের বাঁচাতে লারবে গো, ভগবানকে ডাকো।

সন্ত্রস্ত দারোগার গলার স্বর নকল করে দেখালো জিয়ন। তারপর বলল, ভগবান তো আছেন বটে, তবে তিনি থাকেন বহুৎ দূরে, শুনতে পান না আমাদের ডাক।

জিয়নের কথায়, রগড়ে হাসির ধুম লাগলো সভায়। এখানকার সভা এরকম। বক্তৃতা আলোচনার চেয়ে বেশি হয় গল্পগুজব, হাসাহাসি, গান। সভাতে বসে হাড়িয়া খায় কেউ। কথার মধ্যে আমজোড়া গাঁয়ের প্রহ্লাদ মণ্ডলের নাম উঠতে ঘৃতাহুতি হল আগুনে। আমজোড়া এবং আশপাশের আরো অনেক গ্রামের হাজার হাজার মানুষকে শুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে প্রহ্লাদ। অত্যাচার, পাপের শাস্তি পেতে হবে তাকে।

ডগর মুর্মু বলল, আজকাল ঘর থেকে বেরোয় না পেল্লাদ! আর পাঁচজন কিষানহড়ের মতো ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকে সারাদিন। ঘরের মধ্যে হোলা বানিয়ে হাগা মোতা করছে।

সভা বসেছে আমজোড়ায় জিয়নের বাড়িতে। সভার পর সেখানেই শুরু হল ভোজ। গোরুর মাংস আর ভাত। মশলাহীন জলের মতো মাংসের ঝোল ভাতে মাখার সময়ে গন্ধ পেল কিশোর। মাংস মুখে দিয়ে বুঝলো, পচা। কিশোরের কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বরুণ বলল, প্রহ্লাদ মণ্ডলের একটা গোরু মরেছিল কাল বিকেলে। গোরুটার মাংস কাল মাঝরাতে শিয়াল, কুকুর তাড়িয়ে ভাগাড় থেকে নিয়ে এসেছে গাঁয়ের লোক। কিশোর, বরুণ কেউ মুখে তুলতে পারছে না মাংস। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে অজিত। দ্বিতীয় দফায় আরো মাংস নিল সে। অনেক মানুষের চিবোনো, লালা টানার আওয়াজে সজীব হয়ে উঠেছে অন্ধকার। কিশোরের পিঠে হাত রেখে জিয়নের গরমবা, মানে ঠাকুর্দা প্রশ্ন করল, খাচ্ছিস না ক্যানে?

বুড়োর মমতাময় দু চোখের দিকে তাকিয়ে এক টুকরো মাংস মুখে পুরলো কিশোর। দড়ির চারপায়া, পারকম পেতে বড়োরা বসেছিল দাওয়ার ওপর। বুকে হাত রেখে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে কেউ কেউ জোহর করছে জিয়নের ঠাকুর্দাকে। শালপাতার কুরিয়া ভরে হাঁড়িয়া খাচ্ছে কেউ কেউ। কেরোসিনের অভাবে আলো জ্বলে না সাঁওতাল পাড়ায়। সন্ধের পর ঝুপ করে রাত নামে। ঘন মধ্যরাত। বর্ষার আকাশে মেঘের সঙ্গে অভাব মিশে দিনরাত একই রকম অন্ধকার এখানে। গান-বাজনার শব্দ, উৎসব ছাড়া শোনা যায় না। নীরব মাদল ঝুলতে থাকে ঘরের দেওয়ালে। সভার জন্যে আজ সন্ধেতে বদলে গেছে গাঁয়ের চেহারা। সভা তো নয়, যেন মেলা! তেল চুকচুকে কালো খোঁপায় সাদা সাকামবাহার ফুল লাগিয়ে কুলিতে ঘুরছে মেয়েরা। হাওয়ায় সাকামবাহারের সুগন্ধ! জিয়নের গরমবা বলল, হেই কোরাকুরি, নাচ গান শুরু কর এবার।

নাচ গানে মেতে ওঠা সাঁওতাল পাড়ার রেওয়াজ। গরমবার কথায় কুলিতে দাঁড়ানো নওজোয়ান ছেলেমেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়লো। মাদল ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। মাদলে বোল উঠলো, দ্রিম, দ্রিম! বাঁশিতে উদাস সুর তুললো একজন। বাতাসে মিললো বাঁশির সুর। শুরু হল সমবেত গলার গান,

হেশফ বুথা হেশফ খেরা বইসি দাইকো
দুরুপ আকল বাবা দাইকো তালাকাড়ে
ইঞ দায়ঞা দশ টাকা আম দায়ঞা ইশি টাকা
বাধা দাঞুলো রারা রুয়ারে লড়হাই।

প্রেম করার জন্যে নায়ক নায়িকাকে যে জরিমানা দিতে হয়েছে, গানের কথায়, সুরে ছড়িয়ে পড়ছে সেই বিষাদ। জিয়নের গরমবা চারপায়ায় বসে হাততালি বাজাচ্ছে।

সাঁওতালদের সংঘবোধ, জাতি চেতনা প্রখর হলেও আধুনিক চিন্তা, চেতনায় পিছিয়ে আছে তারা। এখানে কাজ শুরু করার দিনগুলো মনে পড়ছিল কিশোরের। ভারতবর্ষ, স্বদেশ, ভারতীয়ত্ব, পিতৃভূমি, পৃথিবীর কথা এদের বোঝাতে হিমশিম খেয়েছে সে। ঘাম বেরিয়ে যেতো তার। কিন্তু বুঝতে শুরু করার পর তরতর করে এগিয়ে গিয়েছিল কিছু মানুষ। চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, বৃহৎ শক্তি, বিপ্লব ইত্যাদি শব্দগুলোর মানেও ধীরে ধীরে বুঝে গেল তারা। নিরক্ষর মানুষগুলোকে সচেতন করার জন্যে কিশোরের হাড়ভাঙা খাটুনি দেখে অজিত বলতো, এতো ব্যস্ত হবার দরকার কী? সময় নিয়ে ধীর চালে এগোনোই ভালো।

আরো কয়েকমাস পরে বাগজোগরায় কাজ শুরু করে বরুণ একদিন বলল, এতো প্রচারের কী দরকার? খতমই যখন রাজনীতি, প্রচারও সেভাবে হবে।

কিন্তু কোনো যুক্তিতেই রাজনৈতিক প্রচারের রাশ আলগা করেনি কিশোর। দেশ দুনিয়ার রাজনীতি, অর্থনীতির বাস্তব বৈজ্ঞানিক, জটিল ছক বদলে যখন মানুষের ভূমিকা আছে, তখন মানুষ তত্ত্বকথা বুঝবে না কেন? নিশ্চয়ই বুঝবে। এ ধারণা যে ষোল আনা নির্ভুল, কয়েকমাসে প্রমাণ পেয়েছে কিশোর। কয়েকজন নতুন সংগঠক সাঁওতালদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাউরি, মাল, বাগদীরা সম্প্রদায় হিসেবে সাঁওতালদের মতো সংগঠিত না হলেও তুলনায় বেশি সচেতন। খবরও রাখে বেশি। সম্প্রদায়গত দুর্বলতার জন্যেই বাইরের জগতে মেলামেশা আছে তাদের। তাছাড়া জীবিকার কারণে জোতদার, মহাজনদের ঘরে চাকরি করে তারা। কিছু জোতদার মহাজন পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা আছে। আধুনিকতা ঢুকেছে। শহর, গঞ্জের নানা খবর, ঘটনা নিয়মিত আলোচনা হয়। বাউড়ি, মাল, বাগদীরা সে অর্থে অচ্ছুৎ নয়। এইসব বিত্তবান পরিবারের অন্দরমহলে যাবার, কথা, আলোচনা শোনার সুযোগ পায় তারা। তাই হাড়ি, বাগদী, ডোম, মাল, বাউড়িদের মধ্যে রাজনীতি প্রচারের কাজ যেমন তাড়াতাড়ি হচ্ছে, তেমনই অসম্ভব দ্রুত বেরিয়ে এসেছে এক ঝাঁক রাজনৈতিক কর্মী। নিজেদের গ্রাম ছেড়ে সাঁওতাল পল্লীতেও ছড়িয়ে পড়ছে তারা। নরহরির বউ আন্নাকে দেখার পর মেয়েদের একটা স্কোয়াড বানাবার চিন্তা করছে কিশোর। আন্নার মতো দাপুটে গৃহবধূ সহজেই মেয়েদের স্কোয়াডের কম্যাণ্ডার হতে পারে। আন্নার দাদা আমেদপুর থানার কনস্টেবল্। মেয়ে গেরিলা স্কোয়াডের বাকি সদস্যদের নাম পুঁইশা, লালমুনি, উজানী ভেবে নিল কিশোর। স্কোয়াড তৈরির কাজ এখনই শুরু করা যায়। আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে তাড়াতাড়ি রাজনৈতিক প্রচার শুরু করা দরকার। এলাকা থেকে এক ঝাঁক মহিলা কর্মী তুলতে পারলে আদিবাসী জীবনে, চেতনায় বিপ্লব ঘটে যাবে। এ অঞ্চলে সাঁওতাল বাপ মায়েরা কন্যাসন্তানের কোনো নাম রাখে না। নামের দরকারও হয় না। অমুক মাঝির বিটি, বা অমুকের বহু পরিচয়ে আজীবন কাটিয়ে দেয় তারা। নামহীন যৌবন নিয়েই শুরু হয় দুলহার, প্রেম, পিরীত। পছন্দমতো একটা নাম প্রেমিক

উপহার দেয় প্রেমিকাকে। প্রেমিক ছাড়া বিশেষ কেউ জানতে পারে না সে নাম। পরীশা, উজানী, লালমুনিদের নামও এইভাবে এসেছে। তাদের বাড়ির লোক, এমনকি মা, বাবা, ভাইবোনও নামে চিনতে পারবে না ঘরের মেয়েকে। কিশোরের মনে হয়, কলকাতা থেকে রেবাকে এখানে আনতে পারলে সুবিধে হত। কিন্তু পার্টির বারণ। মেয়েদের গাঁয়ে যাওয়া বন্ধ। কিছু করার নেই কিশোরের। রেবা থাকলে এখানে মানুষের চেতনার মান বাড়াবার জন্যে অন্যরকম কিছু কাজ করা যেত। আদিবাসী সংস্কৃতি, নাচ গানের সঙ্গে আধুনিক গল্প, নাটক, গান, সুর, দর্শন মিলে জন্ম নিত নতুন শিল্পশৈলী। একটা পরীক্ষা অন্তত করা যেত। শিল্পের মতো অমোঘ ক্ষমতাবান অস্ত্র ছাড়া মানুষের চেতনা শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন হয় না। একশো বক্তৃতার চেয়ে ভালো একটা নাটকের অভিনয়ে বেশি কাজ হয়। মনের গভীরে, অস্তিত্বের শিকড়ে শিল্প ঢুকে যায়। কিন্তু এসব কথা কাকে বলবে কিশোর! পার্টি লাইন হল গরীব মানুষের ক্রোধের বারুদে অগ্নিসংযোগ। এ মুহূর্তে শিল্প সাহিত্য অর্থহীন। তবু মেয়েদের নিয়ে একটা স্কোয়াড গড়ার কথা ভাবছিল কিশোর। আগে দরকার, অনামী মেয়েগুলোর নামাকরণ। যাদের নাম নেই, কিশোরের মনে এল, এরকম কয়েকজন মেয়ের মুখ। তাদের প্রত্যেকের একটা করে নাম দিয়ে শুরু হবে স্কোয়াড তৈরির কাজ। সর্বস্তরে সংগঠন চাই। পার্টির প্রাণ হল সংগঠন। সংগঠনের কথা ভাবলেই বিস্তৃত গণসংগঠন গড়ার ইচ্ছে হয় তার। নিছক গেরিলা স্কোয়াডে খুশি নয় সে। আলোচনার সময়ে বরুণের সামনে খুব আবছাভাবে এই প্রশ্ন কিশোর তুলেছিল একদিন। সে ভাবনার বিরোধিতা করে বরুণ বলেছিল, সংগ্রামকে ঢেউ-এর মতো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে জঙ্গী ক্যাডার, লড়াকু কর্মী দরকার। তাত্ত্বিকের চেয়ে একজন জঙ্গী সংগঠক, যোদ্ধার এখন প্রয়োজন বেশি। এ মুহূর্তে আমাদের পার্টিতে প্রচারকের ভূমিকা শেষ। লড়াই-এর পার্টিতে পার্টির প্রচার, প্রতিষ্ঠা হবে লড়াই দিয়ে। পার্টি বাড়বে, চেতনা বাড়বে।

কিশোর বুঝেছিল এমন একটা সময় এসেছে, যে তাত্ত্বিক, সংগঠক প্রচারকরা পার্টিতে আর পাত্তা পাবে না। বরুণের সঙ্গে এসব আলোচনার পর এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো। কিশোর শুনলো, তার গণসংগঠনমুখী কাজের স্টাইলে পার্টি বিরক্ত। বোলপুরের দুই পার্টি কর্মীকে এক আলোচনায় পার্টির বিরক্তির কথা বলেছে গণপতি। খবর শুনে কিশোর শুধু আহত নয়, ভয় পেয়েছে। গেরিলাস্কোয়াড গড়া ছাড়া নিজের এলাকায় আর কোনো কাজ গত এক দেড় বছর সে করেনি। রাজনৈতিক, সাংগঠনিক নানা প্রশ্নে অবিরত আলোচনা করেছে। তার আলোচনা কর্মপদ্ধতি কলকাতায় পার্টিকে যারা জানিয়েছে, ভুল বলে প্রচার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিমানে ভারী হয়ে উঠলো মন। নিজেদের মধ্যে কেন এত সন্দেহ, কুৎসা, বিদ্বেষ?

ঘুম পাচ্ছে কিশোরের। গলায় ধামসা ঝুলিয়ে উন্মত্তের মত বাজাচ্ছে অজিত। অজিত কেমন হয়ে গেছে! তার মনের হদিশ পায় না কিশোর।

কলকাতার সেই হুল্লোড়ে, মারকুটে ছেলে হঠাৎ চুপচাপ, শান্ত হয়ে গেল। কথা, আলোচনার বদলে সবসময়ে বুঁদ হয়ে আছে অজানা নেশায়। কিশোর জানে, হাঁড়িয়ার নেশা নয়। অজিতকে খোঁচালে সে বলে, হাঁড়িয়া গিলে ভোঁতা হয়ে গেছে আমার বুদ্ধি।

কিশোর বলে, সাঁওতালদের যা মানায়, তোকে মানায় না।

এরকম কথা চালাচালির মধ্যে অজিত একদিন বলেছিল, এতো মাথা ঘামাবার দরকার কী? পার্টি সিদ্ধান্ত চোখ বুজে মেনে নেব। পার্টিও তাই চায়।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে অজিত আবার বলেছিল, সাঁওতাল হয়ে গেছি আমি। সবসময় মাদল বাজে আমার বুকে। কথা, আলোচনা কিছুই ভালো লাগে না। শুধু হাসতে ইচ্ছে করে। প্রায়ই মনে হয়, কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি।

কথা শেষ করে শিশুর মতো হেসেছিল অজিত।

পাশের খাটিয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে জিয়নের গরমবা। কুলিমুড়োর নাচ গানের আসরে ক্লান্তি নেই। ঘুমে বুজে আসছে কিশোরের দু'চোখ। একসময় ঘুমিয়ে পড়লো সে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলো। সে বুঝতে পারছিল যে, বিকেলে জিয়নের গরমবার মুখে শোনা গল্প ফিরে আসছে স্বপ্নে। তবু সেই স্বপ্ন পুরো মিথ্যে নয়। চোখের সামনে দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্র, জল, ঢেউ-এর গর্জন বাতাসের হা-হুতাশ। ভগবান, ভগবতী, দুই বুড়োবুড়ি আকাশ থেকে ঝুলে পড়া একজোড়া সুতো ধরে সমুদ্রের বুকে এক পানসিতে নামলো। শীতের দুপুর। সমুদ্রের জল বরফ শীতল। মহানন্দে স্নান করছে দু'জনে। ঝামা দিয়ে বুড়োর শরীর ঘসে সাফ করছে বুড়ি। জমা ময়লায় দুটো পাখি বানিয়ে বুড়োকে বুড়ি বলল, প্রাণ দাও।

পাখি দুটোকে প্রথমে চোখ দিল ভগবান। তারপর প্রাণ। ভগবতীর হাতের ওপর থেকে আকাশে উড়ে গেল একজোড়া রাজহাঁস। অনেকক্ষণ উড়ে সমুদ্রে বসার জায়গা না পেয়ে ক্লান্তিতে তারা যখন ভেঙে পড়ছে, তখনই দেখলো জলের ওপর ভেসে উঠেছে একটুকরো শক্ত চর। আসলে তা চর, মাটি নয়, শিবঠাকুরের মাথা। জলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল শিবঠাকুর। হাঁসেরা সংসার পাতলো সেখানে। একজোড়া বাচ্চা হল একদিন। ভগবান প্রশ্ন করলো, বাচ্চা দুটো দেখতে কেমন?

ভগবতী বলল, ট্যারাবাঁকা দেখাইছে।

ভগবান বলল, তাহলে মানুষই বটে।

মানুষের জন্যে স্থলভূমি তৈরির কাজে কেঁচোকে তলব দিল ভগবান। ভগবানের হুকুমে সমুদ্রের তলা থেকে মাটি তুলতে শুরু করলো কেঁচো। তার গন্ধে সমুদ্রের বড়ো মাছেরা এসে হাজির। তাদের হাত থেকে কেঁচোকে বাঁচাতে ভগবান পাঠিয়ে দিল ঢ্যামনা সাপ। কেঁচোকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপ পাহারায় বসলো। সমুদ্রের একপাশে থলথলে নরম কাদামাটির রাজ্যে ঘাসের বীজ ছড়ালো ভগবান।

ঘাস গজালো। শক্ত হল নরম মাটি। দুই মানুষকে ভগবতী নাম দিল, ফিলচু হারাম আর ফিলচু বুড়ি। ঘাসে ঢাকা পৃথিবীতে রাজত্ব করতে ফিলচু হারাম, ফিলচু বুড়িকে পাঠিয়ে গিল ভগবান। তাদের নয় ছেলেমেয়ের অংশ বংশে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ।

অচেনা আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতে কিশোর দেখলো, সামনে সমুদ্রের মতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় তুলে মাথার ওপর পারদের মতো মেঘশূন্য তারা ঝলমল আকাশ দেখলো সে। গাছ-গাছালিতে বাতাসের শিরশির ধ্বনি কানে এল তার। কিশোরের মনে হল, বিশাল কালো রঙের গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো ধীরে ধীরে ঘুরছে আকাশ। আবহমান কালের গান, সংকেত ছড়িয়ে পড়ছে।

চব্বিশ

ক'দিন একনাগাড়ে বৃষ্টির পর সকালে রোদ উঠতে ঝলমল করছে চারপাশ। জলে ধোয়া গাছ, লতা থেকে বেরোচ্ছে সবুজ আভা। ঝিরঝির হাওয়ায় দুলছে ধানের চারা। একহারা, ডাঁটো শরীরে দাঁড়িয়ে আছে আখগাছ।

রাত থাকতে মারাংবুরুর থানে পেঁছে গিয়েছিল জিয়ন। আলো ফুটতে একজন দুজন করে আসতে লাগলো মানুষ। সূর্য ওঠার আগেই মারাংবুরুর থানে ভিড় জমে গেল।

চিলিকা আম-দঅ।

বুকে দু'হাত জুড়ে জোহর, কুশল বিনিময় করছে অনেকে। জিয়নের ঠাকুর্দাও উঠে এসেছে ভোর রাতে। সকলকে প্রশ্ন করছে, ওয়ারেন হয় ভাগী গিয়াসে বাং, বাড়ির সব ভালো তো?

আশপাশের দু'দশটা মাঝি গাঁ থেকে লোক আসার কামাই নেই।

তুর মেঝেন কুথা?

কেউ প্রশ্ন করতে জবাবের বদলে শোনা গেল হাসির শব্দ। মেঝেন নিয়ে আলোচনার সময় এখন নয়।

মারাংবুরুর থান থেকে পাঁচজনের গেরিলা স্কোয়াড কয়েক পা এগোতে নরহরি বলল, আমি যাবো।

নরহরির কথা শুনে আরও অনেকে বলল, আমি যাবো, আমি।

স্কোয়াডের সঙ্গে প্রহ্লাদ মণ্ডলের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে জনতা। চেষ্টা করেও ভিড় ঠেকাতে না পেরে ব্যাজার বরুণ বলল, এ কিন্তু গেরিলা অ্যাকশন নয়, গণবিক্ষোভ। পার্টি লাইন বিরোধী।

কী বলবে ভেবে পেল না কিশোর। উত্তেজনা, রাগে প্রত্যেকে চেঁচাচ্ছে, পেল্লাদকে খুন করবো আমি।

তীরধনুক, কাটারি, বল্লম, লাঠি হাতে শালবনের সরু রাস্তা ধরে আমজোড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে ভিড়। তাপুরিয়ার পর দ্বিতীয় শ্রেণীশত্রু প্রহ্লাদ, খতম হবে আজ। নানা প্রশ্ন, প্রসঙ্গ মনে মনে, নিঃশব্দে বিশ্লেষণ করছিল কিশোর। খতম মানে খুন নয়, শ্রেণী ঘৃণার প্রকাশ।

তবু কষ্টকর, দুর্বোধ্য এক ধাঁধা তীক্ষ্ম ছুঁচের মতো খোঁচাচ্ছে তাকে। গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে মেলাতে পারছে না খতম। তাপুরিয়ার ঘটনার পর গরীব মানুষের মধ্যে এমন বিস্ফোরণ ঘটেছে যে, খতম কর্মসূচির খবর পেলে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো এসে হাজির হচ্ছে তারা। এই স্বতঃস্ফূর্ত, উদ্দাম, আবেগ ঠেকাতে চায় না কিশোর। পুলিসের বেপরোয়া ধরপাকড়, অত্যাচারে ভয় না পেয়ে গরীব মানুষের এগিয়ে আসার দুঃসাহস মুগ্ধ করেছে তাকে। এর নামই বোধহয় গণঅভ্যুত্থান। একে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কর্মসূচী দেওয়া উচিত। তা না পারলে জনস্রোত ঠেকিয়ে রাখাও ঠিক হবে না। তাছাড়া কে ঠেকাবে? পার্টির বারণ শুনবে কে?

জঙ্গল পেরিয়ে একটা মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ভিড়। অল্প দূরে রাস্তার ধারে প্রহ্লাদ মণ্ডলের মাটির দেওয়াল ঘেরা দোতলা মাঠকোঠা। মাঠকোঠার পেছনে ডাঙা জমি। মকাই ফলেছে চমৎকার। বাড়ির পেছনে খিড়কির পাশে এসে থামলো মিছিল। বাড়ির সামনে খামারে কাজে ব্যস্ত মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। প্রহ্লাদের বাড়ির সদরে লোহার কোলাপসিবল গেট। সবসময় বন্ধ। প্রহ্লাদের একটা বন্দুক আছে। গেরিলা স্কোয়াডের সিদ্ধান্ত এলাকার গরীব মানুষ আগেভাগে জানা সত্ত্বেও খবর ফাঁস হয়নি। খামারে দাঁড়িয়ে মুনিষদের তদারক করছে প্রহ্লাদ। জিয়নকে দেখে কিছু আঁচ করে এক দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে গেল প্রহ্লাদ। তড়বড় করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে পড়লো দোতলায়। প্রহ্লাদের পেছনে দৌড়লো জিয়ন। তার পেছনে বাঘা, রবি আর ডগর। প্রহ্লাদের দশাসই শরীর, কুচকুচে কালো রঙ। দোতলায় সে পা দিতেই জিয়ন, বাঘা, রবি, ডগর ঘিরে ধরলো তাকে। ছুরি হাতে বাঘা লাফিয়ে পড়লো প্রহ্লাদের ওপর। শক্ত চামড়ায় ঢাকা প্রহ্লাদের থলথলে ভুঁড়িতে বাঘার ছুরি ঢুকল না। বেঁকে গেল ছুরি! প্রহ্লাদের মুখ ফ্যাকাসে। আতঙ্কে দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এখনই হয়ত বেঁহুস হয়ে যাবে সে। প্রহ্লাদ ডুকরে উঠলো, সোনাদানা টাকাকড়ি নিয়ে তোরা ছাড়ান দে আমাকে। প্রাণে মারিস না।

একতলার খামারে অনেক লোক। কথা না বুঝলেও প্রহ্লাদের ভাঙা গলার শব্দ শুনছে তারা। তাদের দু' একজন চেঁচিয়ে উঠলো, পেল্লাদ মণ্ডলের মাথা চাই, বন্দুক চাই।

এসব কথা প্রহ্লাদ শুনছে কিনা, বোঝা গেল না। জিয়নের হাতের ধারালো বল্লম বুকে বিঁধতে মাটিতে পড়ে গেল সে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। পাশের বন্ধ ঘরে আর্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলো কেউ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে ঘরে দরজায় হুড়কো আটকে বসে আছে প্রহ্লাদের বউ। দরজার কোনো ফুটো দিয়ে স্বামীর অবস্থা হয়ত দেখেছে সে। প্রহ্লাদের বউ-এর হাহাকার শুনে মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠলো কিশোর।

মৃত প্রহ্লাদকে চ্যাংদোলা করে তুলে গেরিলা স্কোয়াড যখন একতলার খামারে এসে দাঁড়ালো, তখন রীতিমতো উৎসব শুরু হয়েছে সেখানে। জমিজমার দলিল, বন্ধকীর কাগজপত্র পুড়ছে আগুনে।

পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে কয়েকটা নগ্ন, নোংরা ছবি দেখে খেপে গেল কিছু

লোক। খামারে পড়ে থাকা মৃত প্রহ্লাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা। গাঁয়ের কয়েকজন পরিচিত বউ, মেয়ের সঙ্গে নিজের গোপন ব্যাভিচারের ছবি তুলে রেখেছিল প্রহ্লাদ। কেন রেখেছিল? এ কি শুধুই বিকার? আগুনে পুড়ে গেল সব ছবি। খামারের ডান দিকে একটা লম্বা রকের সঙ্গে লাগানো পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে বন্ধকী জিনিস, দলিল, জমির কাগজপত্র। পাশের ঘরে মাটির বড়ো বড়ো জালায় গুড়, ঘি, তেল, বস্তায় চিঁড়ে, মুড়ি, ছোলা, মকাই গাদা করা রয়েছে। সবই প্রহ্লাদের ঘরে তৈরি। গুড়ের জালায় লখাই হাত ডোবাতে তার হাতের পাতা থেকে কনুই পর্যন্ত মাখামাখি হল গুড়ে। গুড় মাখা হাত মুড়ির বস্তায় গুঁজে লখাই যখন বার করলো, তখন তার হাত মুড়ির চাক। নেচে নেচে নিজের হাত চেটে গুড়, মুড়ি খাচ্ছে লখাই। মজা পেয়ে গুড়, মুড়ি, চিঁড়ে, ছোলার বস্তায় যে যেমন পাচ্ছে, হাত ঢোকাচ্ছে। খামারের এক কোণে ছড়ানো ছিল কিছু জামাকাপড়, কাঁসা পেতলের বাসন, সোনা রুপোর টুকরো গয়না। সেগুলো স্পর্শ করলো না কেউ।

পঁচিশ

তাঁতিপাড়া থেকে পরাশিয়া প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ। রাস্তা সেরকম কিছু নেই। ধুধু মাঠ, শাল, সেগুন, পলাশ, তেকাঁটার ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। গ্রীষ্মে সূর্য যখন মাঝ আকাশে, গেরুয়া রঙের শক্ত মাটি তেতে বাদামি হয়ে যায়। ফাঁকা মাঠে গরমের স্বচ্ছ ভাপ পাতলা সেলোফেন পেপারের মতো কাঁপতে থাকে। চোখে দেখা যায়। মাঠের এক জায়গায় উঁচু বাঁধ দেওয়া রিলিফের পুকুর। পুকুরের জল ঘন বাদামি। পুকুরের ধারে তাঁতিপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের চার গরীব চাষীর বৈঠকে বসেছে। উঁচু বাঁধের আড়ালে তাদের দেখা যাচ্ছে না। জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেছো বক। নিরীহ ভঙ্গি। কুচকুচে কালো শরীর, সাদা গলা, গাঢ় হলুদ ঠোঁট, এক ঝাঁক গাঙশালিখ বাঁধের পশ্চিমে কিচির মিচির ডেকে চলেছে। উত্তেজনায় রঞ্জন ফুটছে। বাঁধের সামান্য দূরে বনেদী. বিত্তবান গ্রাম পরাশিয়ায় বারোটা বন্দুক আছে জানার পর থেকে রঞ্জনের এই উত্তেজনা। পরাশিয়ায় অ্যাকশন করে আজ রাতেই বারোটা বন্দুক দখল করতে চায় সে। রাতের অভিযান সম্পর্কে এখন শলাপরামর্শ করছে তারা। বন্দুক দখলের পরিকল্পনার সঙ্গে একটা পরাজয়ের জ্বালাও ভুলতে চাইছিল রঞ্জন। সাত দিন আগে প্রায় দেড়শো মানুষ নিয়ে পরাশিয়ায় ঢুকেছিল সে। তখন সন্ধে হচ্ছে। ধোঁয়াটে, পেঁজা অন্ধকারে রঞ্জন আর শিবেনের নেতৃত্বে গ্রামে ঢুকলো মিছিল। নির্জন গ্রামের রাস্তায় লোকজন ছিল না। পরাশিয়া গ্রামে বন্দুকের জন্যে হানা দেবার খবর আগেই রটিয়ে দিয়েছিল রঞ্জন। কবে, কখন যাবে, বলেনি। রঞ্জন ভেবেছিল, তারা পরাশিয়ায় ঢুকলে গ্রামের জোতদার, মহাজনরা ভয় পেয়ে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেবে বন্দুক। বাধা যদি আসে, পুলিসের কাছ থেকে আসবে। উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করতে পরাশিয়া থেকে মাইল দুই দূরে বসেছে পুলিশ ক্যাম্প। কিন্তু গ্রামে ঢুকে চারপাশ দেখে রঞ্জন বুঝেছিল, পুলিশ আসেনি। একটা দোতলা বাড়ির ছাতে বন্দুক হাতে অপেক্ষা করছিল জোতদাররা। মিছিল দেখেই বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করলো তারা। বেপরোয়া গুলি বৃষ্টিতে ভয়ে ছত্রভঙ্গ হল মিছিল।

হইচই তুলে পালাতে শুরু করলো কিছু মানুষ। কে আগে পালাবে, ছুটো-ছুটি লেগে গেল। গুলির শব্দে এমন কাণ্ড হবে, বন্দুকধারী জোতদাররাও ভাবেনি। বেড়ে গেল তাদের হিম্মত। মিছিল তাড়িয়ে গাঁয়ের বাইরে বার করে দিল তারা। কেউ ধরা না পড়লেও, পালাতে গিয়ে আহত হল দু'চারজন। পরাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে সে রাতেই রঞ্জন, বাবলু; শিবেন, পলাশ এবং আরো কয়েকজন এই

বাঁধের আড়ালে বসে খুঁজে বার করতে চেয়েছিল ব্যর্থতার কারণ। রঞ্জন বলেছিল, ছোট গেরিলা স্কোয়াড না গড়ে মিছিল নিয়ে অ্যাকশন করা পার্টি লাইন বিরোধী। ভুল লাইনের জন্যে এই বিপদ।

রঞ্জনের পর মতামত জানিয়েছিল বাবলু, শিবেন, পলাশ। পরাশিয়ার এক ডজন বন্দুক তাড়াতাড়ি দখল করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেই রাতে। পরাজয়, পালাবার অপমানে ছটফট করছিল রঞ্জন। জোতদার, মহাজনদের বারোটা বন্দুক কেড়ে না নেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই তার। শরীরে সারাক্ষণ তাপ, চাপ অনুভব করছে। বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে এই অস্থির ভাব। টানা উত্তেজনা, উদ্বেগ, সতর্কতা, ছন্নছাড়া জীবন-যাপন ক্ষিপ্ত করে তুলেছে তাকে। সারাদিন জঙ্গলে থাকে সে। একদিন খাবার জোটে তো পরদিন উপোস। পুকুরের খোলা জলে মাঝে মাঝে তেষ্টা মেটাতে হয়। সারারাত মিটিং, মাইলের পর মাইল ঘুরে যোগাযোগ, রোজের রুটিন। কত রাত যে না ঘুমিয়ে কাটে। বাবলু, শিবেনেরও এক অবস্থা। চৌকিদার দিবাকর মালের মতো দু'একজন বিরোধী লোক ছাড়া তাঁতিপাড়ার বেশির ভাগ মানুষ রঞ্জন, তার সহকর্মীদের ভালোবাসে। তবু দিনে তাঁতিপাড়ায় যায় না তারা। মাঝে মাঝে রঞ্জন ভাবে, দিবাকর মালকে কেটে দিলে অনেক ঝামেলা মিটে যায়। কথাটা ভাবলেও বাস্তবে করা কঠিন। স্বাধীনের মুখ রঞ্জনের মনে পড়ে। দিবাকরের ছেলে স্বাধীন একজন পার্টিকর্মী, কমরেড। সিউড়ি জেলে স্বাধীন এখন বন্দী। ছেলের খবর সম্ভবত চৌকিদার এখনও পায়নি। পেলে যে কী করবে!

সন্ধের পর পরাশিয়ায় যাবার সিদ্ধান্ত পাকা হতে শিবেন প্রশ্ন করল, কালকের বন্দুক দুটো সঙ্গে থাকবে তো?

দরকার নেই, রঞ্জন বলল, সাবেকি অস্ত্রই যথেষ্ট। ঘরোয়া হাতিয়ার ব্যবহার করা পার্টিরও নির্দেশ।

তাহলে বন্দুক দখলে কী লাভ, প্রশ্ন করল শিবেন।

মজুত করতে হবে, গণফৌজের হাতিয়ার চাই। স্টেজ তৈরি হচ্ছে।

নিতাই বাউড়ি বলল, বন্দুকের চেয়ে হেঁসো অনেক ভালো। বন্দুক ফেটে গেলে কী হবেক বটে?

ঘাসের ওপর রাখা নিজের ধারালো হেঁসোর গায়ে সযত্নে হাত বোলালো নিতাই। নিতাই-এর সমর্থনে ঝানু বাগদী বলল, কথাটা ঠিক। লাউবেড়ের সেজোকর্তা বন্দুক দাগতে গিয়ে কুঁদোর ধাক্কায় কোমর ভেঙেছিল। সেজোকর্তার ভাঙা কোমর আজও জোড়েনি।

মিটিং-এ বসে ক্লান্তি ঘুমে ঢলছিল বাবলু। কাল রাতে গেরিলা স্কোয়াড যে দুটো বন্দুক দখল করেছে, সে স্কোয়াডের নেতা ছিল বাবলু। ফলে তার শরীর, মনের ধকল হয়েছে কাল। ভাঙা তন্দ্রার মধ্যে গতরাতের অ্যাকশন পরিষ্কার ছবির মতো দেখতে পাচ্ছে বাবলু। রাত তিনটে পর্যন্ত কীচক

বধ যাত্রা হয়েছিল কাল। পালা শেষ হতে পোশাক বদলে ঘুমিয়ে পড়লো দলের লোকজন। তাদের ছাড়া পোশাক পরে বাবলুর নেতৃত্বে রঞ্জন, শিবেন, পলাশ পৌঁছে গেল ইণ্ডিয়ান টেকসটাইলের সাদা বাড়ির সামনে। যাত্রাদলের লোকেরা পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে ঘুমিয়ে কাদা। তাদের পোশাক যে বেহাত, বুঝতে পারেনি। বাবলু সেজেছিল ভীম, রঞ্জন কীচক, শিবেন, পলাশ মন্ত্রী, সেনাপতি। কোমরে তলোয়ার, মাথায় মুকুট, মুখে দাড়ি গোঁফ. জমকালো সাজে চারজনকে মনে হচ্ছিল তারা মহাভারতের মানুষ। চাঁদের অল্প আলোয়, আবছা অন্ধকারে নিজেদের চিনতে পারছিল না তারা। পরিচিত মানুষগুলোকে অদ্ভুত পোশাকে দেখে ধাঁধায় লেজ নাড়ছিল পাড়ার কুকুরগুলো। বাতাস শুঁকছিল।

ইণ্ডিয়ান টেকসটাইল কোম্পানির মালিক ধর্মদাস ত্রিপাঠীর ঘি, দুধ খাওয়া জাঁদরেল শরীর, টকটকে গায়ের রঙ, বয়স বোঝা যায় না। পালার মাঝখানে ঘুম চোখে তার উঠে যাওয়া বাবলুর নজর এড়ায়নি। ত্রিপাঠীর দারোয়ান রামভরোসা যাত্রা দেখেছিল শেষ পর্যন্ত। কোম্পানির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাবলু, রঞ্জন, পলাশ, শিবেন দেখল, কাঁধে দোনলা বন্দুক রেখে গেটের পাশে শানের চাতালে বসে রামভরোসা দুলছে। বাবলুর হাতে যাত্রা দলের ঝকঝকে টিনের তরোয়াল। মাথার ওপরে বাবলু সাঁইসাঁই করে কয়েক পাক ঘুরিয়ে নিল তরোয়াল। রাম-ভরোসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বন্দুকে হেঁচকা টান দিয়ে শিবেন বুঝলো, লোহার চেনে দারোয়ানের কোমরের বেল্ট বন্দুক বাঁধা।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল রামভরোসার। চোখ খুলে গলার কাছে ঝকঝকে দুটো তরোয়ালের ধারালো ফলা, রাজকীয় পোশাকে ভীম আর কীচককে দেখে ভয়ে শিয়ারাম শিয়ারাম বলে গোঙাতে শুরু করল রামভরোসা।

· চোপ! চাপা গলায় বাবলু ধমক দিল রামভরোসাকে। বন্দুক ধরে শিবেনের টানাটানিতে ভয় পেয়ে কোমরের বেল্ট খুলে নিজের হাতে বন্দুক দিয়ে দিল সে। বোতাম না থাকায় বেল্ট খুলতে ঝুপ করে পায়ের কাছে খসে পড়লো রামভরোসার খাঁকি প্যাণ্ট। ভালোই হল। প্যাণ্টে বন্দুক জড়িয়ে নিলো শিবেন। রামভরোসার গলায় তরোয়াল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রঞ্জন। নিঃশব্দে দোতলায় উঠে গেল তিন জন। মাথার কাছে বন্দুক রেখে ত্রিপাঠী রাতে ঘুমোয়। তাঁতিপাড়ার সকলে জানে এ খবর। ত্রিপাঠীর বন্দুক পেয়ে গেলে কর্মসূচী ষোলআনা সফল। বাবলু, শিবেন, পলাশ ঘরে ঢুকতে ত্রিপাঠীর পাতলা ঘুম ভেঙে গেল। বিছানার পাশে রাখা পাঁচ ব্যাটারির টর্চের বোতাম টিপে জোরালো আলোয় ত্রিপাঠী দেখল, তার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মহাভারতের কয়েকজন মানুষ। ধাঁধা খেল সে। কী ব্যাপার বুঝতে পারলো না। চোখে আলো পড়ায় কিছু দেখতে পারছিল না বাবলু, পলাশ। দেওয়ালে টাঙানো ত্রিপাঠীর বন্দুক ঘরে ঢুকে নজর করছিল শিবেন। চটপট দেওয়াল থেকে বন্দুক নামিয়ে নিল সে। আলোর সামনে থেকে সরে ত্রিপাঠীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পলাশ। টর্চ জেবলে ত্রিপাঠী। ভয়ে পাথর মেভাবার শক্তি নেই। একটু আগে শোনা যাত্রার সংলাপ গম্ভীর গলায় পলাশ

আওড়াতে শুরু করল,

ওরে দুরাচার যত পাপ করেছিলি
তার ঋণ জমা আছে
সবংশে নিধন হবি তুই……।

ত্রিপাঠীর হাতের টর্চ বিছানার ওপর খসে পড়তে ঘন অন্ধকার নামলো ঘরে।

টেকস্‌টাইল কোম্পানির বাড়ি থেকে বেরিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছে তাড়াতাড়ি যাত্রার পোশাক ছেড়ে নিজেদের জামাকাপড় পরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চারজন। গ্রামের বাইরে পা দেবার আগে বাবলু শুনলো, দোতলা সাদা বাড়িতে হইচই হচ্ছে।

গত রাতের সফল এ্যাক্‌সনের পর বেড়ে গেছে রঞ্জন, বাবলু, শিবেন, পলাশের আত্মবিশ্বাস। সকালে ঘুম ভাঙতে আজই পরাশিয়ায় একডজন বন্দুক দখলের প্ল্যান করেছিল চারজন। কেউ ঠেকাতে পারবে না তাদের।

চারপাশ থেকে এখন আসছে জয়ের খবর। গ্রামাঞ্চল প্রায় মুক্ত। গরীব মানুষের গুরুত্ব, মর্যাদা বেড়ে গেছে। জেলাশহরগুলোতে বিদ্রোহে ফেটে পড়ছে ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত। কৃষিবিপ্লবের ভাবনায় গ্রাম, শহর একাকার। এমন কোনো বাড়ি নেই, যেখানে পার্টির দু'একজন সমর্থক, দরদী মিলবে না।

শুধু জোতদার, মহাজন, বাবুভাইরা, যাদের তেজারতি, দোকানদারি, কেনাবেচা সাতসতেরো ধান্দা, দাঁত টিপে পার্টির বিরোধীতা করছে তারা। পুলিশ, প্রশাসনকে সাহায্য করছে। তাদের শায়েস্তা করতে রিজিওনাল কমিটির নির্দেশের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল রঞ্জন। বাবলুকে ঢুলতে দেখে রঞ্জন বলল, ঘুম পেলে আপনি বাড়ি যান। আপনাকে দিয়ে বিপ্লব হবে না।

পার্টির মিটিং-এর সময় সকলকে, এমনকি নিজের ছেলেকেও আপনি বলার নিয়ম। রঞ্জনের কথায় চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলো বাবলু।

পার্টির নির্দেশের দুটো দিক, রঞ্জন বলল, এক, গাঁয়ের ওপর পুলিশি চাপ কমাতে হবে। অর্ধেকের বেশি জেলায় পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিন রাত গাঁয়ে গাঁয়ে টহল দিচ্ছে তারা। নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর হামলা করছে, জেলে ভরছে তাদের। পুলিশের এই শক্ত বেষ্টনী ভাঙা দরকার। দুই, শহরের গরীব, মধ্যবিত্তের ঐক্যের জন্যেও এ্যাকশন করতে হবে এখানে। কাছাকাছি গ্রামগুলোতে পড়বে এ্যাকশনের প্রভাব। তাঁতিপাড়া, পরাশিয়ায় অনেক গরীব, মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মীয় বন্ধুরা শহরে থাকে। পরাশিয়ায় বন্দুক দখলের খবরে উৎসাহ পাবে তারা। গ্রাম শহরের দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা মুছে যাবে। তাছাড়া শহর, আধাশহরের তরুণদেরও কাজ চাই। আগামী দিনে যে গণফৌজ গড়ে উঠবে, সে বাহিনীর সৈনিক হবে তারা।

পরাশিয়ায় কর্মসূচী পাকা করে মিটিং শেষ হবার আগে অনেক দূর থেকে ভেসে এলো খুকখুক কাশির শব্দ। স্তব্ধ দুপুর নির্জন, ফাঁকা মাঠে কে কাশে? কাশির

শব্দে কান খাড়া হল সকলের। হাঁটা পথের বাইরে এই বাঁধের দিকে চাষের সময় ছাড়া কেউ বিশেষ আসে না। ধীর পায়ে বাঁধের ওপর উঠে বনকলমীর একটা ঝোপের পাশে শুয়ে পড়লো শিবেন। তার চোখে সতর্ক দৃষ্টি। কিছু দূরে দুজন মানুষ। মুখ দেখে না চিনলেও পোশাকে তারা ভদ্রলোক। বাঁধের দিকে এগিয়ে আসছে তারা। পশ্চিমমুখো হাঁটার জন্যে সূর্যের কড়া আলোয় তারা সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। মাথা গুঁজে পা ফেলছে।

কারা যেন আসছে, শিবেন বলল।

পুলিশ, জানতে চাইলো বাবলু।

বুঝতে পারছি না।

ক'জন, রঞ্জন প্রশ্ন করল।

বাঁধ থেকে নেমে শিবেন বলল, সাদা পোশাকের দুজন মানুষ, বোধহয় স্থানীয় লোক, পুলিশ নয়।

শিবেন নেমে আসতে নিতাই আর ঝানু উঠলো বাঁধের ওপর।

গামছা পরা টানটান কালো, আদুল শরীর নিতাই একটা শব্দ করলো মুখে। দু চোখের ভুরুর ওপর হাতের পাতা রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক পলক দেখে ঝানু বলল, পরাশিয়ার সুদেব মণ্ডল আর তার বেটা।

নিতাই বলল, কিষাণহড় বটে!

সুদেব মণ্ডলকে দেখে চলকে উঠেছে নিতাই, ঝানুর রক্ত। কয়েকদিন আগে সন্ধেতে পরাশিয়ার অন্ধকার রাস্তায় মিছিলের ওপর আরো পাঁচজন জোতদার মহাজনের সঙ্গে সুদেব মণ্ডলও নিজের বন্দুক থেকে গুলি চালিয়েছিল। সেই লোক এখন মুঠোর মধ্যে। ঝানু বলল, ও শালাকে জবাই করা হবে এখন।

নিতাই বলল, ঠিক কথা উ শালা চশমখোর।

দাঁত টিপে নিতাই, ঝানু তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। নিতাই, ঝানু, দুজনকে যথেষ্ট হেনস্থা করেছে সুদেব মণ্ডল।

সুদেব মণ্ডলের বিশ হালের চাষ। খাইখালসিতে তাকে জমি দিয়ে সে জমি আজও ফিরে পায়নি নিতাই। সুদেবের বাড়িতে কিছুদিন মুনিষ খেটেছিল নিতাই। একদিকে বলদ আর একদিকে নিতাইকে জুতে ঝাঁঝাঁ রোদে সারাদিন পাথুরে জমি চষিয়েছিল সুদেব। নিতাইকে শাস্তি দিতে এ কাণ্ড করেছিল সে। শেষ বিকেলে জোয়াল থেকে ছাড়া পেয়ে বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিল নিতাই। শীতের সময় আজও টনটন করে তার ঘাড়।

ঝানু বলল, সুদেব মোড়লের গোয়াল থেকে গোবর নিয়ে ঘুঁটে দিতো আমার বহু। গোবর ফেলে দেয় মোড়ল। তবু আমাকে কী মার মারলো মোড়ল একদিন। তবে একবার খুব জব্দ করেছিলাম মোড়লকে। মোড়লের গোয়ালের এক জায়গায় হেগে গোবর দিয়ে ঢেকে দেঁইচিনু। সাত সকালে নিজের হাতে মোড়ল গোবর তুলতে গিয়ে হাতে গু মাখামাখি। মোড়লের আক্কেল গুড়ুম। ধরতে পারেনি

বজ্জাতিটা কে করলো ? পারলে আলাদা করে দিতে আমার ছাল চামড়া।

বাঁধের ওপর থেকে ঝান্নু, নিতাই ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছিল রঞ্জন। অদূরে শালবন। রোদে সেঁকা সবুজ পাতা নেতিয়ে আছে। ফাঁকা মাঠে হাওয়ায় নেচে বেড়াচ্ছে ধুলোর ঘাগরা। ঘুম, অবসাদে ধূসর হয়ে যাচ্ছে রঞ্জনের মাথা। টানটান ক'রে চোখ মেলে ঘুম তাড়াতে চাইছে সে। বাঁধ, শালের জঙ্গলে অনেক দিন কেটে গেল তার। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই দেশ, পাড়াগাঁ, পারিবারিক পরিচয়, বরবাদ করে দিয়েছে তার জীবন। জন্মসূত্রে পেছিয়ে আছে সে। তার শরীরের প্রতিটি কোষে, মাথায় ছড়িয়ে পড়ে চিড়বিড় জ্বালা। মুদির দোকানে দাঁড়ি-পাল্লার সামনে বসা বাবার মুখ, ওজন, হিসেবে বাবার কারচুপি, তিক্ত কটু এক প্লানিতে ভরে রাখে তার মন। বিষিয়ে গেছে তার অস্তিত্ব। স্কুল ফাইনাল পাস করার পর তাকে কিছুদিন দোকানে বসিয়েছিল বাবা। বসতে বাধ্য হয়েছিল সে। দিন কয়েক বাদে বিপদ টের পেয়ে বাবা সরিয়ে দিল রঞ্জনকে। ঘটনা ছিল এরকম। কী একটা জিনিস কেনার পর ছিধর মাল দাম জানতে চাইলে মুখে মুখে হিসেব কসছিল বাবা। ছিধরকে শুনিয়ে বেশ জোরে নামতা কেটে বাবা বলছিল, চার ষোলো হল গিয়ে চুয়াত্তর। চুয়াত্তর আনা মানে পাঁচ টাকা চার আনা। ইচ্ছে করে ভুল হিসেব দিয়ে বাবা যে মুখ্যু, নিরীহ ছিধরকে ঠকিয়ে চারটাকার জায়গায় পাঁচটাকা চার আনা, মানে পাঁচ সিকে বেশি নিচ্ছে, ছিধরের সামনে ধরিয়ে দিয়েছিল রঞ্জন। রঞ্জন যে ডোবাচ্ছে, আঁচ করেও বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে ভুল মেনে নিয়ে খুব হেসেছিল বাবা। বাবার মুখের ভাবটা হয়েছিল, দ্যাখো, কীরকম চৌখস ছেলে বানিয়েছি। খরচা করে লেখাপড়া শেখাতে হয়!

বাবার সঙ্গে তাল দিয়েছিল ছিধর। এই ঘটনার পর রঞ্জনের দোকানে বসা বন্ধ হয়ে গেল। ভালোই হয়েছিল। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল সে। কিন্তু গ্রামের বন্ধ, নিশ্চল, বেকার জীবন মনমরা করে দিচ্ছিল তাকে। বৈচিত্র্যহীন এই বেঁচে থাকা। প্রায় সকলেই গরীব, এবং বেশির ভাগ ঠগ। কে কাকে ঠকাতে পারে প্রতিযোগিতা চলছে। ঠকামি ছাড়া সৎভাবে বাঁচারও উপায় নেই। এ সম্পর্ক শুধু বড় লোক গরীব লোকে নয়, স্বজাতিকে ঠকাতে, অপমান করতে গরীবেরা বেশি দড়। চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে আসতে পুকুর ধার ছেড়ে বাঁধের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো রঞ্জন। তার সঙ্গে এল পলাশ। বাঁ দিকে তেকাঁটার ঝোপের ভেতরে কাল রাতে কেড়ে আনা বন্দুক দুটো আছে। দোনলা বন্দুকটা তুলে পলাশ বাগিয়ে ধরতে কোমরে গোঁজা হেঁসো বার করলো নিতাই। পরাশিয়ার সুদেব মণ্ডল, তার ছেলে সুবাসের শরীর, হাঁটা, কথার শব্দ বাঁধের ওপর থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। পুকুরপাড় ছেড়ে শিবেন ওঠেনি। সুদেব, সুবাস ফাঁদে পড়েছে দেখে গম্ভীর হয়ে গেছে শিবেন। কিছু ভেবে শিবেনকে ডেকে রঞ্জন বলল, আর একটা বন্দুক আছে। তুই নে। রঞ্জনের দিকে এক পলক তাকিয়ে তেঁকাটার ঝোপ থেকে বন্দুকটা বার করল শিবেন। বন্দুক হাতে শিবেন দেখলো, রোদ থেকে বাঁচতে ধুতি, ফতুয়ার ওপর বছর ষাট বয়সী সুদেব মণ্ডল গামছা জড়িয়েছে মাথায়। ধনী, দরিদ্র, বয়স্ক

লোকেরা রোদ বাঁচাতে সকলে মাথায় গামছা জড়ায়। সুদেব মণ্ডলের পাশে সুবাস। বছর পঁচিশ বয়স, মজবুত স্বাস্থ্য, প্যাণ্ট শার্ট পড়েছে। বোলপুর কলেজে শিবেনের সহপাঠী ছিল সুবাস। চার বছর আগে একই ক্লাসে পড়তো তারা। তেকাঁটার জঙ্গলের আড়ালে দলবল নিয়ে রঞ্জন এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে মাঠ থেকে দেখা যাচ্ছে না তাদের। বাঁধের ওপর উঠে হঠাৎ ছ'জনের মুখোমুখী হয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলো সুদেব, সুবাস। রঞ্জন, বাবলু, পলাশ, শিবেন, নিতাই, ঝানু ঘিরে ফেললো দুজনকে। দূরে অদ্ভূত কাঁপা গলায় একটা গোরু মাঝে মাঝে ডাকছে। গাভীন হবার তাগিদে গোরু এভাবে ডাকে। ডাক শুনে আনমনা হয়ে গেল শিবেন।

সুদেব, সুবাসকে ধাক্কা দিয়ে বাবলু বলল, চলো, নিচে চলো।

খাড়া বাঁধ। বাবলুর ধাক্কায় বেশ জোর ছিল। পায়ে পায়ে সুবাস নেমে গেলেও টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়লো সুদেব। পনেরো ফুট উঁচু বাঁধের ওপর থেকে পড়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই সুদেবের। বেঁটে, মোটা মানুষটা মাটিতে চিৎপাত হয়ে গোঙাচ্ছে। আদিখ্যেতা করতে হবে না, উঠে দাঁড়াও, পলাশ বলল।

সুদেবের পাশে উবু হয়ে বসে তাকে তুললো সুবাস। কোথা থেকে গোরু বাঁধার একটা লম্বা কাছি এনে, বাবা, ছেলের হাত, পা শক্ত করে বেঁধে ফেললো রঞ্জন।

এ্যাকশন হোক, পলাশ বলল।

অশান্তিতে খচখচ করছে শিবেনের মাথা। একটু আগে তার দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়েছিল সুবাস। সুবাসের চোখে যাতে চোখ না পড়ে, সে চেষ্টা করছিল শিবেন।

দুজনকে খতমের প্রস্তাব পলাশ দিতে রঞ্জনের চোখে চোখ রেখে শিবেন বলল, এ্যাকশনের আগে পার্টির নির্দেশে ওদের বিচার হওয়া উচিত। বিচারের আগে শাস্তি হতে পারে না।

পলাশ বলল, গত হপ্তায় পরাশিয়ায় আমাদের মিছিলে যারা গুলি চালিয়েছিল, সুদেব মণ্ডল তাদের একজন। সে খুন করতে চেয়েছিল আমাদের।

আরও বড় অপরাধ এ লোক বহু বছর ধরে করছে। বাবলু বলল, গাঁয়ের বিস্তর গরীবের জমি, টাকা মেরে দিয়েছে। অপমান, অত্যাচার চালিয়েছে তাদের ওপর।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে নিতাই, ঝানুকে দেখিয়ে বাবলু বলল, এ দু'জন আমার কথার সাক্ষী।

বাবলুর সমর্থনে একটা কথা বলল না ঝানু। যে কোনো কারণে, সুদেব, সুবাসের ওপর থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছে নিতাই। দুই বন্দীর দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে ঝানু।

এক পলক শিবেনকে দেখে নিতাই-এর সামনে গিয়ে রঞ্জন বলল, তুই আর ঝানু কাট। তারপর হাত লাগাবে শিবেন।

রোদ লেগে ঝকঝক করছে নিতাই-এর হেঁসো। সুদেবের সামনে সামান্য এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো নিতাই। ঘাড় হেঁট করে বসেছিল সুদেব। হঠাৎ মাথা তুলে নিতাইকে দেখে সুদেব ডুকরে উঠলো, মারিস না, আমাদের মারিস না।

বাবার কান্না শুনতে পেল না সুবাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এক জোড়া তিতির ডেকে উঠলো শালবনে। তরুণী পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে সূর্য হেলছে পশ্চিমে। রোদে জ্বলছে পাহাড়চূড়া। জোরালো হাওয়ায় বাঁধের ওপর আছড়ে পড়ছে লাল ধুলোর ঢেউ। পুকুর-ধারে একপায়ে দাঁড়ানো ধ্যানস্থ বক জলে টুপ করে ঠোঁট ডুবিয়ে তুলে নিল চুনো মাছ। দূরে থেকে শরীর কামড়ানোর ডাক ছাড়ছে সেই গোরু। হাত পা বাঁধা দুজন মানুষের সামনে হেঁসো হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিতাই। অনেক চেষ্টাতেও হাত উঠছে না তার।

বাবলু বলল, কাট, শালাদের কাট! তুদের সব্বোনাশ করেছে, মা বুনদের ইজ্জত কেড়েছে এরা।

বাবলুর কথাতেও নিতাই নির্বিকার। সময় চলে যাচ্ছে। ঝানুকে উৎসাহ দিতে পলাশ বলল, ঝানু ছাড়া এ কাজ হবে না। নিতাই-এর সঙ্গে হাত লাগাও তুমি। শ্রেণীশত্রুকে ছেড়ে দিও না। কাস্তে হাতে সুদেব মণ্ডলের দিকে এগিয়ে ঝানুও থমকে দাঁড়ালো। ঘাড় গুঁজে বসে থাকা সুদেবকে একপলক দেখে রঞ্জনকে ঝানু বলল, আগে হাত লাগা তুই, তারপর আমি।

রঞ্জন তাকালো শিবেনের দিকে।

শিবেন বলল, গরীব কৃষকের নেতৃত্ব ছাড়া খতমে পার্টির মানা আছে। তারা শুরু করলে সঙ্গে থাকবো আমরা।

তা ঠিক, সায় দিল পলাশ।

মাথা হেঁট করে ঝানু বলল, পাক মারছে আমার পেটে। সকাল থিকে খাওয়া হয় নাই। হাত যে চলে না।

আশা ছাড়েনি বাবলু। ঝানুকে সে বলল, অ্যাকশনের পর চা-মুড়ি খাওয়াবো।

রঞ্জন অধৈর্য, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। এতদিনের প্রচারেও কাজ হয়নি। গরীব মানুষের শ্রেণী ঘৃণা জাগাতে পারে নি তারা, পারলে সুদেব সুবাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো নিতাই, ঝানু। পেছিয়ে যেত না। কোথাও গোলমাল হয়েছে। গাঁয়ে গাঁয়ে গরীব কৃষকদের সঙ্গে মেলামেশা করে খতম, ক্ষমতাদখলের প্রচারে নেমে যথেষ্ট সাড়া পেলেও, প্রয়োগে কোথাও আটকাচ্ছে। তাই নিতাই, ঝানুর মতো এগিয়ে থাকা ক্ষেতমজুর দুই পার্টিকর্মী খতমে হাত লাগাতে ভরসা পেল না।

কিশোর, অজিতের সঙ্গে রাজনগরের গ্রামে গ্রামে পার্টির কিছু সভায় গিয়েছিল রঞ্জন। গাঁয়ের গরীব কৃষকদের সঙ্গে দু'তিনটে সভায় বসেই তাদের নিয়ে একটা সংগঠন গড়ে ফেলে কিশোর। অবলীলায় তৈরি গেরিলা স্কোয়াড, খতম শুরু হয়।

রঞ্জন দেখেছে, কিভাবে জেগে ওঠে মানুষ। শ্রেণীশত্রু খতমে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে তারা। উত্তেজিত মানুষদের ঠাণ্ডা করে ঠেকিয়ে আবার আলোচনায় বসে কিশোর। ক্ষমতা দখলে কারা শত্রু, কারা বন্ধু, গরীব মানুষের মর্যাদা, অধিকার, নানা প্রসঙ্গ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে। তার সহজ ভাষা, সাদামাটা কথা মন্ত্রের কাজ করে। রুদ্ধশ্বাস আবেগে ফুঁসতে থাকে শ্রোতারা। সভার পরে রঞ্জনের মনে হত কিশোরের কথা, চোখে জাদু আছে। কিশোরের নকল করে নিজের এলাকায় নানা গ্রামে সভা করেছে রঞ্জন। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, খতমের ব্যাখ্যা দিয়েছে। বেশির ভাগ সভাতে যথেষ্ঠ উত্তেজনা, আবেগ থাকলেও দরকারে কাজে লাগলো না। কেন এমন হল? নিতাই, ঝানুর গুটিয়ে যাবার কারণ কি?

নিতাই, ঝানুকে আর একদফা বোঝাবার চেষ্টা করছে পলাশ। শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখা যে মৃত্যু, ব্যাখ্যা করছে সে। শেষ করার আগে বলল, শালাদের কেটে দে। তাহলে ভোজ খাবো আজ রাতে।

চুপচাপ নিতাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার হাতের হেঁসো ছোঁ মেরে নিয়ে বাবলু বলল, আমি কাটবো।

রঞ্জন বলল, না।

বন্দুক হাতে বাঁধের দিকে মুখ, শিবেন দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। চারপাশে নজর রাখছে সে। আসলে সুবাসের দিকে তাকাতে চাইছে না সে। কলেজে পড়ার সময় সুবাসের সঙ্গে তার বাড়িতে কয়েকবার গেছে শিবেন। শীতে দুধ, মুড়ি, পাটালি খেয়েছে। সব স্মৃতি মনে আছে শিবেনের। রঞ্জন বলল, ওদের ছেড়ে দে।

বাবলু বলল, তা হয় না।

হয়, রঞ্জন বলল, যাদের লড়াই তারা উদ্যোগ না নিলে লড়াই হবে না। রিভিউ মিটিং করতে হবে আমাদের।

সুদেব, সুবাসের বাঁধন খুলতে গিয়ে শিবেন দেখল, সুদেব বেহুঁস। পাথরের মতো নিথর বসে আছে সুবাস। পুকুরে গামছা ভিজিয়ে সুদেবের চোখে মুখে শিবেন জল দিতে, জ্ঞান ফিরলো তার। তার শরীর ছুঁয়ে প্রবল জ্বর টের পেল শিবেন। কিছুক্ষণ পরে সুবাসের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুদেব। বাঁধ থেকে নেমে পরাশিয়ার দিকে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে দুজন মানুষ। এক পলক তাদের দেখে রঞ্জনের পাশে বসলো শিবেন। বাবলু বিড়বিড় করলো, আজ রাতে আবার দেখা হবে।

ক্লান্ত দেখাচ্ছে রঞ্জনকে। পিঠের ওপর শিবেনের হাতের স্পর্শ পেয়ে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকলো রঞ্জন। একটু আগের ঘটনা খতিয়ে ভাবছিল সে। সুদেব আর তার ছেলেকে এভাবে চটপট খতম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়নি। বলা যায় ভুল হয়েছে। নিতাই, ঝানু দুজনেই ভালো কর্মী। খতমে অরাজি হওয়া তাদের দোষ নয়। অরাজি হবার কারণ আছে। সাঁওতাল আদিবাসীদের সঙ্গে গরীব হিন্দু সম্প্রদায়ের চরিত্রগত নানা গরমিল থাকলেও দুঃসাহসে দুপক্ষই সমান।

তবে যে কেউ দুঃসাহস দেখাবার আগে গাঁ, গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ, পরামর্শ করে নেয়। এ হল গ্রামীণ, যৌথজীবনের আচরণবিধি, নিয়ম। সামাজিক অনুমোদনেই গ্রামের একজন গরীব মানুষ সংগ্রামে নামে। গাঁয়ের যৌথজীবন যেমন একজন মানুষকে চালায়, তেমনি তার যাবতীয় ভালোমন্দের ভাগীদার হয়। গরীব গাঁয়ে পুলিস ঢুকলে সেখানে ঢি ঢি পড়ে যায়। অত্যাচার থেকে কেউ বাঁচে না। নিদারুণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে সারা গ্রাম।

জলের দিকে তাকিয়ে ঘাসের ডাঁটা চিবোচ্ছে নিতাই। ঝানু হাই তুললো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিতাইকে রঞ্জন বলল, গরমে গরমে কোনো কাজ করা ঠিক নয়।

মুষড়ে পড়েছিল নিতাই। রঞ্জনের কথায় উৎসাহ পেয়ে সে বলল, ঠিক বটে।

পুকুর ধারে সামান্য ঘাস, লতা। বাকি মাঠ শুকনো খটখটে। লাল মাটি। ছিটেফোঁটা সবুজ নেই। ডাক ওঠা গোরুটাকে দেখতে পেল শিবেন। অস্বস্তিতে দড়ি ছিঁড়ে মাঠের ওপর ছুটে এসেছে। এক দল অচেনা মানুষ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গোরুটার দু চোখে ছলছল দৃষ্টি।

বেকুব বনে গেছে পলাশ। বাবলুর গা ছেড়ে দেওয়া ঝিমোনো ভাব। সন্ধের পর পরাশিয়া অভিযানের ছক, পরিকল্পনাও যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে। নিতাই, ঝানুর ব্যবহারে থিতিয়ে গেছে সকলে। হাই তুললো বাবলু। রোদ কমে হালকা ছায়া নামছে পৃথিবীতে। গুড়লগাছির দিকে মনোরম ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক বক। ধীরে ধীরে কমছে পাথুরে মাটির তাপ। কিছু কথা বলতে চাইছিল বাবলু। বীরভূম জেলার কৃষিউন্নয়ন সমিতির নেতৃত্বে জোতদার মহাজনরা গাঁয়ে গাঁয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ছে। প্রতিরোধ বাহিনীতে এলাকার দাগী ডাকাত, গুন্ডাদের নেওয়া হয়েছে। সক্রিয় সাহায্য দিচ্ছে পুলিশ। কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধ ঠেকাতে এই প্রতিরোধ বাহিনী।

এ বাহিনীর মাজা ভেঙে দিতে হলে প্রথম কাজ জোতদারদের বন্দুক কেড়ে তাদের নিরস্ত্র করা। জোতদার, মহাজনদের বন্দুক, প্রতিরোধবাহিনীর বল, ভরসা। সুতরাং সে বন্দুকগুলোর দখল নিতে হবে। এ হল, জনযুদ্ধের কৌশল, ডিসআর্ম দ্য এনিমি আর্ম অ্যান্ড ইওরসেলফ্, শত্রুর অস্ত্রেই সজ্জিত হবে গণফৌজ।

বিত্তবান জোতদার, মহাজনের যে ছেলেরা এতদিন তরজা, তাস, পাশায় সময় কাটিয়েছে, বেকায়দায় না পড়লে বাগাল, মুনিষ নিয়ে খাটাখাটি করেনিনি, তাদের হয়েছে মুশকিল। বন্দুক কাঁধে রাত জেগে গাঁয়ে পাহারা দিতে দিতে মাজায় পিঠে ব্যথা হয়ে গেছে তাদের। সর্দিতে ভুগছে কেউ কেউ।

সকালে বাঁধের ওপর বসে এসব খবর শুনিয়েছিল পলাশ। সুদেব, সুবাস চলে যাবার পর থমথমে আবহাওয়া কাটাতে পলাশকে বাবলু প্রশ্ন করল, কার যেন সর্দি হয়েছে?

ননীগোপালের, পলাশ জানালো।

পলাশের কথার ইঙ্গিত বুঝেও বাবলু প্রশ্ন করল, ননীগোপাল আবার কে ?

যে গোপালরা ননী খেয়ে বেঁচে থাকে।

পলাশের কথায় হাসাহাসি শুরু হল।

বাবলু বলল, গরমে এবার ননীগোপালরা গলতে শুরু করবে।

রঞ্জন বলল, প্রতিরোধবাহিনীতে অনেক বামপন্থী ননীগোপাল ঢুকেছে। বড়লোকদের জন্যে সভা, সমাবেশ করার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

মারা পড়বে ওরা, বাবলু বলল, বড়লোকের বাড়ির কুকুরকে গৃহকর্তার আগে মারতে হয়।

ছাব্বিশ

শালবনের মাঝে মাঝে দু একটা মহুয়া গাছ। অন্ধকারে শাল মহুয়ার তফাত নেই। সব একাকার। রাত আটটা নাগাদ অন্ধকার জঙ্গল দিয়ে দশ জনের গেরিলা স্কোয়াড পরাশিয়ার দিকে এগিয়ে চললো। শালবনের মধ্যে মকবুল এবং আরও তিনজন যোগ দিয়েছে স্কোয়াডে। সকলেই গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর না হলেও পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী। দুপুরের দ্বিধা, ক্লান্তি কাটিয়ে উঠেছে নিতাই। তার মাথায় ঝাঁকড়া বাবরি চুল ফিতের মতো বুনো লতা দিয়ে বাঁধা। এক ফালি চাঁদের আলোয় লাল মাটির পথ ভিজে ভিজে লাগছে। রঞ্জনের মুখে অভিযানের ছক শুনে, সামান্য রদবদলের পর নিঃশব্দে পশ্চিমমুখো এগোচ্ছে স্কোয়াড। পূবমুখী পরাশিয়ায় গেরিলা স্কোয়াড গ্রামের পেছন দিয়ে ঢুকবে। গ্রামের কাছাকাছি দু'ভাগ হয়ে গেল দশজনের বাহিনী। গাঁয়ের সদর রাস্তার দিকে চলে গেল চারজন। খিড়কিতে অপেক্ষায় থাকলো বাকিরা। সদর রাস্তার ওপর সুধন্য সাহার বাড়ির দোতলার ছাত থেকে আগেরবার জোতদাররা গুলি চালিয়েছিল মিছিলের ওপর। সুধন্য সাহার বাড়ি জোতদারদের ঘাঁটি। রোজ রাতে সেখানে প্রতিরোধবাহিনী জমায়েত হয়, শলাপরামর্শ করে। এ খবর রঞ্জন জানে। আজ রাতেও নিশ্চয় এই আয়োজন। এ ধারণাতেই বন্দুক দখলের পরিকল্পনা করেছে রঞ্জন। কম বেশি এক ডজন বন্দুক নিয়ে প্রতিরোধবাহিনীকে সদর সামলাতে ব্যস্ত রাখতে পারলে পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে ছ'জনের স্কোয়াড। বাবলু, রঞ্জনের নেতৃত্বে, দুটো দল অন্ধকারে দু'দিকে সরে যাবার দু তিন মিনিট পরে নির্জন অন্ধকার সদর রাস্তায় হঠাৎ শোনা গেল জোরালো শ্লোগান। চারজনের সমবেত ধ্বনি ছিন্নভিন্ন করে দিল শব্দহীন রাত। কয়েকবার স্লোগান দিয়ে ঝানুর কাঁধে হাত রেখে বাবলু বলল, পেছনের স্কোয়াড আসার আগেই আমরা দখল করবো সবকটা বন্দুক।

দুপুরে সুদেব মণ্ডলের খতমে যে ঝানু পিছিয়ে গিয়েছিল, রাতে বন্দুক দখলে তার অসীম উৎসাহ। টগবগ করে ফুটছে। বাবলুর কথা শুনে সে বলল, হ্যাঁ। স্লোগানের আওয়াজে সুধন্য মণ্ডলের ছাতের ওপর থেকে জোতদাররা হুঙ্কার দিল, আয় শালারা আয়, সবকটার মাথা আজ উড়ায়ে দেবো।

জোতদারদের হাঁকডাক, গালাগাল শুনে খুশি হল বাবলু। ভয় দেখিয়ে, রাগিয়ে লোকগুলোকে সদর রাস্তার দিকে আটকে ফেলার দায়িত্ব ছিল তার। তাই হয়েছে। তবে পার্টির নির্দেশে বন্দুক না আনার জন্যে আফশোস হল তার। রাস্তা

ছেড়ে বুনো ঝোপ, ডোবার ধার দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে গেলো চারজন সুধন্য মণ্ডলের ছাত থেকে ছুটে এল কয়েকটা বন্দুকের এলোপাথাড়ি এক ঝাঁক গুলি। আগুনের ঝলক, গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ঘুমিয়ে পড়া গ্রাম জেগে উঠেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে বারুদের গন্ধ। এক পশলা গুলি চালিয়ে বন্দুকগুলো চুপচাপ। বাবলু ভাবছে, পেছনের স্কোয়াডের সাড়া শব্দ নেই কেন? জোতদাররা নিশ্চয়ই পেছনে গুলি চালায়নি। বন্দুকের শব্দের পর নীরবতা নামলেও চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে চারপাশ। নাটকীয় ভঙ্গিতে বাবলু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, দশ গোনার মধ্যে সব বন্দুক নিচে ফেলে না দিলে ডিনামাইট চার্জ করবো আমরা।

কেটে কেটে পরিষ্কার করে বাবলু কথাগুলো বললেও ছাত থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্ধকারে আর একটা গলা, পলাশের, অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল, দাঁড়াও, একটু সময় দাও, এখনই ডিনামাইটের ফিউজ খুলো না।

পলাশের কথাও সুধন্য মণ্ডলের বাড়ির ছাতের লোকেরা শুনতে পেল। এই কাল্পনিক সংলাপ আগেই তৈরি করেছিল বাবলু, পলাশ। গ্রামের পেছনে ঘন অন্ধকারে রঞ্জন, তার সঙ্গীরা স্লোগান, গুলির শব্দ, সংলাপ শুনছে। পরাশিয়া গাঁয়ের মাতব্বর পান্নালাল সাহার বাড়ির সামনে সদলে এসে দাঁড়ালো রঞ্জন। বাড়ি থেকে পান্নালালের বউ, মেয়েকে বার করে আনতে পারলে কেল্লা ফতে। পান্নালালের বাড়ি কবরের মতো নিস্তব্ধ। মানুষজনের সাড়া নেই।

রঞ্জন এবং বন্ধুদের সাড়া না পেয়ে দমে গেল বাবলু। হঠাৎ কী ওরা কোনো দুর্ঘটনায় পড়লো? দুশ্চিন্তায় পাক খাচ্ছে বাবলুর মাথা। শীতল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে মনে। তাদের দুর্বলতা টের পেয়ে বন্দুক হাতে শত্রুরা ছাত থেকে নেমে ঘিরে ধরলে রেহাই নেই। ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় পরাশিয়ার মাঠে পড়ে থাকবে গুলিতে ঝাঁঝরা চারটে লাশ। পুলিশ রিপোর্টে লেখা হবে গ্রামবাসীদের হাতে চার কুখ্যাত উগ্রপন্থী নিহত। একটা কুটুরে পেঁচা মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। অন্ধকারে পাশের একটা বাড়ি দেখিয়ে ঝানু বলল, সুদেব মণ্ডলের ঘর বটে।

ডানদিকের বড় দোতলা মাঠকোঠার একতলার ঘরের বন্ধ জানলার চিড় দিয়ে অল্প আলো দেখা যাচ্ছে।

বাবলু দেখলো, বন্ধ জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পলাশ।

সুদেব মণ্ডলের বাড়ির এটা পেছন দিক। সামান্য এগিয়ে শুরু হয়েছে মাটির পাঁচিল। প্রায় দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল সোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরে সদর দরজায় মিশেছে। মাটির হলেও পাঁচিল যে পোক্ত, মজবুত বুঝতে পারলো বাবলু। বন্ধ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাবলুর মাথায় একটা মতলব এলো। ঝানু, পলাশের সঙ্গে চাপা গলায় পরামর্শ করে বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, বন্দুকটা দাও।

ঘরের মধ্যে আবছা শব্দ তুলে যারা কথা বলছিল, বাবলুর গলা শুনে চুপ করে গেল তারা। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। গম্ভীর গলায় বাবলু আবার বন্দুক চাইতে ঘরের মধ্যে মেয়েলি কণ্ঠ ডুকরে উঠলো, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও।

ভরাট গলায় একজন বলল, নাহ্।

ঘরে স্বামী স্ত্রীর কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে। ঝানুকে নিয়ে মাটির পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো বাবলু। মানুষ সমান খাড়া পাঁচিল বেয়ে ওপরে ওঠার সময়ে সুধন্য সাহার বাড়ির ছাত থেকে ভেসে আসা কিছু কথা বাবলু শুনতে পেল। সেখানেও জোতদারদের মধ্যে বচসা চলছে। এক দল রাস্তায় নেমে শত্রুদের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ছাত থেকেই লড়াই করতে চাইছে অন্যরা। পাঁচিল বেয়ে প্রথমে ঝানু তারপর বাবলু বাড়ির ভেতরের উঠোনে নামলো। কেউ টুঁ শব্দ করলো না। নিকোনো, পরিষ্কার উঠোন। উঠোনের দুদিকে মাটির উঁচু দাওয়া। একটা ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁকে ফিকে আলো দেখে বাবলু বুঝলো, সেখানেই আছে সস্ত্রীক সুদেব মণ্ডল। অন্ধকার থাকলেও ঝানুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে নিল বাবলু। বন্ধ দরজার সামনে মুহূর্তের জন্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাঁচ সাত হাত পেছিয়ে এসে শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে বন্ধ দু পাল্লার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দুজন। দরজার হুড়কো তোলা ছিল না। শুধু ভেজানো ছিল। ফলে পাল্লা খুলে ঘরের মধ্যে খাটে বসা সুদেব মোড়লের প্রায় কোলের ওপর গিয়ে পড়লো বাবলু। বন্দুক হাতে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিল সুদেব। আচমকা ধাক্কায় তার হাত থেকে ছিটকে গেল বন্দুক। জোর আছাড় খেয়েছিল ঝানু। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে দেখলো, তার পায়ের কাছে কেউ ছুঁড়ে দিল একটা বন্দুক। ঝানু তুলে নিল বন্দুকটা। হাতে বন্দুক রাখার ভরসা না পেয়ে বাবলুকে গছিয়ে দিল। ঝানুর হাতে ধারালো হেঁসো। ঝকঝকে লম্বা ছুরি বাবলুর হাতে। অস্ত্র দুটো বাগিয়ে ধরে ভেজানো দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা। সুদেব মণ্ডলের বন্দুক পেয়ে বাবলু বুঝলো, বাকি এগারোটা বন্দুক দখলে আর অসুবিধে নেই। ছুরি হাতে বাবলুকে সুদেবের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে তার বউ আছড়ে পড়লো বাবলুর পায়ের ওপর।

বাবাগো।

শব্দটা উচ্চারণ করেই বুজে গেল তার গলা।

এক পা পেছিয়ে এলো বাবলু। কিছু ভেবে পকেটে পুরে রাখলো ছুরি। দাওয়ায় এসে বাড়ির চারপাশ দেখে নিল সে। সুদেবের ছেলেটা কোথায় আঁচ করতে চাইল। দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে অন্ধকার আকাশের দিকে বন্দুক তুলে ফাঁকা আওয়াজ করলো চার, পাঁচবার। সুধন্য সাহার বাড়ির ছাত থেকে জবাব এল, গুড়ুম গুড়ুম। অন্ধকারে ছুটে গেল কয়েক টুকরো আলোর ঝলক।

সুদেব মণ্ডলের বাড়ির বন্ধ দরজা খুলে বাবলু, ঝানু বাইরে পা দিয়ে দেখলো, পুব দিক থেকে একটা মিছিল আসছে। মিছিলের সামনে দুই মহিলা।

দুজনের মুখের কাছে দুটো হ্যারিকেন শিবেন, নিতাই এমনভাবে ধরেছে যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুই মহিলার মুখ। ঝানু বলল, পান্নালালের বহু আর বিটি।

পান্নালাল গাঁয়ের মাতব্বর, প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা।

ঝানুর কথা শেষ হবার আগেই মিছিলের সামনে থেকে বয়স্ক মহিলাটি, সম্ভবত পান্নালালের বউ, সুধন্যর ছাতের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ওগো তুমরা বন্দুক চালিয়ো না গো, আমরা মরে যাবো।

সুধন্য সাহার বাড়ির ছাত নিস্তব্ধ। কথা বলছে না কেউ। মিছিলের সামনে বউ মেয়েকে দেখে পান্নালাল হতবাক। তার সঙ্গীরাও তাই। বন্দুক হাতে ছাতের ওপর অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে তারা। রঞ্জনের বুদ্ধি দেখে বাবলু তাজ্জব। মাথা খাটিয়ে এমন চাল দিয়েছে যে, প্রতিরোধবাহিনী কুপোকাত। পান্নালালের বউ-এর কানে শিবেন কিছু বলতে মহিলা চেঁচিয়ে উঠলো, তুমরা বন্দুকগুলান দিয়ে দাও।

শব্দহীন অন্ধকারে তার কথা শুনতে পেল সবাই। বন্দুক হাতে মিছিলের সামনে এসে বাবলু চেঁচিয়ে উঠলো, এগারোটা বন্দুক গুনে নেব।

সুধন্যর সদর দরজার সামান্য দূরে দাঁড়ালো মিছিল। বাবলু বলল, সময় নেই, জলদি।

ছাত থেকে মাটিতে প্রথম বন্দুক ফেললো পান্নালাল।

তারপর একটা একটা করে পড়লো আরো দশটা বন্দুক। বাবলু গুনছে রাম, দুই, তিন! বন্দুক পাওয়ার পর মিছিলে উঠলো স্লোগান। স্লোগানের ঝড় বইছে। স্লোগান ফুরোতে শুরু হল নাচ গান। চারপাশের গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা জড়ো হয়েছে। হ্যারিকেনের আলোয় হঠাৎ নিজের হাতের পাতা দেখে ঝানু বলল, আমার কড়ে আঙুল নাই।

রঞ্জন, বাবলু একসঙ্গে নজর করলো ঝানুর ডানহাত রক্তাক্ত। উড়ে গেছে তার কড়ে আঙুল। সুদেব মণ্ডলের বাড়ির দরজা ভাঙতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে ঘটলো, বুঝতে পারছে না বাবলু। এখনই চিকিৎসা না হলে বেচারি ভুগবে।

বাবলু তাকালো রঞ্জনের দিকে।

সাতাশ

হাওয়ায় খবর ছোটে হুল শুরু হয়েছে। দুমকা, ভাগলপুর থেকে রাণীশ্বর, রাজানগর, সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত। এর মধ্যে পার্টি খবর পাঠালো, জেলায় মিলিটারি নামছে। সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব। এরকম হবে আগেই বুঝতে পেরেছিল কিশোর। গ্রামে গ্রামে যে সব পুলিশ ক্যাম্প বসেছে, সারাদিন, রাত ক্যাম্পেই থাকে তারা। দল বেঁধেও গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতে তারা রাজি নয়। ভয়ে তাদের মুখ কালো। প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। জেলার পরিস্থিতি জেনে কলকাতা তোলপাড়, দিল্লি উদ্বিগ্ন। মাঠের পাকা ফসল ফেলে রেখে জোতদার, মহাজনরা গাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে। জীবনের চেয়ে ফসল তো আর বেশি দামী নয়।

একটা বড়ো হামলা যে শুরু হবে, পুলিসের পর সেনাবাহিনী, তারপর গোটা রাষ্ট্রশক্তি নেমে রক্তস্রোতের বন্যা বইয়ে দেবে, এ আশংকা কিশোরের ছিল। বিপ্লব মানে যুদ্ধ, দুটো শ্রেণী ক্ষমতার জন্যে দাঁতে দাঁত দিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়বে। সে যুদ্ধে রক্ত ঝরবেই। সাজানো, নকল যুদ্ধে, যাত্রা, থিয়েটারে, সংসদীয় গণতন্ত্রে রক্ত ঝরে না। রক্তপাতহীন বিপ্লব ষোল আনা ধাপ্পা। একরকম এক ধাপ্পা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে বামপন্থীরা।

সভা হচ্ছে টোংরা গ্রামে। জেলা কমিটির সভায় নিজের ধারণার কথা কিশোর বলল। আরো কিছু কথা মাথার মধ্যে চাপ বেঁধে থাকলেও গুছিয়ে বলতে পারলো না সে। আজ খুব বড় সভা বসেছে বাঁশকুলি গ্রামে। সভায় জেলার সমস্ত প্রতিনিধি এসেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুরেনদাকে নিয়ে ব্রজদার আসার কথা।

সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় পরিবর্তন, এখন চোখে পড়ে, তা হলো তাদের ইজ্জতবোধ। আত্মসম্মানের ধারণা ফিরে পেলে লড়াকু হয় মানুষ। তাই ঘটেছে। আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাসে সাঁওতাল কৃষকরা এখন ভরপুর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর হতাশায় মুখোমুখি গুম হয়ে যারা বসে থাকত, তারা কথা বলছে। খই ফুটছে তাদের মুখে। সাঁওতালী শব্দভাণ্ডার খুব বড় নয়। জীবনের হাজার ছোটখাটো স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা নিঃশব্দে প্রকাশ করে তারা। অনেক জীবন্ত শব্দও না ব্যবহার করায় অচল, মৃত হয়ে গেছে। এভাবে চললে আগামী বিশ, পঞ্চাশ বছরে সাঁওতালী ভাষার অর্ধেক শব্দ হারিয়ে যাবার আশংকা ছিল। কিন্তু ইজ্জতবোধ জেগে ওঠার সঙ্গে নিজেদের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য-চর্চায় এগিয়ে এসেছে সাঁওতাল যুবকরা। দপ করে জ্বলে ওঠা আলোয় ভাসছে শব্দের ভাঁড়ারঘর, মুখে মুখে তৈরি হচ্ছে নতুন কবিতা, ছড়া, গান।

সশস্ত্র সংগ্রামের তাপে পেছিয়ে থাকা, নিরক্ষর জনসমষ্টির মনে ইতিহাস, সংস্কৃতি চর্চার ঢেউ উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য কিশোরের যখন মনে পড়লো, তখন বক্তৃতা শুরু করেছে বরুণ।

বরুণ বলল, যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি। খতমের রাজনীতি এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এক লাফে অনেক এগিয়ে গেছে লড়াই। যুদ্ধে জয়, পরাজয়, দুটোই আছে। আজ জিতেছি, কাল হারতে পারি। কাল যদি মার খাই, ভয়ের কিছু নেই। শত্রুরা তৈরি। তারা নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে আমাদের। তবু শেষ পর্যন্ত আমরা জিতব। শত্রুপক্ষের আক্রমণের কথা মাথায় রেখে এখনই গ্রামভিত্তিক স্কোয়াডগুলো মজবুত করতে হবে। স্কোয়াডের নেতৃত্বে থাকবে গরীব কৃষক। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। সভায়, গেরিলা স্কোয়াডে এত ভিড় করা চলবে না।

কথাটা বলে বরুণ একবার তাকালো কিশোরের দিকে। বরুণের শেষ কথাগুলো মেনে নিতে পারছে না কিশোর। উৎসাহী বন্ধুরা যদি সভায়, গেরিলা স্কোয়াডে আসে, ক্ষতি কী? কীভাবে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যায়? কিন্তু এ প্রশ্ন সে তুললো না। প্রশ্ন তুললে সে জানে, তার তার সঙ্গে বরুণের বিতর্ক বেঁধে যাবে। তর্ক করার জন্যে সবসময় মুখিয়ে আছে বরুণ। কিশোরকে আজকাল বরুণ সহ্য করতে পারছে না। পার্টির ভেতর তাকে নিয়ে ঘোঁট পাকানো চলেছে। আভাসে বুঝতে পারলেও মুখে কিছু বলতে পারে না কিশোর। চোখের সামনে নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত দুই জোতদার খতম হবার পর থেকে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন, সংশয় জেগেছে তার মনে। যুদ্ধে দুটো পক্ষ মুখোমুখি লড়াই করে। তাপারিয়া, প্রহ্লাদ মণ্ডল শ্রেণীশত্রু হলেও মরার সময়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি ছিল না তারা। মরার আগে দুজনেই কিছু বলতে চেয়েছিল। সম্ভবত নিজেদের শুধরে নেবার প্রতিশ্রুতি দিতে চেয়েছিল তারা। সুযোগ পেলে ওরা কি বদলাতো না? কথাটা গত কয়েকদিন বারবার ভেবেছে কিশোর। হয়তো বদলাতো, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষকদের সঙ্গে কথা, আচরণে সংযত হত'। উল্টোটাও হতে পারত। আরও মারমুখি, নিষ্ঠুর হয়ে উঠত দুজনে। সবই তার অনুমান। বাস্তবে না ঘটলে পাকা সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তবে কিশোরের বিশ্বাস, মানুষ বদলায়। ভালো মানুষ যেমন খারাপ হয়, তেমনই সৎ, শুদ্ধ, মহৎ হয়ে উঠতে পারে একজন বাজে লোক। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনার অসংখ্য নজির আছে। রূপান্তরেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য! তাপারিয়া, প্রহ্লাদের ঘরবাড়ি, আসবাব, পোশাক দেখেও হতাশ হয়েছিল কিশোর। ছেঁড়া কাঁথার বিছানা, মোটা ময়লা জামাকাপড়, পুরনো ভাঙাচোরা আসবাব, বাসন, সব মিলে শহরের নিম্নবিত্ত পরিবারের মতো এখানকার বেশিরভাগ জোতদারের ঘরকন্না, পারিবারিক জীবন। দেখলে করুণা হয়। পোশাক, ঘরসাজানো, আধুনিক জীবনে ঘোর অবিশ্বাসেই তারা এরকম এক জীবন বজায় রেখেছে। ব্যাঙ্কের বদলে এখনও মাটির তলায় সোনাদানা, টাকাকড়ি পুঁতে রাখে কেউ কেউ। আসলে রুচি, সংস্কৃতির অভাব। জীবনযাপনের সামন্ততান্ত্রিক মাপকাঠিও তৈরি হয়নি এখানে।

বরুণের বক্তৃতা শেষ হতেই অজিত প্রশ্ন করল, খতমের পরে কী ?

ভ্রূ-কুঁচকে অজিতকে এক পলক দেখে বরুণ বলল, খতমের পর জনযুদ্ধ, ক্ষমতা দখলের লড়াই।

কথাগুলো অজিত জানে, তবু যে সে কেন বরুণকে প্রশ্নগুলো করল, কিশোর বুঝতে পারলো না। বরুণের জবাব প্রায় না শুনেই অজিত ফিসফিস করে কিশোরকে বলল, আমার ওষুধের পুঁজি শেষ। কী করে আনবো, ভেবে পাচ্ছি না।

কিশোর বুঝতে পারলো ছটফটানি পেয়ে বসেছে অজিতকে। একটু আগে বরুণকে যে প্রশ্ন অজিত করেছিল, তা যেমন বানানো, ওষুধের প্রসঙ্গও তাই।

চাপাগলায় কিশোর জিজ্ঞেস করল, খতমের লাইন কি মানতে পারছিস না তুই ? একটা পোড়া দেশলাই কাঠি দিয়ে মাটির ওপর নকশা আঁকছিল অজিত। কিশোরের প্রশ্নে এক মুহূর্ত চুপ থেকে অজিত বলল, খতমের পর কী? একজন, দুজন, তিনজন জোতদার খতম করার পর যখন খতমের জন্যে আর জোতদার পাওয়া যাবে না, কি হবে তখন ? ঘৃণা উগরে দেবার পর, গরীব মানুষের বুকে যে দরদ, প্রীতি, ভালোবাসা আছে, সেগুলো কোন কাজে লাগাবে তারা ? পুলিস, মিলিটারির সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই-এ সিধু, কানুর মতো এরা জীবন দেবে. তারপর ? শুধু শ্রেণীশত্রু খতম, বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ মিলে বিপ্লব হয় না।

অজিতের ফিসফিস কথায় বিরক্ত বরুণ গলা চড়িয়েছে। বক্তৃতার প্রায় শেষ পর্বে বরুণ বলল, বিপ্লবী যুদ্ধ শুধু শত্রুর নয়, আমাদের ভেতরের বিষও ঝেড়ে দেবে। আরও সাহসী, সুস্থ, বিবেকবান মানুষ হয়ে উঠবো আমরা।

বরুণের কথা শেষ হতে দাঁড়িয়ে উঠে মোতি প্রশ্ন করল, আমরা যারা গরীব কৃষক, ক্ষেতমজুর নই, পার্টি-নেতৃত্বে কী কখনও জায়গা পাবো না ? সবকিছু ছেড়ে বিপ্লবের স্বার্থে যে সব মধ্যবিত্ত ছেলেরা এগিয়ে এসেছে, তারা কী কম্যুনিস্ট হিসেবে গ্রাহ্য হবে না ?

নিশ্চয়ই হবে, বরুণ বলল।

কম্যুনিস্ট হলে কেন নেতৃত্বে যাবে না তারা ?

মোতির প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে বরুণ বলল, এ সব তাত্ত্বিক আলোচনার সময় এখন নয়। আমার বিশ্বাস, বিপ্লবী কাজের মধ্যে দিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে তুমি।

বরুণের কথায় খুশি না হলেও চুপ করে গেল মোতি। বক্তৃতার ভঙ্গিতে মিনিট দুই বুধন কী বলল, সে নিজেও পরিষ্কার বুঝলো কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জিয়ন রাগী গলায় বরুণকে প্রশ্ন করল, জোতদার কাটার কাম তুরা করিস না ক্যানে ? জোতদার কাটার সময় ক্যানে দলের বাইরে থাকিস ?

গরীব কৃষকের নেতৃত্বের বিষয় বুঝতে না পেরে জীয়ন ভেবেছে, শহরের সংগঠকেরা শ্রম আর সংগ্রাম এড়িয়ে যাচ্ছে। এ ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। অনেক গরীব কৃষকের মনে এই প্রশ্ন আছে।

পেছনে ফুর্তি কড়াই-এর সবুজ ক্ষেত। শুঁটিগুলো বড়ো হয়েছে। এক গোছা কড়াই-গাছ মাঠ থেকে ছিঁড়ে আনলো বুধন। ফুর্তি-কড়াই-এর আঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো অনেকে। জেলার নানা জায়গা থেকে শুধু নয়, বৃন্দাবনি, বাঁশকুলি, টোংরা, মাদারপুর, বাহেঙ্গা, দিখুলি, রাণীশ্বর থানার অনেক গাঁ থেকেও আজকের সভায় প্রতিনিধি এসেছে। বেশির ভাগ অঞ্চলে গেরিলা স্কোয়াড তৈরি। শ্রেণীশত্রুর ওপর যে কোনো দিন ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা।

সামনে সিধ নদী। তারপর ঘন শালবন চলে গেছে রামপুরহাট ছুঁয়ে দুমকা পর্যন্ত। দিন ফুরিয়ে আসার সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে চারপাশ। স্থির শীতল বাতাস জেগে উঠছে লাল মাটি ফুঁড়ে! কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুরেনদা যে কোনো কারণে এসে না পৌঁছনোয় আলোচনায় একটা খামতি থেকে গেল। সভা শেষ হওয়ার আগে সুরেনদা আসবে, এরকম ক্ষীণ এক আশা এখনও কাজ করছে কিশোরের মনে।

প্রবল বর্ষার জন্যে এবছর সিধ নদীর স্রোত হেমন্তেও কমেনি। নদীর কলকল শব্দ সভায় বসেও শুনতে পেল কিশোর। নদীর ধারে শালবনে পাহারায় বসেছে অজিত। সভা ছেড়ে চলে গেছে সে। উত্তরপুবের মাঠে হঠাৎ চার ছায়ামূর্তি দেখে বরুণ বলল, সুরেনদা!

কিশোরও দেখলো সুরেনদা, ব্রজদা, দুজন অচেনা তরুণ, ধীর পায়ে আঁকাবাঁকা মেঠো পথে এগিয়ে আসছে। সুরেনদা শুধু পার্টির দায়িত্বশীল নেতা নয়, বীরভূম জেলার কমুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ষাটের কাছাকাছি বয়স, ত্যাগী মানুষ।

কিশোর বুঝতে পারলো আজ সারা রাত চলবে এ সভা। সুরেনদার জ্বর হয়েছে। দারুন জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে সুরেনদা এতটা পথ পায়ে হেঁটে এসেছে। অসুস্থ সুরেনদার সঙ্গে বোলপুর থেকে এসেছে এক ছাত্রনেতা, নাম বুদ্ধদেব। তাঁতিপাড়া থেকে ব্রজদা আর রঞ্জনকে নিয়ে প্রায় দশমাইল পথ হেঁটে সভায় পেঁছেছে চারজন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল সুরেনদার। সারা শরীরে, এমনকি কপাল, গলায়, বিষ ফোঁড়ার মতো দগদগে ঘায়ের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছে সুরেনদার গলা। তবু নিজেকে চাঙ্গা রেখে বর্তমান পরিস্থিতি, পার্টির দায়িত্ব, রিপোর্ট করছেন সুরেনদা।

সবচেয়ে বড়ো কথা, পুলিসের ইনটেলিজেন্স ভেঙে দিয়েছি আমরা, সুরেনদা বলল, আমাদের কোনো খবর তারা পাচ্ছে না। যেটুকু পাচ্ছে ভুল, ভুয়ো। হয়রান হয়ে ফিজিকাল ইনটেলিজেন্স, ব্যাপক ধরপাকড়, লকআপে থানায় মারপিট, নির্যাতন, এমনকি খুনও করছে তারা। কলকাতা থেকে এক ঝাঁক গোয়েন্দা এনে তাদের পরামর্শেই এগোচ্ছে জেলা প্রশাসন। পুলিশ, প্রশাসনকে একতরফা ক্ষমতা দেবার পরেও কাজ না হওয়ায় সরকারী উদ্যোগে ডাকা হয়েছে সর্বদলীয় সম্মেলন। মিলিটারিও নামছে জেলাতে। এসবের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে আমাদের। তবে কয়েকটা ব্যাপারে সাবধান! পার্টির নামে ডাকাতি জোরজুলুম, টাকা আদায় চলছে। এসব বন্ধ করার জন্যে দরকার হলে ছাপানো প্রচারপত্র বিলি করতে হবে। আরও একটা

কথা, এলোপাথাড়ি অ্যাকশন, খতম আর নয়, হিসেব করে পা ফেলা দরকার।

সুরেনদার কথায় যুক্তির সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক উপাদান পেল কিশোর। পোড়খাওয়া, পরিণত রাজনৈতিক নেতার মতো কথা বলছে সুরেনদা।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে লম্বা শ্বাস টানলো সুরেনদা। সুরেনদার পাশে বনকাপাসির ঝোপে লাল জবার মতো ঝাঁকঝাঁক কুঁচো ফুল ফুটেছে। বাতাসে স্থির হয়ে আছে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। এক ঝলক সুবাস পেল কিশোর। সুরেনদাকে ক্লান্ত, অসুস্থ দেখাচ্ছে। কথা বলারও যেন সামর্থ্য নেই। কাঁধের ঝোলা থেকে একটা ট্যাবলেট বার করে বুদ্ধদেব বলল, একটু জল।

বুদ্ধদেবের কথায় নারকোলের মালায় করে হাঁড়িয়া এগিয়ে দিল বরুণ মাঝি। সবিনয়ে সুরেনদা বলল, আজ নয় কমরেড, আমার শরীর ভালো নেই।

ওষুধ খেয়ে সুরেনদা একটু সুস্থ হলেও, মুখ, চোখের ক্লান্তি গেল না। খুঁটিয়ে সুরেনদাকে দেখছে কিশোর। বনকাপাসি ফুলের গন্ধ খুব চড়া মনে হল তার।

দেড় দু' মিনিট চুপচাপ বসে সুরেনদা আবার শুরু করল, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ বিহারের সঙ্গে আমাদের জেলার সীমানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের হিসেবে এই জেলায় মারা গেছেন একুশজন পার্টি কর্মী। ধরা পড়েছেন প্রায় চারশো। জোতদার, মহাজন, ডাকাত গুন্ডাদের তৈরি প্রতিরোধ বাহিনীকে বন্দুক চালাবার ঢালাও হুকুম দিয়েছে সরকার। সিউড়িতে শিবির খুলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষকদের বোঝাচ্ছেন যে, হিংসা লোভ মহাপাপ। প্রফুল্লবাবুর অনুরোধে জোতদাররা একটাকার বদলে দেড়টাকা দিনমজুরি, খোরাকি পান্তা বা মুড়ির সঙ্গে দুটো করে বিড়ি দিতে রাজি হয়েছে। প্রফুল্লবাবু বলছেন, এমন এক পরিবেশ সিউড়িতে তিনি গড়ে তুলবেন যেখানে জোতদার, ক্ষেত-মজুর ভাই ভাই।

কার তরফে কথা বলছেন উনি, প্রশ্ন করলো বরুণ মাঝি।

বুঝে নিন।

জবাব দিয়ে সুরেনদা আবার বলল, ফসল কাটার মরসুম এখন। মাঠের ফসলের দখল রাখতে জেলার জোতদাররা নানা মতলব ছকেছে। প্রফুল্ল সেনকে শিখন্ডী খাড়া করে গাঁয়ে ঢুকতে চাইছে তারা।

সেটি হতে দেবো না বটে, রবি হাঁসদা বলল, ফসলের দখল ছাড়বো না।

সুরেনদার আলোচনা যে বরুণের অপছন্দ, তার মুখ দেখে বুঝতে পারছে কিশোর। রবি হাঁসদা ফসলের কথা তোলায় রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বরুণ বলল, ফসল দখলের লড়াই করার আগে পার্টির মতামত নিতে হবে।

ক্যানে, প্রশ্ন করলো রবি।

ক্ষমতা দখলের লড়াই, খতম, গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে ফসল, জমি দখলের লড়াই-এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ দুটো একসঙ্গে করা যায় না। করলে মূল লড়াই-এর ক্ষতি হয়।

বরুণের কথা শেষ হতে বক্তৃতা শুরু করল ব্রজদা। ব্রজদা বলল, রাজনৈতিক লড়াই, অর্থাৎ শ্রেণীশত্রু খতম করলেই অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া মিটে যাবে। শুধু অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের লড়াই করার পরিস্থিতি আজ নেই।

ব্রজদাকে সমর্থন করলো বরুণ। রঞ্জন ফ্যাকাসে মুখে চুপচাপ বসে থাকলো। তিনজনের বক্তৃতার পর সকলে আশা করছিল সুরেনদা কিছু বলবে। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা হিসেবে তার মতামতই এখন চূড়ান্ত। সুরেনদা কিন্তু কিছু বলল না। সুরেনদার দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে হল, বয়স্ক মানুষটার শরীরে কোনো কষ্ট হচ্ছে। চাপা গলায় সে প্রশ্ন করল, আপনার কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে ?

ঢোঁক গিলে সুরেনদা উচ্চারণ করলো, নাহ্।

খয়রাশোল, ইলামবাজারের কমরেডরা উত্তেজিত ভঙ্গিতে ব্রজদা, বরুণের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে শুরু করল। সুরেনদাকে খোঁচা দিয়ে বক্তৃতা করল খয়রাশোলের এক ছাত্র কর্মী। সে বলল, কোনো কোনো জায়গায় গেরিলা অ্যাকশনের নামে পুরনো সংশোধনবাদী লাইন চলছে। দু'চার হাজার মানুষের ভিড় জমিয়ে গেরিলা স্কোয়াডের ধার মেরে দেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এর মধ্যে বাহাদুরি নেবার মানসিকতা আছে। সিউড়ির বনশঙ্কা গ্রামে গত হপ্তায় গেরিলা অ্যাকশনের পর গান-বাজনা, সভা করেছে দু' হাজার লোক। ভুরিভোজ হয়েছে। এ ঘটনা আমাদের পার্টি রাজনীতির বিরোধী।

খয়রাশোলের ছাত্রকর্মীর বক্তৃতার এই অংশে আড়চোখে সুরেনদার দিকে তাকালো ব্রজদা। সুরেনদার উদ্যোগেই বনশঙ্কায় তুঙ্গে উঠেছে কৃষক সংগ্রাম। গত পঁচিশ বছর সেখানে গরীব মানুষের সুখেদুঃখে সুরেনদা জড়িয়ে আছে। কলকাতায় পার্টির হেডকোয়ার্টার্সে যাবার সময় পায় না। তরুণ বক্তার সরাসরি আক্রমণে শব্দহীন বসে থাকলো সুরেনদা। অস্বস্তি হচ্ছে কিশোরের। অসুস্থ মানুষটাকে ঘোলাটে অন্ধকারে ভাঙাচোরা মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। অজিত থাকলে সুরেনদার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেত সে। কিন্তু এ সভার পাহারায় রাখা হয়েছে তাকে। সদর রাস্তায় নজর রেখে শালবনের মধ্যে বন্দুক বাগিয়ে বসে আছে সে। অজিতের সঙ্গে আছে মাঝবয়সী দীনু মাণ্ডি। জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নিরাপত্তার জন্যে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে স্থানীয় পার্টি। গাঁয়ের মানুষও সজাগ আছে। পাহারার কাজে অজিত যে সেরা লোক, সকলে জানে। চতুর পরিকল্পনায় সুরেনদাকে কোণঠাসা করা হচ্ছে বুঝেও কী বলবে ভেবে পেল না মোতি। সুরেনদার সমর্থনে বুদ্ধদেব উঠে দাঁড়ালে ইলামবাজারের এক কমরেড বলল, আপনি শহরের কমরেড। এ সভায় আপনার বক্তৃতা করার কোনো মানে হয় না।

হতাশ হয়ে বুদ্ধদেব বসে পড়লো। কিশোরের মনে হল, সুরেনদাকে হেনস্থা করার জন্যে রিজিওনাল কমিটির নেতারা দুর্বল, অসুস্থ সুরেনদাকে ধরে এনেছে এখানে। কিশোর শুনেছিল, পুণ্যদার সঙ্গে সুরেনদার রাজনীতিতে চোরা বিরোধ আছে। রিজিওনাল কমিটি পুণ্যদার গোঁড়া সমর্থক। সুরেনদাকে আক্রমণে কি

পুণ্যদার হাত আছে? কথাটা মনে হতে গুটিয়ে গেল কিশোর। এ অসম্ভব, নিজেকে বোঝাতে চাইল সে।

শূন্য চোখে অন্ধকার মাঠের দিকে সুরেনদা তাকিয়ে আছে। অসুস্থ মানুষটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে নাকি? সুরেনদার শরীরে অনেক রোগ, ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবিটিস, ক্রনিক আলসার। টিবি হয়েছিল ষাটের দশকের ঘোড়ায়। এত রোগ, উপদ্রব নিয়েও সুরেনদা অদম্য, অক্লান্ত, লড়াকু। আত্মগোপন করে আছে গত দু'বছর। পুলিস ভূভারত চষে খুঁজছে সুরেনদাকে। কেন্দ্রীয় সরকার, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, চার রাজ্য সরকার জীবিত বা মৃত সুরেন ঘোষালের মাথার জন্যে যে পুরস্কার ঘোষণা করেছে, তা লাখ টাকার বেশি। সুরেনদার দিকে তাকিয়ে মোতি প্রশ্ন করলো, শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে?

মোতির পিঠে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল সুরেনদা। সুরেনদার হাতের পাতায় আগুনের তাপ। ছ্যাঁক করে উঠলো মোতির পিঠ। রাত গড়িয়ে গেলেও সভা চলেছে। লড়াই যত বাড়ছে, সমস্যা, জটিলতা, জিজ্ঞাসা তৈরি হচ্ছে। সব সমস্যাই আনকোরা নতুন. আলোচনা তাই ফুরোচ্ছে না। ফসল তোলার ঠিক আগে গাঁয়ে গাঁয়ে এখন দারুন অভাব, চালের হাহাকার। ফি বছরই হয়। এ বছর অভাব, দারিদ্র্য বেশি। জোতদাররা গাঁ ছেড়ে পালানোয় গরীব চাষী, ক্ষেত মজুরদের কাজ নেই। মুনিষ, মাহিন্দার, বাগালের কাজ দেবে কে? ধান, চাল টাকাকড়ি ধার করারও উপায় নেই। ফলে প্রতি অ্যাকশনের পর দলের কিছু লোক একটু চাল, ডাল, তেল, নুন, পুরোনো ছেঁড়া একটা ধুতি হাতিয়ে নেবার জন্যে ছটফট করে। গেরিলা স্কোয়াড আর পার্টি নেতৃত্বের মধ্যে তখন এক স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। এ সমস্যার মীমাংসা এখনো হয়নি। কিন্তু হওয়া দরকার। জোতদার মহাজনরাও কম ধূর্ত নয়। ঘরবাড়ি ছেড়ে যারা চলে গেছে, তাদের গোলা, ভাঁড়ার ফাঁকা। এক কণা ধান, চাল মেলে না। গাঁয়ে যারা বাস করছে, হেঁসেল খরচের রসদ রেখে বাড়তি সব সরিয়ে ফেলেছে। ভাতে মারার কৌশল ভালো রপ্ত করেছে তারা।

বন্দুক দখলের রাজনীতি সমর্থন করলেও এখনই গণফৌজ গড়ার প্রস্তাব নাকচ করে বক্তৃতা দিচ্ছে ব্রজদা। ব্রজদা বলল, দখল করা বন্দুক দিয়ে এখনই যারা গণফৌজ গড়ার কথা ভাবছে, তারা ভুল। গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেবে নতুন মানুষ। গড়ে উঠবে গণফৌজ। খতম, গেরিলা যুদ্ধ বাদ দিয়ে গণফৌজ তৈরির কথা যারা ভাবছে, পার্টির সামরিক দর্শন তারা বুঝতে পারেনি।

ব্রজদার বক্তৃতার লক্ষ্য এখন সুরেনদার সঙ্গে কিশোরও। গণফৌজ গড়ার কথা আভাসে, ইশারায় কিশোর বলেছে।

মোতি প্রশ্ন করল, দখল করা বন্দুকগুলো কী করবো?

লুকিয়ে রাখো, ব্রজদা বলল।

কোথায়?

পুকুরে, ধানের গোলায়, গাছের মাথায়।

আঠাশ

জিপিওর বড় ঘড়ির নিচে এসে রেবা দেখলো আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে শিবানী। ঝিপঝিপ বৃষ্টিতে বাস থেকে নেমে এটুকু আসতেই ভিজে গেছে রেবা। কপাল, মুখে গড়িয়ে পড়ছে জল। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে আবছা হেসে রেবা বলল, দেরি হয়ে গেল।

গুমোট হয়ে আছে চারপাশ। আকাশে রুদ্ধশ্বাস মেঘ। ঝড় উঠতে পারে।

শিবানী বলল, আমি ভাবছিলুম আসবি না তুই।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শিবানী বলল, এখনই যাওয়া দরকার।

ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে শিবানীর সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো রেবা। বৃষ্টিতেও রাস্তায় মানুষজন কম নেই। ভিজে রাস্তায় জল কাটার শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। ফেয়ারলি প্লেস ছেড়ে কয়েকটা বাড়ির পর সরু, লম্বা একটা গলিতে শিবানীর সঙ্গে রেবা ঢুকলো। গলির মধ্যে পুরোনো একটা বাড়ির চারতলায় রায় এণ্টারপ্রাইজের অফিস। বাড়ির সদর দরজার মুখোমুখি ছিমছাম ছোট রেস্টুরেণ্ট। শিবানী বলল, এক কাপ চা খেয়ে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রায় এণ্টারপ্রাইজে যাওয়া উচিত।

বৃষ্টিতে ভিজে ঝোড়ো কাকের মতো হয়েছে দুজনে। মাথা মুখ মুছে, জল-কাদা মাখা শাড়ি গুছিয়ে নিতে চাইছিল রেবা। চারটে নিমকি বিস্কুট, দু' কাপ চা নিয়ে রেস্টুরেণ্টের কেবিনে বসলো দুজন। পরদা টানা কেবিন। চা খাওয়ার আগে রুমালে আরো এক দফা মুখ মুছে, গুছিয়ে শাড়ি পরে নিল রেবা। হাত ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে আঁচড়ে নিল সামনের ভিজে চুল। আয়না লাগানো একটা পাউডারের কৌটো নিজের ঝোলা থেকে নিয়ে পাকা হাতে প্রসাধন করছে শিবানী। মুখে সযত্নে পাউডারের পাফ বুলিয়ে সে বলল, যে চাকরির জন্যে তোকে নিয়ে যাচ্ছি, আমার করার কথা। টাইপ না জানায় ফসকে গেল।

শিবানীর মতো স্নো, পাউডার না মাখলেও তার আয়না নিয়ে মুখ দেখলো রেবা।

পাউডার লাগবে ?

শিবানীর প্রশ্নে রেবা বলল, নাহ্।

এমনিতেই সুন্দর তুই।

শিবানীর প্রশংসায় হাসলো রেবা। প্রসঙ্গ পালটে শিবানী বলল, মিঃ রায়ের

সঙ্গে তোকে আলাপ করিয়ে চলে যাবো আমি। জরুরী কাজ আছে।

কিছুক্ষণ থাক।

রেবার অনুরোধ শুনে শিবানী বলল, পারবো না রে। তাড়া আছে। তাছাড়া ইণ্টারভিউ দিতে হবে তোকে। এক, দু'পাতা টাইপ করতে দেবে রায়। সময় লাগবে।

শিবানীকে আয়না ফিরিয়ে দিল রেবা। বটুয়ায় আয়না রেখে চা, বিস্কুটের দাম দিল শিবানী। রেস্টুরেণ্ট ছেড়ে বেরিয়ে সেই পুরোনো বাড়িতে ঢুকে রেবা, শিবানী দেখলো লোডশেডিং। লিফট বন্ধ। একতলার করিডোর ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভ্যাপসা গন্ধে ভারী হয়ে আছে চারপাশ। পুরোনো স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠে হাঁপ ধরলো রেবার। পরিশ্রমের সঙ্গে অকারণ আতঙ্কে দুরদুর করছে তার বুক। চারতলার করিডোরে ডান দিকে অল্প হেঁটে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালো শিবানী। ঘরের দরজায় লাগানো লোহার কোলাপসিবল্ গেট আধখোলা। গেটের পর কাচের সুইংডোর। কাচের গায়ে লেখা, পুশ্। সুইংডোর ঠেলে ঘরে ঢুকলো শিবানী। পেছনে রেবা। পরিপাটি সাজানো ঘরের দেওয়ালে হাল্কা সবুজ প্লাস্টিক ডিসটেম্পার রঙ। বাইরের জরাজীর্ণ চেহারা দেখে বাড়ির ভেতরে যে এরকম সুসজ্জিত ঘর আছে বোঝা যায় না। ঘসা কাচের পার্টিশনে দুভাগ করা ঘর। সামনের দিকে দুটো টেবিল, চারটে চেয়ার, দেওয়ালে স্টিলের র‍্যাকের সারি। র‍্যাকে সরু, মোটা নানা সাইজের অনেক ফাইল। একটা টেবিলের ওপর টাইপ-রাইটার। অফিস ছুটি হয়ে গেছে। ফাঁকা ঘর। পার্টিশনের ওপাশ মালিকের খাস কামরার কাচের দরজা খুলে নীল উর্দি পরা অল্পবয়সী একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। রায় এণ্টারপ্রাইজের কর্মী। পিওন বা বেয়ারা।

মিঃ রায় আছেন?

শিবানীর প্রশ্নে বন্ধ কাচের দরজার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ টিপলো ছেলেটি। তার ভঙ্গি দেখে শিবানী হাসলেও গম্ভীর হয়ে গেল রেবা। ছেলেটার আচরণ পছন্দ হলো না তার। কাচের বন্ধ দরজায় দু'বার মৃদু টোকা দিল শিবানী। ঘরের ভেতর থেকে গম্ভীর গলা বলল, কাম্-ইন্।

পেতলের হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো শিবানী। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রেবা। বিশ, পঁচিশ সেকেণ্ড্ পরে দরজা ফাঁক করে রেবাকে শিবানী বলল, ভেতরে আয়।

ঘরে ঢুকলো রেবা। চমৎকার সাজানো ঘর। ঝকঝকে সাদা রিসিভার কানে লাগিয়ে কথা বলছে একজন মোটা, বেঁটে, লোক। তার বয়স বছর চল্লিশ, গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, নিকোটিনে বেগুনি দাঁতের মাড়ি। গদিমোড়া, ঘোরানো চেয়ারে গা এলিয়ে ফোনে কথা বলছে সে। এ মানুষটাই যে রায় এণ্টারপ্রাইজের মালিক, খোদ মিঃ রায় বুঝতে রেবার দেরী হলো না। দমে গেল সে। রায়ের গলার স্বর, কথা বলার ধরণে বোঝা যায়, গোপন, জরুরী আলোচনা চলেছে। রিসিভার রেখে রায় তাকাতে শিবানী বলল, আমার বন্ধু রেবা। এর কথাই বলেছিলাম। টাইপ জানে।

এক পলক রেবাকে দেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে রায় বলল, ব'সো।

রায়ের টেবিলের সামনে দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসলো শিবানী, রেবা।

চা খাবে?

নাহ্, এই মাত্র খেয়েছি, শিবানী বলল, তাছাড়া এখনই যেতে হবে আমাকে। কাজ আছে।

যাও। তোমার বন্ধুর টাইপ-এর স্পিড একবার পরীক্ষা করবো আমি।

রায়ের অনুমতি পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শিবানী বলল, দেখা করবো আপনার সঙ্গে।

কাল নয়, পরশু এসো।

শিবানী চলে গেল। সে যেতে নিস্তব্ধ হলো ঘর। গা ছমছম করছে রেবার।

তোমার স্পিড্ কতো?

রায়ের প্রশ্নের জবাব দিল রেবা। একটুকরো ছাপা কাগজ টেবিলে রেখে রায় বলল, বাইরে মেশিন, সাদা কাগজ আছে। টাইপ করো এই লেখাটা। তিন কপি হবে।

কথা শেষ করে ঘরের সব আলো জ্বেলে দিল রায়। বাইরে মেঘ, অন্ধকার। ঝিপঝিপ বৃষ্টির কামাই নেই। অফিস, কাছারি ছুটির পর ডালহৌসি পাড়া নির্জন। নিচের রাস্তা থেকে গাড়ির শব্দ, মানুষের গলাব আবছা গুঞ্জন ভেসে আসছে। ছাপা কাগজ নিয়ে টাইপ মেশিনের সামনে বসেছে রেবা। শিবানী চলে যেতে অশান্ত তার মন। স্কুলজীবনে তার সহপাঠিনী ছিল শিবানী। তারপর বহুবছর দেখা নেই। টেলিফোন সাফাই-এর কাজে ঢুকে প্রায় ছ সাত বছর পরে শিবানীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আবার। শিবানীও টেলিফোন ঝাড়পোঁছের কাজ করতো। এ বাড়ির তিন, চারটে অফিসের ফোনের তদারকী করতো সে। রায় এণ্টারপ্রাইজের ফোনের দায়িত্বও ছিল তার। রায়ের সঙ্গে তখনই তার আলাপ। ফোনসাফাই-এর চাকরি ছেড়ে এখন এক সওদাগরি অফিসের সে রিসেপ্শনিস্ট্। চালচলন, পোশাক, প্রসাধনে শিবানী দারুণ স্মার্ট, আধুনিক। তার আর্থিক অবস্থা যে স্বচ্ছল, দেখে বোঝা যায়। তাব মুখেই রায়ের নানা ব্যবসার খবর রেবা জেনেছে। সিনেমা হল, কোল্ড্ স্টোরেজ, কাপড়ের মিল আছে। কেনাবেচার কাজও করে। ফাটকা বাজারের সে একজন চাঁই।

রায় এণ্টারপ্রাইজের মূল অফিস বাগরি মার্কেটে। এ অফিস নতুন। এখনও পুরোদমে কাজ শুরু হয়নি।

ছাপা কাগজ দেখে সাবধানে টাইপ করছে রেবা। এক বছর আগেও মিনিটে চল্লিশটা শব্দ টাইপ করতে পারতো সে। চর্চা না থাকায় স্পিড্ কমে গেছে। তাড়াহুড়োয় ভুল হয়ে গেল একটা বানান। ইরেজার ঘসে বানান শোধরাতে গিয়ে কালচে দাগ পড়েছে কাগজে। অশান্তি হচ্ছে তার। ঝমঝম শব্দে জোরে বৃষ্টি নামলো। সেই ফোক্কড় বেয়ারাটা যে বাইরে গেল, এখনো ফিরলো না। কাজ শেষ

করে হয়তো বাড়ি চলে গেছে সে। আজ আর ফিরবে না। পিলে চমকানো শব্দে কাছে কোথাও বাজ পড়লো। ভয় করছে রেবার। ঘাড়ের ওপর গরম হাওয়া লাগতে আঁতকে উঠলো সে। পেছনে ফিরে দেখলো, তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে টাইপ করা কাগজ দেখছে রায়। দরজা খুলে রায় কখন বেরিয়ে এসেছে টের পায়নি সে। মেশিনের খটখট শব্দে ঢেকে গিয়েছিল সব আওয়াজ।

সহজ গলায় রায় প্রশ্ন করল, হলো ?

ভয়ে কাঁপছিল রেবা। কোনোমতে বিড়বিড় করে সে যা বলল, কানে গেল না রায়ের। টাইপরাইটারের রোলার থেকে টাইপ করা কাগজটা বার করল সে।

ভেতরে এসো।

রায় ডাকতে তার সঙ্গে ভেতরের ঘরে ঢুকলো রেবা। জ্বালা করছে তার কণ্ঠনালী। ডালহৌসি থেকে ভেসে আসছে ট্রামের ঘণ্টার আবছা ধ্বনি। ঘরের বাতাস বন্ধ, গুমোট। বাতাসে অচেনা গন্ধ। রেবার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ বোলাচ্ছে রায়। ঘরের সব জানলা বন্ধ। রাস্তার দিকের জানলা কেটে বসানো হয়েছে একটা এয়ারকুলার। কুলার চলার রিনরিন শব্দ শুনতে পাচ্ছে রেবা। ঠাণ্ডা মেশিন শীতলতা ছড়াচ্ছে ঘরে। তবু ঘাম ফুটেছে রেবার কপালে। টেবিলের বাঁ দিকে শৌখিন ডিভান। একমানুষ লম্বা। ডিভানের পাশে টিপয়ের ওপর কাটগ্লাসের ছাইদানি। ডিভানে বসেছে রায়। কাচ লাগানো দেওয়ালআলমারির নিচে লোহার সেফ্। কাগজ থেকে চোখ তুলে রায় বলল, চলে যাবে। তবে স্পিড্ কম।

জানলার বন্ধ কাচে আঁকজোক কাটছে বৃষ্টির জল। রেবার সঙ্গে চোখাচোখি হতে হেসে রায় বলল, তোমার ঠিকানায় অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠি চলে যাবে।

যাবার জন্যে রেবা পা বাড়াতে রায় প্রশ্ন করল, এই বৃষ্টিতে কী করে যাবে ?

পালাতে পারলে রেবা বাঁচে। সে বলল, চলে যাবো।

খুব তাড়া ?

কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না রেবা। এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে বলল, সকালে বেরিয়েছি। তাড়াতাড়ি না ফিরলে চিন্তা করবে বাড়িতে।

কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু শুধু বাড়ির কথা ভেবেই যে সে ফিরতে চাইছে, তাও পুরো ঠিক নয়। তার ব্যাগে অসুস্থ মায়ের ওষুধের ফর্দ। টাকার জন্যে ফেরার পথে একবার প্রভাদির বাড়ি যাবে সে। দ্যুতির খবরও নেবে। গ্রামে কাজ করার জন্যে মাসখানেক হলো বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে সে। কিশোরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাঁওতাল পরগণাতেই দ্যুতির থেকে যাবার কথা। একমাস কোনো খবর নেই তার। বীরভূমের পার্টির কাছ থেকে দ্যুতির খবর নেবার চেষ্টা করেছিল প্রভাদি। কিছু জানা যায়নি। দ্যুতির হদিশ মিললে কিশোরেরও খবর পাওয়া যেত।

জানলার বাইরে একলহমা তাকিয়ে রায় বলল, একটু বসে যাও। বৃষ্টিটা ধরুক।

তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাস্তায় বেরোতে রেবার যে খুব ইচ্ছে আছে, এমন নয়। কিন্তু রায় কেমন মানুষ, ভালো, না মন্দ, বুঝতে পারছে না রেবা। তার মুখের ওপর সটান নজর রেখে রায় বলল, সন্ধ্যেটা আমার সঙ্গে কাটালে রাত নটায় বাড়িতে নামিয়ে দিতে পারি তোমাকে।

প্রস্তাব শুনে পাথর হয়ে গেল রেবা। দরজার হাতল ধরেও বন্ধ দরজা খুলতে পারছে না সে। এক মুহূর্ত রেবাকে দেখে রায় বলল, সবটাই তোমার ইচ্ছে। হিন্দি ছবির ভিলেন নই আমি।

বন্ধ দরজা। ফাঁকা বাড়ি। দিন শেষ। মেঘে মেঘে ঘন হয়েছে অন্ধকার। সামনে দাঁড়ানো লোকটা এখন তাকে ছিঁড়ে খেলেও বাঁচাতে আসবে না কেউ। মানুষটার টাকা আছে, প্রভাব, প্রতিপত্তিও কম নয়। রেবা জানে, শুধু এই ফাঁকা বাড়িতে কেন, রায় চাইলে ভিড় রাস্তা, সংসার থেকে উপড়ে আনতে পারে তাকে। তার মতো গরীব, অসহায় কতো মেয়েই তো ভেসে যাচ্ছে রোজ।

নিস্তব্ধ শীতল ঘরে বাতানুকুল যন্ত্রের সিরসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডিভান ছেড়ে দাঁড়িয়ে রায় বলল, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।

রায় কী বলছে, বুঝতে পারলো না রেবা। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

রায় বলল, কাল আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে শিবানী।

একমুহূর্ত চুপ থেকে রায় প্রশ্ন করল, টাকাটা কেন সে নিয়েছিল জানো ?

বোবা চোখে রেবা তাকিয়ে আছে দেখে রায় বলল, জেনে কাজ নেই তোমার। চাকরির খোঁজে তার সঙ্গে আর কোথাও যেও না।

রাস্তায় বোধহয় জল জমেছে। গাড়ির চাকার জল ভাঙার শব্দ শুনলো রেবা। জানলার কাচে মুখ রেখে রাস্তা দেখছে রায়। নিজের চেয়ারে ফিরে রায় বলল, একজন টাইপিস্টের দরকার আমার। তবে এখনই নয়। শিবানী প্রায়ই তার দু'একজন বান্ধবীকে চাকরির জন্যে এখানে আনে। এক'দুজনকে ঢুকিয়েও দিয়েছি। কিন্তু সকলকে চাকরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। গোড়াতেই নিজের অসহায়তা জানিয়ে দিই আমি। যদি কোনো মেয়ে সঙ্গ দেয় আমাকে, কোনো সন্ধেতে গল্প, আড্ডায় বসে, তাহলে তাকে পঞ্চাশ, একশো টাকা দিয়ে থাকি। অনেকে স্বেচ্ছায়, সানন্দে রাজি হয়। ফোন করে চলে আসে আমার কাছে। রেস্টুরেণ্টে যায়, ড্রিংক করে। বেশ কিছু ভদ্র, স্মার্ট মেয়ে এই যোগাযোগ, মেলামেশাকে স্পোর্টস হিসেবে নিয়েছে। তাদের কোনো গ্লানি, পাপবোধ নেই। কেন থাকবে ? যে মেয়েরা চাকরি করে, নাটক, সিনেমায় অভিনয় করে, মডেল হয়, ক্লাবে, রেস্টুরেণ্টে নাচে, গায়, নিজেদের পেশার জন্যে কি তারা লজ্জিত ? মোটেই নয়। পেশা হিসেবে নিলে পুরুষের সন্ধ্যাসঙ্গিনী হওয়াও দোষের নয়। বাসনমাজা, ভিক্ষে করার চেয়ে এ পেশায় সম্মান বেশি।

সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ ছাড়ছে রায়। নিটোল কালো বৃত্ত একটার পর একটা মিলিয়ে যাচ্ছে ঘরের বাতাসে। সিগারেট নিভিয়ে রায় বলল, অনেক কথা বললাম আমি। এখন তুমি বলো। কোথায় বাড়ি তোমার ? কারা আছেন ?

প্রবল ঝাঁকুনিতে সজাগ হয়ে উঠেছে রেবা। বাড়ি সম্পর্কে দু'চার কথা সে জানাতে রায় বলল, বুঝেছি, তুমি লড়াকু মেয়ে। লড়ে যাও।

চামড়ার মানিব্যাগ খুলে কিছু টাকা বার করে রায় বলল, পঞ্চাশ টাকা। তোমাকে দিলাম। নাও।

রেবা পাথর। হাত তুলতে পারছে না সে। অসুস্থ মা, মায়ের ওষুধের ফর্দ, ক্লিষ্ট সংসার, নানা ছবি তার মাথায় তালগোল পাকাচ্ছে।

ধার হিসেবে নাও, রায় বলল, পরে শোধ করে দিও।

রেবার স্মৃতিতে ঝলসে উঠলো কিশোরের মুখ। সম্বিত ফিরে পেল সে। বলল, নাহ্, ধন্যবাদ।

রায়কে আর কথার সুযোগ না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে। অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে তাড়াতাড়ি নামতে নামতে বিড়বিড় করল, কিশোর, তুমি কোথায়?

উনত্রিশ

দশাই সিরিং-এর সুর বাঁশিতে বাজাচ্ছিল মগন টুডু। সবে কুড়ি পেরিয়েছে মগন। আর পাঁচটা সাঁওতাল ছেলের সঙ্গে চেহারায়, চরিত্রে ফারাক না থাকলেও তার চোখ দুটো বেশ বুদ্ধিদীপ্ত! টোংরা থেকে চার মাইল দূরে বিলকান্দির স্কুলে বারো বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে সে। তারপর টাকার অভাব, সংসারের কাজে বন্ধ হয়েছে স্কুল। স্কুলের বইখাতা আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছে সে। অবসর পেলে ধুলো, ময়লা ঝেড়ে বইখাতা নিয়ে আজও বসে। ঘরে না বসে শালবনের গভীরে চলে যায়। চর্চা না থাকায় পড়ার বই পড়তে অসুবিধে হয়। মন খারাপ লাগে। গান, বাজনা, যাত্রা, ঝুমুরের ভক্ত মগন। যাত্রা, আলকাপের প্রায় সব আসরে হাজির থাকে।

সিধ নদীর ধারে অন্ধকার শালবনে অজিতের পাশে বসে আছে মগন। অজিতের হাতে বন্দুক। বাঁশি বাজিয়ে অজিতকে মগন বলল, তু হাল ধর। আলকাপের দল বানাই একটো। তু শিখাবি আমাদের।

আলকাপের দল তৈরিতে অজিতের উৎসাহও কম নয়। সে বলল, ঠিক আছে। পালা লিখব আমি। গাঁয়ে গাঁয়ে দেখাবো সে পালা।

অন্ধকার ঘন হতে কালো হচ্ছে সিধ নদীর ঘোলা জল। নদীর এদিকে শালবন পাতলা। পায়ে চলা পথ আছে। এ পথেই গাঁয়ের লোক নদীতে যায়। নদীর পাড় ঘেঁসে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা মস্ত কালো রঙের পাথর। এই পাথরটাই ঘাট। পাথরের দুপাশে বনকলমি, ভ্যারেন্ডার ঘন ঝোপ। একটা ঝোপের সামনে তিনটে বেঁটে তেঁতুল গাছ। গাছ তিনটের পেছনে মগনকে নিয়ে পাহারায় বসেছে অজিত। রাস্তা থেকে তেঁতুল গাছের পেছনটা দেখা না গেলেও রাস্তাটা অজিতের নজরে ধরা আছে। গাঁয়ে ঢোকার এই একটাই পথ। রামপুরহাটের দিক থেকে যে রাস্তা এগাঁয়ে এসেছে, তার মাঝখানে দু,তিন জায়গায় গভীর শালবন। সে পথে গাঁয়ের মানুষ সাধারণত আসে না।

আঞ্চলিক কমিটির কমরেডরা শালবনে জরুরিসভায় বসেছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে অজিতের দু'চোখ। একটা গরুর গাড়ি চলে গেল। নদীর ধারে বাঁধা রয়েছে তিনটে দিশি নৌকো। দু, একজন মানুষ আসা যাওয়া করছে। রঞ্জন চা পাতা এনেছে। পাতা ভিজিয়ে চা করার জন্যে ঘণ্টাখানেক আগে গরম জল আনতে গাঁয়ে গেল গৌরমাঝি। এখনও ফেরেনি সে। সভার খবর গাঁয়ের সকলে জানে। সজাগ আছে সবাই। গরম জল আনতে গিয়ে হাঁড়িয়ার কোনো আসরে হয়তো জমে গেছে গৌর। একটা, দুটো করে তারা

ফুটছে আকাশে। পেছনের শালগাছে শেষবার ডেকে রাতের মতো চুপ করে গেল একটা পিঅই পাখি। মগন বলল, সাঁজবেলা পিঅই ডাকলো। পেড় আসবে বটে।

পেড় মানে কুটুম। মগনের কথায় হাসলো অজিত। ধীর চালে বয়ে যাচ্ছে সময়। বাঁ পাশে, অল্পদূরে ঘাস, লতা ঢাকা জমিতে পায়ের শব্দ শুনে বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়ালো অজিত। বাঁ হাতে দু'চোখ মুছে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সরডাঁটার মতো ছিপছিপে সতেজ এক তরুণীকে দেখলো। মাথায় পুঁটলি নিয়ে গাঁয়ে ফিরছে মেয়েটা। পায়ের শব্দ শুনেই বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছিল মগন। নিস্তব্ধ শালবনে একরাশ মিঠেসুর শুনে থমকে দাঁড়ালো মেয়েটা। আঠারো, উনিশের বেশি বয়স নয় তার। সে দাঁড়াতে গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো মগন। তাকে দেখে তরুণী হাসলো। হাসি ছড়ালো মগনের মুখে। সে প্রশ্ন করল, ঘুঙরি, তু কুথা গেঁইচিলি ?

নানার ঘরকে, ঘুঙরি বলল, তিন রোজ ছিলাম বটে। আজ ফিরতে লাগছি।

নাম শুনেই মেয়েটাকে চিনেছে অজিত। মগনের প্রেমিকা। ঘুঙরিকেই বিয়ে করবে সে। মেয়েটা চটপটে, সাবলীল। রাস্তা থেকে তেঁতুলতলায় এসে অজিতকে দেখে হাসলো। ঝকঝকে সাদা দাঁত। অজিতের পাশে ঝুপ করে বসে পড়লো সে।

রাস্তার ডানদিকে কয়েক একর পাথুরে নাবাল জমির পর মকাই-এর ক্ষেত। ক্ষেতের মুখে খড়ের ছাউনি একটা ছোট ঘর। এর নাম ঢোকা। পাহারার ঘর। তিন, সাড়ে তিন হাত উঁচু ঢোকার ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। ঘুঙরির কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে বসে চাপা গলায় কথা বলছে মগন। দু'জনকে ছেড়ে বুনো ফুলের একটা ঝোপের পেছনে বসেছে অজিত। আদিবাসী দুই তরুণ-তরুণীর কথা, হাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের চারপাশে নেচে চলেছে এক ঝাঁক জোনাকি। মগন, ঘুঙরির হালচাল দেখে অজিতের মনে হলো, আজ তারা ঘরে ফিরবে না। চারপাশ এখন বেশ অন্ধকার। বাতাসে ভেসে আসছে তিহেবাহা ফুলের সুবাস। সারা দুপুর, বিকেলে এখানে কোথাও তিহেবাহার জঙ্গল দেখে নি অজিত। আনারস গাছের মতো পাতা, একহাত লম্বা সাদা ফুল, তিহেবাহার জঙ্গল নজর এড়াবার নয়। ফুল ফুটলে একমাইল দূরে বসে টের পাওয়া যায়।

অজিতের কানে মুখ রেখে চাপা গলায় একঘণ্টায় ছুটি চাইছে মগন। সরল গলায় বলছে, মকাই ক্ষেতের ঢোকায় ঘুঙরির সঙ্গে একঘণ্টা কাটাতে চায় সে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে ঘুঙরি। মগনের চোখে চোখ রেখে অজিত হাসতে সে দৌড়ে গিয়ে ঘুঙরির হাত ধরলো।

নাচতে নাচতে দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছে ঢোকার পথে। অজিত জানে, তার বদলে এখানে বরুণ, মোতি, এমন কি কিশোর থাকলেও মনের কথা মুখ ফুটে বলতো না মগন। না জানিয়ে চলে যেত। মগনের চোখে সাঁওতাল হয়ে গেছে সে। সাতপুরুষের সাঁওতাল। দুই তরুণ, তরুণীকে দেখছে অজিত। মগনের পিঠে

বন্দুক, হাতে বাঁশি। ঘুঙরির খোঁপায় এক গোছা তিহেবাহা। সুবাসের উৎস খুঁজে পেল অজিত।

অন্ধকার শালবনে একা বসেও সে বুঝতে পারছে, জমে উঠেছে সভা। তারও বসার কথা ছিল সভাতে। তবু চৌকির দায়িত্ব চাপতে না বলেনি সে। শালপাতার মর্মর, সিধ নদীর ধ্বনি, যেন প্রকৃতির দুই কুশীলবের কথা চালাচালি।

কে তুই ?

আমি কানু, এ আমার দেশ।

তুই কে ?

আমি সিদু, এ আমার দেশ।

মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে ফুলের ঝোপ ছেড়ে তেঁতুলতলায় আবার সরে এলো অজিত। গরম জল নিয়ে গৌরমাঝি ফিরলো না। রাতের খাবারও গৌরের আনার কথা। খাবার, গরমজল, একসঙ্গে নিয়ে হয়তো ফিরবে সে। খাবারের মেনুও তার মুখ থেকে শুনেছে অজিত। খুদ, ব্যাঙের ছাতার খিচুড়ির সঙ্গে থাকবে মেটে আলু পোড়া। কয়েকজন সমবয়সী ছেলে নিয়ে মাঝদুপুরে শিকারে বেরিয়েছে কির্তা আর ভাদু সোরেন। তরণী পাহাড়ের দিকে গেছে তারা। ভাগ্য ভালো হলে খরগোস, মেঠো ইঁদুরে মাংসও রাতের খাবারের সঙ্গে জুটে যেতে পারে। খাবারের কথা ভেবে খিদেতে চিনচিন করছে অজিতের পেট। একঘেয়েমি, খিদেতে বুজে আসছে দু'চোখের পাতা।

গত রাতের কথা মনে পড়লো তার। ঝড়ের মতো কেটেছে কাল রাত। আমেদপুরে থানায় বন্দুক দখল করার জন্যে তাঁতিপাড়ার অনুষ্ঠান ছেড়ে একসময়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো গেরিলা স্কোয়াড। অজিতও ছিল তাদের সঙ্গে। রাত শেষ হবার আগেই বন্দুক দখল শেষ করেছিল তারা। পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেছিল প্রায় বিশমাইল।

বক্রেশ্বরের মেলা উপলক্ষে গোপনে জনসভা ডেকেছিল টাউন কমিটি। নতুন ধাঁচের কর্মসূচি। গ্রামে, গ্রামে এমনকি মেলাতেও পৌঁছেছিল জনসভার খবর। পুলিশ, প্রশাসন জানতে পারেনি কিছু। সন্ধ্যের পর মেলা থেকে ধামসা, মাদল, ঢাক, ঢোল, ড্রাম, বিউগিল বাজিয়ে এক, দেড়হাজার মানুষের মিছিল হাজির হলো তাঁতিপাড়ার মাঠে। মিছিলের সামনে হাতে আঁকা মাও-এর বিরাট ছবি। ছবির দু'পাশে দুটো হ্যাজাক ঝুলছে। রাইফেল, লাঠি, কুড়ুল, টাঙি কাঁধে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করছিল খাঁকি পোশাক পরা একদল তরুণ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে গণসংগীত গাইলো তারা। চারপাশে ঘন অন্ধকার। মেঘ ছিল আকাশে। ছলাৎছল করছিল ময়ূরাক্ষীর জল। খুশির ঢেউ বইছিল তাঁতিপাড়ায়। কয়েকটা বাড়ি থেকে শাঁখ বাজিয়ে স্বাগত জানানো হলো শোভাযাত্রার মানুষদের। খাঁকি পোশাকে সশস্ত্র ছেলেদের দেখে গণফৌজ শব্দটা ছড়িয়ে পড়লো লোকের মুখে মুখে। বাইরে উদ্দীপনা, খুশি থাকলেও শোভাযাত্রা নিয়ে পার্টির মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বিরোধীরা সভায় আসেনি। এলাকা কমিটির কাছে পাঠাবার জন্যে উদ্যোক্তাদের

অভিযোগপত্রের মুসাবিদা করছিল তারা। সুরেনদার প্রেরণায় কিশোর, অজিত যে এই জনসভার মূল উদ্যোক্তা তারা জানতো।

গতকালের জনসমাবেশ দেখে নিশ্চয় শিক্ষা হয়েছে তাদের। গেরিলা অ্যাকশনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ, সংগঠিত হবার আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে তারা। মিছিলের পরেও আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ এসেছিল। দাউদাউ করে মাঠের মাঝখানে হঠাৎ জ্বলে উঠলো আগুন। স্কুলমাস্টার জ্ঞানেন্দ্র মণ্ডলের বাড়ি থেকে বোর্ডের পরীক্ষার কয়েক বাণ্ডিল খাতা বার করে নিয়ে এলো কিছু ছেলে। শুরু হলো বহ্ন্যুৎসব। আগুন পরিক্রমা করে ছেলেরা স্লোগান দিল, জনবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থা নিপাত যাক। বুর্জোয়া শিক্ষাপদ্ধতি ধ্বংস হোক।

তাদের সঙ্গে গলা মেলালো অনেকে। চৌকিদার, পুলিশ, মিলিটারি কারো টিকি দেখা যায় নি।

কিশোর অজিতের সঙ্গে মোতির ওপরও চটেছিল বাবলু। জনসভার আয়োজনে মোতিরও যে হাত আছে, বাবলু আঁচ করেছিল। বাবলুর সবচেয়ে বেশি রাগ রঞ্জন, শিবেনের ওপর। রাগের সঙ্গে আছে অভিমান ক্ষোভ। তার ধারণা দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিশোরের প্রভাবে পার্টিবিরোধী রাজনীতি করছে। সমাবেশে এলেও গম্ভীর হয়েছিল সারাক্ষণ। রঞ্জনের জ্বালাময়ী বক্তৃতার সময়েও না শোনার ভান করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল বাবলু। মুখ দেখে তার মনের খবর বুঝেছিল অজিত। ভারতীয় বিপ্লবে পার্টি, গণফৌজ, যুক্তফ্রন্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে মঞ্চ থেকে রঞ্জন নেমে আসতে শুরু হলো নাচ, গান, আবৃত্তি। তখনও মাঠে ঢুকছিল বৃদ্ধ, শিশু, যুবক, যুবতীরা। সকলের মুখে চোখে সতেজ, নির্ভয় ভাব। কয়েক ঘণ্টায় কেটে গেছে সব সংস্কার, সন্দেহ। অজিত টের পেয়েছিল, একটা মুক্তাঞ্চলের জন্ম হচ্ছে। তাঁতিপাড়ার অনুষ্ঠানে কিছু অর্থনৈতিক সংগ্রামের জয় মিশে আছে, অজিত জানতো। কিশোরও টের পেয়েছিল। গরীব তাঁতিদের যে সব ন্যায্য দাবী মালিক, মহাজনরা এতোদিন কড়া হাতে ঠাণ্ডা রাখতো, এলাকা তেতে উঠতে এখন আলোচনায় বসতে চাইছে তারা। তাঁতিদের দিকে ঘুরে গেছে খেলার দান। কিছু দাবী তারা আদায় করে নিয়েছে।

তিনশো মিটার সুতো পাকানির বানি যেমন ষাট পয়সা থেকে একটাকা হয়েছে, কিলো প্রতি বুনুনির মজুরিও বেড়েছে পাঁচ টাকা। এক কাহন গুটি থেকে পুরোনো হিসেবে বারোশোর বদলে চোদ্দশো গ্রাম সুতোর হিসেব একতরফা চাপিয়ে দিয়েছিল মালিকরা। তাঁতিদের অনুনয় আকুতি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল তারা। এখন আবার বারোশো গ্রামে নেমে এসেছে মালিকপক্ষ।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলার সময়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল আশি বছরের বৃদ্ধ তাঁতি সুধীর কুণ্ডু। শ্রোতারাও কেউ কেউ চোখ মুছছিল। বুড়ো মানুষটার সব কথা না বুঝলেও চোখের জলে ভেজা তার তুবড়োনো মুখের ভাঁজে ভাঁজে মিশে ছিল তাঁতিপাড়ার করুণ ইতিহাস।

খাঁকি পোশাক ছেলেদের দিকে তাকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় সুধীর বলেছিল

তুমরা যে কী উপকার করেছো আমাদের, তা শুধু ভগবান জানেন।

কৃতজ্ঞতায় বারবার বুজে যাচ্ছিল তার গলা। কেশে কণ্ঠনালী সাফ করে সুধীর বলেছিল, শোনার টুকরো ছেলে তুমরা। আমাদের সন্তান। ভগবান সহায় হবেন তুমাদের।

সুধীরের কথায় হৈহৈ করে সায় দিল অনেকে। মাঠের এক অন্ধকার কোনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল অজিত। মুহূর্তের জন্যে মঞ্চের কাছে ঘেঁসেনি সে। টাউনকমিটির নির্দেশও ছিল তাই। বনকলমি ঝোপের পেছনে খাঁকি পোশাক পরা একজন মানুষ দেখে চমকে উঠেছিল সে। পুলিশ, মিলিটারি এলাকা ঘিরছে নাকি? ঝোপের পেছনে অন্ধকার। সতর্ক পায়ে কিছুটা সরে গেল অজিত। কয়েকসেকেণ্ড দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছিল, তার আশংকা ভুল। খাঁকি পোশাক অচেনা লোকটা সম্ভবত চৌকিদার। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুধীর কুণ্ডুর সঙ্গে চৌকিদারও কাঁদছিল। অবাক হয়েছিল অজিত। অচেনা লোকটার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাকে দলে টানার কথা যখন সে ভাবছে, নরহরি মাল এসে বললো, এবার যেতে হবে।

তার গলা শুনে তীর গতিতে অন্ধকারে মিশে গেল চৌকিদার। পশ্চিমের মাঠে ঝানু, নিতাই, বাবলু, রঞ্জন, শিবেন একে একে হাজির হলো। সকলের হাতেই অস্ত্র, বন্দুক, ভোজালি, টাঙি। পরাশিয়ায় একডজন বন্দুক দখলের পর সকলের মনোবল বেড়ে গেছে। আমেদপুর থানার বন্দুকগুলোও দখল করতে চায় তারা। তৈরী হলো আমেদপুর থানা অভিযানের পরিকল্পনা। আমেদপুর ছোট থানা। শক্তি কম। সবচেয়ে বড়ো সুবিধে ছিল নরহরির সম্বন্ধী মাধব মাল থানার একজন কনস্টেবল। নরহরির সুবাদে মাধবের সঙ্গে কিশোরের যোগাযোগ হয়েছিল। মাধব এখন পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী। থানা পুলিশের নানা গোপন, জরুরী খবর পার্টিকে পৌঁছে দেয় মাধব। আমেদপুর থানার মালখানা লুঠের প্রস্তাব মাধবই দিয়েছিল। কলকাতার এক বড়ো অফিসারকে সেলাম জানাতে থানার বড়োবাবু সিউড়ি যাবে শুনেই বাঁশকুলিতে অজিতকে খবর দিয়েছিল মাধব। তখনই ঠিক হলো আমেদপুর থানা অভিযানের ছক। পার্টির অনুমোদন পেল। দুহপ্তা আগের ঘটনা এটা। নরহরিকে কম্যাণ্ডার করে গেরিলা স্কোয়াড যখন আমেদপুর রওনা হলো, তখন রাত বারোটা। মেঘ কেটে গেছে। তারায় ঝলমল করছে আকাশ। কীট পতঙ্গের ডাকে মুখর রাতের পৃথিবী।

আমেদপুর থানার নাড়িনক্ষত্র নরহরির চেনা। থানার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো গেরিলা স্কোয়াড। সদর দরজায় পাহারায় ছিল মাধব। কথাও ছিল তাই। মাধবকে দেখে অজিত বুঝেছিল, অর্ধেক কাজ হাসিল হয়েছে।

টালির চাল, ছিটে বেড়ার তিনটে ঘর নিয়ে থানা। লকআপের ঘরটা শুধু পাকা। ইলেকট্রিক নেই। একটা ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা হ্যারিকেন। কাঁটাতারে ঘেরা থানার সীমানায় সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকলো অজিত। বাবলু, রঞ্জন ঝাঁপিয়ে পড়তে বিনা বাধায় বন্দুক দিয়ে দিল মাধব। পিছমোড়া করে বাঁধা হলো

তাকে। সেরকমই কথা ছিল। কিন্তু বুঝে ওঠার আগেই থানার চার কর্মীকে বন্দুকের গুঁতোয় লকআপে পুরে দিল গেরিলা স্কোয়াড। কর্মীদেরই একজন খুলে দিয়েছিল লকআপের লোহার গেট। পাঁচ মিনিটে অপারেশন শেষ। গোলা-গুলি চললো না। রক্ত ঝরলো না এক ফোঁটা। লক আপে বন্দী সিপাইরা অবাক হয়ে দেখছিল ছায়ার মতো সাত, আটজন মানুষের কাজকর্ম। তাদের দিকে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শিবেন। হল্লা করার সুযোগ ছিল না। তিনটে রাইফেল, পাঁচটা মাস্কেট, কিছু গুলি পাওয়া গেল? মালখানায় সেগুলো নিয়ে পুরো বাহিনী থানার পেছনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার আকাশ। একটা তারা নেই। কখন যে আবার মেঘ জমেছে, খেয়াল করেনি কেউ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। পাথুরে মাঠ পেরিয়ে ফাঁকা ধুধু জলাজমিতে তারা পা দিতেই শুরু হলো ঝিরঝির বৃষ্টি। হঠাৎ শীতল হয়ে গেল চারপাশ।

ফাঁকা মাঠ ধরে হাঁটার সময় বাবলু বলেছিল, কেন্দুয়ার মেন ক্যানেলের কাছে পুলিশ যার লাশ পেয়েছে, সে ছিল পার্টির দুষমন, গুপ্তচর। আমরাই খতম করেছি তাকে।

বাবলু আবার বলল, দিনকয় আগে আমাদের জেলার পার্টির ঘনিষ্ঠ কেউ খবরের কাগজে চিঠি লিখে অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে।

কে?

রঞ্জন প্রশ্ন করতে বাবলু বলল, হদিশ করতে হবে তার।

চুপচাপ হাঁটছিল শিবেন। অন্ধকারে তার মুখ না দেখলেও অজিত টের পেল, কিছু ভাবছে সে। অস্ত্রগুলো দু'ভাগ করে বইছিল ঝানু, নিতাই। তিনটে রাইফেলই ছিল ঝানুর কাঁধে। সে হাঁপাচ্ছে বুঝে রাইফেল তিনটে প্রায় কেড়ে নিল অজিত।

একটা কিছু শব্দে পাতলা ঘুম ভেঙে যেতে রাস্তায় দিকে তাকালো অজিত। কতো রাত বুঝতে পারছে না সে। ঘুঙরিকে নিয়ে মগন যে গেল, এখনও ফিরলো না। পাহাড়, নদী, জঙ্গল অন্ধকারে একাকার। ঘুমে ডুবে আছে টোংরা গ্রাম। গোর মাঝির খাবার নিয়ে আসার কথা। তারও পাত্তা নেই। কাল বন্দুক দখলের পর থেকে আজ সারাদিন দু'চোখের পাতা এক করার সময় পায়নি অজিত। দুপুরে মিটিং শুরুর পরে এই শালবনে পাহারায় বসে এক ঠোঙা মুড়ি, একঘটি জল খেয়েছে সে। তারপর পেটে কিছু পড়েনি। খিদেতে চোঁচো করছে পেট। অন্ধকার জঙ্গলে একা বসে থাকতে অশবস্তি হচ্ছে তার। পার্টিলাইন নিয়ে কিছু প্রশ্ন জেগেছে তার মনে। শেষ বিকেলে এ নিয়ে বরুণের সঙ্গে একদফা তর্ক হয়েছে তার। প্রায় দু'শো রাইফেল, বন্দুক দখলের পরেও গণফৌজ বলতে যা বোঝায়, আজও তৈরী হয়নি। এখনই গণফৌজ গড়তে পার্টি রাজি নয়। কাজের অভাবে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে গেরিলা স্কোয়াডের কিছু সদস্য। অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজও কিছু নেই। তরাই রিপোর্টে যে দশটা কাজের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো নিয়েই এগিয়ে যেতে পারতো সংগঠন। তাও হচ্ছে না ধামা চাপা পড়ে গেছে তরাই

রিপোর্ট। গেরিলা অ্যাকশন ছাড়া আর কিছু করার কথা এ মুহূর্তে কেউ ভাবছে না। অ্যাকশন এখন জলভাত। গরীব কৃষকদের সভায় সঠিক খাতে আলোচনা বইলে এখন তারাই অ্যাকশন করার জন্যে হাঁক-ডাক জুড়ে দেয়। গত দেড়, দু'বছরের অভিজ্ঞতায় গরীব কৃষকদের উসকে দেবার এক সরল পদ্ধতিও তৈরী করে ফেলেছে সংগঠকরা। সভার শুরুতে প্রথম দু'তিন ঘণ্টা কৃষকদের বলতে দেওয়া হয়। নিজেকে দুঃখ, কষ্ট, অসহায়তার কথা বলে তারা। সময় যতো এগোয়, উত্তেজিত হয় তারা। রাগে, ক্ষোভে কাঁদে, হাত কামড়ায়।

রিপোর্টিং শেষ করে ঝিমিয়ে পড়ে মানুষগুলো। তখন সংগঠক প্রশ্ন করে, আমা তিনো খেত মিনা গিয়া, কতো জমি আছে আপনার ?

জবাব হয় প্রায় একরকম। বেশিরভাগের জমি নেই। কারও খুব সামান্য আছে। উত্তর শুনে সংগঠক প্রশ্ন করে আমা ওরারে তিনো হর, আপনার সংসারে ক'জন মানুষ ?

পরের প্রশ্ন, সানাম বছর রিয়া যম কুলাওয়েজা সে বাৎ, সারাবছর খান কি ? তিন অ চাদোরিয়া যম লাগি বাহার বেকাম জরুর, খাবার জোগাড় করতে ক'মাস বাইরে খাটতে যান ?

প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। কেন খেতে পান না ? এতো মেহনতের পরেও কেন উপোস করতে হয় ? তুষের আগুনে ফুঁ পড়ার মতো ধিকধিক আগুন হঠাৎ দপ করে জ্বলে ওঠে। ইতিহাস, অতীত, সিদু, কানু, চাঁদ, ভৈরব তোলপাড় করে মানুষগুলোর রক্তে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ উঠবে তিন প্রহরে। গত রাতে হালকা বৃষ্টি হলেও আজ আকাশ পরিষ্কার। অনেক তারা উঠেছে। নদীর ওপারে কুকুরের ডাক, গোলমাল শুনে অজিতের ঝিমুনি কেটে গেল। তীক্ষ্ণ নজর নদীতে ফেলে দুটো নৌকো আবছা দেখতে পেল সে। এ পাশে বাঁধা আছে তিনটে দিশি নৌকো। নতুন দুটো কখন নদীতে নেমেছে, খেয়াল করেনি সে। জল কেটে সাঁইসাঁই করে এগিয়ে আসছে দুটো বড়ো নৌকো। পালে বাঘ পড়েছে। ক্লান্ত শরীরের অবসাদ, ঢিলেমিতে ঘনিয়ে উঠেছে ভয়ানক বিপদ। আসলে নদীর ওপর নজর রাখার কথা ছিল মগনের। তাকে একঘণ্টার ছুটি দিলেও তার দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করেনি অজিত। অন্ধকারে একটা মাদলের সাংকেতিক দ্রিমদ্রিম ধ্বনি বেজে উঠতে শুকনো ঘাস পাতায় অনেক পায়ের শব্দ শুনলো অজিত। তখনই বন্দুক বাগিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো মগন। তার পাশে ঘুঙরি। ঝকঝক করছে মগনের দুচোখ। ঘুঙরির ভাঙা খোঁপা থেকে কখন খসে পড়েছে তিহেবাহার গোছা। একপলক ঘুঙরির দিকে তাকিয়ে অজিতকে মগন বলল, তু হিথায় খাড়া থাক। পুলিশের গুষ্টিকে নিব্বংশ করবো আমি।

অজিতকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বন্দুক হাতে অন্ধকার নদীর দিকে ছুটে গেল মগন। পেছনে ঘুঙরি। নৌকো লক্ষ্য করে প্রথম গুলি চালালো মগন। সার্চলাইটের জোরালো আলোয় ঝলমল করে উঠলো নদী, গ্রাম, পথ, গাছপালা।

দুটো নৌকোয় একাধিক সার্চলাইট জ্বলেছে। তীব্র আলো। চোখ ধেঁধে যায়। তেঁতুল গাছের আড়াল থেকে মগন, ঝুমরিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অজিত। মগনের দশ হাত পেছনে ঘুঙরি। তার ভাঙা খোপা খুলে গেছে। পিঠ জুড়ে একরাশ কালো তেলতেলে চুলের প্লাবন। তার ডান হাতে মগনের বাঁশি। দুজনকে মৃত্যুর দিকে ছুটে যেতে দেখে অজিত হাঁক দিল, হুঁশিয়ার, মাটিতে শুয়ে যা মগন।

কথা শেষ হবার আগেই অজিত শুনলো গুলির শব্দ। ট্রিট, ট্রট ট্রট, ট্রিট, মেশিন গানের ডাক। মগন মুখ থুবড়ে পড়লেও ঘুঙরিকে দেখলো না অজিত। সার্চলাইট নিভে গেল।

গাঁয়ের ভেতরে প্রবল গোলমাল শুনলো অজিত। ক্ষীন হয়েছে কুকুরের ডাক। দূরে পালিয়েছে তারা। দুহাতে রাইফেল ধরে, পা টিপে পিছু হটছে অজিত। জঙ্গলে ঢুকে পড়তে চায় সে। যে কোনো মুহূর্তে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রচণ্ড শক্তির আলো। নদীর ওপর চোখ রেখে ঝোপের মধ্যে সরে যাচ্ছে সে। বিপদ সঙ্কেত সভায় পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। গভীর শালবনে একবার গা ঢাকা দিলে কারও হদিশ পাবে না পুলিশ। জুতোপরা একদল মানুষের পায়ের শব্দ শুনছে অজিত। ধীর পায়ে সভার দিকে এগোচ্ছে তারা। অজিতও সরে যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে। ক্রমশ আবছা হচ্ছে কান্না, হৈহৈ, কুকুরের ডাক। ঘরবাড়ি ছেড়ে গাঁয়ের অনেকে আজ রাত কাটাবে এ জঙ্গলে। জোরালো আলো এখন সরাসরি জঙ্গলে এসে পড়েছে। বনকলমির যে ঝোপের আড়ালে একটু আগে অজিত লুকিয়েছিল, আলো পড়লো সেখানে। তিনটে বেঁটে তেঁতুলগাছের মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তারপর শালগুঁড়ির শক্ত দেওয়ালে আলো আটকে গেল। সভায় গিয়ে পুলিশ যে কাউকে পায়নি, বুঝতে পেরেছে অজিত। কেউ ধরা পড়লে এমন নীরব থাকতো না জঙ্গল। পায়ের তলায় শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ। চেষ্টা করেও এ শব্দ এড়ানো সম্ভব নয়। সামনে চাপা গলার কথা শুনে স্থির হয়ে দাঁড়ালো অজিত। একটা, দুটো কথার পর নিস্তব্ধ হয়েছে জঙ্গল। তিন, চার জনের হাঁটার শব্দ স্পষ্ট শুনছে অজিত। খুব আস্তে হাঁটছে তারা। এরা যে পুলিশ নয়, টের পেয়েছে অজিত। গাঁয়ের লোকেরা জঙ্গলে ঢুকলেও তাদের কাউকে দেখেনি সে। তাহলে এরা কারা? তাড়াতাড়ি কিছুটা এগিয়ে সে দেখলো, ছ' সাতজনের একটা দল। একজন মানুষকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দু'জন। ঘন অন্ধকার জঙ্গলে অচেনা পথে এগোতে পারছে না তারা। এক জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আরও কয়েকপা এগিয়ে কিশোরকে চিনতে পারলো অজিত। কিশোরের পিঠে হাত রাখলো সে। চমকে উঠে একলহমা অজিতকে দেখে কিশোর বলল, সভার মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সুরেনদা। মনে হচ্ছে, স্ট্রোক। জ্ঞান নেই। সুরেনদাকে নিয়ে যখন আমরা রাজনগরে যাবার কথা ভাবছি, মাদলের সঙ্কেত পেলাম।

মগন বোধ হয় মারা গেছে।

অজিতের কথায় চুপ করে আছে কিশোর। কাঁধ থেকে সাবধানে সুরেনদাকে মাটিতে নামিয়ে মোতি, ঝানু হাঁপাচ্ছে। তাদের পাশে বুদ্ধদেব। রঞ্জন গেছে বরুণদের সঙ্গে। মগনের খবর শুনে খালি হয়ে গেল কিশোরের বুক। সেই গড়ে

পিঠে তুলেছিল মগনকে। অন্ধকারে কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। নিঃশ্বাস, নড়চড়ার শব্দে নিজেদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে তারা। টোংরা থেকে রাজনগর যাবার গোপন একটা রাস্তা আছে। পথটা একটু দুর্গম। তবে সময় লাগে কম। গৌর মাণ্ডির মুখে খবরটা শুনে বুদ্ধদেব বলল, সে পথেই যাবো। তাড়াতাড়ি না পৌঁছোলে সুরেনদাকে···

বেদনায় গলা বুজে গেল তার। কথা শেষ করতে পারলো না।

এরকম দুর্যোগের রাত মানুষের জীবনে বেশি আসে না। কিশোর কথা বলছে না। অন্ধকারে হেঁটে চলেছে ছ'জন মানুষ। সুরেনদাকে বইছে অজিত, ঝানু। শালবন একটু পাতলা হতে অজিত দেখলো, চাঁদ উঠেছে আকাশে। দু'ঘণ্টা বাদে সকাল হবে। আবছা আলো লেগেছে কিশোরের মুখে। অজিতের মনে হলো, শিশুর মতো দেখাচ্ছে কিশোরকে। তার চোখা নাক, ধারালো চোখ, রোগা শরীরে উদ্বেগ, শোকের ছাপ পড়ে না। সব সময়ে সে ধীর, শান্ত, কর্তব্যে অবিচল। বিপ্লব ছাড়া কিছু জানে না।

লাল হচ্ছে পূব আকাশ। আবছা দেখা যাচ্ছে কুয়াশা জড়ানো তরণীপাহাড়। অল্প দূরে বৃন্দাবনী গ্রাম। থমকে দাঁড়ালো অজিত। ঝানুও দাঁড়িয়েছে। দুজনে অনুভব করছে কিছু। কিশোর তাকাতে অজিত বলল, সুরেনদা বোধহয় নেই।

শিশিরভেজা ঘাসের ওপর সুরেনদাকে সযত্নে রাখলো অজিত, ঝানু। অজিতের কথাই ঠিক। সুরেনদার শরীর গরম, হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে। বাঁ পাশে নেতিয়ে পড়েছে ঘাড়। তরুণ সহকর্মীদের নিবিড় সান্নিধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সুরেনদা।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো বুদ্ধদেব।

ত্রিশ

যমুনা দিনরাত কাঁদে। গাল দেয় দিবাকরকে। বলে, বাপের পাপে অমন সোনার ছেলে পুড়ে আংরা হৈঁচে গো। ও সোয়ামী নয়, আমার শত্তুর।

যমুনার অভিযোগ শুনে আজকাল রাগে না দিবাকর। ভোঁতা হয়ে গেছে তার বোধ। যমনা কী বলছে, বুঝতে পারে না সে। তবু নির্বোধ কষ্টে টনটন করে বুক। কার কী ক্ষতি, সর্বনাশ করেছে, অনেক ভেবেও মনে করতে পারে না সে। যমুনার গাল, খোঁটা অসহ্য লাগলে আড়ালে বসে কাঁদে। শুধু নিজের কষ্টে যে সে কাঁদে, তা নয়, অন্যের দুঃখেও চোখে জল আসে তার। সেদিন সন্ধ্যেতে বুড়ো সুধীর কুণ্ডুর কাহিনী শুনেও সে কেঁদেছিল। আগে কখনও অন্যের দুঃখে চোখের জল ফেলেনি সে। সেই সন্ধ্যেতেই প্রথম ঘটলো এ ঘটনা। মন খুব ভেঙে গেছে, বুঝতে পারে দিবাকর।

পরাশিয়ায় দু ডজন বন্দুক লুঠ হবার পরে প্রবল ধরপাকড় চলেছে চারপাশে। সারা জেলা চষে ফেলেছে সি. আর পি. আর রাজ্যপুলিস। তাদের জিপ, ভ্যান, ট্রাকে বসে থাকে কলকাতার সাদা পোশাকের গোয়েন্দা। সরকারি বেল্‌ট্‌ যে রোজ আলগা হচ্ছে কোমরে, টের পায় দিবাকর। গ্রাম তল্লাসীতে পুলিশের সঙ্গে থাকতে হয় তাকে। নানা জনের বাড়ি চিনিয়ে দেয় সে। সংকোচে নিচে নেমে যায় কোমরের বেল্‌ট্‌। বেল্‌ট্‌ তুলে বাঁধার চেষ্টা করে। শরীরের ভেতরে চিড়চিড় জ্বালায় দিনে, রাতে ঘুমোতে পারে না। একটা ফাঁকা জায়গায়, যেখানে বৌ নেই, কান্না, অভিযোগ নেই, মাধু নেই, চোরা পায়ে মোতি আসেনা, দাপিয়ে বেড়ায় না পুলিশ, সি. আর পি, সেখানে চলে যেতে চায় দিবাকর। বাড়ি চেনাবার কাজে ঘেন্না ধরে গেছে তার। চব্বিশঘণ্টা পুলিশের সঙ্গে আর দৌড়ে বেড়াতে পারছে না সে। স্বাধীনকে একবার দেখার জন্যে আনচান করে বুক। সাহস করে ইচ্ছেটা থানার বড়োবাবুকে বলতে পারে না দিবাকর। গোপন বাসনা বুকে নিয়ে সে ছটফট করে।

বাড়ির দাওয়ায় বসে শিবেনের মাকে একদিন কাঁদতে দেখেছিল দিবাকর। দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। পাথরের মতো নিরেট ভারী লাগছিল দু'পা। নড়তে পারেনি। হুহু করছিল বুক। কেঁদে ফেলেছিল সে। তাকে অবাক চোখে দেখছিল শিবেনের মা। স্বাধীন জেলে, জানতো না শিবেনের মা। চোখের জলে ভেজা দিবাকরের মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে যা বোঝার বুঝেছিল। পুলিশের অনুচর দিবাকরের জন্যে মমতা বোধ করেছিল। সেই থেকে সময়, সুযোগ পেলে শিবেনদের বাড়ির দাওয়াতে চলে আসে দিবাকর। শিবেনের মা, বাবার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে। রঞ্জনের বাপ

নরেন মাইতি আগে এড়িয়ে চলতো দিবাকরকে। রাস্তায় ঘাটে মুখোমুখি হলে পাশ কাটিয়ে চলে যেত। সেদিন হঠাৎ দিবাকরকে আড়ালে ডেকে স্বাধীনের খবর নিল নরেন। অমরডাক্তার সাহসী লোক। ছেলে যে ফেরার, ডাক্তারের মুখ দেখে বোঝা যায় না। রুগী, চেম্বার নিয়ে মজে আছে। লম্ফ ডাক্তার হলেও অমরের পসার ভালো। রাজনগর হাসপাতালের নতুন ডাক্তার ডিসপেনসারি খুলতে সামান্য মার খেয়েছে অমর ডাক্তারের ব্যবসা। তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। যন্ত্রণা, চোখের জলে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে যে নতুন এক সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে, আলগোছে বুঝতে পারে দিবাকর। এর নাম বোধহয় নাড়ির যোগ। দেশ, মাটি, গাছপালার আত্মীয়তা। পেশার জন্যে এতোদিন সে যা করেছে, এখন মনে হয়, সে কাজের কোনো দাম নেই। খাঁকি পোশাকটাও এক বড়ো ধাপ্পা। গাঁয়ের মানুষ, আত্মীয়, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাকে। সরকারি পোশাক, তকমার বোঝা আর বইবে না সে। বাবলু, রঞ্জন, শিবেন তাদের দলের ছেলেরা যদি খুলে নেয় এ পোশাক, সে ঠেকাবে না। এমন কি মাধুকে আজ মোতি যদি বিয়ে করতে চায়, দিবাকর রাজী।

মাথার ওপর গনগনে সূর্য। দুপুর ফুরোলেও রোদের ঝাঁঝ কমেনি। পায়ের নিচে গলা পিচ। থানায় হাজিরা দিতে যাচ্ছে দিবাকর। আজ তার মন মেজাজ ভালো। পেশার পলকা, ঘুনধরা স্বরূপটা জেনেই বোধহয় তার এই স্বস্তি। পরাশিয়ার বন্দুক দখলের ঘটনা নাড়া দিয়েছিল দিবাকরকে। নকশালদের পরাশিয়া অভিযানের খবর কানাঘুষোয় আগে জেনেও থানায় বলেনি দিবাকর। কেন বলেনি, সে নিজেও জানে না। পরাশিয়া থেকে হৈচৈ, গুলির শব্দ শুনে সে রাতে ভয়ে ঠকঠক করে কেঁপেছিল সে। নিজের মনে বিড়বিড় করেছিল, হে ভগবান বাঁচাও আমাকে।

তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসেছিল সে। থানায় যায়নি। ঘুমোতেও পারেনি। সংসার, চাকরি, ছেলের জন্যে দুশ্চিন্তায় আগুনে পুড়ছিল। মনের আগুন, ঘরের আগুন, না নিভিয়ে থানায় গিয়ে কী লাভ?

দাওয়ায় বসে রাত কাটিয়েছিল দিবাকর। পরের দিন থানায় যেতে রাগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো বড়োবাবু। প্রশ্ন করেছিল, খুব গাঁজা, ভাঙ খাচ্ছিস? পাশের গাঁয়ে ডাকাত পড়লো, গোলাগুলি চললো, এতো হল্লা, টের পেলি না?

দিবাকর নেশাভাঙ কখনও করেনি, এমন নয়। সে সব বিশ বছর আগের ঘটনা। ছেলে-মেয়ে বড়ো হবার পর নেশা যা ছিল ছেড়ে দিয়েছে। একটা বিড়িও এখন খায় না সে। বড়োবাবুর গালাগাল শুনে তবু একটা কথা বলে নি সেদিন। আতঙ্কে কেঁপেছে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে দিবাকরকে ঘরে ডেকে বড়োবাবু বলেছিল, রঞ্জনের খবর চাই। ধরিয়ে দে রঞ্জনকে।

হাত কচলাচ্ছিল দিবাকর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে বড়োবাবু বলল, রঞ্জন, বাবলু, শিবেন, মোতি, যে কোনো একজনের হদিশ আনতে পারলে তোর ছেলেকে

খালাস করাবার দায়িত্ব আমার। নিজে ব্যবস্থা করবো আমি।

ফিসফিস করে কথা বলছিল বড়োবাবু। ছোট হয়ে গেল দু'চোখ। স্বাধীনকে খালাসের এখন মওকা হাতে পেয়ে দিবাকরে চারপাশের পৃথিবী ঘুরছিল। রঞ্জন, মোতি, তাদের দলের যে কোনো একজনকে একটু চেষ্টা করলেই ধরতে পারে দিবাকর। হদিশ করা অসম্ভব কিছু নয়। তারপর? কথাটা ভেবে এলোমেলো হয়ে গেল তার চিন্তা। শুকনো গলায় বড়োবাবুকে সে বলল, তাদের ডেরা, আড্ডার কোনো খবর পাচ্ছি না সাহেব। বনে-বাঁদাড়ে থাকে, রাতের অন্ধকারে হাঁটাচলা করে, ভূতপ্রেতের মতো চালচলন।

ঠিক যে কী বলেছিল, মনে করতে পারে না দিবাকর। এটা গতহপ্তার ঘটনা।

ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা বাস। সিউড়ির গাড়ি। বক্রেশ্বর থেকে আসছে। এ বাসে দশ মিনিটে থানায় পৌঁছোনো যায়। গুঁতোগুঁতি ভিড় দেখে বাসে উঠলো না দিবাকর। চড়া রোদে কষ্ট হলেও একা হাঁটতে খারাপ লাগছে না তার। ফাঁকা রাস্তায় দুর্ভাবনাগুলো নাড়াচাড়া করে আরাম পাচ্ছে। দিবাকরের প্রায়ই মনে হয়, বাবলু, রঞ্জনদের দলে সবচেয়ে নরম ছেলে শিবেন। তাকে একা পেলে গাঁয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক খবর জানা যায়। কথাটা ভেবে দিবাকরের গায়ে কাঁটা দিল। শিবেনের সঙ্গে এক, দুবার দেখা হয়েছে তার। পাশ কাটিয়ে চলে এসেছে সে। শিবেনের সঙ্গে কথা বলার চিন্তা তার মাথায় আসেনি। আবার যদি দেখা হয়? মাধুর সঙ্গে মোতির যে যোগাযোগ আছে, দিবাকর জানে। নজর রাখলে মোতির হদিশও পাওয়া যায়। মাঠ, জঙ্গল ফুঁড়ে যে কোনোদিন তার সামনে রঞ্জনও এসে দাঁড়াতে পারে। সবই হওয়া সম্ভব। কিন্তু রঞ্জন, বাবলু, শিবেন এখন অগুনতি, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে, সে ঝামেলা কীভাবে ঠেকাবে দিবাকর? দলুইপাড়া, বাউড়িপাড়া, মালোপাড়ায় হাওয়া বেগতিক। জল যে অনেক গড়িয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না তার। রাতের অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে টহল দেবার সময়ে দু'চারজন ছেলেকে প্রায়ই ছায়ার মতো গা ঢাকা দিতে দেখে সে। তারা সকলেই রঞ্জন। এতো রঞ্জনের মধ্যে এক রঞ্জনকে ধরে কী লাভ? তবু তার নাগাল পেতে দিবাকরকে অতিষ্ঠ করছে বড়োবাবু।

দিবাকরের মনে হলো, হঠাৎ একদিন রঞ্জনকে মুঠোয় পেলে কী করবে সে? থানায় খবর পৌঁছে ছাড়িয়ে আনবে স্বাধীনকে? সত্যি ছাড়া পাবে স্বাধীন? প্রশ্নটা মনে জাগতে বিপন্ন বোধ করলো সে। স্বাধীন ঘরে না ফিরলে ভেসে যাবে তার সংসার। কোনোদিন সুখ, শান্তির মুখ দেখবে না সে। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে দিবাকর সর্বস্ব, ঘটি, বাটি পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়েছে। সাইকেল বাঁধা দিয়েছিল পশুপতি কুণ্ডুর কাছে। ঋণ শোধ করে সে সাইকেল ফিরিয়ে আনার কোনো আশা ছিল না। সাইকেলটা হঠাৎ ফেরৎ পেয়ে চমকে গিয়েছিল দিবাকর। চার দিন আগে তাকে ডেকে সাইকেল ফিরিয়ে দিল পশুপতি। রঞ্জনদের দলের দাপটে মহাজনরা ভয় পেয়ে যে গোঁসাই সেজেছে, পশুপতির হাবভাবে টের পেয়েছিল দিবাকর। সাইকেল ফেরৎ দিয়ে পশুপতি বলেছিল, তোর নামে লেখা বকেয়া ধার চল্লিশ টাকাও

মকুব করে দিলাম। খুশি তো ?

পশুপতির কথায় অবাক হয়েছিল দিবাকর। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনি সে। বন্ধকী সাইকেলের সঙ্গে কর্জও ছাড়ান হবে, ভাবতে পারছিল না।

সাইকেল নিয়ে দিবাকর বলেছিল, বাবু, গাড়ি ঘরকে তুলছি বটেক। তবে কর্জ শোধ না করে এ গাড়িতে চাপবো না।

মুচকি হেসে পশুপতি বলেছিল, আমি জানি, তুই বেইমান নয়।

কিন্তু স্বাধীন ঘরে ফিরে কাজকর্মে না লাগলে কীভাবে ঋণমুক্ত হবে সে? ঘর ছাওয়ার জন্যে আজকাল কেউ ডাকে না তাকে। যারা ডাকে, পয়সা দেয় না। যাদের টাঁকের জোর আছে, দিবাকরের চেয়ে ভালো ঘরামি ধরে আনে তারা।

থানার সামনে এসে লম্বা শ্বাস টেনে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো দিবাকর। বড়োবাবুর সামনে যাবার আগে একটু জিরিয়ে নিতে চায় সে।

একত্রিশ

তিন রাত না ঘুমিয়ে ঝিমঝিম করছে পুণ্যর মাথা। গত তিন দিনে সতেরোটা সভা করেছে সে। বেশীরভাগ সভা হয়েছে রাতে। রাত ফুরোলেও শেষ হয়নি আলোচনা। পার্টির ঘোর দুর্দিন। অবিশ্বাস, সন্দেহ, দলাদলি বাড়ছে। জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দিনকয় আগে খুন হয়েছে দু'জন পার্টি কমরেড। তাদের একজন প্রভাদির ছেলে দ্যুতি। খবর শুনে মনে বেজায় চোট পেয়েছে পুণ্য। প্রভাদি, তার স্বামী বিরাজকে কীভাবে মুখ দেখাবে, পুণ্য জানে না। বয়সে ছোট হলেও প্রভাকে দিদি বলে পুণ্য। এ হলো স্নেহের ডাক। তার পঁচিশ বছরের পার্টি জীবনে এমন জঘন্য ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। পুণ্য পার্টির সামনের সারির নেতা। পুলিস খুঁজছে তাকে। তার মাথার দাম ত্রিশ হাজার টাকা। পার্টিকে বাঁচাতে হিমসিম খাচ্ছে সে। প্রভাদি, বিরাজের সঙ্গে দেখা করার সময় পাচ্ছে না।

আজ এই মাঝবয়সে ছেলেবেলা, স্কুল, কলেজ, ছাত্রজীবনের স্মৃতি বারবার মনে পড়ে তার। স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে এক আদর্শবাদী যুবক। সে গল্প লেখে, কবিতা লেখে। ধূসর শৈশব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পুণ্যর প্রিয় বই ছিল জাঁ ক্রিস্তফ্। তরুণ ক্রিস্তফের মতো এক জীবন চেয়েছিল সে। মনে পড়ল রোমাঁ রোঁলার বিখ্যাত সেই কথা, আইনশৃঙ্খলা যখন অন্যায়ের পোষকতা করে, তখন বেআইন, বিশৃঙ্খলা দিয়ে শুরু হবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

রোঁলার বাণী নানা সময়ে ব্যবহার করেছে পুণ্য। কাঁচা বয়সের সে আবেগ, স্বপ্ন—সময়ে, অভিজ্ঞতায় পোড় খেয়ে এখন যুক্তিবদ্ধ, সংহত হয়েছে। তবু শৈশব, কৈশোরের মায়াবী দিনগুলো আজও তাকে কবিতা লিখতে প্রেরণা দেয়। প্রীতির কথা ভেবে প্রায়ই বিষাদ জাগে পুণ্যর মনে। বেচারী প্রীতি! স্বামী, ছেলে নিয়ে ভরপুর সুখী এক সংসারের সাধ ছিল তার। সাধ মেটে নি। একমাত্র সন্তান, ছেলে অশনির বয়স বয়স বারো। স্কুলে যায় সে। অশনিকে একবার দেখার প্রবল তাগিদ মাঝে মাঝে বোধ করলেও বাড়ি যেতে সাহস পায় না পুণ্য। ছেলের সঙ্গে দেখা হলেও বিহ্বল হয় সে। পুণ্যর মনে হয়, বেশী বয়সে বাবা হবার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু প্রীতিরও তো কিছু সাধ-আহ্লাদ আছে।

পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এতো অসংখ্য বার পুণ্য আত্মগোপন করেছে, যে, তার প্রায় সব গোপন ডেরা পুলিস জানে। নতুন আশ্রয়, আস্তানার ঠিকানাও পেয়ে যাচ্ছে পুলিস। আশ্রয় খোঁজা, বাসা বদল ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। গোপন ডেরা ফাঁস হয়ে গেলে সেখানে আর ঢোকার উপায় থাকে না। কিন্তু

কীভাবে গোপন ঠিকানা পুলিস জেনে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না পুণ্য। এক লম্বা দৌড়ের মধ্যে কাটছে তার জীবন। হাঁপ ছাড়ার সময় নেই। বিশ্রাম দরকার টের পেয়েও সুযোগ মেলে না। যৌবনের তেজ, তাপ আজও রক্তে অনুভব করে সে। অল্পবয়সী কতো তাজা ছেলে চারপাশে জীবন দিচ্ছে। শহিদ হচ্ছে। তাদের মুখ মনে পড়লে টাট্টু ঘোড়ার মতো টগবগ করে পুণ্য। হতাশ, ক্লান্ত না হলেও মনে হয়, বড়ো দেরী হয়ে যাচ্ছে। সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতি, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার কাজ অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল। তবে আফশোস করার মানুষ নয় সে। দেরী হলেও নির্ভুল পথের হদিশ যখন মিলেছে, জয় অনিবার্য। তাছাড়া ইতিহাসের কিছু নিয়ম আছে। বিকাশের নিয়মেই সঠিক রাজনীতি, নেতার জন্ম দেয় ইতিহাস। সেখানে গাজোয়ারি, তাড়াহুড়ো চলে না। সঠিক রাজনীতি, যোগ্য নেতা প্রসবের আগে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে ইতিহাস। হাজার রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাঙচুর চালায়। ইতিহাসের সৃষ্ট সেই মানুষ সূর্যদা। এই মানুষটির জন্যে অনেককাল অপেক্ষা করেছে ভারতীয় ইতিহাস।

দুপুর থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বৃষ্টির কামাই নেই। কালো মেঘ জড়িয়ে আছে আকাশে। চারপাশ অন্ধকার। বৃষ্টির জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। জল কেটে ছুটে চলেছে গাড়ি। হর্নের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দু'ঘণ্টা পরে বীরভূমের ট্রেন। আজ বীরভূম যাবে পুণ্য। রামপুরহাট পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে তারপর বাস ধরবে। পুণ্যকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে গণপতি। ট্যাক্সি ডাকতে গেছে সে। আধঘণ্টা কাবার। এখনও ফিরলো না গণপতি।

সংগঠন গড়ার কাজ দ্রুত এগোচ্ছে বীরভূমে। কিন্তু খতমের প্রশ্নে, আদর্শ কমুনিস্টের সংজ্ঞা নিয়ে জোর বিতর্ক চলেছে সেখানে। খতমের রাজনীতি এবং কৃষিবিপ্লবে গরীব, মাঝারি, ধনী কৃষকের ভূমিকা সম্পর্কে আঞ্চলিক কমিটিতে মতপার্থক্য আছে। কড়া হাতে এ বিতর্কের মোকাবেলা করবে পুণ্য। পার্টিতে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বিতর্কের আখড়া নয় পার্টি। খতমবিরোধীদের পার্টিতে জায়গা নেই। ধনী চাষীদের নিয়ে যারা কৃষিবিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে, তাদের সহ্য করবে না পার্টি। সূর্যদার রাজনীতি, প্রতিটি নির্দেশ পার্টির সকলকে মানতে হবে। আঞ্চলিক নেতা সুরেনবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ায় বীরভূম পার্টিতে শূন্যতা তৈরী হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে পার্টির। অবশ্য পার্টির লাইন সম্পর্কে সুরেনবাবুরও নানা প্রশ্ন, সংশয় ছিল। তা সত্ত্বেও প্রবীণ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, অভিজ্ঞ সুরেন ছিল পার্টির সম্পদ। তার ওপর নির্ভর করতে পারতো পার্টি নেতৃত্ব। নির্ভর করার মতো অনেক কমরেড এখনও সাঁওতাল পরগণায় আছে। মৃত সুরেনকে কাঁধে নিয়ে দশমাইল রাস্তা ভেঙে রাজনগর হাসপাতাল পর্যন্ত নির্ভয়ে হেঁটে আসতে পারে তারা। তাদের জন্যে গর্ব করতে পারে পার্টি। তবু সুরেনের মৃত্যু দুর্বল করেছে পার্টিকে। পুণ্যর চেয়ে বয়সে সামান্য বড়ো ছিল সুরেন। দুই পুরোনো পার্টি সদস্যের মধ্যে ছিল নিবিড় প্রীতি। আটচল্লিশে একসঙ্গে জেল খেটেছে দুজন। সুরেনের মৃত্যুর খবরে তাই কাতর হয়েছিল পুণ্য। হাসপাতাল

সুরেনের

থেকে প্রণারি মৃতদেহ তুলে নিয়ে কাটাছেঁড়া, ময়নাতদন্ত করে আত্মীয়দের হাতে তুলে দিয়েছিল পুলিশ।

সব খবরই লোক মুখে জেনেছে পুণ্য। সূর্যদাও জানে বীরভূম পার্টির সমস্যা। সমস্যা মেটাতেই সেখানে যাচ্ছে পুণ্য। সামান্য দুর্যোগ, বৃষ্টিতে এখন বেসামাল হয় কলকাতা। যানবাহন অচল। বাসে, ট্রামে ওঠা যায় না। রাস্তা থেকে উধাও হয় ট্যাক্সি। গণপতির দেরী হওয়ার কারণ বুঝেও অস্বস্তিতে ছটফট করছে পুণ্য। স্টেশনে যাবার পথে সূর্যদার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায় পুণ্য। সেইরকমই ইচ্ছে ছিল তার। বোধহয় আর সম্ভব হবে না। বীরভূম নিয়ে সূর্যদার কিছু পরামর্শ শোনা দরকার ছিল। সূর্যদা গুরুতর অসুস্থ। একা চলাফেরা করতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গ সমেত পাঁচটি রাজ্য সূর্যদার মাথার জন্যে তিন লাখ টাকা দর হেঁকেছে। সূর্যদাকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে পুণ্য। অসুস্থ মানুষটার ওষুধ, পথ্য, আশ্রয়, পুণ্য নিজে তদারক করে। তিন বন্ধু ডাক্তার নিয়ে সূর্যদার জন্যে মেডিকেল বোর্ড তৈরী করেছে পুণ্য। বোর্ডের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখা হয়। জরুরী তলব পেলেই সূর্যদার চিকিৎসায় হাজির হয় তিন ডাক্তার। বিপ্লবের স্বপ্নে সারা দেশকে যে মানুষ মাতিয়ে তুলেছে, তাকে বাঁচাতে সব কিছু পুণ্য করতে পারে। সূর্যদা কলকাতায় থাকলে রোজ তার সঙ্গে একবার দেখা করে পুণ্য। সূর্যদার মুখের দিকে তাকালে প্রেরণা, আবেগে ভরে যায় তার বুক। পুণ্য পাশে না থাকলে সূর্যদাও অসহায় বোধ করে। পার্টি মহলে সবাই জানে একথা।

সূর্যদার সঙ্গে পাঁচ-সাত মিনিট কথা বলে ভবানীপুরে প্রিয়নাথের বাড়ি যাবে পুণ্য। প্রিয়নাথও একদা পুণ্যর পার্টি কমরেড ছিল। একসঙ্গে ট্রেডইউনিয়ন করেছে দু'জন। পার্টি না করলেও পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আজও যোগাযোগ রাখে প্রিয়নাথ। বন্ধুদের প্রতি পুরোনো দিনের মতো সদয়, উষ্ণ সে। সারাদিন লেখাপড়া করে। দর্শন, ইতিহাসে তার পাণ্ডিত্যে শিক্ষিত বিদগ্ধ মানুষ মুগ্ধ। প্রিয়নাথের কাছে পুণ্যও মাঝে মাঝে চলে যায়। তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় প্রিয়নাথ। জরুরী লেখালিখির কাজ শেষ করতে প্রিয়নাথের পড়ার ঘর আদর্শ জায়গা। যে কোনো বিষয়ের প্রাসঙ্গিক বই প্রিয়নাথের ঘরে পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ নিজেও এক জীবন্ত আকরগ্রন্থ। পার্টিপত্রিকার সম্পাদকীয়, এবং অন্য দরকারী লেখার কাজে হপ্তায় এক, দু'দিন তাই প্রিয়নাথের বাড়িতে পুণ্যকে যেতে হয়। পার্টি বেআইনী হবার আগেও দেশব্রতী, লিবারেশনের লেখার কাজ কখনও দপ্তরে বসে পুণ্য করেনি। দেশব্রতী দপ্তরের কাছে একটা ভাড়াটে ঘরে, অথবা কাছাকাছি কোনো বন্ধুর বাসায় ঢুকে লেখা সেরেছে। তখন মাসে এক, দু'বার আসতো প্রিয়নাথের বাড়ি। লেখা ছাড়াও প্রিয়নাথের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আরাম পায় পুণ্য। পুণ্য জানে, তাকেও পছন্দ করে প্রিয়নাথ। পুণ্যকে দেখলেই খুশিতে ঝলমল করে অকৃতদার মানুষটার মুখ, চোখ। পুণ্যর চরিত্র, কথার সরসতা, দীপ্তি উপভোগ করে প্রিয়নাথ। পুণ্যকে আগে প্রিয়নাথ প্রায়ই বলতো, ভারতের

ভোলতেয়ার তুমি। তোমার পাওনা মেটাতে একদিন বাধ্য হবে এদেশের মানুষ।

প্রিয়নাথের কথায় মুচকি হেসে পুণ্য বলতো, বিপ্লবছাড়া আমার কোনো পাওনা নেই।

বীরভূমের ট্রেন ধরার আগে প্রিয়নাথের ঘরে বসে দেশব্রতীর সম্পাদকীয়টা লিখে ফেলতে চায় পুণ্য। সূর্যদার সঙ্গে দেখা না করে এখন তাড়াতাড়ি পেঁছাতে হবে প্রিয়নাথের বাড়ি। দেশব্রতীর ছাপাখানা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে পুলিশ। ফলে গোপনে, অনিয়মিত বেরোচ্ছে দেশব্রতী। তবু মাসে অন্তত দুটো সংখ্যা বার করতে হয়। পার্টির পত্রিকা ছাড়া পার্টি বাঁচে না। মাথায় পেকে উঠেছে সম্পাদকীয়। এখনই নামিয়ে ফেলতে হবে। প্রিয়নাথের ঘরে ঘণ্টাখানেক বসার সুযোগ হয়ে যাবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হচ্ছে স্মৃতি। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়। একটা বিষয় ভেবে নিয়ে তাড়াতাড়ি না লিখলে অশান্তি জাগে। মজলিশী মেজাজটাও হারিয়ে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে রসবোধ। সভায় বসে নিজের আচরণে অনেক সময় লজ্জিত হতে হয়। তরুণ কর্মীদের মধ্যে দু'একটা বিচ্ছু এমন নাজেহাল করে যে মাথা ঠান্ডা থাকে না।

এই ঘরে আজ সকাল ছ'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত, এগারো ঘণ্টা সভা করেছে পুণ্য। মাঝে একঘণ্টা স্নান, খাওয়ার বিরতি ছিল। কলকাতা জেলা কমিটির সভা। কমিটির সাত সদস্যই পুণ্যর চেনা। সভায় দু'একবার তেতে উঠেছিল পুণ্য। ফলে জেলা কমিটির দু'তিন সদস্য ভয়ে মুখ খোলেনি। পুণ্য জানে, মজলিশী ভঙ্গিতে যে কোনো সভা সে জয় করতে পারে। রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, শিল্পসাহিত্য, সব আলোচনায় সে সরস, সাবলীল।

বাগ্মিতাই তার আকর্ষণ। জ্বলজ্বলে দু'চোখ মেলে তরুণ ছেলেরা যখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শোনে, তখন আবেগে ভিজে ওঠে তার বুক। মনে হয়, দিগন্ত ঝাঁপিয়ে এখনই বৃষ্টি নামবে। এ সব মুহূর্তে পুণ্য কেঁদে ফেলে। আজও কেঁদেছে। দ্যুতির নাম উচ্চারণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পুণ্য। নিজের কান্না নিয়ে রসিকতা করতেও পিছপা নয় সে। প্রায়ই সে বলে, এই স্যাঁতসেঁতে দেশের সব মহাপুরুষ কেঁদেই বাজিমাত করেছে। আমিও কেঁদেকেটে মহাপুরুষ হবো।

রসিকতায় সভার থমথমে পরিবেশ সারাদিনে বেশ কয়েকবার বদলে দিয়েছিল পুণ্য। ভিজে কাকের মতো ফিরলো গণপতি। বলল, যাচ্ছেতাই কাণ্ড! একটা ট্যাক্সি নেই রাস্তায়।

খবর শুনে ঘাবড়ে গেল পুণ্য। সূর্যদার সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই। কিন্তু প্রিয়নাথের বাড়ি যেতেই হবে। এখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রিয়নাথের বাড়ি দশ মিনিট। হেঁটেই যাবে পুণ্য। দেরী করার উপায় নেই। গণপতির সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো সে। রাস্তার এখানে, ওখানে জমা জলে ছড়িয়ে আছে ফিকে আলো। চকচক করছে জল। সাবধানে হাঁটছে দুজনে। দু'জন ফেরারী মানুষের রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটা নিষেধ। নিষেধের কারণ আছে। পাশাপাশি হাঁটলেই কথা বলবে তারা। কথা মানে রাজনীতি, রাজনৈতিক আলোচনা। কথা এড়াতে দুরত্ব

রাখতে হয়। এসব নিয়মকানুন পুণ্য তোয়াক্কা করে না জেনে তার অনেক পেছনে চলে গেছে গণপতি। তার নামেও পরোয়ানা আছে। পুণ্য মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছে। সে কথা বলতে চায় টের পেয়ে আরও কয়েক কদম পিছিয়ে গেল গণপতি। পুণ্যদার কথা মানেই চড়া গলার উত্তেজিত সংলাপ।

কাঠগুদোমের পাশ দিয়ে যে সরু গলিটা গেছে, তার শেষ মাথায় একটা পাঁচতলা বাড়ির তেতালায় থাকে প্রিয়নাথ। তিন কামরার ফ্ল্যাটে প্রিয়নাথ একা। ঠিক একা নয়। তিনটে ঘরেই রাশিরাশি বই, দেশবিদেশের নানা পত্রপত্রিকা। প্রিয়নাথের লেখা একাধিক দর্শন, ইতিহাসের বই বেশ জনপ্রিয়। বই-এর ভালো রয়ালটি পায় প্রিয়নাথ।

অন্ধকার সরু গলিতে মানুষজন নেই। কাঠের গুদোম নিস্তব্ধ। বাদল আবহাওয়ায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে চারপাশ। গলির শেষ মাথায় পুণ্যকে পৌঁছে দিয়ে গণপতি চলে গেল। অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠলো পুণ্য। ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজায় আন্দাজে আঙুল ঠেকাতে কলিংবেলের বোতাম মিলে গেল। ফ্ল্যাটের ভেতরে ঘণ্টি বাজাতে দরজা খুললো প্রিয়নাথ। পুণ্যকে দেখে বলল, এসো।

সতেরো, আঠারো বছরের যে ছেলেটা প্রিয়নাথের সংসার সামলায়, তার নাম মধু। নিরীহ, ভালো ছেলে। প্রিয়নাথের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ফ্ল্যাটের দরজা মধু বন্ধ করতে তাকে প্রিয়নাথ বলল, দু'কাপ চা।

বিরাট ঘর জুড়ে আলমারি, র‍্যাক বোঝাই বই। মাঝখানে পর্দা টাঙিয়ে দুভাগ করা ঘর। পর্দার ওপাশে হ্যাঙারে পুণ্যর একটা লুঙি, গামছা আছে। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ট্রাউজার্স ছেড়ে লুঙি পরলো পুণ্য। খুলে রাখলো ফুলশার্ট। তারপর প্রিয়নাথের টেবিলের সামনে একটা আরাম কেদারায় এলিয়ে দিল শরীর। ঘুমে বুজে আসছে দু'চোখ। মাথায় অগোছালো চিন্তা। সম্পাদকীয়র বিষয় মনে মনে ঝালিয়ে নিচ্ছে পুণ্য। চেয়ারম্যান মাও-এর সাম্প্রতিকতম ঘোষণা, যুদ্ধ বিপ্লব আনবে, অথবা বিপ্লব চিরতরে স্তব্ধ করবে যুদ্ধপ্রচেষ্টা, ভাবিয়েছে পুণ্যকে। মাও-এর এই মন্তব্যের আলোতেই সম্পাদকীয় লিখবে পুণ্য। ক্লান্তিতে জুড়ে যাচ্ছে চোখের দু'পাতা। প্রিয়নাথ প্রশ্ন করল, ক'রাত জেগে আছো?

জবাব না দিয়ে পুণ্য হাসলো। তারপর বলল, দুটো সাদা কাগজ দাও।

প্রিয়নাথের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে ইজিচেয়ার ছেড়ে একটা সাধারণ চেয়ারে বসলো পুণ্য। চেয়ারের সামনে ডেস্কের মতো ছোট টেবিল। এক সেকেণ্ড বসে পর্দা সরিয়ে ভেতরে গিয়ে শার্টের পকেট থেকে কলম হাতে চেয়ারে ফিরলো পুণ্য। কলম খুলে ঘাড় গুঁজলো সাদা পাতায়।

আদিম ভারতীয় সমাজের জটিল শ্রেণীরূপের ব্যাখ্যা সংকলিত এক কঠিন বই পড়ছে প্রিয়নাথ। খোলা বই হাতে ডিভানে আধশোয়া প্রিয়নাথ দু'একবার দেখলো পুণ্যকে। মশগুল হয়ে মানুষটা লিখছে। সংবাদ, সম্পাদকীয় লিখে ফুরিয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনাময় এক লেখক। লেখায় নিবিষ্ট পুণ্য ভাবছে, মানুষের মাথার মধ্যে

আছে হাজার লক্ষ গজ সুতো জড়ানো এক আশ্চর্য লাটিম। নিপুণ হাতে টানলে সে লাটিম থেকে ক্রমাগত সুতো বেরোতে থাকে। মনোরম নকশায় ফুটে ওঠে কতো লণ্ডভণ্ড স্মৃতি, চিন্তা, অভিজ্ঞতা! পুণ্যের শরীরে এ মুহূর্তে ভর করেছে তার পঞ্চাশ বছরের জীবন, মেধা, অনুভূতি, সংবেদন। জীবনের তুচ্ছতম ঘটনা পর্যন্ত কলম হাতে নিলে মনে পড়ে যায়। একটা দিনও ভেসে, হারিয়ে যায়নি, ধরা পড়ে।

বই হাতে পুণ্যের কথাই ভাবছে প্রিয়নাথ। ছোট-খাটো রোগা শরীর, নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে চশমা, হাড় বেরোনো চোয়াল, মাথার চুল প্রায় সাদা, পঞ্চাশেই পুণ্য বুড়ো হয়ে গেছে। অথচ বয়সে সে প্রিয়নাথের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। পুণ্যের লেখা কিছু কবিতা একসময়ে মুখস্থ ছিল প্রিয়নাথের। বই থেকে মুখ তুলে পুণ্যকে প্রিয়নাথ বললো, গেঞ্জিটা ছেড়ে যেও। মধু কেচে রাখবে।

পুণ্য শুনতে পেল না। লেখায় পুণ্য বুঁদ। পুণ্য লিখছে যুদ্ধ আর বিপ্লবের ভেতরকার সম্পর্ক। যুদ্ধ কি? বিপ্লব কি? বিপ্লবে যুদ্ধের শেষ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানে নবজন্ম হবে মানবসভ্যতার।

মাঠে, ময়দানে, মিছিলে, সভায়, স্কুলে, সুখে, শোকে, জেগে, ঘুমিয়ে অনলস এ কথাগুলো বলে চলেছে, লিখে যাচ্ছে সে। লেখাতেই বেশী আরাম। ঝিলিক দিয়ে ওঠে কতো চিন্তা। খালি চায়ের কাপ দুটো নিয়ে গেল মধু। পুণ্যের জন্যেও মধু নিশ্চয় রাঁধছে। মধু যাই রাঁধুক, খেলে তারিফ করে পুণ্য। পুণ্য এলে রাঁধতে উৎসাহ পায় মধু। পাঁচতলা এ বাড়ির পেছনে তিনতলা বাড়িটায় একটা মেস্ আছে। অনেক আবাসিক থাকে সেখানে। বেশীরভাগ চাকরীজীবী। দিনের বেলায় মেসবাড়িটা নির্জীব। কথা, গান, গালগল্পে সন্ধ্যের পরে সেই ঘুমন্ত পুরী জেগে ওঠে। হল্লা, তর্ক পছন্দ না হলেও মেসবাড়ি থেকে ছিটকে আসা জীবনের তাপ মাঝে মাঝে উপভোগ করে প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ অবশ্য নিজেকে কখনও নিঃসঙ্গ ভাবে না। বই যার সঙ্গী, কেন নিঃসঙ্গ হবে সে?

মেসবাড়ির তিনতলার এক আবাসিক হেঁকে উঠলো, ঠাকুর, আধখানা পটলভাজা দিয়ে যাও।

একতলার রান্নাঘর থেকে ঠাকুর জবাব দিল, আমার মাজায় ব্যথা। সিঁড়ি ভাঙতে পারবো না।

তোমার জন্যে লিফ্‌ট্‌ লাগাতে হবে না কি?

ঠাকুর কী জবাব দিল, শুনতে পেল না প্রিয়নাথ। ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, সামাজিক বিকাশ নিয়ে গবেষণাধর্মী কিছু কাজ করার ইচ্ছে ছিল প্রিয়নাথের। রাশিয়া, চীন, কমিনটার্নের দিকে তাকিয়ে না থেকে বস্তুবাদী প্রজ্ঞায় ভারতীয় সাম্যবাদীদের স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিল। প্রিয়নাথের সে সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে। কোথাও কোনো উৎসাহ পায়নি। তীব্র ভাষায় সমালোচিত হয়েছে তার একাধিক বই, প্রবন্ধ। দর্শনের স্বয়ম্ভরতা নামে এক প্রবন্ধ লেখার পর তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করল পার্টি। জবাব দিয়েছিল প্রিয়নাথ। পার্টি নেতৃত্ব খুশি হয়নি সে জবাবে। ট্রট্‌স্কিপন্থী, জাতীয়তাবাদী কম্যুনিস্ট অভিযোগে এক ঘরে

করা হলো তাকে। ক্ষুণ্ন প্রিয়নাথ পার্টি থেকে দূরে সরে গেল। এসব প্রায় দশ, বারো বছর আগের ঘটনা। কিন্তু নিজের বিশ্বাসে আজো সে অবিচল। পার্টিতে না থেকেও সাধারণ মানুষের চোখে প্রিয়নাথ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী। শিক্ষিত মহলে সমাদর আছে তার। হতাশা, অনুতাপের কথা খুলে না বললেও চাপা বিষাদ আছে তার মনে। পুণ্য এলে বেড়ে যায় এ বিষাদ। পড়াশোনা, লেখালিখির এমন শান্তিপূর্ণ এক পরিমন্ডল তৈরী করেও যে অতৃপ্তি তার কাটলো না, তা থেকে কীভাবে রেহাই পেল পুণ্য। কলম ছেড়ে উত্তপ্ত রাজনীতির প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়াই কি এ পরিতৃপ্তির কারণ? তৃপ্তি কোথায়, কোনপথে?

এ প্রশ্নের জবাব পায় নি প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ যখন পার্টিসদস্য তখন এ নিয়ে পুণ্যর সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা হতো। মৌলিক প্রবন্ধকার হিসেবে তখন প্রিয়নাথের সুনাম বাড়ছে। রাজনীতির বদলে লেখায় বেশী সময় দেবার কথা ভাবতে শুরু করেছে প্রিয়নাথ। ট্রেডইউনিয়নে কাজের চেয়ে লেখালিখি দিয়ে পার্টিকে বেশী সাহায্য করা যাবে, এমন চিন্তা মাথায় এসেছে। তার কথায় সায় দিয়েও পুণ্য বলতো চিন্তার জগৎকে জীবন্ত রাখতে মানুষের পাশে থাকা চাই। তাদের মূল সংগ্রামের সাথী হতে হবে।

লেখাপড়া করবো কখন?

তার মধ্যেই করতে হবে।

পুণ্যর জবাব শুনে চুপ হয়ে যেত প্রিয়নাথ। পার্টির সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও পুরোনো অনেক বন্ধুর সঙ্গে প্রিয়নাথের ঘনিষ্ঠতা কমলো না। পুণ্যকে একদিন প্রিয়নাথ বললো, চিন্তার জগতে আমার কাজ। মূল কাজ। তোমাদের সাহায্য করবে আমার কাজ।

পুণ্য সেদিন যে কোনো কারণে তেতে ছিল। তীক্ষ্ণ চোখে এক মুহূর্ত প্রিয়নাথকে দেখে বলেছিল, বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তোমার কাজ কোনো সাহায্য করবে না আমাদের। বাস্তবকে যারা ভয় পায়, তাদের উপকার করবে তোমার দর্শন।

প্রিয়নাথ বলেছিল, তোমাদের পার্টির বাইরে থাকা মানে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়। ইতিহাস প্রমাণ করবে একথা।

কথা বাড়ায়নি পুণ্য। প্রিয়নাথের তিন চারটে বই তখন বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। বিক্রি হতো খুব। এখন কমে গেছে। হাজার কাজের মধ্যে নিজের লেখা থামায়নি পুণ্য। প্রবন্ধ, কবিতা, অনুবাদগ্রন্থ মিলে পুণ্যেরও সাত, আটখানা বই ছিল বাজারে। বিক্রি হতো না। সে সব ঘটনা আজ স্মৃতি। অভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ, জীবনদর্শন যদি শিল্পবিচারে শেষ কথা হয়, তাহলে পুণ্যর জনপ্রিয় লেখক হওয়ার কথা। সেরকম ঘটেনি। প্রিয়নাথের ভাববাদী দর্শনে যদি সাধারণ মানুষ বিমুখ হয়ে থাকে, পুণ্যর জীবন্ত বাস্তবকেও পাঠক মেনে নেয়নি। কেন এরকম হলো? সৃষ্টির এই নিগূঢ় ধাঁধার জবাব প্রিয়নাথ জানে না। তবে এ সত্য সে বুঝেছে যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আগুনে পুড়লেই যেমন স্রষ্টা হওয়া যায় না,

তেমনই ঘরে বসে সাধনায় ডুবে থেকেও কোথাও পৌঁছোনো যায় না। জয়ের পথ, প্রক্রিয়া কী, সে জিতে যায়, সে-ও কি জানে? প্রিয়নাথ জানে, সে অসফল। হেরে গেছে। পুণ্য হারেনি। হারার কথা ভাবতে পারে না সে। এখানেই তার জিৎ। লেখালিখি ছেড়ে যে পথে সে হাঁটছে, তার বিচারে এ হলো অবশ্যম্ভাবী জয়ের পথ। সুদৃঢ় এ বিশ্বাস যার থাকে, তাকে হারায় কে? পুণ্যর রাজনীতি, বিশ্বাসের সঙ্গে প্রিয়নাথের অনেক অমিল। কিন্তু এ বিষয়ে কথা বলে না প্রিয়নাথ। তার ধারণা একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীকে নিষ্ক্রিয় একজন মানুষের উপদেশ দেবার অধিকার নেই। সময়ের পিঠে চেপে লড়াই করছে পুণ্য। দ্বিধা, সংশয়, ভয় নেই তার। সে সবসময়ে আধুনিক, সকলের সমবয়সী, তার রক্তে মিশে আছে যৌবনের অলৌকিক নুন।

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে খিচুড়ির গন্ধ। খিচুড়ি, পাঁপরভাজা যে পুণ্যর প্রিয় খাবার, জেনে গেছে মধু। এই বর্ষায় খিচুড়ির মতো উপাদেয় খাদ্য আর কী আছে? প্রিয়নাথের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাঁপড় কিনতে দোকানে গেছে মধু। পুণ্যর যাবার তাড়া আছে, মধুকে বলেছে প্রিয়নাথ। পুণ্য কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, এ প্রশ্ন প্রিয়নাথ কখনও করে না। চোখ তুলে প্রিয়নাথ দেখলো টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে পুণ্য। মাথার নিচে গুটিকয় কাগজ। ফ্যাকাসে, ক্লান্ত মুখ। কতো ঘণ্টা পরে পুণ্য ঘুমোচ্ছে, বুঝতে পারলো না প্রিয়নাথ।

মেসবাড়িতে হুল্লোড়। কথা আড্ডা, তর্কের ঝড় বইছে। রাতের খাওয়া শুরু হয়েছে। এটাই ওদের খেতে বসার সময়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মধু ফিরছে। ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো। ভেতরে ঢুকতে মধুর অসুবিধে হবে না। খোলা বই মুখের সামনে তুলে ধরলো প্রিয়নাথ। মধুর বদলে দরজা খুলে ট্রাউজার্স, বুশশার্ট পরা একজন জোয়ান লোক ঘরে ঢুকতে অবাক হলো প্রিয়নাথ। অচেনা লোক। তাকে আগে কখনও দেখেছে মনে করতে পারলো না প্রিয়নাথ। ঘরের মাঝখানে এসে সে দাঁড়ালো। দরজা হাট খোলা। প্রথম লোকটার পেছনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো আরও পাঁচজন। সকলের মজবুত স্বাস্থ্য। এবার প্রিয়নাথ প্রশ্ন করল, কী চাই আপনাদের?

জবাব দেবার বদলে সামনের লোকটা প্রশ্ন করল, আপনি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়?

হ্যাঁ। আপনারা?

কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আসছি।

এখানে কেন?

রুটিন টহল।

আমার ফ্ল্যাটে?

হ্যাঁ।

সাদা উর্দিপরা তিন অফিসার ঘরে ঢুকলো। ঘর প্রায় বোঝাই। টেবিলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমোচ্ছে পুণ্য। টেবিলের পাশে গিয়ে প্রথমজন প্রশ্ন করলো,

ইনি কে ?

আমার মামাতো ভাই ।

প্রিয়নাথের জবাবে এক সেকেন্ড পুণ্যকে দেখে অফিসার প্রশ্ন করল, অসুস্থ নাকি ?

হ্যাঁ ।

কী নাম ?

বনমালী ঘোষাল ।

পুণ্যর পিঠে হাত রেখে সামান্য চাপ দিল অফিসার। ধড়ফড় করে জেগে উঠলো পুণ্য। একবার অচেনা মানুষটাকে, তারপর প্রিয়নাথকে দেখলো। ঘরভর্তি একঝাঁক তাগড়া চেহারার মানুষ দেখে ফ্যাকাশে হলো তার মুখ। সব বুঝেও প্রিয়নাথ শান্ত, স্বাভাবিক। পুণ্যকে অফিসার প্রশ্ন করলো, কী হয়েছে আপনার ?

কিসসু না ।

পুণ্যর গলায় অবজ্ঞা। পুণ্যর মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে অফিসার প্রশ্ন করল, আপনার নাম ?

মুরারি চক্রবর্তী ।

পুণ্যর জবাব শুনে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে অফিসার হাসলো। এতোক্ষণে ভয় পেল প্রিয়নাথ। দুরদুর করে উঠলো তার বুক। নিস্তব্ধ রাত। মেঘ ডাকলো আকাশে। প্রিয়নাথ বললো, বনমালীর ওটাই অসুখ। নিজের নাম মনে রাখতে পারে না। আবোল তাবোল যা মনে আসে বলে।

প্রিয়নাথের কথায় অবিশ্বাসের কিছু নেই, এমন ভঙ্গিতে অফিসার প্রশ্ন করল, কতোদিন ভুগছেন ?

বছর চার ।

ডাক্তার দেখেছেন ?

হ্যাঁ ।

কে দেখছেন ?

বিশেষজ্ঞ দু'তিনজন ডাক্তারের নাম বলল, প্রিয়নাথ। কী বলছে, প্রিয়নাথের খেয়াল নেই। কুটো আঁকড়ে মহাসমুদ্রে বাঁচার চেষ্টা করছে। বোবা চোখে রঙ ওঠা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে পুণ্য। হাতের তলায় সদ্য লেখা সম্পাদকীয়। ঘরের ভেতরে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাক, আর ইউনিফর্ম পরা ন'জন পুলিশ। আলমারি, শেলফ্ বোঝাই বই ঘুরে ঘুরে দেখছে একজন। কারও চোখে খর দৃষ্টি, কারও উদাসীন নজর। পুণ্যর হাতে চাপা লেখা কাগজগুলো একলহমা দেখে অফিসার প্রশ্ন করল, কোথায় থাকেন ?

উত্তরপাড়া ।

পাঁপড় কিনে ফিরে ঢুকে একঘর লোক দেখে মধু অবাক। প্রিয়নাথের কাছে মানুষজন আসে। কিন্তু একসঙ্গে এতো লোক, পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেছে মধু। পাঁপড়ের প্যাকেট হাতে মধু তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলে যাবার চেষ্টা করছে

তারা ঘাড় ধরে দাঁড় করালো ইউনিফর্ম পরা একজন। ভয়ে কুঁকড়ে গেল মধু। অফিসার প্রশ্ন করলো, এ ছেলেটা কে?

প্রিয়নাথ বলল, আমার পরিচারক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে অফিসার বলল, আপনাদের যেতে হবে।

কোথায়?

থানায়।

ওয়ারেণ্ট আছে?

দরকার নেই।

অফিসারের চৌকো চোয়াল কঠিন হয়েছে। পুণ্যর জন্যে আশঙ্কায় প্রিয়নাথ ঘামছে। থানায় গেলে পুন্যর আসল পরিচয় জানতে পুলিশের অসুবিধে হবে না। কেউ একজন শনাক্ত করবে। পুণ্যর ঘোর বিপদ টের পেয়ে প্রিয়নাথ বলল, আমি গেলেই হবে তো?

নাহ্, দুজনকে যেতে হবে।

অসুস্থ মানুষটাকে কেন টানাহ্যাঁচড়া করছেন?

দুই সহকর্মী অফিসারের সঙ্গে প্রথমজন যখন চাপা গলায় পরামর্শ করছে, টেলিফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো প্রিয়নাথ। রিসিভার তুলতেই প্রথম অফিসার প্রশ্ন করল, কী করছেন?

পুলিশ কমিশনারকে একটা ফোন করতে চাই।

ধুতি, শার্ট পরা পালেয়োন চেহারার একজন এসে দাঁড়িয়েছে প্রিয়নাথের পাশে। কাঁধের ওপর পালোয়ানের নিঃশ্বাসের গরম ছোঁয়া পেল প্রিয়নাথ। ঠাণ্ডা গলায় অফিসার বলল, রিসিভার রেখে দিন।

লজ্জা, অপমানে ফাঁকা হয়ে গেল প্রিয়নাথের বুক। রিসিভার রেখে নিজের চেয়ারে ফিরে এলো প্রিয়নাথ। মেসবাড়িতে মুখ ধোবার, কুলকুচো করার শব্দ। খাওয়ার পাট শেষ হলো।

অসহায় প্রিয়নাথ বলল, আপনারা বোধহয় ভুল করছেন। আমার একটা পরিচয়, সামাজিক সম্মান।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অফিসার বলল, ওসব বলে লাভ নেই। নামী লোক হয়েও মিছে কথা বলেছেন আপনি।

প্রিয়নাথের শিড়দাঁড়ায় বইছে হিমেল স্রোত। দুই প্রৌঢ়কে নিয়ে পুলিশভ্যান যখন রওনা হলো, মেসবাড়ি শান্ত। বেশীরভাগ ঘরে আলো নিভে গেছে। বর্ষায় শীতল কলকাতা ঘুমোনোর জোগাড় করছে। প্রিয়নাথ, পুণ্যকে প্রিজন ভ্যানে তুলে ঘিরে বসলো ছ'জন পুলিশ। সামনে কালো জিপে বসলো তিনজন। ফাঁকা, ভিজে রাস্তায় এগিয়ে চলেছে দুটো গাড়ি। প্রিয়নাথ দেখলো তামাটে আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পুণ্য চুপ। কথা নেই তার মুখে। প্রিয়নাথের সামনে বসা এক পুলিশ সিগারেট ধরালো। রাস্তার আলো ছুটন্ত ভ্যানের মধ্যে আসা যাওয়া করছে। ট্রাউজার্স গেঞ্জি পরেই ভ্যানে উঠেছে পুণ্য। প্রিয়নাথের শরীরে

পাজামা, পাঞ্জাবি। ঘরে, বাইরে এটাই তার পোশাক। ভয়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়েছে প্রিয়নাথ। ফিরে আসছে তার মনের প্রশান্তি। যুক্তি, চিন্তা, নিপুণভাবে ছকে নিচ্ছে। প্রায় বিশবছর বাদে পুলিশের পাল্লায় পড়তে হলো। উনিশশো আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশের পর পুলিশের সঙ্গে আর পাঞ্জা কসতে হয়নি। অন্ধকার গাড়িতে বসে নিজের কথার অসংগতি, বোকামি বুঝতে পারলো প্রিয়নাথ। কিন্তু প্রিয়নাথ জানে তার কোনো শাস্তি হবে না। হোমরা, চোমরা একডজন পুলিশ অফিসার আছে, যারা শ্রদ্ধা করে তাঁকে। তার অনুগত বেশ কয়েকজন ছাত্র জবরদস্ত আমলা। তারা কেউ খবর পেলে এখনই থানায় আসবে। প্রিয়নাথের আপন ভাগনে সিতেশ। উঁচু পদের রাজকর্মচারী সে মামার বিপদ শুনলে এখনই তোলপাড় শুরু করবে। তবে সময় খারাপ। চারপাশে রক্ত, বেহিসেব মৃত্যু। সব সম্পর্ক, যোগাযোগ অসাড় হয়ে যাচ্ছে। থানার বদলে লর্ড সিন্‌হা রোডের যে বাড়িতে দুটো গাড়ি ঢুকলো, সে জায়গা প্রিয়নাথ, পুণ্যর চেনা। মালার মতো দু'জনকে ঘিরে ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে এলো ছয় পুলিশ। ফাঁকা বড়ো ঘর। একটা লম্বা টেবিল ঘিরে অনেকগুলো চেয়ার।

বসুন।

অফিসারের কথায় পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসলো দু'জন। ধুতি,শার্ট পরা লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর চলে গেল আরও দু'জন। অচেনা একজন অফিসার ঘরে ঢুকতে তটস্থ হয়ে দাঁড়ালো ছ'জন। এ নিশ্চয় আরও পদস্থ অফিসার, প্রিয়নাথ ভাবল। ধারালো চোখে মুহূর্তের জন্যে দু'জনকে দেখার পর হাসি ফুটলো নবাগতর মুখে। টকটকে ফর্সা রঙ, ভারিমুখে হিটলারি গোঁফ, কটা চোখ, সাধারণভাবে লোকটা সুপুরুষ। প্রিয়নাথকে হাসিমুখে সে বলল, আপনার মতো একজন মানুষের দর্শন পাওয়া সৌভাগ্য। আপনি বাড়ি যান আমাদের জিপ পৌঁছে দেবে আপনাকে। আপনার ভাই বনমালীবাবু যাবেন উত্তরপাড়ায়। তাঁকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার। দরকার হলে ট্রেনে তুলে দেবো। প্রচুর গাড়ি আছে।

লোকটা রসিকতা করছে কিনা বুঝতে পারলো না প্রিয়নাথ। একবার মনে হলো সিতেশকে ফোনে হয়তো খবর দিয়েছে মধু। সঙ্গে সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করছে সিতেশ। কিন্তু সিতেশের ফোননম্বর মধুর জানার কথা নয়। তাহলে? প্রিয়নাথ বলল, বনমালীর জামা, টাকাপয়সা আমার বাড়িতে। কিছু ওষুধপত্রও আছে। তাছাড়া এই বৃষ্টিবাদলে আজ ওকে ছাড়বো না আমি। কাল সকালে বাড়ি ফিরবে বনমালী।

প্রিয়নাথ অভিনেতা নয়। মিথ্যে বলার চর্চাও নেই। কথা বলতে বুকের বাতাস ফুরিয়ে যাচ্ছে। শুকনো ঠেকছে জিভ। তার কথায় অধস্তন অফিসার গম্ভীর হয়ে থাকলেও সুদর্শন লোকটার মুখে ছড়িয়ে আছে স্মিত হাসি। সে বলল, আপনি একদম দুশ্চিন্তা করবেন না। বনমালীবাবু ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবেন।

পালোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে প্রিয়নাথের পাশে। তার গরম শ্বাস লাগলো প্রিয়নাথের

কপালে। বাড়িতে রিসিভার তুলতে ঠিক এভাবেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। হিটলারি গোঁফ বলল, যান।

প্রিয়নাথ টের পেল চেয়ার ছেড়ে না উঠলে তার ঘাড় ধরে পালোয়ান টেনে তুলবে। উঠে দাঁড়ালো প্রিয়নাথ। ঘর থেকে বেরোবার মুহূর্তে একবার দেখলো পুণ্যকে। শান্ত, সমাহিত বসে আছে পুণ্য। সাদা পোশাকের এক অফিসার একটা খালি ট্যাক্সিতে প্রিয়নাথকে তুলে দিয়ে বলল, আজ সন্ধ্যেটা ভুলে যাবেন।

লোকটার কথার মানে বুঝতে পারলো না প্রিয়নাথ।

পুণ্যকে ঘিরে চাপা গলায় অফিসার কথা বলছে।

একজন বলল, হেলে ধরতে কেউটে।

পুণ্যর মুখোমুখী চেয়ারে বসে সুদর্শন অফিসার বলল, পুণ্যবাবু নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। একটা শর্তে ছেড়ে দিতে পারি আপনাকে। এখনই সূর্যবাবুর ডেরায় নিয়ে যেতে হবে আমাদের।

কথা না বলে পুণ্য হাসলো। সে হাসির পর আর কোনো প্রশ্ন চলে না।

রাত প্রায় এগারোটায় রায় এন্টারপ্রাইজের মালিক, বেঁটে, কালো বিশ্বরূপ রায় পার্ক স্ট্রিট থেকে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বিশ্বরূপ বুঝলো, গড়বড় করছে ইঞ্জিন। কোনোমতে বাড়ি পৌঁছে কাল সকালেই গাড়ি গ্যারাজে পাঠাবে। পার্ক স্ট্রিট ছেড়ে রেড রোড ধরলো বিশ্বরূপ। চেতলায় তার বাড়ি। ক্যাসুরিনা এ্যাভিনু পেরিয়ে রেড রোড কিছুটা ছুটে বন্ধ হলো ইঞ্জিন। টিপটিপ বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়ায় শ্মশানের মতো নির্জন ময়দান। রাস্তায় ছড়িয়ে আছে গাছের ডাল, রাশি রাশি পাতা। হাওয়ায় উড়ছে কিছু পাতা। বনেট খুলে ইঞ্জিন পরীক্ষার জন্যে রাস্তায় নামলো বিশ্বরূপ। কী ঠান্ডা, নিস্তব্ধ চারপাশ! ইঞ্জিনে ঘাড় গুঁজে খুটখাট নাড়াচাড়া করল সে। স্টার্ট নিল না ইঞ্জিন। দিশাহারা রায় কি করবে, যখন ভাবছে, ময়দানের ভেতর থেকে ভেসে এলো একঝলক আলো, গুলির শব্দ, আবছা আর্ত কণ্ঠস্বর। আতঙ্কে জমাট বেঁধে গেল রায়। অল্পদূরে একটা কালো ভ্যান দেখে তলপেটে তীক্ষ্ণ কামড় অনুভব করল। গাড়ি ফেলে অন্ধকার ময়দানের ভেজা ঘাস, কাদার ওপর দিয়ে দৌড় লাগালো। কোথায় পৌঁছোবে, জানে না।

বত্রিশ

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গড়েছে ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া। মুক্তিকামী তিনরাষ্ট্রের এই ঐক্যে মহাদেশ জুড়ে বইছে উদ্দীপনার ঝড়। আমেরিকা কোণঠাসা। পূর্বপাকিস্তানে লড়ছে মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অত্যাচারে পিলপিল করে পশ্চিমবাংলায় ঢুকছে পূব-বাংলার অসহায় মানুষ। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত, পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেল। ঊনিশশো একাত্তর সালের শেষ দু'মাসে বদলে গেল এশিয়ার মানচিত্র। ছয়ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষের স্বীকৃতি পেল নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশ। সাতই ডিসেম্বর যশোরে ঢুকলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। জরুরী অবস্থা অনেক দিন আগে থেকেই বহাল ছিল দেশে। যুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়তে ভারত সরকার বলল, পাকিস্তানের ঘটনা সেদেশের নিছক অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। প্রতিবেশী দেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো এদেশের সব রাজনৈতিক দল সমর্থন করল। আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ইত্যাদি শব্দ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গ্রন্থ থেকে সাময়িক-ভাবে খারিজ হয়ে গেল।

পরিস্থিতি পর্যালোচনায় পার্টিও যে তালগোল পাকাচ্ছে, দেশব্রতী পড়ে বুঝতে পারলো কিশোর। দেশব্রতী লিখলো, ভারত, পাকিস্তান যুদ্ধ হলো হালুয়া, রুটির বখরা নিয়ে দুই বৃহৎশক্তির দুই দালালের লড়াই।

পার্টির ব্যাখ্যায় ক্ষুব্ধ হলো অনেকে। আক্রমণকারী, আক্রান্তের মধ্যে পার্টি কোনো সীমানা না টানায় শুরু হলো তুমুল বিতর্ক। পার্টির মধ্যে দীর্ঘ দিন জমে থাকা ক্ষোভ, অসন্তোষ ফেটে পড়লো। মাথা চাড়া দিল নানা উপদল। দিস্তে দিস্তে দলিল প্রকাশিত হতে থাকলো। চোখা চোখা গালাগাল উড়তে থাকলো বাতাসে। সুরেনদা মারা যাবার পর একবছরেও আঞ্চলিক কমিটির একটা সভা হয়নি। বিতর্ক তুঙ্গে উঠতে ডাকা হলো জরুরি বৈঠক।

পুলিশ, মিলিটারি ঘিরে আছে জেলা। স্বাধীন ঘোরাফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তবু সভা বসলো। সভায় কিশোর বলল, বিশে জুলাই-এর দেশব্রতীতে দু'বাংলা জোড়া দেবার যে তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। দুটো দেশ এভাবে জোড়ো লাগে না। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে শ্রেণীযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে পারলে তবেই অখণ্ড বাঙলা, অখণ্ড ভারত, এমন কি অখণ্ড পৃথিবীর জন্ম হতে পারে। জয়- বাংলা শ্লোগানও রীতিমতো প্রাদেশিক, সংকীর্ণ।

রোগা, কালচে গলা, কপালে শিরা জেগে ওঠা ব্রজদাকে দেখে মনে হচ্ছে, তার শরীরে রক্ত চলাচল অনেক দিন থেমে গেছে। ব্রজদা ঘামছে। পার্টির তত্ত্ব, কর্মসূচি

যে নির্ভুল গতরাত থেকে আঞ্চলিক কমিটির সদস্যদের বোঝাতে চাইছে ব্রজদা। ব্রজদা বলল, পার্টিলাইন নির্ভুল। ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গী জমানাকে কিছুতেই আমরা সমর্থন করতে পারিনা।

হাল ছেড়ে দিয়েছে কিশোর। বিশদ আলোচনা করেও ন্যায় যুদ্ধ, অন্যায় যুদ্ধের তত্ত্ব সে বোঝাতে পারেনি ব্রজদাকে। না বোঝার প্রতিজ্ঞা করেছে ব্রজদা। একটা সত্য কিশোর উপলব্ধি করল যে, যুদ্ধ হলো রাজনীতির কষ্টিপাথর। যুদ্ধের সময়েই দেশ, জাতি, রাষ্ট্রনেতা, ইতিহাসবিদ, তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের সততা ও প্রজ্ঞার সঠিক যাচাই হয়।

আঞ্চলিক কমিটির সব সদস্যকে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে বেশীর-ভাগ খবর পেয়েছে। তারা এসেছে। আটঘাট বেঁধে, সতর্কতা নিয়ে সভা ডাকা হয়েছে। সুরেনদার মৃত্যুর পর পুলিশের গুলিতে মারা গেছে আঞ্চলিক কমিটির দুই সদস্য। জেলে আছে তিনজন। চুপ করে গেলেও ব্রজদার ব্যাখ্যা মানতে পারছে না কিশোর। শক্তিমান এক রাষ্ট্র পাশের দুর্বল দেশে গোলমাল চলার অজুহাতে, সেখানে সৈন্য পাঠাতে পারে না। সামরিক শাসন চালু থাকলেও সে দেশের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হবে। স্বদেশের সম্প্রসারণবাদে কমুনিস্টরা মদত দিলে বিপদে পড়তে হবে তাদের। বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের যদি জন্ম হয়, সে দেশের মানুষের সংগ্রামই হবে সেই জন্মের ধাত্রী। বিদেশের সেনাবাহিনী স্বাধীনতা, মুক্তি, বিপ্লব রপ্তানি করতে পারে না। ইতিহাস মেনে নেবে না এ ঘটনা।

সভা শেষ হতে চলেছে। ব্রজদা গম্ভীর। এক, দু'জন করে ছেড়ে যাচ্ছে সভা। বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতের বুড়ো আঙুলে খৈনি ডলছে অজিত। সভা ছেড়ে সকলের শেষে উঠলো কিশোর, অজিত, ব্রজ। সামনে একচিলতে শালবন, তারপর বাহেঙ্গা গ্রাম। বুধনের আজ তিলকচুরি, পাকা দেখা। আত্মীয়, কুটুম আসছে তাদের ঘরে। এই উপলক্ষ খাড়া করে ডাকা হয়েছিল সভা। অচেনা মানুষজনের গাঁয়ে ঢোকা গায়ে মাখবে না কেউ। বুধনের বিয়ে, তিলকচুরির খবর বাহেঙ্গার বাইরে আর কে বা জানে?

শালবনের বাতাসে মোলফুলের সুবাস পেল কিশোর। শালবন ছেড়ে গাঁয়ে ঢুকলো তিনজন। গাঁয়ের কুলিতে লাঠি ঠুকঠুক করে অজিতের সামনে এসে দাঁড়ালো পুর্খনি বুড়ি। বুড়ির বয়সের গাছপাথর নেই। শুকনো শরীর। নাক, মুখ, চোখ একাকার। হাঁপানি রুগী। টানের কষ্টে পুর্খনি কাঁপছে। দু'চোখে জল। হাত পেতে অজিতকে বলল, ব্যাটা দাবাই দে। বহুৎ কষ্ট।

ফাঁপরে পড়লো অজিত। তার হোমিওপাথির ভাঁড়ার শেষ হয়েছে অনেকদিন। খালি বাক্স ভরে নেবার সুযোগ হয়নি আর। সঙ্গীতও নেই। বুড়ি আবার বলল, মইরে যাচ্ছি বেটা, দাবাই দে।

অজিত বলল, দাবাই নাই গো বুড়িমা।

দুহাতে বুক চেপে পুর্খনি বলল, যা হোক কুছু দে ব্যাটা। আমাকে বাঁচা

বটেক।

বুড়ির অবস্থা দেখে অজিতের কষ্ট হচ্ছে। কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। পুখনিকে এক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল তার। পুরোনো হাঁপানিতে কষ্টে ছটফট করলেও অজিতের বিস্তর সাধ্যসাধনাতেও ওষুধ ছোঁয়নি পুখনি। শেষ পর্যন্ত খেল একদিন। ভোজবাজির মতো ফল পেল। জীবনে কখনও ওষুধ না খাবার জন্যেই যে পুখনি চটপট আরাম পেল, অজিত জানতো। সেই থেকে হা পিত্যেশ করে অজিতের জন্যে অপেক্ষা করে বুড়ি। বুড়ির জন্যে কিছু করা দরকার। অজিতের মনে পড়লো, গতকাল তাঁতিপাড়া ছুঁয়ে আসার সময়ে কিশোরের জন্যে দুটো এনট্রোকুইনল কিনেছিল। বড়ি দুটো এখনও গোঁজা আছে তার ট্যাঁকে। লুঙির ট্যাঁক থেকে বার করে একটা বড়ি দিল পুখনির হাতে। আনন্দে হাসি ফুটলো বুড়ির মুখে। জল ছাড়াই বড়িটা গিলে নিল সে। তারপর বুধনদের বাড়ির বাইরের দাওয়ায় শাল খুঁটিতে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো সে। অজিত দেখলো বুড়ির শ্বাসের টান কমে গেল। অবাক হয়ে তার কান্ড দেখছে ব্রজদা। অজিত বলল, এর নাম বিশ্বাস। পাঁচ, সাতদিন হাঁপানিতে আর কষ্ট পাবে না বুড়ি।

মুচকি হেসে কিশোর বলল, ওষুধের চেয়ে ডাক্তারের ওপর রুগির বেশী বিশ্বাস।

বাকি এনট্রোকুইনল কিশোরের হাতে গুঁজে দিয়ে অজিত বলল, এখনই খেয়ে নে।

বাড়ির সামনে কুলিতে গুমগুম শব্দে ধামসা বেজে উঠলো। সেজেগুজে, রঙিন মিছিল করে এসে গেছে কনেপক্ষের আত্মীয়রা। নিকোনো ঝকঝকে কুলি, দাওয়া, বাড়ির ভেতরের উঠোন। কুলি থেকে উঠোন পর্যন্ত পিটুলির আলপনা। বাড়ির মসৃণ দেওয়ালে লাল মাটি গুলে আঁকা হয়েছে ঘট, পাখি, বেঁটে বেঁটে কলাগাছ। নিপুণ রেখায় জীবন্ত নকশা। বাড়ির মেয়েরা এঁকেছে। যামিনী রায়ের শৈলীর সঙ্গে এসব ছবির মিল খুঁজে পায় কিশোর। ব্রজদাকে নিয়ে অজিত, কিশোর উঠোনে এলো। উঠোনের পুব দিকে পাঁচটা বড়ো হাঁড়িতে বাখর মেশানো ভাত কাল থেকে পচছে। হাঁড়ির মুখে লাগানো মুড়ো ঝাঁটা—গেঁজিয়ে ওঠা ভাত খালি হাঁড়ি, কলসিতে ঢালার সময় মুড়ো ঝাঁটা ছাকনির কাজ করবে। উঠোনের বাতাসে ভুরভুর করছে হাঁড়িয়ার গন্ধ। অজিত, কিশোর ব্রজদার মতো তিন সম্মানিত অতিথি দেখে চারপাই এগিয়ে দিল বুধনের বাবা। চারপাই ঘিরে চাটাই-এর ওপর বসেছে আত্মীয়, কুটুম, প্রতিবেশীরা। তখনই খোলা হলো ঝাঁটা ডোবানো একটা হাঁড়ি। সবচেয়ে বয়স্কদের সামনে হাঁড়িটা বসিয়ে দিল একজন। প্রবীণদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ঝকঝকে কাঁসার বাটি।

বাঁশি, বেহালা, মাদল, বাজিয়ে কুলিতে শুরু হয়েছে তরুণতরুণীদের নাচগান। খুশির হাওয়া বইছে গাঁয়ে। সারারাত হয়তো চলবে এ উৎসব। মরশুমী চাষের কাজ শেষ। জেলার বেশীরভাগ অঞ্চলের কৃষক এ বছর ন্যায্য পাওনা ঘরে তুলেছে। গ্রাম

ছেড়ে পলাতক জোতদার, ধনী চাষীদের মাঠের ধান ধর্মগোলায় আলাদা রাখা হয়েছে। পার্টির নির্দেশও ছিল তাই। বড়ো জোতের মালিক যারা গাঁয়ে ছিল, ক্ষেতমজুরদের তারা ন্যূনতম মজুরি দিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে গাঁয়ের গরীবদের ঘরে এখনও খোরাকি ধান মজুত আছে। ঘরে ভাত থাকলেই এই দরিদ্র আদিবাসী গ্রামগুলোর চেহারা বদলে যায়। শালমহুয়ার জঙ্গলে তাই এখন রূপকথার দিনরাত। তরণী পাহাড়ের বুক থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মহুয়া ফুলের গন্ধ।

খিড়কির রাস্তায় কাঠের আগুন জেলে ছাল ছাড়ানো একটা গোটা শুয়োর ঝলসাচ্ছে গাঁয়ের মেয়ে, বৌরা। কনের বাড়িতে পাঠাবার জন্যে শুয়োরের ডান পা কেটে আলাদা রাখা হয়েছে। দমকা হাওয়ায় উড়ে এলো একরাশ লাল ধুলো। এক মুহূর্ত নেচে মিলিয়ে গেল ধুলোর ঢেউ। খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে ভ্রু বাঁকিয়ে যে মেয়েটা বারবার অজিতের দিকে তাকাচ্ছে, সে বুধনের বোন, নাম লালমুনি। তাকে আগেই দেখেছে কিশোর। লালমুনির কটাক্ষে চঞ্চল হচ্ছে অজিত। তার দুচোখের অস্থিরতা টের পেল কিশোর। অবাক হলো না সে। এই শালবন, মাদল, বাঁশির ধ্বনি, সুর, বিরাট চুলোয় আস্ত শুয়োর ঝলসানোর সঙ্গে লালমুনির চাহনি, অজিতের ব্যাকুলতা মিশে গেছে। এ পরিবেশে এরকমই হয়। সাঁওতাল বনে গেছে অজিত। অথচ কথা ছিল জীবনযাপনে আদিবাসীদের একজন হবার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত চেতনায় তাদের তুলে আনবে একজন সংগঠক। বদলে যাবে মধ্যবিত্ত সংগঠক এবং গাঁয়ের সর্বহারা মানুষের চেতনা ও শ্রেণীগত অবস্থান। নতুন মানুষের জন্ম হবে। কিন্তু অজিতের ক্ষেত্রে ঘটনা ঘটেছে একতরফা। সে সাঁওতাল হয়ে গেছে। কিন্তু বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি আদিবাসী সমাজকে। লালমুনিকে পছন্দ করেছে অজিত। অথচ লালমুনির চিন্তা, ধ্যানধারণা পরিচ্ছন্ন করায় মন নেই তার। লালমুনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একচুল নড়েনি। অজিতকে নিয়ে তাই দুশ্চিন্তা আছে কিশোরের।' রোজ বাড়ছে দুশ্চিন্তা।

খিড়কির দরজার পাশে গায়ে গায়ে তিন, চারটে ভিলা গাছ। পিঅই পাখি নেচে বেড়াচ্ছে একটা গাছের ডালে। সুরেলা গলায় পাখিটা ডেকে উঠতে অজিত তাকালো। উঠোনে, চুলোর সামনে বসা মেয়ে, বৌরা, সকলে দেখছে পাখিটাকে। অনুষ্ঠানের মুহূর্তে পিঅই দেখা সৌভাগ্যের ইঙ্গিত। পিঅই তো আসলে পাখি নয়, স্বামীহারা এক সাঁওতাল বধূ। অনেক অনেক বছর আগে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরঘরে আসার পথে ঘন জঙ্গলের মধ্যে নবদম্পতির ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী হারিয়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলো নবীন স্বামী। নববিবাহিতা তরুণী স্বামীর খোঁজে জঙ্গলে উন্মাদিনীর মতো ঘুরে বেড়ালো। স্বামীকে না পেয়ে পাখি হয়ে গেল সে। স্বামীর নাম ধরে আজও সে ডেকে চলেছে।

শুয়োর পোড়ানো শেষ হতে হাত ধুয়ে উঠোনে এলো লালমুনি। এক ধামা চালভাজা, তিনটে কাঁসার বাটি ঘর থেকে এনে বুধনের হাতে দিল সে।

চারপাই-এর ওপরে ধামা রেখে অজিত, কিশোর, ব্রজর হাতে তিনটে বাটি বুধন ধরিয়ে দিল। কিশোর বলল, আমি ব্রজদা, শুধু চালভাজা খাব।

হাহা করে উঠে বুধনের বাবা বলল, আজ তুরা লাচার হলে আমার বেটার ক্ষেতি হৈঁয়ে যাকে।

ব্রজদার দিকে তাকালো কিশোর। বাটি বাড়িয়ে দিয়ে বুধনকে ব্রজদা বলল, ঠিক আছে, দাও।

ব্রজ, কিশোর হাঁড়িয়ার বাটি দুটো ঠোঁটে ছুঁয়ে নামিয়ে রাখলো। মুঠো মুঠো চালভাজা চিবোচ্ছে তারা। চালভাজায় আগ্রহ নেই অজিতের। একগাল চালভাজা চিবিয়ে একচুমুকে সে শেষ করলো হাঁড়িয়ার বাটি। খালি বাটি এগিয়ে দিল বুধনকে। কিশোর ভাবছে অন্যকথা। তার মতামত শুনে অখুশি হয়েছে ব্রজদা। পার্টি নেতৃত্বের কাছে তার বিরুদ্ধে নিশ্চয় নালিশ করবে। নেতৃত্বের একাংশ অবিশ্বাস করে তাকে। এখনও সে দক্ষিণদেশ গোষ্ঠিতে আছে, প্রমাণ করতে চায়। তাঁতিপাড়ায় প্রকাশ্য সভার পর তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সমালোচনার যুৎসই জবাব দিয়েছিল সে। জবাব দেবার সুযোগ ছিল। আমেদপুর থানায় বন্দুক দখল অভিযানের সঙ্গে তাঁতিপাড়ায় জনসভা ডাকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছিল সে। পুলিশ, প্রশাসনের নজর ঘোরাতেই ডাকা হয়েছিল তাঁতিপাড়ার জনসভা। তার এ যুক্তি আঞ্চলিক কমিটি মেনে নিয়েছিল। মানতে বাধ্য হয়েছিল। সুরেনদা তখন বেঁচে। তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছিল কিশোর। সুরেনদার মৃত্যুর পরেই পার্টিতে আলগা হয়েছে কিশোরের শেকড়। আঞ্চলিক কমিটির সভায় তাকে সোচ্চারে সমর্থন করার কেউ নেই। দু'একজন সমর্থক যারা আছে, কথা বলতে পারে না তারা। ফলে আঞ্চলিক কমিটিতে কিশোর এখন অসহায়, কোনঠাসা। তার আশংকা, এখান থেকে তাকে আর কোথাও সরিয়ে দেবে পার্টি।

খারাপ মানুষ নয় ব্রজদা। কিশোরের শত্রুও নয়। নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী। আনুগত্যের সাবেক ধারণা আঁকড়ে আছে। নেতৃত্বের ওপর অবিচল আস্থা। বিদ্রোহ করে পুরোনো পার্টি ছেড়ে যে এই ব্রজদা বেরিয়ে এসে নতুন পার্টিতে ঢুকেছে, ভাবা যায় না।

এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে রজদা বলে, বিদ্রোহীকেও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। সব সময়ে সে বিদ্রোহী থাকতে পারে না।

ব্রজদাকে আড়চোখে দেখলো কিশোর। ব্রজদার কপালে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা। গতকাল বিকেলে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে সে। বুধন, তার বাবাকে সে গল্পই বলছিল ব্রজ। আমজোড়া গাঁয়ের বাইরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে সেনাবাহিনীর চার জোয়ান ধরেছিল তাকে। মাঠ থেকে তুলেছিল আরও সাতজন আদিবাসী কৃষককে। মিলিটারির মেজরের সামনে আটজনকে হাজির করে জোয়ানরা বলল, সবাই মার্ডার

পার্টির লোক।

জোয়ানদের ধারনা, মার্ডার পার্টির লোক চিনতে বুদ্ধিমান মেজর ভুল করবে না। বন্দীদের পরনে ছিল লুঙি, গেঞ্জি। শরীরে কম্বল, তুষের চাদর। লুঙি, কম্বলে জড়ানো ছিল ব্রজদার শরীর। সকলকে ভালো করে দেখে মেজর বলল, ইয়ে সব বিলকুল নাঙ্গা আদমি। ইসকা অন্দরমে মার্ডার পার্টিকা কোই নেহি হ্যায়।

মেজরের ধারণা পরিষ্কার পোশাক পরা স্কুল, কলেজ, য়ুনিভার্সিটির ছাত্ররাই মার্ডার পার্টিতে আছে। গরীব চাষীরা পার্টিতে নেই। ভয়ে ব্রজদার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। মেজরের কথায় ঘাম দিয়ে জবর ছাড়লো। ব্রজদার গল্প শুনে সকলে হাসছে। ব্রজদা বলল, পুলিশের কাছে নিয়ে গেলে তারা গুলি করে মারতো আমাকে।

ব্রজদার মুখে এখন সরল হাসি। কাল, পরশু এ মানুষই নেতৃত্বের কাছে কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করবে। ব্রজদাও কলকাতার লোক। এম. এ পাশ। এখানে আসার আগে কলকাতার এক স্কুলে পড়াতো। রবীন্দ্রসংগীত গায় চমৎকার। ব্রজদার গান কিশোর শুনেছে। চার বাটি হাঁড়িয়া শেষ করে পাঁচ নম্বর নিয়ে বসেছে অজিত। হিসেব রাখছে কিশোর। অজিতের দু'চোখ টকটকে লাল। ব্রজদাকে অজিত বলল, একটা রবীন্দ্রসংগীত শোনান।

ব্রজদা বলল, ভুলে গেছি।

গান কেউ ভোলে না।

অজিতের চাপাচাপিতে ব্রজদা বলল, আর একদিন গাইবো।

একজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বুধনের বাবা মিলিটারিদের বিষয়ে কথা বলছে। তাঁবুর ভেতরে তারা কীভাবে থাকে, শোয়, ঘুমোয়, খায়, অচেনা মানুষটা শোনাচ্ছে বুধনের বাবাকে। ব্রজদার দিকে তাকিয়ে বুধনের বাবা বলল, উদের ডর লেগেছে। এখন উরা দিনরাত মারডারেন পার্টির আদমি দেখবে।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বুধনের বাবা গল্প শুরু করল। দুটো পিঁপড়ের সঙ্গে একটা হাতির একবার ঝগড়া লাগলো। হাতি বলল, তাকে বনের রাজা না মানলে দুই পিঁপড়েকে পিশে মারবে সে। ভয়ে শুকিয়ে গেল পিঁপড়েদুটোর প্রাণ। একজন বলল যে, তাদের সঙ্গে দৌড়ে হাতি জিতলে তাকে রাজা মানবে তারা। রাজি হলো হাতি। শুরু হলো দৌড়। বনবাদাড় ভেঙে ছুটতে লাগলো হাতি। তারপর যেখানে দাঁড়ায়, দেখে সামনে দুটো পিঁপড়ে। রাগে রক্ত উঠে গেল তার মাথায়। পাগলের মতো আরও জোরে দৌড়োতে থাকলো সে। তারপর? ছুটতে ছুটতেই সে মারা গেল।

গল্প শুনে নড়েচড়ে বসলো কিশোর। ব্রজদা কিছু ভাবছে।

বাঁশি, বেহালা, মাদলে কুলিতে জমে উঠেছে আসর। আনন্দউৎসবেও বাহেঙ্গার বুকের ভেতরটা এখন ভয়ে ছমছম করছে সবসময়। জানগুরু খতমের পর যখন তখন পুলিশী হামলা চলছে গ্রামে। লখাই ধরা পড়েনি। তাকে ধরার জন্যে তল্লাশীর নামে বাহেঙ্গার কিছু নির্দোষ, নিরীহ লোককে নানা সময়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে

পুলিশ। তাদের ওপর অত্যাচারও হয়েছে থানায়। তারা এমন সব গল্প শুনিয়েছে যে ধোঁকা খেয়েছে পুলিশ। কেউ বলেছে, কোট, প্যাণ্ট, টুপি পরা বিশ পঁচিশজন লোক বন্দুক বাগিয়ে মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এসে দোষীদের শাস্তি দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। কেউ বলেছে, ঘোড়ায় চেপে তারা আসে। তাদের দেখে গাঁয়ের কুকুরগুলো পর্যন্ত বোবা মেরে যায়।

ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানোর মতো গেরিলাদের সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আরও অসুস্থ হয়েছে লখাই। ক্রমশ ঘোলাটে হচ্ছে তার দু'চোখ। রাতদিন ভুল বকে। তাকে নিয়ে কিশোরের যথেষ্ট দুর্ভাবনা। তার সামনে গাঁয়ের একজনকে কিছুদিন আগে লখাই বলল, মাও সে তুংকে নিয়ে চারু মজুমদার বৃন্দাবনীর জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছে। লখাইকে তারা বলল, হুল লাগাও।

ব্যস্, হুল লেগে গেল।

মাঝে মাঝে আচমকা লখাই চেঁচিয়ে ওঠে, ঝুমরি তু খাড়া থাক।

জানগুরুকে খুন করার ধকল, ঝুমরির সঙ্গে বিয়ে হলে কাটিয়ে উঠতে পারতো লখাই। বিয়েটা হলো না। কুঞ্জমাঝিকে জেল থেকে ছাড়াতে নিঃসম্বল ঝুমরি দুমকায় গেল। কুঞ্জমাঝির জামিন নিতে লাগবে দু'হাজার টাকা। কে দেবে? এগিয়ে এলো ভগতরাম। কড়ার হলো, তার বাড়িতে গতরে খেটে ঋণ শোধ করবে ঝুমরি। সে থেকে গেল দুমকায়। গাঁয়ে একা ফিরলো কুঞ্জ। তাকে একা ফিরতে দেখে আরও বিগড়ে গেল লখাই-এর মাথা। এখন তাকে সামলে রাখা মুশকিল।

মাঝেরপাড়া থেকে ছেলে, বুড়ো মিলিয়ে কন্যাযাত্রী এসেছে পঁচিশজন। বুড়োদের হাতে হলুদে ছোপানো টুকরো থান কাপড়। জল ঢেলে তাদের পা নিজের হাতে ধুয়ে দিয়েছে বুধনের বাবা। মাদল, বাঁশি, দোতারা নিয়ে এসেছে কমবয়সীরা। খাবার দেওয়া শুরু হতে কুলি ছেড়ে ছেলেমেয়েরা উঠোনে জড়ো হলো। ভরে গেল উঠোন, দাওয়া। শালপাতার টোলায় মুড়ি গুড় নিয়ে হৈ হৈ করে খাচ্ছে আট, দশজন তরুণ। মুড়ি, গুড়ের পরে সবাইকে দেওয়া হলো, শালপাতার কুরিয়ায় শুয়োরের মাংস, কাঁসার বাটি বোঝাই হাঁড়িয়া। ঝলসানো মাংস থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ম্ ম করছে বাতাস।

কন্যাযাত্রীদের অনেকেই অজিতের চেনা। মাঝের পাড়ায় তারা পার্টির কর্মী, দরদী। অজিতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁড়িয়া, মাংস খাচ্ছে দু'জন। হেরে যাবে জেনেও পাল্লা দিচ্ছে। হাসছে খুব। অজিতের ফুটবল টিমেও এই দু'জন আছে।

খাওয়া শেষ করে কন্যাযাত্রীদের একজন ফুঁ দিল বাঁশিতে। দাওয়া থেকে বেহালা তুলে নিয়ে তারে ছড় টানলো আর একজন। ছড়িয়ে পড়লো সুর। মেয়ে-পক্ষের বয়স্ক মানুষেরা হাতের টুকরো হলুদকাপড় একে একে জড়িয়ে দিচ্ছে বুধনের মাথায়। টুকরো জমে তৈরী হলো হলুদ পাগড়ি। বুধনের মাথার চেয়ে বড়ো হয়ে গেছে পাগড়িটা। নীল আকাশ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। উঠোনে হৈচৈ, ব্যস্ততা। গাছে পাতার আড়ালে বসে পিঅই পাখিটা আবার ডাকলো। বাঁশি, বেহালা,

হারমোনিয়ামের সঙ্গে শুরু হয়েছে গান।

কাতি খোনা কুলিছুরিরে খিলো তেলাম রুপমাকান
দিন দিনতে দুলহর গড়ওলে হো ময়রি।

কুলিতে খেলাধুলোর সময়ে ছেলেবেলায় যে ভালোবাসা হয়, পরিণামে তা দুঃখ আনে।

গানের কথা, সুরে চাপা বিষাদ। বারবার শোনা যাচ্ছে গানের ধুয়ো, হো ময়রি। মুড়ি, গুড় মেখে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে ব্রজদা। বাড়ির বাইরে এসে নদীর দিকে এগিয়ে চললো কিশোর। কুলিমুড়ো শেষ হতে বাঁদিকের জঙ্গলে ফুটেছে আটাল ফুল। গন্ধ পেল কিশোর। জবাফুলের চেয়ে সামান্য ছোট লালরঙের এ ফুলে দারুণ সুবাস। মেয়েরা খোঁপা সাজায় আটাল ফুলে। ফুলের গোছা সাঁওতাল তরুণ উপহার দেয় প্রেমিকাকে। সামনে জঙ্গল। জঙ্গলের ডান পাশে সিধনদী। শীতের নদীতে জল কম। নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে ঝিরঝির স্রোত। জঙ্গলের বাঁদিকে কারা যেন কথা বলছে। কয়েকপা এগিয়ে কিষ্টোমাল, কাছেম আলিকে দেখতে পেল কিশোর। দু'একটা কথা কানে গেল তার। কিষ্টোর দুটো হেলে গরুর একটা ছ'মাস আগে মরে গেছে। নতুন একটা এখনও কিনতে পারেনি। চাযের মরশুম কী করবে, এ নিয়ে কিষ্টোর উদ্বেগ। তার উদ্বেগে সান্ত্বনা দেবার বদলে কাছেম বলছে, তার দুঃখের কাহিনী। কিশোর জানে, এখন দুঃখের গল্প বলার প্রতিযোগিতা চালাবে দু'জন। কাল হয়তো আবার এখানে বসেই কার কতো সুখ, সৌভাগ্য জানাবার প্রতিযোগিতায় মাতবে তারা। গাঁয়ের গরীব, বড়োলোক সকলেরই এই এক স্বভাব। সুখ, দুঃখে প্রত্যেকে একে অপরকে টেক্কা দিতে চায়।

কিষ্টোমাল বলছে, দেশে গাই বলদের বড়ো অভাব। চাঁদসুদাগরের রাজত্বি মোচরমানরা কেড়ে নেবার পরে বাবর রাজা খেয়ে ফেললো সব গরু, বাছুর। আট কুড়ি বছর পরেও সে অভাব মিটলো না। দুধেল গরু নেই, চাষের বলদ নেই, গরীব মানুষের হেনস্থার একশেষ। সাপের কামড়ে মরলো চাঁদ রাজের ছেলে লখাই রাজা। লখাই রাজা বেঁচে থাকলে একটা কাজের কাজ হতো।

কিষ্টোর মুখে দেশের ইতিহাস শুনছে কাছেম। চাযের হাল নেই তার। গরু নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। কিশোরকে দেখে চুপ করলো কিষ্টো। সিধ নদীর জল ছুঁয়ে উড়ে গেল একজোড়া চিতি পাখি। গানবাজনার আবছা শব্দ গাঁ থেকে ভেসে আসছে। কিশোর ভাবছে অন্যকথা। তিলাবুনিতে আজ মেয়েদের স্কোয়াড অ্যাকশন করবে। এতোক্ষণে নিশ্চয় হয়ে গেছে। সফল অ্যাকশনের পর স্কোয়াডের মেয়েরা যে যার ঘরে ফিরেছে। স্কোয়াড কম্যান্ডার ছিল নির্মলা। সাহসী, তেজী মেয়ে সে। সম্পর্কে বাঘার হিলি, বৌদি। বাঘার জ্যাঠতুতো দাদা ভানুচাঁদের বৌ নির্মলা। ভানুচাঁদ লটকনওলা। গাঁয়ে একটা ছোট মুদির দোকান আছে তার। শুরুতে পার্টিতে ছিল সে। একবছর হলো কুষ্ঠে ভুগছে। তার ডান হাতের আঙুলে ধরলো ব্যাধি। তখন থেকে বিগড়ে গেছে সে। লটকনের দোকানটা বাড়াবার জন্যে কর্পূরলাল মহাজনের টাকা পেতে সে এমন সব কাজ করছে, যা প্রতিবেশীদের

চোখে খারাপ লাগছে। তার সঙ্গে বেশ কয়েকবার এ নিয়ে নির্মলার ধুন্দুমার ঝগড়া হয়েছে। ভানুচাঁদের হাতের ক্ষতে আগে রোজ ভিলাবীজের তেল গরম করে লাগিয়ে দিত নির্মলা। এখন দেয় না। কর্পূরলালের সঙ্গে ভানুচাঁদ ষড় করছে জেনেও তার ঘরে আজও কিশোর যায়। সে জানে ভানুচাঁদ সরে গেলেও পার্টির পাশে নির্মলা থাকবে। ভানুচাঁদও হয়তো আবার ফিরে আসবে পার্টিতে। নির্মলারও কোনো নাম ছিল না আগে। ভানুচাঁদের মায়জু, বৌ, এই ছিল তার পরিচয়। নির্মলা নামকরণের পর কিশোরকে ভানুচাঁদ প্রশ্ন করেছিল, ইটার মতলব কী ?

স্বামী, স্ত্রীকে কিশোর শুনিয়েছিল অন্ধ্রের বীরাঙ্গনা, শহিদ নির্মলা কৃষ্ণমূর্তির কাহিনী। নির্মলার স্বামী ছিল পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি। পঞ্চাদ্রিও শহিদ হয়েছে। তাদের পিতৃমাতৃহীন চার ছেলেমেয়ে গরীব প্রতিবেশী কৃষকদের ঘরে বড়ো হচ্ছে।

পঞ্চাদ্রি, নির্মলার কাহিনী শুনে জলে ভরে গিয়েছিল তিলাবুনির এক গরীব সাঁওতালবধূর চোখ। ভানুচাঁদও বিষণ্ণ হয়েছিল। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তিলাবুনিতে জন্ম নিয়েছিল আদিবাসী নতুন নির্মলা। ভানুচাঁদও সেই থেকে বৌকে নির্মলা বলে ডাকতো। নাম পেয়ে পার্টির কাজে আরও মেতে উঠলো নির্মলা। বদলে গেল তার দৃষ্টি। এখন তার চোখের মণিতে সবসময়ে ঝকমক করে আলো। এই এলাকায় এমন বুদ্ধিমতী, চটপটে মেয়ে দ্বিতীয় দেখেনি কিশোর। রাজনীতি, কথা, আলোচনা সে যেমন তাড়াতাড়ি বোঝে, তেমনই পাঁচজন মেয়ের সামনে সহজ ভাষায় রাখতে পারে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মহিলাসংগঠকের ভূমিকা পালন করতে চেয়েছিল নির্মলা। ইচ্ছে থাকলেও সাহস পায়নি কিশোর। রক্ষণশীল আদিবাসী সমাজ ঘরের বধূকে এভাবে পাড়া বেড়াতে দেখলে হয়তো অখুশি হবে। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হলেও মেনে নিতে পারবে না। বিশেষ করে বৌ, মেয়েরা চটবে। পার্টির সুনাম নষ্ট হতে পারে।

চার মাস আগে রবির বাড়িতে বসে তৈরী হয়েছে মেয়েদের স্কোয়াড্। তিনজন মেয়ে ছিল সেখানে। সকলেই গাঁয়ের বাসিন্দা। তিলাবুনি থেকে তাঁতলুইতে নির্মলা সভা করতে যাওয়ায়, রবির বৌ পুঁইশা এমন চটেছিল, যে, সে সভায় বসেনি। নির্মলা চলে যাবার পরে রবির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেছিল পুঁইশা। নির্মলাকে দেখে ভয় পেয়েছিল সে। রবিকে বলেছিল, উর দুচোখে তুক আছে। উ ডান বটেক।

পুঁইশার ভয় পাবার কারণ ছিল। নির্মলার শরীরের গঠন, গায়ের রঙ, নাক, চোখে অস্ট্রিক উপাদানের চেয়ে বেশী আছে মঙ্গোলিয় ধাঁচ। সামান্য আর্যরক্তও বোধহয় মিশেছে। ফলে, পাঁচজন সাঁওতাল মেয়ের মতো সাদামাঠা নয় তার লাবণ্য। বরং তাদের তুলনায় রূপবতী বলা যায় নির্মলাকে। তার উদ্যোগেই তৈরী হলো স্কোয়াড। অ্যাকশনের কর্মসূচী নেওয়া হলো।

দুটো অ্যাকশনে পুরুষদের স্কোয়াডের সঙ্গী হয়েছিল নির্মলা। বিলকান্দির মহেশ মণ্ডলের বাড়িতে অ্যাকশন দেখে উত্তেজনায় ফুটছিল সে। সিধু নদীর জলের

দিকে তাকিয়ে ঘটনাটা কিশোরের মনে পড়লো। তখনও অন্ধকার হয়নি। মাটির উঁচু পাঁচিলে ঘেরা মহেশের দোতলা পাকা বাড়ি। পাঁচিল টপকে নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকেছিল পাঁচজনের স্কোয়াড। কেউ একজন বন্ধ সদর দরজা খুলে দিয়েছিল। শান বাঁধানো চাতালে দাঁড়িয়েছিল মহেশের বৌ। পিলপিল করে উঠোনে লোক ঢুকতে দেখে একটুও ভয় পেল না সে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। ছিপছিপে শরীর, মাজা শ্যামলা রঙ, কপালে সিঁদুরের বড়ো টিপ, বছর চল্লিশ বয়স! মহেশের দ্বিতীয় পক্ষের এ বউ সিউড়ি শহরের মেয়ে। ঘন ঘন স্লোগান চলেছে উঠোনে। আবছা অন্ধকারে একতলার ঘরগুলোতে মহেশের খোঁজ করছে গেরিলা স্কোয়াড। মহেশ নেই। গলায় কর্তৃত্ব ফুটিয়ে মহেশের বৌ বলল, শুনেছি, তোমাদের সঙ্গে কলেজে পড়া, শহরের দু'একজন ছেলে আছে। তারা কই ? তাদের সঙ্গে কথা বলবো আমি।

মহিলার কথার ভঙ্গিতে থমকে গেল ভিড়।

কোথায় তারা ? মহেশের বৌ আবার একই প্রশ্ন করতে ঝকঝকে খোলা ছুরি হাতে চাতালে লাফিয়ে উঠলো নির্মলা। তার মুখ দেখে ভয় পেল মহেশের স্ত্রী। সে কিছু বলার আগেই বাঁ হাতে তার চুলের মুঠি ধরে বুকে ছুরি ঠেকিয়ে নির্মলা প্রশ্ন করেছিল, আমাদের পছন্দ হচ্ছে না ক্যানে ? শহরের ছেলে চাই ?

উঠোনের কোনে একটা বন্ধ ঘরে গেরিলা স্কোয়াড তখন পেয়ে গেছে মহেশকে। কপাট ভাঙতে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে এলোপাথারি গুঁতো মারছে। ভেঙে গেল কপাট।

শুধু কিশোর কেন, তিলাবুনির কমবয়সী ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই জানে নির্মলা ভালোবাসে বাঘাকে। আড়ালে আবডালে দুজনের দুলহার চলছে।

নির্মলা বেপরোয়া। মহাজনের পা চাটা, সুদখোর ভানুচাঁদের ঘর করতে আর একদিনও সে রাজি নয়। এখনই সাঙ্গা করতে চায় বাঘাকে। লড়াই-এর তাপ যতো বাড়ছে, বাঘার প্রতি ততো ঘন হচ্ছে তার দুলহার, প্রেম। এই ত্রিকোণ সম্পর্ক নিয়ে গাঁয়ে তৈরি হয়েছে এক জট। বাঘা, নির্মলাকে সমর্থন করছে অনেকে। সমালোচনা, কাটা কাটা মন্তব্য শোনাচ্ছে কেউ কেউ। সমস্যার সুরাহা করতে অজিতের পরামর্শ চেয়েছিল কিশোর। এক মুহূর্ত না ভেবে অজিত বলল, বাঘার সঙ্গে নির্মলার বিয়ে দিয়ে দে।

সহজে কথাটা বলে দিলেও কাজটা যে কতো কঠিন, অজিত জানে। তবু বলেছিল। কোনো বিষয়ে খতিয়ে ভাবার তাগিদও এখন তার নেই।

কিষ্টো, কাছেম জঙ্গল ছেড়ে একটু আগে বেরিয়ে গেছে। শালবনের ছায়ায় শুয়ে সিধনদীর ফিনফিনে স্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। চিন্তার শেষ নেই। এলাকায় শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক প্রচার। গোপনে, নিঃশব্দে চলছে এ কাজ। প্রচার হচ্ছে, গরীব কৃষকের বিপ্লবী যুদ্ধ হলো আসলে হিন্দু বাঙালীদের উৎখাত করতে আদিবাসীদের ষড়যন্ত্র। বিহারী হিন্দুরাও রেহাই পাবে না। দু'-

চারজন ধনী সাঁওতালকে নমুনা খাড়া করেছে রটনাকারীরা। পয়সাওলা সেই মানুষগুলোর গায়ে কেন হাত পড়েনি, কেন নিজেদের বন্দুক জড়িয়ে রাতে দিব্যি ঘুমোচ্ছে তারা, এরকম প্রশ্ন ছড়াচ্ছে প্রতিরোধবাহিনী।

খবর নিয়ে এসেছিল মোতি। রাজনগর, তাঁতিপাড়ার প্রতিবেশী গ্রামগুলোতে জোতদারদের নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে প্রতিরোধবাহিনী। রোজ বাড়ছে তাদের শক্তি। প্রচার জোরদার হচ্ছে। পার্টি ছেড়ে দু'একজন যোগ দিয়েছে প্রতিরোধবাহিনীতে। নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে কিছু পার্টিকর্মী। জাতপাতের এই প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আদিবাসী জোতদার গুণীন মর্মুর বাড়িতে অ্যাক্‌শনের পরিকল্পনা নিল পার্টি। মুর্মুকে প্রাণে না মেরে তার বন্দুক দখল করার সিদ্ধান্ত হলো।

পনেরো দিন আগে পার্টিসভার চব্বিশ ঘণ্টা পরে গুণীনের খামারে ঢুকলো গেরিলা স্কোয়াড। তখন ভরদুপুর। খামারে কাজ করছিল কিছু মানুষ। তেপায়া বাঁশের ঝোলানো দাঁড়িপাল্লায় মাপা হচ্ছিল বস্তাবোঝাই ধান। সুর করে হিসেব বলেছিল এক মজুর। ঠিল মেঝেন সতেরো, ঠিল মেঝেন আঠারো।

কাঠের পাল্লার মাথায় লালমাটির ঢেরা পড়ছিল। বস্তা ভরছিল দুই মজুর। গুণীন মুর্মু সম্পন্ন চাষী হলেও পার্টির বিরোধিতা কখনও করেনি। অ্যাক্‌শন করার আগে এক সভায় অজিত বলল, শুধু বন্দুক দখলে লাভ নেই। গণফৌজ গড়তে হবে। আমাদের জিম্মায় এখন দু'শো বন্দুক আছে। অকেজো পড়ে থেকে জং ধরে যাচ্ছে। ঠিকঠাক রাখার জায়গা নেই। নতুন বন্দুক রাখবো কোথায় ?

অজিতের গলায় ছিল চাপা ক্ষোভ। লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। স্কোয়াডের সকলের দিকে একপলক তাকিয়ে সে বলল, তাছাড়া গুণীন আমাদের বন্ধু। নিন্দুকদের প্রচারের চাপে এ অ্যাকশন করতে হচ্ছে আমাদের। তবু আর একবার ভেবে দেখা উচিত। আমার ধারণা, গুণীনের ওপর চড়াও হয়ে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা প্রমাণ করা যাবে না।

এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলেছিল, আমার বিশ্বাস একবার চাইলেই বন্দুকটা দিয়ে দেবে গুণীন। হামলা করলে বেঁকে বসবে সে। শত্রুতা করবে।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে অজিত বলেছিল, স্কোয়াড অনুমতি দিলে গুণীনের কাছ থেকে বন্দুকটা নিয়ে আসতে পারি আমি।

অ্যাকশনের জন্যে স্কোয়াড তখন তৈরী। অজিতের প্রস্তাবে মুখচাওয়াচায়ি করছে সবাই। মোতির মুখ ভার। অজিতের কথায় সে ক্ষুব্ধ। অজিত বলল, আমাকে দু'বছর সময় দিলে, এলাকার সমস্ত গরীব মানুষের চিন্তা, চেতনা লাল করে দেবো আমি। এতো অ্যাকশনের দরকার হবে না।

ক্ষোভ চেপে হালকা গলায় মোতি বলেছিল, তুমি নিজেই সাঁওতাল হয়ে গ্যাছো অজিতদা।

পুরোপুরি হতে পারলাম কই ?

অজিতের ঠাট্টায় মোতি বলল, কিন্তু যাদের বদলাতে এসেছো, তাদের কতোটা

বদল হলো ?

মোতির প্রশ্নে হেসেছিল অজিত। মুখভর্তি দাড়িগোঁফের মধ্যে ঝকঝক করছিল তার দুচোখের মণি। মোতির কানের পাশে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় সে বলল, পার্টি লাইন ভুল।

গলা নামালেও তার কথা শুনতে পেল সবাই। ফ্যাকাসে হলো মোতির মুখ। কথা বাড়ালো না সে।

সে দুপুরে কথার নেশায় পেয়েছিল অজিতকে। অজিত বলল, কাজ করার যে নক্সা মাথায় নিয়ে এখানে এসেছিলাম, সে নক্সায় কাজ করতে পারছি না। রবি, বুধন, বাঘার মতো কমরেড পেয়েও কাজের নতুন ছক তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি তাদের। আমাদের শহুরে নক্সা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। বিষয়টা ঠিক বোঝাতে পারছি না। কিন্তু আমি বুঝেছি। কাজ করার একটা আলাদা ধারা পেয়েছি আমি। সেভাবেই কাজ করছি। শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনীতির তত্ত্ব নিয়ে গরীবমানুষের মধ্যে খুব বেশিদিন টিঁকে থাকা যাবে না। শুধু গরীব মানুষ কেন, কোনো সমাজেই হালে পানি মিলবে না। আরও কিছু চাই। সেটা কী ? জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি, যে, রাজনীতির সঙ্গে একজন মানুষের গোটা পরিচয়, অস্তিত্ব জানতে হবে। পার্টির জন্যে একজন মানুষের যতোটা জানা দরকার, তার চেয়ে মানুষ অনেক বড়ো।

অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আঁচ করতে চাইছিল কিশোর। মোতিও দেখছিল অজিতকে। কিশোরকে মৃদু হেসে অজিত বলল, সকালে সামান্য হাঁড়িয়া খেলেও, আমার কথাগুলো কিন্তু নেশার কথা নয়। সেরকম ভাবলে দুঃখ পাবো।

কিশোরের মনে হলো, মোতির কথা ঠিক। সাঁওতাল হয়ে গেছে অজিত। স্বাভাবিক অবস্থায় বিশেষ কথা বলে না। পেটে হাঁড়িয়া পড়লে সাঁওতাল সুলভ ইঙ্গিতময় কথাবার্তা বলে। জীবন, রাজনীতি একাকার হয় তখন। বোঝা যায়, রাজনীতির নতুন আদল দিচ্ছে সে।

গুণীন মুর্মুর খামার থেকে ভেসে আসছিল ধান মাপার একঘেয়ে সুর, আন মেঝেন মিতেসি, ঠিল মেঝেন মিতেসি।

স্কোয়াড সদস্যরা শুনতে পাচ্ছিল সে সুর। পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসেছিল স্কোয়াড কম্যাণ্ডার বাঘা। কাছাকাছি কোনো গ্রাম থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে কান খাড়া করল সবাই। পরপর তিন চার রাউণ্ড গুলি চলার পর নিস্তব্ধ হলো চারপাশ। কিশোরের দিকে তাকালো অজিত। মোতি বলেছিল, এলাকায় পুলিশ ঢুকেছে।

কোথায় গুলি চললো, অনুমান করতে চাইছিল কিশোর। দু মিনিটের আলোচনায় গুণীন মুর্মুর বন্দুক দখলের কর্মসূচি সেদিনের মতো বাতিল হলো।

সিধ নদীর জলে ছড়িয়ে আছে দুপুরের রোদ। ঘুমে বুজে আসছে কিশোরের

চোখ। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো সে। এখন ফুল ফোটার মরশুম। শালবনের তলায় লতানো ঝোপে ফুটে আছে অগুনতি সাকমবাহা। কড়া, মিষ্টি গন্ধ। শালগাছের ডাল জড়িয়ে ঝুলে আছে ফুলে ভরা সাকমবাহা লতা। মেয়ে তরফের তিন, চারজন তরুণ অল্পদূরে আড্ডা মারছে। তারা না দেখলেও তাদের হাসি, কথা শুনতে পাচ্ছে কিশোর। কেউ একজন ফুঁ দিল বাঁশিতে।

জ্বালানি কাঠ কুড়োতে এখন জঙ্গলে আসে মেয়েরা। প্রথমে তিনজন, তারপর আরও দু'জন মেয়ে কিশোরের পাশ দিয়ে চলে গেল। এ গাঁয়ে কিশোর চেনা। পাঁচ তরুণীকে দেখে আড্ডায় হৈচৈ বেড়ে গেছে। তীক্ষ্ণ হয়েছে বাঁশির সুর। মেয়েদের কাউকে এক তরুণ বলল, পেড়াহয় হিজুমে মিতঘারি আলেঠে দুড়ুপমে। আমাদের সঙ্গে একটু বসে যান কুটুম।

অনুরোধ শুনে এক মেয়ে চাপা গলায় সখীদের কিছু বলল। খিলখিল করে পাঁচজন হাসছে। বিয়েবাড়িতে গান, বাজনার বিরাম নেই। আসর একবার বসলে সহজে ভাঙে না। অনুষ্ঠান চুকতে হয়তো কাবার হয়ে যাবে রাত। দশ, বারো ঘণ্টা একটানা নেচে, গেয়ে তরুণ-তরুণীরা ক্লান্ত হয় না। আনন্দের শেষ বিন্দু পর্যন্ত চেটে নেয়। কাল যে দিনটা আসবে, তা অনিশ্চিত। কানাকড়ি দাম নেই। আজই সত্য, শেষ কথা।

ঘাস, পাতায় কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শুনে সজাগ হলো কিশোর। এক ঝলক হাওয়ার মতো তার সামনে এসে দাঁড়ালো তিনটি মেয়ে। সকলের সামনে নির্মলা। পেছনে মেঘনা, আন্না। বিচলিত নির্মলার মুখ। কিশোরকে দেখে নির্মলা ডুকরে কেঁদে উঠলো। কিশোর অবাক। কী হয়েছে, বুঝতে পারলো না। সে প্রশ্ন করার আগে কান্না ভেজা গলায় নির্মলা বলল, আমার মরদ বেইমানী করেছে। উর সাথে আমি আর ঘর করবেক না।

নির্মলা ফোঁপাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না। মেঘনার কথা শুনে কিশোর বুঝতে পারলো, কী ঘটেছে। সকাল দশটায় লটকনওলা কর্পূরলালের দোকানে অ্যাকশন্ করতে গিয়েছিল পাঁচ মেয়ে সদস্যের গেরিলা স্কোয়াড। দশ মিনিট আগে দোকানে ছিল কর্পূরলাল। স্কোয়াড গিয়ে দেখলো, দোকান ফাঁকা। কর্পূরলালের বদলে পাল্লা নিয়ে বসে আছে তার চাকর। দোকানের পেছনে দুটো ঘর খুঁজেও কর্পূরলালকে পাওয়া গেল না। রাস্তায় এসে নির্মলা দেখলো, ভানুচাঁদ দাঁড়িয়ে আছে। এক মুহূর্তে সে বুঝে গেল, খবর পেয়ে কর্পূরলাল পালিয়েছে। তাকে খবর দিয়েছে ভানুচাঁদ। হেঁসো হাতে নির্মলা কাটতে গিয়েছিল ভানুচাঁদকে। সঙ্গিনীরা নির্মলাকে ঠেকিয়েছিল। মাঠের ওপর দিয়ে দৌড় মেরেছিল ভানুচাঁদ।

খোঁপা ভেঙে কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে নির্মলার পিঠে। তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছে সে। বাঘা এসে দাঁড়াতে খোঁপা বেঁধে নিল নির্মলা। বুধনের তিলকচুরির অনুষ্ঠানে পার্টি কর্মীদের ভোজ খেতে ডাকা হয়েছে আজ। বুধনের আত্মীয়-কুটুমরা বেশীরভাগ আসবে পাঁচ দিন পরে। সেদিন বুধনের বিয়ে। শালবন ছেড়ে বুধনদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পাঁচজন। বাইরের দাওয়ায় অসাড়ে

ঘুমোচ্ছে অজিত। বাঘার ডাক শুনে ধড়ফড় করে উঠে বসলো সে। হলুদ পাগড়ি মাথায় বাড়ির উঠোনে স্থির হয়ে বসে আছে বুধন। তার চোখে লাজুক দৃষ্টি। লম্বা টুকরো সুতোয় পরপর পাঁচটা গিঁট বাধছে বুধনের মা। এই সুতোর নাম লবণ। সুতোর টুকরোগুলো যাবে আত্মীয়, কুটুমদের ঘরে। বিয়ের আমন্ত্রণের চিঠি এ সুতো। গিঁট গুনে ঠিক দিনে বিয়েবাড়িতে এসে যাবে সবাই। বুধনের বাবা খেতে ডাকলো অতিথিদের। শালপাতা পেতে উঠোনে বসলো সকলে। খিদে না থাকায় অজিত বসলো না। তাকে চোখের ইসারায় লালমুনি ডেকেছে, কিশোরের নজর এড়ায়নি। উঠোন ছেড়ে অজিত চলে যাবার এক, দু'মিনিট পরে বেরিয়ে গেল লালমুনি। কিশোরের সামনে শালপাতার ওপর শুয়োরের মাংস মেশানো গরম খিচুড়ি। ধোঁয়া উড়ছে সকলের পাতা থেকে।

খেতে খেতে ব্রজদা বলল, রাতে আর একবার আলোচনায় বসবো। একমত হওয়া দরকার। এখান থেকে ফারাক্কায় পৌঁছে রিজিওনাল কমিটিকে রিপোর্ট করতে হবে।

তেত্রিশ

মণীন্দ্র ঘোষালের মৃত্যুর দেড় বছর পরে তার অফিসে একটা চাকরি পেল তপতী। চাকরি পেতে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে বিশু। বিশুর দল এখন ক্ষমতায় আছে। বিশুর নেতা হয়েছে রাজ্যের এক মন্ত্রী। গত এক, দেড় বছরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে বিশু। বদলে গেছে তার চাল-চলন, চেহারা। দুটো রুটে তার বাস চলে। মিনিবাসের পারমিটও তার হাতের মুঠোয়। নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি কিনবে। এক গা গয়না, দামি শাড়ি পরে মাঝে মাঝে বাপের বাড়িতে আলো বেড়াতে আসে। খুব সুন্দরী দেখায় তাকে। দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রঙ। তরমুজের ফালির মতো টসটসে লাল ঠোঁট।

কাল জামাইষষ্ঠী। বিশুকে ষষ্ঠীর নেমন্তন্ন করেছে রেবার মা। চব্বিশঘণ্টা আগেই মায়ের কাছে চলে এসেছে আলো। রাতে মাকে ঘিরে গল্প করছিল মেয়েরা। মূল বক্তা আলো। সবাই শুনছে তার কথা। এ সংসারে হঠাৎ বেড়ে গেছে তার গুরুত্ব। আলো বলল, এ বছর বি কম পরীক্ষা দেবে বিশু।

মা খুশি হয়ে বলল, ভালো খবর। মন দিয়ে লেখাপড়া যেন করে। তুইও বলবি।

আলো বলল, পড়ার সময় কোথায় ? সারাদিন কতো লোক, কতো ধান্দায় যে বিরক্ত করে ওকে। নাওয়া, খাওয়ার সময় পায়না।

স্বামীর গুণপনার কথা অবাধে বলে যাচ্ছে আলো। উজ্জ্বল তার মুখ। রেবা ভাবছে, কীভাবে বি. কম পরীক্ষা দেবে বিশু ? স্কুলের গণ্ডি কবে পেরোলো সে ?

ছোট বোনকে এ প্রশ্ন করা যায় না। চুপ করে থাকলো রেবা। কুলুঙ্গিতে রাখা হ্যারিকেনের ফিকে আলো ঘরে ছড়িয়ে আছে। শাড়িতে পিঠ দেখে বসে ছিল আলো। শাড়ি সরে গেছে। তখনই রেবা দেখলো বিনুনির ঠিক নিচে আলোর পিঠের উপর দগদগে কালশিটে রেখা কীভাবে হলো ? প্রশ্নটা মুখে এলেও গিলে নিল রেবা। আলোর কথা ভেবে বিষণ্ণ হলো সে। বৌকে ভালোরকম শাসনে রেখেছে বিশু। রাখতেই পারে। বিশু এখন তালেবর লোক। পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে এ বছর পাড়ায় কালীপুজো করেছে সে। সর্বজনীন পুজো। লোকে বলে, বিশুর পুজো। জাঁকজমক, আলোয় তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশু। পুজো চলেছে বারো-দিন। উদ্বোধন করতে দিল্লী থেকে এক মন্ত্রী এসেছিল। তারপর বারো দিন ধরে রোজই নামী, দামী কেউ একজন মণ্ডপে এসেছে। লোকসভা সদস্য, রাজ্যের

মন্ত্রী, নামী লেখক, হিন্দী ছবির অভিনেতা, সকলেই উঁচুদরের লোক। কালীপুজো করে বিশুর জনপ্রিয়তা এমন বেড়েছে যে, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, আগামী নির্বাচনে এম এল এর মনোনয়ন পাবে সে।

বিশুর সমৃদ্ধির কাহিনী শোনাচ্ছে আলো। তার ঘাড়ের তলায় কালসিটের ওপর ঘুরে ফিরে চলে যাচ্ছে রেবার চোখ। হাসতে হাসতে আলো বলল, পাড়ার অল্পবয়সী ছেলেদের তাদের মা-বাবারা এখন বিশুর মতো হতে বলে। এটা কম কথা নয়।

মিথ্যে বলছে না আলো। চোখের সামনে সব কিছু তাড়াতাড়ি বদলে যেতে দেখছে রেবা। দেখে সে বিপন্ন হয়। অসহায় বোধ করে। সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। গণপতির মুখে রেবা শুনেছে, তাদের দলের অনেক কর্মীকে বিশু এবং তার দলবল খুন করেছে। এখনও করছে। উগ্রপন্থী দমনে সরকারি উদ্যোগে যে প্রতিরোধবাহিনী গড়ে উঠেছে, তার নেতা বিশু। রাজ্যপুলিশের আই. জির সঙ্গে তার বৈঠকের খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। স্থানীয় থানার অফিসাররা সমীহ করে বিশুকে।

আজকাল, সারাক্ষণ রেবার বুক ভয়ে এমন কাঁপে, যে বাড়ি থেকে বেরোতে চায় না সে। কিশোর হঠাৎ এখানে এসে গেলে কী হবে? বিশু, তার দলের কোনো ছেলের সামনে কিশোর যদি পড়ে যায়? দুশ্চিন্তায় ঝিমঝিম করে তার মাথা। মাস দুই, তিন আগে হাতের কাছে গোরাকে পেয়ে আতঙ্কিত রেবা একদিন বলেছিল, একটু নজর রেখো। কিশোরদা যদি হঠাৎ এখানে এসে যায়।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গোরা বলেছিল, তুমি ঘাবড়াইও না। কিশোরের কোনো ক্ষতি হলে হালার পো হালাদের বাপের নাম ভুলায়ে দিমু আমি।

গোরার বীরত্বের বড়াই শুনে আশ্বস্ত হয়নি রেবা। গোরা তখনও থামেনি। শরীরচর্চা সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছিল। আধখানা শুনে ঘরে চলে গিয়েছিল রেবা। কিশোরের পিসিকেও সে সতর্ক করে দিয়েছিল। ভীত পিসি প্রশ্ন করেছিল, দেশটা কি গুন্ডা, বদমাশদের হাতে চলে গেল?

পিসির প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারেনি রেবা। জবাব দেবার কিছু ছিল না। তার মনে পড়েছিল গণপতির কথা। একমাস আগে শেষ ঐ বাড়িতে এসেছিল গণপতি। তখন ভোররাত। আলো ফোটেনি। চারপাশে পাতলা অন্ধকার। নর্দমার পাশে বসে চেঁচাচ্ছে একদল কাক। বন্ধ জানলায় টোকার শব্দ শুনে চমকে জেগে উঠেছিল রেবা। প্রথমে ভাবলো, কিশোর এসেছে। ধড়ফড় করছে বুক। তপতীও জেগেছিল। জানলার পাল্লা খুলে বাইরে নজর ফেলে ফিসফিস করে সে বলল, গণপতি।

নিঃশব্দে দরজা খুলে রেবা বাইরে এসে দাঁড়াতে চাপা গলায় গণপতি ডুকরে উঠলো, পরশু রাতে ধরা পড়ে গেছে পুণ্যদা। কোথায় তাকে রাখা হয়েছে হদিশ মিলছে না।

গণপতির আলুথালু চেহারা, জটপাকানো চুল, লালচে চোখ দেখে রেবার মনে

হয়েছিল, সে যেন শ্মশান থেকে আসছে।

রেবাদের দুটো ঘর পাশে থাকে পাঁউরুটিওলা সনাতন। ভোররাতে রোজ উঠতে হয় তাকে। সনাতন কানে খাটো, কম শোনে। গনপতির গলা শুনে সে প্রশ্ন করেছিল, কে আবার মারা গেল ?

তার প্রশ্নের জবাব দিল না রেবা। পুণ্যদার ধরা পড়ার খবরে গলা শুকিয়ে গছে তার। গণপতিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে এলো। গণপতি বলল, পার্টির কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে প্রিয়নাথবাবু। কেন গেল ? প্রিয়নাথবাবু রুশপন্থী। তাকে সন্দেহ করছি আমরা। কিন্তু পুণ্যদার কোনো হদিশ নেই। পুলিশের সদরদপ্তরেও পার্টি সূত্রে খোঁজ করা হয়েছে। খোঁজ মেলেনি। পুণ্যদাকে গ্রেপ্তার করার প্রশ্নে পুলিশ চুপচাপ। হ্যাঁ, না, কিছু বলছে না।

গণপতির মুখে, চোখে ছড়িয়ে ছিল বিপন্নতা। চাপা গলায় স্বগতোক্তি করছিল সে, আমার কী দোষ ? পুণ্যদাকে শুধু পেঁৗছে দিয়েছিলাম আমি। অথচ আমিও সন্দেহভাজন।

গণপতিকে দেখে কষ্ট হলো রেবার। গণপতি আবার বলল, আমি এখন কী করব ? কী করার আছে আমার ?

গণপতির কথার মধ্যেই রেবা শুনলো, ঘরের বাইরে দুজোড়া পায়ের মৃদু শব্দ। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কারা যেন কথা শুনছে। কান খাড়া করে শব্দটা আবার শুনতে চাইল সে। নাহ্, মনের ভুল। গণপতিকে সান্ত্বনা দিতে রেবা বলল, জেল থেকে নিশ্চয় সব খবর পুণ্যদা জানাবেন।

দু'হাতে মাথা রেখে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে গণপতি বলল, আজই গ্রামে চলে যাবো আমি। কিশোরের এলাকাতেই হয়তো যাবো। যাবে আমার সঙ্গে ?

গম্ভীর হলো রেবা। এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে সে বলল, পার্টির অনুমতি না নিয়ে আপনি, আমি, কেউই গ্রামে যেতে পারি না। তাছাড়া যে এলাকায় যাবো, পার্টির নির্দেশ ছাড়া তারা কেন জায়গা দেবে আমাদের ?

রেবার কথা যে ঠিক, বুঝতে পেরেছিল গণপতি। নিরাশ্রয়, সন্ত্রস্ত গণপতিকে বুড়োটে দেখাচ্ছিল। তার জন্যে চা বানাবার কথা ভেবে রেবা উঠে দাঁড়াবার মুহূর্তে ভেজানো দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল ঝাঁকড়া চুল একটা মুখ। গণপতিকে সে বলল, তোমাকে যে একবার বাইরে আসতে হবে গুরু।

ছেলেটার চেহারা, গলার স্বর শুনে ধক করে উঠলো গণপতির বুক। পুরো খুলে গেছে ঘরের দরজা। ঝাঁকড়া চুলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল আরও দু'জন চোয়াড়ে চেহারার ছেলে। তিনজনই বিশুর চেলা। তাদের আগে দেখেছে রেবা। ঝাঁকড়া চুল ছেলেটার নাম পাঁইয়া লছমন। পাঞ্জাবী নয় লছমন। তার নামও লছমন নয়। ঝাঁকড়া চুলের জন্যে বাঙালী লক্ষ্মণ হয়েছে পাঁইয়া লছমন। অন্য দুজনের একজনকে আগে অনেকবার দেখলেও তৃতীয়জনকে রেবার অচেনা লাগলো। চৌকো চোয়াল, বাঁ ভুরুর ওপর কাটা দাগ মিশমিশে কালো রঙ, ছেলেটাকে পাকা

খুনীর মতো দেখাচ্ছিল।

সবে সকাল হয়েছে। ভোরের আলো বস্তিতে তখনও পৌঁছোয়নি। দরজা আগলে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে তিন মূর্তি। গণপতিকে পাঁইয়া লছমন আবার ডাকতে রেবা বলল, যা বলার ভেতরে এসে বলুন।

চৌকো চোয়াল সামনে এসে গণপতিকে বলল, বাইরে এসো।

চৌকো চোয়ালের দিকে তাকালো গণপতি। রেবা দেখলো উদ্বেগ, ভয় মুছে গণপতির মুখ, ধীর, শান্ত হয়েছে।

চৌকো মুখকে করুণ গলায় রেবা বলল, ভেতরে আসুন। চা বানাচ্ছি।

চৌকো মুখ রেবাকে একটা নোংরা গাল দিতে বিকট চিৎকার তুলে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো গণপতি। ভয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল তিন মূর্তি। রেবা দেখলো গণপতির হাতে কুচকুচে কালো একটা রিভলভর। আশপাশের ঘর ছেড়ে কিছু মানুষ বেরিয়ে এসেছিল। রেবাদের ঘরের দুপাশে জটলা করছিল তারা। বাঁ দিকের জটলায় শরীরে জপজপে তেল, মুগুর হাতে দাঁড়িয়ে ছিল গোরা। গণপতির হাতে অস্ত্রটা দেখে থেমে গেছে সব গুঞ্জন। রিভলভরের তিন ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চৌকো চোয়াল। ভাবলেশহীন তার মুখ। জটলা থেকে বেরিয়ে এসে চৌকো চোয়ালের মাথায় হঠাৎ মুগুর বসিয়ে দিল গোরা। আবছা আওয়াজ করে কাটা গাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। গলগল করে রক্ত উপচে পড়ছে তার মুখ থেকে। সঙ্গীকে নিয়ে দৌড় মারলো পাঁইয়া লছমন। বেহুঁশ চৌকো চেয়াল পড়ে থাকলো।

চোখের পলকে ঘটনাটা ঘটে যেতে, কী করবে ভেবে পেল না গণপতি। মুগুর হাতে গোরাও হতভম্ব। আহত লোকটাকে অবাক হয়ে দেখেছে সে। রেবার মুখ ফ্যাকাসে। দু'চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। সে তাতিয়ে রেখেছিল গোরাকে। অপরাধবোধে পায়ের তলার মাটি কাঁপছিল তার। ফিসফিস করে গণপতি বলেছিল, গোরাকে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছায়া সিনেমার সামনে চলে এসো। আমি যাচ্ছি।

সারা বস্তি জেগে উঠেছিল। আতঙ্কে সকলের মুখ রক্তহীন, বিবর্ণ। পুলিশ, বিশুর দলের তাণ্ডব শুরু হতে যে দেরী নেই, টের পেয়েছিল তারা। চৌকো চোয়াল মাটিতে পড়ে আছে। সে বেঁচে আছে, না মরে গেছে, বুঝতে পারলো না গণপতি। জটলার মধ্যে দু'টো চেনা মুখ দেখে তাদের গণপতি বলেছিল, একবার হাসপাতালে নিয়ে যান একে।

কথা শেষ করে ঝড়ের মতো বস্তি ছেড়ে চেলে গেল সে। তখনও রাস্তা জন-বিরল। পাঁউরুটির ভ্যান, দুধের গাড়ি, খবরের কাগজওলার সাইকেল ছাড়া পথে বিশেষ যানবাহন ছিল না। বস্তির বাসিন্দারা ভয় পেয়েছিল। বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছিল অসুস্থ মা। মা, ভাইবোনদের সাহস দিচ্ছিল তপতী। গোরাকে নিয়ে তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল রেবা। অলিগলি দিয়ে ছায়া সিনেমার সামনে এসে সে দেখলো, গণপতি দাঁড়িয়ে আছে। রেবার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে গণপতি বলল, বাড়ির বাইরে কিছুদিন থাকতে হবে গোরাকে।

কোথায় থাকবে ?

রেবার প্রশ্নে গণপতি বলল, কোনো আত্মীয়র বাড়ি। সে মুহূর্তে রেবার মনে পড়লো কিশোরের বাড়ির কথা। কিশোরের বাবা গোরার মামা। মামাবাড়িতে পাঁচ, সাতদিন গোরা থাকতে পারে। গণপতি বলল, কিছুদিন তোমারও বাড়িতে না থাকা ভালো। আমার খোঁজে তোমার ওপর ওপর হামলা করতে পারে। পুলিশও ছাড়বে না তোমাকে।

অস্থির চোখে চারপাশ দেখছিল গণপতি। রাস্তায় বাড়ছে মানুষ, গাড়ি। গণপতি বলল, প্রভাদির বাড়িতে পাঁচ, সাতদিন থাকো। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

কথা শেষ করে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়লো গণপতি।

এসব একমাস আগের ঘটনা। এই একমাসের মধ্যে প্রথম সাতদিন গণপতি যা আশংকা করেছিল, তাই ঘটেছে। বস্তি এবং পাড়ায় দলবল নিয়ে প্রচণ্ড জুলুম চালিয়েছে বিশু। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে পুলিশ। চব্বিশ ঘণ্টা বেহুঁশ থাকার পর চোকো চোয়ালের জ্ঞান ফিরলেও স্মৃতি লোপ পেয়েছে তার। জুলুম কমলেও বাড়ি ফিরলে গোরা যে খুন হয়ে যাবে, রেবা জানে। তবে তাদের পরিবারকে ঝামেলা থেকে বিশু বাঁচিয়ে দিয়েছে।

প্রায় পনরো দিন প্রভাদির বাড়িতে কাটিয়ে হাঁপ ধরে গেছে রেবার। ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ, অন্ধকার বাড়ি। গত দশমাসে পরপর দু'ছেলেকে হারিয়ে পাথর হয়ে গেছে প্রভাদি। গোপীবল্লভপুরে পুলিশের গুলিতে দীপ্তিময় মারা যেতে যে শোক প্রভাদি পেয়েছিল, তার দশগুণ বেশী শোক পেয়েছে সহকর্মীদের হাতে দ্যুতির খুনের পর। অন্ধকার ঘরে বসে প্রভাদি এখন মাঝে মাঝে দু'ছেলের ছবি দেখে। তাদের লেখা চিঠি পড়ে। দীপ্তি, দ্যুতির বন্ধুরাও জেল থেকে প্রভাদিকে চিঠি লেখে। চিঠিতে অনেকে মা সম্বোধন করে। দুই ছেলের চিঠির সঙ্গে তাদের বন্ধুদের চিঠিগুলোও সাজিয়ে রাখে প্রভাদি।

প্রভাদি যেন এক স্থির, জমাট কান্না। তার দিকে তাকালে তোলপাড় করে রেবার বুক। প্রভাদির স্বামী, দ্যুতি, দীপ্তির বাবা বিরাজবাবু এখনও নিয়মিত অফিসে যায়, দোকান-বাজার করে, সন্ধ্যের পর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ছাতে ইজিচেয়ার পেতে চুপচাপ বসে থাকে। অনেক রাত ইজিচেয়ারে কেটে যায়। প্রভাদির আশ্রয়ে দু' হপ্তা কাটিয়ে একবারও বিরাজবাবুর গলা, পায়ের শব্দ শোনেনি রেবা। একদিন রাত প্রায় এগারোটায় শুকোতে দেওয়া শাড়ি আনতে ছাতে গিয়েছিল সে। চেয়ারে বুঁদ হয়ে এলিয়ে ছিল বিরাজ। নিঃশব্দে শাড়ি নিয়ে ফেরার পথে চাঁদের আলোয় রেবা দেখলো, বিরাজের চোখে জল। দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সে। আবার দেখলো তার মনে হলো, বিরাজের চোখের তলায় সোনালি কাজল। গা ছমছম করছিল তার। কান্না পাচ্ছিল। অন্ধকার আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল সে।

পনেরো দিনে বেশ কয়েকবার একটা বিদেশী গল্প তাকে শুনিয়েছে প্রভাদি। মায়ের একমাত্র ছেলেকে খুন করে গ্রাম ছেড়ে পালালো এক বদ লোক। দূরের এক দ্বীপে আশ্রয় নিল সে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়েছে বাড়ি

ফিরতো সেই খুনী। সন্তানহারা মা পেয়েছিল সে খবর। শোকে উন্মাদিনী মা একটা কুকুর পুষতে শুরু করল। দিনে দিনে বাঘের মতো হলো সেই কুকুর। সন্ধ্যের পর কুকুরটা তার দিনের বরাদ্দ খাবার পেত। কুকুরকে খাওয়াবার পদ্ধতিও ছিল অদ্ভুত। খড়ের তৈরী একটা মানুষের গলার কাছে মাংসের টুকরো বেঁধে ক্ষুধার্ত কুকুরকে ছেড়ে দিত মা। খড়ের পুতুলের গলা থেকে ছোঁ মেরে মাংসের টুকরো খাবলে নিত কুকুরটা। দিন, মাস, বছর, কেটে গেল। এক ঝড় বাদলের রাতে মা খবর পেল, বাড়ি ফিরেছে সেই খুনী। উপোসী কুকুর নিয়ে লোকটার বাড়ির বন্ধ দরজায় মা টোকা দিল। লোকটা দরজা খুলতে তার কণ্ঠনালীর দিকে আঙুল তুলে সংকেত দিল মা। লোমশ, কালো কুকুরটা চোখের পলকে খুনীর টুঁটি ছিঁড়ে নিল।

গল্প বলার সময়ে প্রভাদির মুখের চেহারা, কণ্ঠস্বর এমন অলৌকিক হয়ে ওঠে যে রেবার বুকে কাঁপুনি জাগে। এক রাতে গল্প শেষ করে রেবার হাত চেপে ধরে প্রভাদি বলল, সন্তানহারা সব মায়ের কাছে গল্পটা পেঁাছে দিতে চাই আমি। খুনীদেরও শোনাতে চাই এ গল্প।

মা, মাসীদের গল্পটা শোনাবার জন্যেই বোধহয় মাঝে মাঝে কোর্টে যায় প্রভাদি। মায়েরা অনেকেই জেনেছে এ কাহিনী। বিভিন্ন কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটরাও চিনে ফেলেছে প্রভাদিকে।

আলোকে ঘিরে বোনেরা আড্ডায় মশগুল। কতো রাত, রেবা বুঝতে পারছে না। শ্বশুরবাড়ির খুটিনাটি খবর আলোর মুখ থেকে মা শুনছে। অনেকদিন কিশোরের খবর পায় নি রেবা। অথচ হাওয়ায়, লোকমুখে, খবরের কাগজ পড়ে কিশোরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে সে। বীরভূম জেলা জুড়ে বিদ্রোহের পরিস্থিতি। পুলিশ, মিলিটারি সামাল দিতে পারছে না। উগ্রপন্থীদের হেপাজতে জমা হচ্ছে ডজন ডজন রাইফেল, বন্দুক।

খবর পড়ে রেবা প্রেরণা পায়। এই সাফল্য, জয়ের সঙ্গে দেখতে পায় একজন মানুষের মুখ। মুক্তির দশকের বিবর্ণ স্বপ্ন তার মাথার মধ্যে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিশোরের বিরুদ্ধে অভিমান, ক্ষোভ গলে জল হয়ে যায়। দুর্বল মুহূর্তে কিশোরকে অপরাধী ভাবার জন্য অনুতাপ জাগে তার। এই শহর, জীবন, জীবিকা, টিকে থাকার সংগ্রামে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সে। তার রক্তে মিশছে ক্লান্তি, অবসাদ, হতাশা। বাবার অফিসে তপতী চাকরি পাওয়ায় সামান্য স্বস্তি পেয়েছে রেবা। দু'বেলা দুমুঠো নুনভাত জোগাড়ে অসুবিধে হবে না। অফিসে বাবার পাওনা টাকাকড়িও তাড়াতাড়ি হাতে এসে যাবে। এ সংসারের একটা বিহিত করে গ্রামে চলে যাবে সে। কোন গ্রামে? কোথায়? গ্রামে কোনো যোগাযোগ নেই তার। কিশোরের কলকাতায় আসা অনিশ্চিত। গণপতির সঙ্গে এখন একবার দেখা হলে মনের ইচ্ছেটা জানাতে পারতো সে। কিন্তু সেদিনের ঘটনার পর চলন্ত বাসে উঠে গণপতি সেই যে গেল, আর দেখা নেই। প্রভাদির বাড়িতেও আসেনি। কোথায় গেল সে? তার জন্যে দুশ্চিন্তা হয় রেবার। তবে চোখ বুজলেই সে

দেখে শাল, মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা লালমাটির এক দেশ। সেখানে আছে তরুণী পাহাড়, সিধ নদী আর একজন মানুষ। চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও সে দেশে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারে রেবা।

হ্যারিকেনের আলো কমে আসছে। ঝিমিয়ে পড়ছে আলোর শিখা। ঘুমিয়েছে দু'একজন বোন। লম্বা হাই তুলে মা বলল, এবার শুয়ে পড়ো তোমরা। কাল অনেক কাজ।

রেবা ঠিক করল, কাল দুপুরে বিশু আসার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে সে।

চৌত্রিশ

রাতে আর এক দফা আলোচনার কথা ব্রজদা বলার পর থেকে কিশোর বুঝতে পারছিল, শুধু বাইরে থেকে নয়, পার্টির মধ্যেও ঘনীভূত হচ্ছে বিপদ। সাংঘাতিক বিপদ ডেকে আনছে সে। তার পার্টিজীবন শেষ হয়ে যাবে।

পার্টি রাজনীতির সঙ্গে তার বিরোধ এখন জানাজানি হয়ে গেছে। সামান্য বিরোধ, সমালোচনা সহ্য করবে না পার্টি। গেরিলাযুদ্ধের পাশাপাশি দখল করা বন্দুক নিয়ে গণফৌজ গড়ার সিদ্ধান্তে কিশোর অবিচল। এখনই গণফৌজ তৈরী করতে চায় সে। তার এই সিদ্ধান্তে অজিত খুশি। খুশি হবারই কথা তার। বন্দুক দখলের শুরু থেকে গণফৌজের স্বপ্ন দেখছিল সে। গণফৌজ তৈরীর বদলে এখনও গেরিলা যুদ্ধ চালাতে চায় পার্টি। কিশোর চায় দুটোই। তার মতে জনযুদ্ধের দুটো হাত, গেরিলা বাহিনী, নিয়মিত সেনাবাহিনী। একটা বাদ দিলে অন্য হাত দুর্বল হবে। কিশোরের যুক্তির বিকৃত ব্যাখ্যা হলো পার্টিতে। প্রচার হলো, সে গেরিলা যুদ্ধের বিরোধী। ভারত, পাকিস্তান যুদ্ধকেও দুই বৃহৎশক্তির তাঁবেদার দুটি রাষ্ট্রের হালুয়া রুটির ভাগাভাগি নিয়ে লড়াই, ভাবতে রাজি হয়নি কিশোর।

সন্ধ্যের আগেই এখানে পৌঁছে যাবে বরুণ। তার জন্যে অপেক্ষা করছে ব্রজদা। দ্বিতীয় দফা আলোচনার শেষে হয়তো এক চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিদ্ধান্তটা অনুমান করতে পারে কিশোর। এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হবে তাকে। তার সঙ্গে হয়তো অজিতকেও যেতে হবে।

কিশোরের মনে এখন প্রায়ই যে প্রশ্নটা জাগে, তা হলো, একই অভিজ্ঞতার আঁচে পুড়ে কেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাদের মতামত, মূল্যায়ন? ব্রজদা, বরুণও নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী। তাদের ধরার জন্যে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ। কিশোর, অজিতের মতো ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে তারা। কিশোরের পুরোনো বন্ধু বরুণ। ব্রজদাও অচেনা নয়। তা সত্ত্বেও দৃষ্টিকোণে এতো গরমিল কেন? ব্রজদা, বরুণ কি অসৎ? না, তা নয়। সন্দেহের বাইরে তারা। কিশোর নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি সৎ?

অবশ্যই। আত্মপক্ষ সমর্থনে নিঃশব্দে এগিয়ে এলো তার বিবেক। কিশোর বুঝলো, ভুল এবং নির্ভুলের মধ্যে সহজ, সরল লড়াই-এর পাশাপাশি নির্ভুলের সঙ্গে নির্ভুলের, সততা বনাম সততার তীব্র সংগ্রাম চলেছে। এ লড়াই জটিল, বেদনাদায়ক।

একটা ভুল শুরু থেকে কিশোর করেছে। পার্টির ঐক্য বাঁচাতে এড়িয়ে গেছে

কিছু প্রশ্ন, বিতর্ক। ছোটখাটো আপোস, রফা করে সাময়িক আরাম পেয়েছে। খণ্ড, টুকরো সেই ফাঁকিবাজি আজ বড়ো গাফিলতির চেহারা নিয়েছে। গুণোগার দিতে হবে তাকে। সে তৈরী। ব্রজদা, বরুণের সঙ্গে আজ খোলাখুলি আলোচনা করবে সে। কোনো প্রশ্ন, বিতর্ক পাশ কাটিয়ে যাবে না।

অজিতের ওপর অভিমানে কিছুদিন ধরে ভারি হয়ে আছে তার মন। কিশোর আজও জানে, যে গোটা পৃথিবী বিরুদ্ধে গেলেও তার সঙ্গ ছাড়বে না অজিত। সে পাশে থাকবে। কিন্তু সভা, বৈঠক রাজনীতি আলোচনায় ছিটেফোঁটা আগ্রহ নেই তার। পাহারা দেবার নাম করে জরুরি সভার বাইরে থাকে। আদিবাসী ছেলে-মেয়ে, বুড়োবুড়িদের সঙ্গে আড্ডা মারে। তারাও ভালোবাসে অজিতকে।

লম্বা, লকলকে বনকলমী ঝোপের আড়ালে অজিত, লালমুনিকে বসে থাকতে দেখে চোখ ঘুরিয়ে নিল কিশোর। জঙ্গলের এটা প্রান্ত অঞ্চল। সামনে লালমাটির ঢেউখেলা উঁচুনিচু জমি। মাঝে মাঝে বুনো ঝোপ, আগাছার ভিড়। গাঁয়ের এ পাশে মানুষের যাতায়াত কম। দিন শেষ হয়ে আসছে। গভীর হয়েছে নির্জনতা। দৃষ্টি সরিয়ে নিলেও অজিত, লালমুনির কথা শুনছে কিশোর। সুরেলা, নরম গলায় লালমুনি কিছু বলল। চাপা গলায় জবাব দিল অজিত। শালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কিশোর দেখলো, একটা জল বোঝাই পেতলের জামবাটি মাঝখানে রেখে মুখোমুখি বসেছে অজিত, লালমুনি। একটা ছড়া মন্ত্রের মতো বিড়বিড় করে বলল লালমুনি। সে ছড়া আবার উচ্চারণ করল অজিত। বাটির জলে ডোবানো তার ডান হাতের পাতা। দু'একটা শব্দ কানে যেতে কিশোর বুঝলো, কিরা খাচ্ছে অজিত। লালমুনিকে বিয়ের শপথ নিচ্ছে।

মুখ বোঝাই দাড়িগোঁফ অজিত তাকিয়ে আছে লালমুনির দিকে। নিরীহ সন্তের মতো দেখাচ্ছে তাকে। ঘটনা দেখে মজা পেলেও পরমুহূর্তে কিশোরের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। দৈহিক মিলনের পরেই প্রেমিককে ধরে সাঁওতাল মেয়েরা কিরা খাওয়ায়। সন্তানসম্ভবা কুমারী মেয়েরা সাধারণত এ লোকাচার মেনে চলে। অজিত, লালমুনির সম্পর্ক কি এতোদূর গড়িয়েছে? দুশ্চিন্তা হলো কিশোরের। খবরটা এখানকার মানুষ কীভাবে নেবে, ভেবে সে ভয় পেল। সম্প্রদায়ের বাইরে ছেলে, মেয়ের বিয়ে দেবার কথা আদিবাসীরা ভাবতে পারে না। বিশেষ করে বুড়োবুড়িরা এ বিয়ের ঘোর বিরোধী। তাদের বিশ্বাস, এ বিয়ে পাপ। এ ঘটনায় অখুশি বোঙ্গার অভিশাপে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়। আদিবাসী তরুণ, তরুণীরা কিন্তু বিয়ের প্রশ্নে অনেক উদার। লালমুনি, অজিতের সম্পর্ক তারা জানে। দু'জনকে উৎসাহ দেয়। লালমুনির দাদা বুধনও মদত জুগিয়েছে।

শেষপর্যন্ত এ সম্পর্কের যে কী হাল হবে, ভাবার চেষ্টা করে কিশোর। লালমুনিকে অজিত ঠকাবে না। আজ অথবা কাল বিয়ে করবে। কিন্তু স্ত্রী লালমুনিকে কতোদিন সহ্য করবে অজিত? সে যতোই শ্রেণীচ্যুত হোক, তার মধ্যবিত্ত রুচি, শিক্ষা, ধারণাকে ছাড়তে পারবে না। আদিবাসী তরুণী লালমুনির পক্ষেও কোনোদিন অজিতের মাই ফেয়ার লেডি হওয়া সম্ভব নয়। বিয়ের প্রথম

চমক কেটে গেলে দু'জনের মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে যাবে। তখন? লালমুনি গুণবতী মেয়ে। সে একটানা বারো ঘণ্টা নাচতে পারে। মাটি কাটার কাজে সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে তার জুড়ি নেই। দু হাঁড়ি হাঁড়িয়া খেয়ে বেসামাল হয় না সে। কিন্তু তার এতো গুণপনা অজিতের পক্ষে কতোদিন কদর করা সম্ভব?

কম করে আগামী একদশক এখানে পার্টি করতে হবে। সংগ্রাম শুরু হয়েছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ঝামেলায় যেতে কিশোর রাজি নয়। কিন্তু তালগোল পাকিয়েছে অজিত। তার জন্যে একটা বড়ো ধাক্কা খাবে পার্টি।

মেয়েদের স্কোয়াডের সঙ্গে কিছুক্ষণ বুধনের বাড়িতে বসে আবার জঙ্গলে ফিরেছিল কিশোর। পার্টির নির্দেশ হুবহু মেনে চলার চেষ্টা করে সে। দিনে গাঁয়ে থাকা পার্টির বারণ। রাত নামলে, অন্ধকার ঘন হলে সে গ্রামে ঢোকে। সভা, আলোচনা করে। গরীব গ্রামে প্রায় সকলেই বন্ধু। দুষমন, দালাল কদাচিত এক-আধজন হয়। বাহেঙ্গায় পার্টির শক্ত ঘাঁটি। তবু নিয়ম ভাঙতে কিশোর রাজি নয়। আজ বুধনের তিলকচুরির খবর মুখে মুখে কতোদূর পৌঁচেছে, কে জানে! বাহেঙ্গা থেকে রাণীশ্বর থানার দূরত্ব চোদ্দ মাইল। গাঁয়ের গরীব মানুষের কোনো খবর থানায় পৌঁছায় না। কিন্তু বুধনের তিলকচুরির খবরে আলাদা গুরুত্ব আছে। থানা জানলে, একবার নিশ্চয় ঢু মারবে এখানে।

অন্ধকার নামতে কুলিমুড়োয় জড়ো হচ্ছে ছেলেমেয়েরা। মরা আলোয় ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে চারপাশ। আড়বাঁশি বাজলো। হালকা ছাই এর ওপর ডোরাকাটা কালো রঙের একঝাঁক গুণ্ডিপাখি লাল পলাশবনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। কুলিমুড়োর গানের আসরে মেয়ের বাড়ির তরুণবয়সীরা ঢুকে পড়েছে। বাহেঙ্গায় আজ রাত কাটিয়ে কাল সকালে ঘরে ফিরবে তারা। যাবার সময় নিয়ে যাবে পাত্রের বাবার উপহার, কিছু চাল, আর শুয়োরের একটা ঠ্যাং। গ্রামে পৌঁছে এই চাল, মাংসে খিচুড়ি বানিয়ে প্রতিবেশীদের খাওয়াবে। প্রতিবেশীরা জানবে, বিয়ে পাকা।

কুলিমুড়োয় যখন গানের আসর জমে উঠেছে, পুনাই বাস্কের বাড়ির উঠোনে পার্টিসভায় উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। রাত প্রায় দশটা। ঘুমন্ত পৃথিবীতে দ্বীপের মতো জেগে আছে বাহেঙ্গা। সভায় বইছে তত্ত্ব, তর্কের ঝড়। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থের নাম করে একটার পর একটা উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের মতামত বোঝাতে চাইছে বরুণ। বরুণের আগেই কিশোর জানিয়েছে তার বক্তব্য। সব সভাতে দু'চার কথা রবি বলে। আজ সে চুপ। সভার শুরু থেকে গুম হয়ে বসে আছে। রাজনীতিতে রবি অভিজ্ঞ, পুরোনো লোক। আলোচনা শুনে সে টের পাচ্ছে, পার্টির মধ্যে গোলমাল লেগেছে। সহজে এ গোলমাল মিটবে না। অজিত সভায় আসেনি। সন্ধ্যে থেকে তার হদিশ নেই। নির্মলা, মেঘনা, আন্নাকে তিলাবুনির পথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে পুনাই বাস্কের বাড়িতে ফিরে এসেছিল বাঘা। প্রায় জোর করে তাকে কথা বলালো ব্রজদা। নিজের মতো করে বাঘা যা বলল, তার অর্থ হলো, গণসংগঠন, গণআন্দোলন, গণফৌজ দরকার। বাঘা থামতেও

মুখ খুললো না রবি। আলোচনা প্রায় শেষ হতে চলেছে। বোঝা যাচ্ছে একমত হবার বদলে নিজেদের মধ্যে ফারাক আরও বেড়ে গেছে। গেরিলা অ্যাকশন, খতম, মূর্তিভাঙা, স্কুলকলেজ পোড়ানোর চেয়ে গণফৌজ গড়ার কাজে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কিশোর। ব্রজদা, বরুণ ভাবছে উল্টোটা।

খিড়কির রাস্তায় অ্যাশশ্যাওড়ার ঝোপে উড়ছে একঝাঁক জোনাকি। শেষ রাতে আকাশে উঠবে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। রাত দেড়টায় সভা যখন শেষ হলো, তখন কারও মুখে কথা নেই। কথা ফুরিয়ে গেছে। অনেক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থেকে ব্রজদা বলল, কাল সকাল দশটার মধ্যে ফরাক্কা পৌঁছোতে হবে। ভোররাতে বেরোতে হলে এখনই শুয়ে পড়া দরকার।

পুনাই বাস্কের দাওয়াতেই রাত কাটাবে ব্রজদা। কিশোর বুঝতে পারছে ব্রজদা ফরাক্কায় পৌঁছোবার সাতদিনের মধ্যেই পার্টি থেকে বরখাস্তের হুকুম পাবে সে। এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। এরকম কিছু রবিও টের পেয়েছে। কেরোসিন টেমির মিটমিটে আলোয় দেখা যাচ্ছে তার গম্ভীর মুখ। আড়চোখে সে তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে। তাকে অভয় দিতে চাইছে। ব্রজদা, বরুণের ওপর বিরক্তিতে ভাঁজ পড়েছে রবির কপালে। পুনাই-এর বাড়ির এক চিলতে উঠোনের গা ঘেঁসে শাল, পলাশের জঙ্গল। জঙ্গলের ওপর হালকা নীল আকাশ। হাজার হাজার তারা জ্বলছে। দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে ব্রজদা, মোতি পাশাপাশি শুয়ে পড়তে ঘরে ঢুকলো কিশোর, বরুণ। অন্ধকার খিড়কির পথে মিলিয়ে গেল পুনাই, বাঘা। রবি আগেই বেরিয়ে গেছে। কুপির আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে পুনাই-এর ঘর। ঘরে রয়েছে তিন, চার বস্তা ধান। ঘরের কোণে গোটানো দুটো খালি বস্তা টেনে নিল কিশোর। বরুণকে একটা দিয়ে নিজে নিল আর একটা। ঠাণ্ডা পড়েছে। তবু বস্তা নিচে রেখে শুয়ে পড়লো কিশোর। বরুণও তাই করলো। চারপাশ নিঝুম, নিস্তব্ধ। বরুণ শোয়ার পর ফুঁ দিয়ে টেমি নিভিয়ে দিল কিশোর। ঘুমে বুজে আসছে দু'চোখ। কিশোর টের পেল, কিছু বলার জন্যে উসখুস করছে বরুণ। অন্ধকার ঘরে ধকধক করে জ্বলছে তার বিড়ি। বিড়ির আগুনে দেখা যাচ্ছে বরুণের চোখ, নাক। বরুণের কথা শোনার আগ্রহ থাকলেও ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে কিশোরের চোখের পাতা। অন্ধকার কুলিতে লখাই চেঁচিয়ে উঠলো, ইঞ্জ সঙ্গে আলুম লাগা হয়তে, দাকাটুকুই ওটাঙওয়া। আমার পেছনে কাঠি দিলে হাওয়ায় উড়ে যাবে তোর ভাতের হাঁড়ি।

কিশোর বুঝলো, একদম ক্ষেপে গেছে লখাই। গ্রামের মানুষেরও তাই ধারণা। অজিতের কাছে লখাই কিছু অভিযোগ করছে। অজিতের কথায় বোধহয় শান্ত হলো লখাই। অন্ধকারে দুজোড়া পায়ের শব্দ শুনলো কিশোর। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

বরুণের ধাক্কায় জেগে গেল কিশোর। কতো রাত বুঝতে পারছে না সে। বাড়ির সামনে কুলিতে, খিড়কিতে ছোটাছুটি, পায়ের শব্দ। শুকনো পাতা মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে। চাপা গলায় কারা যেন আলোচনা করছে। কয়েক জোড়া ভারি

বুটের আওয়াজ শুনলো কিশোর।

চাপা গলায় বরুণ বলল, পুলিশ। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।

খোলা জানলার বাইরে এক ফালি চাঁদ দেখে সময়ের হদিশ পেল কিশোর। রাত দু'টো। কম, বেশি হতে পারে। শিয়রে ভয়ংকর বিপদ বুঝে তার ঘুম, জড়তা ছুটে গেছে। চটপট উঠে দাঁড়ালো সে। এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর বরুণকে বললো, বস্তায় ঢুকে হাঁটু মুড়ে বসে যাও।

কিশোরের নির্দেশ নিমেষে বুঝে গেল বরুণ। তিনবস্তা ধানের লাইনে দুটো বস্তায় ঢুকে ধান হয়ে গেল কিশোর, বরুণ। চটের বস্তায় বসে কিশোর দেখছে, খোলা জানালায় ছড়ানো চাঁদের আলো। হৈ হল্লায় জেগে গিয়ে পলাশগাছে ডাকাডাকি করছে অনেক পাখি। বাইরের দাওয়ায় ককিয়ে উঠলো ব্রজদা। কিশোর ভাবলো, কী হলো ব্রজদার? গুরুতর আঘাত পেল? মোতিও কি ধরা পড়লো? আপাদ-মস্তক বস্তায় মুড়েও কিশোর বুঝতে পারছে বাইরের ঘটনা।

রাইফেল, বন্দুক হাতে খাঁকি পোষাকের সাত আটজন ঘরে ঢুকলো। টর্চের জোরালো আলো চট ফুঁড়ে ধাঁধিয়ে দিল কিশোরের চোখ। ধানভরা বস্তায় রাই-ফেলের তীক্ষ্ণ বেয়োনেট ঢুকিয়ে দিল একজন। ঝরঝর করে ঝড়ে পড়লো কিছু ধান। বস্তা জড়ানো কিশোরের ওপর স্থির হয়ে আছে টর্চের আলো। এখনই খোঁচা দেবে বেয়োনেট। আতংকে ঘামছে কিশোর। চারপাশে দৌড়, পায়ের শব্দ। গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালাচ্ছে সবাই। আতংকে বন্দুকধারীরাও গুটিসুটি পাকিয়ে আছে। অন্ধকার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে তখনই বিকট গলায় লখাই চেঁচিয়ে উঠলো, ঝুমরি তু খাড়া থাক।

লখাই-এর চিৎকারে চমকে উঠলো বন্ধুকধারীরা। বস্তার দিকে উদ্যত বেয়োনেট চকিতে ঘুরে গেল। দু'ঝলক আলো, গুলির শব্দ। ঘরের দরজায় লুটিয়ে পড়লো লখাই। কুঁইকুঁই করে কেঁদে অন্ধকার কুলির দিকে পালালো লখাই এর পোষা কুকুর, কুঙ্গা। টর্চের আলো পড়েছে দরজার বাইরে লখাই-এর নিথর শরীরে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে বেরোতে চাইছে পুলিশবাহিনী। গ্রামের বাইরে এখনই চলে যেতে চায় তারা। তাদের চাপা গলার কথা, পা ফেলায় আতংক, ভয় মিশে আছে। পাশে বস্তাবন্দী বরুণ। তার আবছা শ্বাসের শব্দ শুনতে পেল কিশোর। বস্তার ভেতরের তুষ-কুটোয় দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। ধুলো ঢুকে গলা বুজে গেছে। শরীরে দরদর করে ঘাম বইলেও হাড়ের ভেতরে বয়ে যাচ্ছে শীতল স্রোত। উঠোন থেকে একজন বলল, শালালোক সব ভাগ গিয়া।

টর্চ নিভে গেল। ঘর থেকে দাওয়ায় উঠোনে, রাস্তায় সরে গেল পায়ের শব্দ। স্টার্ট নিল একটা ইঞ্জিন। গম্ভীর, তীব্র শব্দ। অসাড়, রক্তাক্ত রাত ঝুলে আছে বাহেঙ্গার আকাশে। হাঁকডাক করছে এক দঙ্গল কুকুর। দুটো পুলিশ ভ্যানকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল কুকুরবাহিনী।

নিস্তব্ধ গ্রাম। মানুষের সাড়া নেই।

আরও পাঁচ, সাত মিনিট পরে ফিসফিস করে বরুণ বলল, এখন বোধহয়

বেরোনো যায় !

কিশোর বলল, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি ।

তার কথা শেষ হতেই ঘরের মধ্যে ফস করে জ্বলে উঠলো একটা দেশলাই কাঠি । অজিত ডাকলো, কিশোর ।

বস্তার বাইরে মাথা বার করে অজিত, মোতিকে দেখতে পেল কিশোর । প্রথমে বরুণ, তারপর কিশোর বেরিয়ে এলো বস্তা থেকে । তাদের অবাক চোখে দেখছে মোতি । কিশোর, বরুণ যে এভাবে বেঁচে যাবে, অজিত ভাবতে পারেনি । কিশোরকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো সে । মোতি বলল, লখাই মারা গেছে ।

আগেই নিভে গেছে দেশলাই কাঠি । অন্ধকার ঘর । ফুঁপিয়ে কাঁদছে অজিত । তার শরীরের তাপ টের পায় কিশোর । জ্বর হলো নাকি অজিতের ? তাপের সঙ্গে অজিতের গায়ের অচেনা গন্ধ পাচ্ছে কিশোর । ঠিক অচেনা নয়, আধচেনা সাজি-মাটির গন্ধ । বাড়িতে কাচা সাঁওতাল তরুণীর শাড়িতে এ গন্ধ মিশে থাকে । অজিতের ফোঁপানি থেমেছে । কিশোরকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে । ঘরের বাইরে অন্ধকার দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো চারজন । সবাই চুপ । আবার একটা দেশলাইকাঠি জ্বাললো অজিত । মৃত লখাইকে পা ধরে কুকুরের মতো দাওয়া, উঠোন, রাস্তা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে ভ্যানে তুলেছে পুলিশ । লখাই-এর রক্তের রেখা বাড়ির সদরে শেষ হয়েছে ।

আকাশ দেখলো কিশোর । রাত শেষ হয়ে আসছে । একটু পরে পাখির কলরবে মুখর হবে চারপাশ । হবে কি ? পাখিরা কি ডাকবে আজ ? শেষরাতের ঘোলাটে অন্ধকারে গোটা গ্রাম নিস্তব্ধ । বারবার ঘুরে ফিরে লখাই-এর রক্তের গন্ধ শুকছে কুঙ্গা । হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে মানুষের মতো করুণ গলায় কুকুরটা কেঁদে উঠলো । জঙ্গল ছেড়ে সতর্ক পায়ে গ্রামে ফিরছে এক, দুজন লোক । ভোর-রাতের ফিকে আলোয় নিরুদ্বেগ তাদের মুখ । কীভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো, গল্প করছে তিন তরুণ । নিজেদের বুদ্ধির তারিফ করছে তারা । তারা হাসছে । কথা না বললেও গত রাতের স্মৃতি বয়স্করা মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে । লেপামোছা পরিষ্কার তাদের মুখ । জন্ম থেকে হাজার দুঃখ, দুর্ভোগ দেখে দেখে গা সহ্য হয়ে গেছে তাদের । কোনো কিছুতে বিচলিত হয় না ।

সকালের আলো ফোটার আগেই বুধনের বাড়িতে পৌঁছে গেল চারজন । উঠোনে ছড়ানো ভাঙা হাঁড়ি, কলসির মাঝখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে বুধনের মা কাঁদছে । বুধনের সঙ্গে মেয়ের বাড়ির কয়েকজন কুটুমকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ । কিছু কুটুম রাতের অন্ধকারেই গ্রামে পালিয়েছে । অজিত, কিশোর যেতে ভরসা পেল বুধনের মা । কান্না মেশা গলায় সে যা বলল, তা হলো, তিলকচুরির ধকলে ক্লান্ত বুধন মড়ার মতো দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল । পুলিশ টেনে তোলার পর ঘুম ভাঙলো তার । মেয়েপক্ষের বয়স্ক কুটুমরাও হাঁড়িয়ার নেশায় ঘুমিয়েছিল । হাতের

কাছে তাদের দু'তিনজনকে পেয়ে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

গাছপালার ফাঁকে অল্প আলো জেগেছে। বুধনের মায়ের কোলে গিঁট বাঁধা হলুদ সুতোর গোছা, লবণ, বিয়ের চিঠি। এ সুতো এখন পাঠানো যাবে না। থানা, পুলিশ, আইন, আদালতের খপ্পর থেকে কবে বুধন ছাড়া পাবে, আদৌ পাবে কিনা, কে বলতে পারে! থানা, পুলিশের হাতে একবার পড়লে খুব কম লোক ঘরে ফেরে। আইন, আদালতের খরচ মেটাতে ঘরবাড়ি, জমিজমা বেচতে হয়। তারপর আর খোঁজ থাকে না তাদের। উঠোনে উল্টে আছে দড়ির খাটিয়া। ভাঙা হাঁড়ি, ভিজে মাটিতে লেপ্টে আছে এক ঝাঁক ডুমো মাছি। হাঁড়িয়া খেয়ে উড়তে পারছে না। চেষ্টা করে এক, দু'বার বেতাল উড়ে খসে পড়ছে। দাওয়ায় ছড়ানো চাল। পাশে রয়েছে শুয়োরের একটা ঠ্যাং। ফ্যালফ্যাল করে অজিতকে দেখছে বুধনের বাবা বসন মাঝি।

জেলায় মিলিটারি নেমেছে, কিশোর জানে। সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করতে কলকাতা থেকে এসেছে পাঁচ, সাতজন গোয়েন্দা! অভিজ্ঞ খুনী তারা। স্থানীয় থানাগুলোয় তারা কর্তা। সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করার সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামের জোতদার, মুখিয়াদের নিয়ে কৃষিউন্নয়ন সমিতি গড়ছে তারা। সমিতি আসলে প্রতিরোধবাহিনী। বাহিনীতে জায়গা পেয়েছে অঞ্চলের প্রায় সমস্ত দাগী অপরাধী। পুলিশ, মিলিটারি, প্রতিরোধবাহিনী মিলে পার্টি কর্মী, দরদীদের বেমক্কা খুন করছে। আক্রমণ আরও বাড়বে। সে ধাক্কা সামলাতে পারবে না পার্টির গেরিলা স্কোয়াড। ইতিমধ্যেই পিছু হটছে তারা। পার্টির দুর্বলতার জন্যেই ভেঙে পড়ছে। স্কোয়াড। ভাঙনের সঙ্গে বাড়ছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, দলাদলি। হতাশা, ভাঙন ঠেকাতে এলোপাথাড়ি কিছু এ্যাকশন করছে একাধিক গেরিলা স্কোয়াড। জেল ভেঙে বেরিয়ে আসা কমরেডরা এ ধরণের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। পার্টি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বুঝতে পারছে না কিশোর।

গত রাতে গাঁয়ে দুরমুশ পিটে গেছে পুলিশ। বেলা বাড়তে ধরা পড়লো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। জঙ্গল থেকে সকলে ঘরে ফিরেছে। রাগ, অসহায়তায় থমথম করছে মানুষের মুখ। তাদের চাঙ্গা রাখতে অজিত, রবিকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরলো কিশোর। বেশিরভাগ বাড়ি তছনছ। কোথাও ভেঙে পড়েছে দাওয়ার বাঁশের খুঁটি, কোথাও ধসে গেছে ঘরের আধখানা দেওয়াল। কিশোর, অজিত, রবির চেষ্টায় তরুণরা কিছুটা উদ্দীপ্ত হলেও বয়স্করা গুম হয়ে থাকলো। ভাদু চোঁড়ে স্পষ্ট প্রশ্ন করলো, কিষাণহবদের বাটবি, আবার পুলিশ এলে ভাগবি, ইটা তুদের ক্যামন লড়াই?

ভাদুর প্রশ্নের জবাব কিশোর জানে না। চুপ করে থাকলো সে। পার্টির রাজনীতির শেকড়ে জড়িয়ে আছে এ প্রশ্ন। পুলিশ, মিলিটারির আক্রমণ, অত্যাচার থেকে বাঁচতে হলে পার্টির ফৌজ দরকার। গণফৌজ, নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়তে হবে এ মুহূর্তে। গণফৌজ তৈরিতে এখন রাজি নয় পার্টি। শত্রুর হামলা রুখতে শুধু গেরিলা স্কোয়াডের ওপর পার্টি নির্ভর করতে চায়।

সন্ধ্যের পর বাগজোরায় ফিরবে বরুণ। তাই মাঝদুপুরে বাহেঙ্গার উত্তর দিকে কেঁদু জঙ্গলে এক বৈঠকে বসেছে কিশোর। কেঁদুর জঙ্গলে কয়েকটা ভিলা গাছ, কিছু মহুয়া, ছাতিম গাছও ছড়িয়ে আছে। কাছে কোথাও ধীর লয়ে ডাকছে একটা ঘুঘুপাখি। গতরাতে ব্রজদা ধরা পড়ার জন্যে পার্টি সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আঞ্চলিক পার্টির যোগাযোগ রাখতো ব্রজদা। তার অভাবে শূন্যতা দেখা দেবে আঞ্চলিক কমিটিতে। সে শূন্যতা কাটাতেই ডাকা হয়েছে বৈঠক। আর কাউকে নিতে হবে ব্রজদার দায়িত্ব। ব্রজদার জায়গায় বরুণের নাম প্রস্তাব করলো কিশোর। সবাই মেনে নিল।

মাস কয় আগেও কোনো সভার খবর পেলে দলে দলে সেখানে হাজির হতো আশপাশের গাঁয়ের মানুষ। সভায় আসার নিয়ম, নিষেধ মানতো না তারা। আঞ্চলিক পার্টিও আপত্তি করতো না। গাঁয়ের মানুষের মনে সে উৎসাহ আর নেই। সভায় হামলে পড়ার আগ্রহ প্রায় উবে গেছে। গনগনে, তেজী মানুষগুলো হঠাৎ নেতিয়ে পড়েছে। ডাকলেও আসে না অনেক সময়। তাদের এই ডিমরালাইজেশন দেখে কিশোর রীতিমতো আতঙ্কিত। রোজ দু'দশটা বন্দুক দখল-খতম চললেও আগের উৎসাহ এখন নেই। কিছুদিন আগেও গেরিলা বাহিনীর পাশে স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে হাজার মানুষ এসে দাঁড়াতো, আজ তারা হতোদ্যম, পেছিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাড়ছে গেরিলা বাহিনীর দূরত্ব। জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে পার্টি, গেরিলা স্কোয়াড। অথচ গতবছর এ সময়েই রবির নেতৃত্বে জমি আর ফসল দখলের সংগ্রামে জোয়ার এসেছিল। কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কিছু বন্দুক। কৃষকদের উগ্র মূর্তি দেখে গ্রাম ছেড়ে ভেগেছিল জোতদার, মহাজন, আমলারা। গ্রামের মানুষের সেই উদ্দীপনা, সমাবেশের সঙ্গে এখনকার অবস্থার কোনো মিল পায় না কিশোর। তুলনা করলে কষ্ট হয়। গত বছরের সেই সংগ্রাম থেকে উঠে এসেছে রবি হাঁসদার মতো জঙ্গী নেতা। গণআন্দোলনের স্রোতে নানা এলাকায় তৈরি হয়েছিল, কৃষকসমিতি, ভলান্টিয়ার বাহিনী। অচেনা কেউ গাঁয়ে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে খবর পেত সবাই। নেতাদের ঘিরে ছিল সাধারণ মানুষের মজবুত ব্যূহ। সংস্কারবাদী অভিযোগে সেই সংগঠন ভেঙে দিল পার্টি। মুখিয়া নির্বাচনে পার্টিকর্মীদের অংশ নেবার নিন্দে করল নেতৃত্ব। তখন থেকেই গণআন্দোলনের বিরতি। কুঁকড়ে যাচ্ছে পার্টি সংগঠন। লাল রাষ্ট্রশক্তি, গণফৌজ আজও স্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্ন এবার ভূমিষ্ঠ হবে। গণফৌজ গড়ার সব আয়োজন পাকা। নেতৃত্বের সবুজ সংকেত পাবার আগেই কিশোর, অজিত, রবি গোপনে এগিয়ে গেছে অনেকটা। ভাবনা চিন্তা করেই এ ঝুঁকি নিয়েছে তারা। আভাসে জানিয়েছে পার্টিকে। নেতৃত্ব ভুল বুঝেছে তাদের। ঘন কেঁদুপাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে দুপুরের রোদ। আলোচনার মধ্যে বরুণ হঠাৎ বলল, সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠেছে পার্টির বিরুদ্ধে। প্রচার হচ্ছে আদিবাসী জোতদার, ধনীদের

নির্দেশে বেছে বেছে বাঙালী, বিহারী জোতদার, মহাজনদের খতম করছে আমাদের গেরিলা স্কোয়াড। এ কুৎসার জবাব দিতে হবে। গুণীন মুর্মুর বাড়িতে আজই আমাদের এ্যাকশন করা উচিত। এখনই। আর দেরী করলে পার্টির দুর্নাম হবে।

আজই ?

কিশোরের প্রশ্নে বরুণ বলল, গত রাতের পুলিশী হামলার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এলাকায় একটা এ্যাকশন হলে মনোবল ফিরে পাবে সাধারণ মানুষ। তাদের হতাশা কেটে যাবে।

বরুণের জবাবে কিশোর চুপ। কথা ফুরিয়ে না গেলেও আর কেউ কথা বলুক, কিশোর চাইছিল। মুখ খুললো মোতি। সে বলল, সাধারণ মানুষ জেনেছে, তারা কী করতে পারে জোতদারদের। জোতদার, পুলিশের প্রতিহিংসার চেহারাও সাধারণ মানুষ দেখছে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তিকে মোকাবেলা করার সঠিক পথ সাধারণ মানুষ আজও জানতে পারেনি। অথচ জানতে চাইছে। প্রশ্ন তুলছে তারা। তাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

মোতির কথায় কয়েক সেকেণ্ড গম্ভীর থেকে বরুণ বলল, আপনি যা বললেন ঠিক নয়। পার্টির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের খবর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। গেরিলা এ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে যে গণফৌজ গড়ে উঠবে, একথাও গরীব মানুষের কাছে পার্টি পৌঁছে দিয়েছে। তবে ফৌজ গড়তে সময় চাই। চাই নিখাদ মানুষ। গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় সে মানুষ জন্মাচ্ছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে একটা বাহিনী খাড়া করে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

লম্বা বক্তৃতা করার অভ্যেস মোতির নেই। বরুণের মতো গুছিয়ে কথা বলতেও সে পারে না। অনেক কথা বুকে নিয়ে শব্দের অভাবে হাঁসফাঁস করে। আজও তাই হলো। সে চুপ করে যেতে কিশোর বলল, নতুন মানুষ তৈরীর ব্যাখ্যাটা আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত। আমাদের ডাকে যে হাজার হাজার গরীব মানুষ এগিয়ে এসেছে, আজও আসছে, প্রাণ দিচ্ছে, তারা কি নতুন মানুষ নয় ? গণফৌজে তারা কি অযোগ্য ?

প্রশ্ন তুলে সকলের মুখের দিকে একপলক তাকালো কিশোর। বরুণ কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে থাকলো। এক মুহূর্ত তাকে দেখে কিশোর বলল, গণফৌজ গড়ার সাহস চাই। সে সাহস দেখাতে হবে আমাদের। শত্রুপক্ষের সঙ্গে শুধু যুদ্ধ করার জন্যে নয়, জনগণের সেবা, পরিচর্যায়, তাদের হিম্মত যোগাতেও গণফৌজ তৈরী জরুরি। পার্টির ভূমিনীতি কার্যকর করতে, উৎপাদন বাড়াতে গণফৌজের ভূমিকা আছে।

কথা বাড়াতে চাইছে না বরুণ। সে বুঝেছে, এ তার এলাকা নয়। তার যুক্তি, মতামত এখানে ধোপে টিকবে না। ব্রজদা ধরা পড়ায় একা হয়ে গেছে সে। বাগ-

জোরায় একটা সভা ডেকে সব বিতর্কের ফয়সালা করতে চায় সে। বৈঠক গুটিয়ে ফেলার জন্যে বরুণ বলল, বাগজোরায় তাড়াতাড়ি সভা ডাকছি। যা আলোচনা আছে, সেখানে হবে। এ্যাক্শনটা আজ করে ফেলা ভালো। বিস্তর জবাবদিহি থেকে তাহলে রেহাই পাওয়া যায়।

সভা, আলোচনায় অজিতের মন নেই। ঘুমে বুজে আসছে দু'চোখ। গতরাতের ঘটনা বারবার মনে পড়ছে। গ্রামে যখন পুলিশ ঢুকলো, তখন মাঠের মধ্যে একটা খড়ের গাদায় লালমুনির পাশে শুয়ে গল্প করছিল অজিত। একটুকরো চাঁদ উঠলো আকাশে। অল্প আলোয় ঝকঝক করছিল লালমুণির তেলতেলে কালো মুখ। অজিতের কাঁধে মুখ গুঁজে মাঝে মাঝে খিলখিল হাসির শব্দ লুকোতে চাইছিল সে। কথায় গল্পে দুজনে এমন মশগুল ছিল যে, পুলিশ গাঁ ঘিরেছে, বুঝতে পারেনি কেউ। পুলিশের শব্দ পেয়েও লালমুনির সর্বনেশে হাসি থামতে চাইছিল না। তার মুখটা নিজের বুকের মধ্যে দুহাতে চেপে ধরে অজিত বলেছিল, চুপ মার লালমুনি, চুপ!

অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে তখন এক অফিসার তড়পাচ্ছিল, এবার হাতি নিয়ে আসবো, মাঠ করে দেবো গ্রাম।

ঝাঁঝের কথা বলে ভরসা, আত্মবিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে চাইছিল লোকটা। তার মনস্তত্ত্ব টের পেতে অজিতের অসুবিধে হয়নি। হাসি থামলেও অজিতের বুকে মুখ গুঁজে রেখেছিল লালমুণি। তার শরীরের তাপে ছিটেফোঁটা ভয় ছিল না।

কিশোর দেখলো ঘুমে বুজে গেছে অজিতের দুচোখের পাতা। কিশোর তাকিয়ে আছে জেনেও তাকাতে পারছে না অজিত। একজোড়া গুণ্ড্রি পাখি অল্পদূরে ঘাসের ওপর নেচে নেচে ডেকে বেড়াচ্ছে। পাখির ডাকে চোখ খুললো অজিত। দেখলো, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে শুকনো শালপাতা।

পঁয়ত্রিশ

বরুণের চাপেই গুণীন মুমুর বাড়িতে অ্যাকশন করার সিদ্ধান্ত হলো। গেরিলা স্কোয়াডেব কমান্ডার হলো রবি। স্কোয়াড ঠিক করল, বন্দুক ছাড়া গুণীনের বাড়ির আর কিছুতে হাত দেওয়া হবে না। গুণীনের গোলার ফসল, টাকাপয়সা, গয়না, বাসন, জমিজিরেতের দলিল যেমন আছে, তেমনই থাকবে: শুধু বন্দুকটা কেড়ে নেওয়া হবে।

মাটির পাঁচিল ঘেরা কেল্লার মতো গুণীনের দোতলা মাঠকোঠা সকলের চেনা। রবি আবও বেশি চেনে। এ বাড়ির অন্ধিসন্ধি তার নখের ডগায়। গুণীনের বাড়িতে বহুবার রবি এসেছে, খেয়েছে, রাত কাটিয়েছে। গুণীনের সদর দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালো রবি। তার মসৃণ কপালে রেখা জেগেছে। শুকনো মুখ। কথা বলছে না সে। সভা, বৈঠক, মিটিং, অ্যাকশনে ঘোরতর ব্যস্ত রবি, গত সাতদিন বাড়ি যেতে পারেনি। বাড়ির সঙ্গে রাজনীতির বেসামাল দশাও দুশ্চিন্তায় ফেলেছে তাকে। পথ আঁকাবাঁকা জেনেও তার মনে হচ্ছে, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। সে হাঁক পাড়লে কয়েক মাস আগেও ছুটে আসতো দশ, বিশ গাঁয়ের হাজার হাজার মানুষ। কোথায় গেল তারা? কেন আসেনা আজ? জোয়ারের পর ভাটা এবং তারপর ফের জোয়ার আসে। প্রবল জোয়ার। জনযুদ্ধের রণনীতিতে জয়, পরাজয়, জোয়ার ভাঁটার মতো। আজ আছে, কাল নেই। পরশু আবার আসবে। এসব তত্ত্ব তাকে বুঝিয়েছে কিশোর। রবি বুঝেছে! কিন্তু বোঝার সঙ্গে বাস্তবের মিল ঘটছে না। রবি জানে, কিশোরও টের পেয়েছে এ গরমিল। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক দেখে চুপসে গেছে সে। পার্টির সঙ্গে গোলমাল লেগেছে তার। মান বাঁচাতে গণফৌজ গড়ার কাজে নেমেছে সে। গণফৌজ তৈরিতে রবিরও আপত্তি নেই। সায়, চোরা সংশয়, দুইই আছে। শাল মহুয়ার জঙ্গলে ঢাকা তরণী পাহাড়ের এই আধা-সমতল অঞ্চলে কীভাবে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে গণফৌজ?

এ প্রশ্ন একদিন কিশোরকে করেছিল রবি। জবাব দেয় নি কিশোর। ঘাস, পাতা ভেদ করে বাঘার পায়ের পাশ দিয়ে ছুটে গেল এক মেটে রঙের খরগোস। টাঙ্গি হাতে লোলুপ বাঘা খরগোশের পেছনে ধাওয়া করতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো। তার মনে পড়েছে, গেরিলা স্কোয়াডের একজন সদস্য সে। পেছমে বনকলমীর ঝোপে তখনই দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল। কান খাড়া হলো সকলের। শব্দ মিলিয়ে যেতে বাঘা বুঝলো, খরগোস তাড়িয়ে ছুটে আসছিল একটা খটাশ বা ভাম। মানুষ দেখে শিকার ছেড়ে শিকারী সরে গেল। দশজনের গেরিলা স্কোয়াড, সামনে হেঁসো

হাতে রবি, হুড়মুড় করে গুণীনের খামারে ঢুকতে অবাক চোখে মুনিষ, মাহিন্দাররা তাকিয়ে থাকলো। কাজ করছিল তারা। বন্ধ হলো কাজ। গেরিলারা এ বাড়িতেও হানা দেবে, ভাবে নি তারা। রবির পেছনে বল্লম হাতে বরুণ, তারপর বাঘা, অজিত, কিশোর, মোতি। সকলের হাতেই অস্ত্র। শুধু অজিতের খালি হাত। গুণীনের দোনলা বন্দুক দখলই স্কোয়াডের লক্ষ্য। খামারের মুনিষ, মাহিন্দারদের দিকে সংকোচে তাকাতে পারছে না রবি! সবাই তার চেনা। গুণীনের সঙ্গে তার সম্পর্কও সকলে জানে।

চার, পাঁচ বছর আগে গুণীনের সঙ্গে অযোধ্যাপাহাড়ে শিকারে গিয়েছিল রবি। শিকারীদের সর্দার ছিল গুণীন। কাজেও সে সর্দারের আচরণ করেছে। দলের সকলের ভালো, মন্দে ছিল তার সজাগ নজর। দিলখোলা, মেজাজী মানুষটা অভিভাবকের মতো আগলে ছিল শিকারীদের।

অনেক সম্পত্তি, জমিজমা, দশ হালের মালিক হাওয়া সত্ত্বেও আর পাঁচজন জোতদার, মহাজনের তুলনায় গুণীন আলাদা মানুষ। জোতদার, মহাজন, পুলিশের সঙ্গে মাখামাখি নেই তার। আদিবাসী গুণীন বড়োলোক হলেও বর্ণহিন্দু শোষকেরা এড়িয়ে চলে তাকে। গুণীনের বন্দুক দখলে এসে, তার খামারে দাঁড়িয়ে নানা স্মৃতিতে স্থবির হয়ে গেছে রবি। কিন্তু পেছোবার উপায় নেই। মহাজন, দিখুরা বাতাসে ঢেলে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক বিষ। মুহুলি, পাহাড়িয়া, ঘাটোয়াল সাম্প্রদায়ের মানুষরা পর্যন্ত পার্টিলাইনকে বাঙালী, বিহারীদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের যুদ্ধ ভাবতে শুরু করেছে। সম্প্রদায়গত এ বিষ ঝাড়তেই আজ গুণীনের বন্দুক দখল করতে হবে।

অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ, গুমোট কাটাতে বরুণ আওয়াজ দিল, নকশালবাড়ি লাল সেলাম। কৃষিবিপ্লব জিন্দাবাদ। খতম চলছে চলবে।

তার সঙ্গে গলা মেলালো সবাই। তবে আধখানা গলা। সমবেত হল্লায় খামারের উত্তরদিকের হর্তুকি গাছের কোটর ছেড়ে একজোড়া টিয়াপাখি ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। নিমেষে জেগে উঠলো ঘুমন্ত দুপুর। খামারেরর পশ্চিমে লোহার গ্রিলে ঢাকা গুণীনের বাড়ির চাতাল। সদরে লোহার কোলাপ্সিবল্ গেট্। বন্ধ গেটের ওপাশে দোনলা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে গুণীন। তাকে প্রথমে দেখলো কিশোর, তারপর রবি। কুচকুচে কালো রঙের বন্দুক বাগিয়ে ধরে খামারের কিষান, কিষানীদের গুণীন বলল, তুরা সরে যা।

খামারের মজুরেরা সভয়ে দেখছে গুণীনকে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে তারা। গুণীনের হুকুম যেন তাদের কানে যায় নি। গুণীন আবার চেঁচিয়ে উঠলো, তুরা সরে যা।

পায়ে পায়ে মুনিস, মাহিন্দাররা পেছিয়ে যাচ্ছে। স্লোগান তুললো বরুণ,

বন্দুক দখল চলছে, চলবে।

গলা মেলালো সবাই। গুণীন নির্বিকার। গুণীনের বয়স পঞ্চাশ, বাহান্ন। কালো পাথরে খোদাই তার মুখ গম্ভীর, শান্ত। কোমরে মালকোঁচা বাঁধা আটহাত ধুতি। লোহার মতো শক্ত আদুল শরীর। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটের ফাঁকে বন্দুকের নল রেখে সে দেখছে বরুণকে। বক্তৃতা শুরু করল মোতি। ঝাঁঝালো বক্তৃতা নয়। সে বলল, শুধু বাঙালী, বিহারী জোতদারদের ওপর এ্যাকশন করায় পার্টির বিরুদ্ধে শত্রুরা কুৎসা রটাচ্ছে। অপবাদ থেকে রেহাই পাবার জন্যে গুণীনের বন্দুকটা গেরিলা স্কোয়াড নিতে এসেছে। পার্টির চোখে গুণীন দুষমন নয়।

উদাসীন ভঙ্গিতে গুণীন শুনছে বক্তৃতা। বন্দুক দেবার কোনো লক্ষণ তার নেই। মোতি থামতে বাঘা চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দুকটো দাও।

আমি বন্দুক দিবেক নাই। তুরা ঘরকে যা।

ঠান্ডা গলায় কথাটা বলে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুণীন। মাঠকোঠার দোতলার ঘেরা বারান্দায় শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে গুণীনের বৌ, চার ছেলে-মেয়ে। খামারের পুব কোণে বয়রা গাছের তলায় ভিড় করেছে গাঁয়ের কিছু মানুষ।

বন্দুকটো দাও বটে।

কথা বলল রবি। রবির কথায় চটে গিয়ে গুণীন বলল, উদ খেতে খুদ নাই, ভাজা খেতে খোপরা নাই, আমার সাথে লাগতে এঁইছিস?

স্কোয়াড ছেড়ে বন্ধ কোলাপসিবল গেটের দিকে কয়েক পা একা এগিয়ে গেল রবি। দুহাত পেতে বলল, বন্দুকটো দাও।

গুল্লি চালায়ে দেবো।

গুণীনের হুঙ্কার শুনে বরুণ বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্দুক না পেলে লোহার দরজা ভেঙে ফেলবো আমরা।

বরুণের দাবড়ানিতে গুণীন ভয় পেয়েছে বলে কিশোরের মনে হলো না। বন্দুকের নলের চার, পাঁচ ফুট দূরে দু'হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে রবি। তাকে স্থির চোখে দেখছে গুণীন। গুণীনের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও তার মুখের দিকে রবি তাকাতে পারছে না। তার মাথায় ভাসছে অযোধ্যা পাহাড়ের ছবি। তীরে আহত এক দুর্ধর্ষ বুনো শুয়োরের আক্রমণ থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল গুণীন। শুয়োরটা যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, রবি ঠাহর করেনি। দেখেছিল গুণীন। পালন করেছিল সর্দারের দায়িত্ব। দাঁতাল শুয়োরটার সঙ্গে কুঠার হাতে একা লড়েছিল সে। কঠিন লড়াই। রক্তে ভেসে গিয়েছিল গুণীনের হাত, কাঁধ, বুক। তবু শুয়োরটাকে মাটিতে পেড়ে না ফেলা পর্যন্ত গুণীন থামেনি।

রবির মুখের চেহারায় কিছু আন্দাজ করে তার পাশে এসে দাঁড়ালো কিশোর। বিনীত গলায় গুণীনকে বলল, বন্দুকটা দিয়ে দিন।

কিশোরকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো গুণীন। বন্দুকের নলটা

কোলাপসিবল গেটের বাইরে সামান্য ঠেলে দিয়ে ট্রিগারে আঙুল রেখে সে বলল, যতো নষ্টের গোড়া তুই। আজ তুকে গঁজ করবো।

কিশোরের বুকে তাগ করা বন্দুক দেখে ভয়ে শিউরে উঠলো অজিত। হাওয়ায় দুলছে বয়রা গাছের ছায়া। শ্বাস বন্ধ করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের মানুষ। দোতলার বারান্দায় ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলো গুণীনের কচি মেয়ে। হঠাৎ একলাফে কোলাপসিবল্ গেটের সামনে এসে বন্দুকের নলে বুক ঠেকিয়ে রবি বলল, হপনবা, আমাকে গুল্লি মার। তু গুল্লি চালা আমার বুকে।

মাথার দুপাশে দু'হাত তুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবি। তার ফুস্‌ফুস ছুঁয়ে আছে বন্দুকের কালো নল। এক কথা সে বলে চলেছে, হপনবা, তু গঁজ কর আমাকে।

গুণীনের কপালের চামড়া কাঁপছে। অল্প টেনে নিয়েছে বন্দুক। ট্রিগারে আঙুল নেই। ঘটনা দেখে বরুণ বিরক্ত। গান্ধীমার্কা এ এ্যাকশন্ পার্টিলাইনের বিরোধী। গুণীনের মুখ চোখ দেখে কিশোরের মনে হলো, রবির ওপর গুলি চালাবার আগে লোকটা আর একবার ভেবে নিচ্ছে। ভয় পেল কিশোর। বন্ধ কোলাপ্‌সিবল গেট দুহাতে ধরে চোখ বুজে রবি দাঁড়িয়ে আছে। বুলেটের স্পর্শ বুকে না পেলে সে যেন আর চোখ খুলবে না। আশা, নিরাশায় দুলছে অজিত। কী ঘটবে, বুঝতে পারছে না সে। অপলকে রবির দিকে তাকিয়ে আছে গুণীন। হঠাৎ বন্দুকটা পাশে রেখে কোলাপ্‌সিবল্ গেটের তালা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো সে। রবির কাঁধে হাত রেখে বলল, নে। বন্দুকটো নে।

এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বলল, যাবার আগে স্লুগান্ লাগাস। সবাইকে জানিয়ে যা আমার বন্দুক লুঠ হঁয়ে গেঁইলো। তা না হল্যে ফিন থানা, পুলিশের ঝকমারি।

চাতাল থেকে বন্দুকটা এনে বরুণের হাতে দিল রবি। ঘন ঘন স্লোগান উঠছে। রবির কানে মুখ লাগিয়ে মোতি বলল, সাবাস!

ছত্রিশ

যমুনার মুখ দিয়ে একমাস আগে প্রথম রক্ত উঠেছিল। তারপর আরও তিন চারবার রক্ত উগরেছে সে। নানা দুশ্চিন্তা, ঝামেলায় দিবাকর এমন জেরবার যে, এ ঘটনায় মাথা ঘামাবার সময় পায়নি। মাথা ঘামিয়ে সে করবে কি? দিবাকর জেনে গেছে, পৃথিবীতে সুখ নেই, শান্তি নেই, মৃত্যু পর্যন্ত দগ্ধাতে হবে তাকে। ধীরে ধীরে যমুনা মরছে টের পেয়েও হাত পা গুটিয়ে বসেছিল দিবাকর।

হঠাৎ সকালে রক্তবমিতে যমুনা ঘরের মাটি ভাসিয়ে দিতে দিবাকরের ঘোর কাটলো। চমকে গেল সে। চামড়াজড়ানো কঙ্কালসার যমুনাকে দেখে নিজের বৌ বলে চিনতে পারলো না। অনুশোচনায় বুক ফেটে যাচ্ছে তার। ভিজে গামছায় মায়ের মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে মাধু। অসহায় চোখে দেখছে দিবাকর।

গত একমাসে গোল্লায় গেছে তার সংসার। পুলিশ, মিলিটারির সঙ্গে দিনরাত ছুটছে সে। ঘেরাও, কোম্বিং, অ্যারেস্ট, খুন দেখে দেখে হেজে গেছে দুচোখ। সব অপারেশনের ছক কষছে কলকাতার এক জাঁদরেল পুলিশকর্তা। থানার পুরোনো বড়োবাবু বদলি হবার পর নতুন যে এসেছে, সে ক্ষ্যাপা বাঘ। সারাক্ষণ গর্জাচ্ছে। তার দাপটে খাঁকি পোশাক, কোমরের বেল্ট্ খোলার সময় পাচ্ছে না দিবাকর। চব্বিশঘণ্টা ভোঁ ভোঁ করছে তার মাথা। খিদে নেই, ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই, ঝাপসা দেখছে সে। ইট, কাঠ পাথরের মতো আড়ষ্ট মনে হয় নিজেকে। সহকর্মীদের সন্দেহ, দিবাকরের মাথা গোলমাল করছে। শুকলাল একদিন বলল, দাদা, কয়েকদিন ছুটি নাও।

রামদয়াল সায় দিল, অনেক হলো, এবার থামো।

তাদের কথা শুনে চুপচাপ, হাবার মতো তাকিয়ে থাকলো দিবাকর। একটা কথা বলতে পারলো না। *তাকে দেখলেই নতুন বড়োবাবু তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। অকথ্য গাল দেয় আর বলে, যতো বুড়োহাবড়া, ওয়ার্থলেস্ চেপেছে আমার ঘাড়ে। সব শালাকে দূর করে দেবো এবার।*

গালমন্দ শুনেও এখন দিবাকরের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। দিন, রাত মিলিয়ে তিন, চার ঘণ্টার বেশী ঘুমোতে পারে না। ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেও ফেরার কাউকে ধরার জন্যে তার দৌড় থামে না। নিষ্ঠুর এক চাবুক তাড়িয়ে বেড়ায় তাকে। ডজন ডজন মরা মুখ, তাদের রক্ত, কাতরানি, বিভীষিকা দেখায়। দিবাকর আঁতকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়!

সিউড়ি জেলে একদিন স্বাধীনকে দেখতে গিয়েছিল দিবাকর। জেল গেটে দাঁড়িয়ে বুকের মধ্যে সে কি ধড়ফড়ানি। দম আটকে যাচ্ছিল। দিবাকর ভেবেছিল, তার সামনে এসে দাঁড়াবে, ভগ্নস্বাস্থ্য, আধমরা স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীনকে দেখে

তাজ্জব হয়েছিল দিবাকর। ছেলে হাসছে। তার মুখে ভয়, কাতরতার চিহ্ন নেই। উনিশ, কুড়ি বছরের ছেলেটার মনের জোর অবাক করেছিল দিবাকরকে। স্বাধীন বলেছিল, আমরা চোর, ডাকাত নই। কোনো অন্যায় করিনি।

আরও কতো কথা যে ছেলেটা বলেছিল, দিবাকরের মনে নেই। সে সব কথা আগে কখনও শোনেনি সে। স্বাধীন যে তার ছেলে, ভাবতে অসুবিধে হলেও চাপা অহমিকা জেগেছিল মনে। বাড়ি ফিরেও বুকের মধ্যে উথালপাথাল, টানাপোড়েন। দিবাকর ঠিক করল, চাকরিতে আর যাবে না সে। চাকরির কোনো দরকার নেই। কিন্তু এ চিন্তা মুছে যেতে বেশী সময় লাগলো না। বাড়িতে বসে থাকার উপায় কোথায়? থানার এত্তেলা আসছে চব্বিশ ঘণ্টা। ডিউটিতে ছুটতে হচ্ছে রাজনগর থানার বাইরে দুবরাজপুর, ইলামবাজার, সিউড়ি। রামপুরহাটেও যেতে হয়েছে দু'তিনবার। সকালে মুশাবনি ঘেরাও শেষ করে সন্ধ্যের আগেই ছুটতে হলো অবিনাশপুর তারপর গুরুলগাছি। ছুটোছুটির যেন শেষ নেই। গতকালই সিউড়ির হায়াতপুর, পার্বতীপুর, সাজিনা, কুবিলপুর, কোটা, শীর্ষায়, কোম্বিং অপারেশনে সি· আর. পি, পুলিশ বাহিনীর সঙ্গী ছিল দিবাকর। রাত শেষ হবার আগে ঘর থেকে বেরিয়ে ফিরেছিল পরের দিন প্রায় মাঝরাতে। জিপে কলকাতার অফিসার, থানার বড়োবাবু, দু'তিন লরি সশস্ত্র বাহিনী. গ্রামরক্ষী, চৌকিদার, সব মিলে এক এলাহি কান্ড। যেন যুদ্ধে যাচ্ছে সবাই। লাগাতার ঘেরাও, কোম্বিং, গুলি, খুন দেখে দিবাকরের শরীর কাঁপছিল। কালই সাতজন তরুণকে মরতে দেখেছে দিবাকর। বড়োবাবু যে দু'জনকে গুলি করে মারলো, তারা স্বাধীনের সমবয়সী। সি. আর. পি., গ্রামরক্ষীরা রাইফেলের কুঁদো, লাঠি পিটিয়ে খুন করল পাঁচজনকে। যে গ্রামেই তারা ঢুকেছে. সেখানেই গ্রেপ্তার, মারধোর, রক্তপাত ঘটেছে। গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়েও অনেক রেহাই পায়নি। জঙ্গলের একপাশে দুটো যুবতী মেয়েকে ল্যাংটো করে পাঁচ, সাতজন সি. আর. পি. ধমকাচ্ছিল। দিশাহারা দিবাকর পালিয়ে গিয়েছিল সে জায়গা ছেড়ে। তারপর কী ঘটেছে, দিবাকর জানে না। ফাঁকা মাঠে একা দাঁড়িয়ে দিবাকরের মনে হয়েছিল, হঠাৎ বিদেশ বিভুঁই হয়ে গেছে তার চেনা দেশ গাঁ। পাঁচ, সাতটা গ্রামে ঘেরাও-এর পর সাতটা লাশ, দু'ভ্যান ভর্তি ষাট সত্তরজন আধমরা বন্দী আর লুটের মাল নিয়ে পুলিশবাহিনী যখন সিউড়ি থানায় ফিরলো, পৃথিবীতে তখন অন্ধকার নেমেছে। ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছিল দিবাকরের মাথা।

গামছায় যমুনার মুখ মুছে দিয়ে তাকে জল খাওয়াচ্ছে মাধু। একটু আগে ভিজে চটে ঘরের রক্ত মুছে গোবর জলে নিকিয়েছে সে। মেয়েটাই এখন আগলে রেখেছে সংসার। গতকালের ঘটনার পাশাপাশি দিনকয় আগে পারুল গ্রামে ঘেরাও-এর স্মৃতি মনে পড়লো দিবাকরের। তার সামনে মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠেছিল এক চেনা মুখ। ছেলেটাকে আগে কোথায় দেখেছে, খেয়াল করতে পারলো না দিবাকর। তাঁতিপাড়ায় রঞ্জন, বাবলু, শিবেনের সঙ্গে হয়তো দেখেছে তাকে। পাশের কোনো

গাঁয়েও দেখে থাকতে পারে। রাজনগর ছেড়ে এই দূর গাঁয়ে ছেলেটা কেন এসেছে, মালুম পেল না দিবাকর। রক্তমাখা পোশাক, হাতে লাল বই ছেলেটা ভয়ে কাঁপছিল।

চৌহদ্দির শেষ সীমায় নদী পেরিয়ে পারুল গ্রাম। সারা রাত তাণ্ডবের পর বাহিনী ক্লান্ত। দিবাকরকে নিয়ে পাঁচ, সাতজন সি. আর. পি. গ্রামে ঢুকেছিল। খাঁখাঁ শূন্য গ্রাম। দু'চারজন অথর্ব, অসুস্থ বুড়োবুড়ি কিছু কচিকাঁচা বাচ্চা ছাড়া পালিয়েছে সবাই। অচেনা জায়গায় আটকে পড়েছে ছেলেটা। ফ্যাকাসে মুখে সে দেখছিল দিবাকরকে। একপলক ছেলেটাকে নজর করে বিবশ হলো দিবাকর। স্বাধীন, মাধু নিশ্চয় চেনে এ ছেলেকে। হয়তো তাকেও চিনেছে ছেলেটা। বাইরে কয়েকজোড়া ভারি বুটের শব্দ। নাম ধরে দিবাকরকে ডাকলো একজন। কেঁপে উঠলো সে। চড়া রোদ ছিল আকাশে। ফিসফিস করে ছেলেটাকে দিবাকর বলল, চুপ মেরে থাকো। সাড়া করো না।

তারপর ঘর ছেড়ে দাওয়ায় এসে পুলিশবাহিনীকে বলল, সব শালা ভেগেছে। কেউ নেই।

ঝমঝম শব্দে মেলট্রেন ছুটছিল তার বুকে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তার ভাগ্য ভালো, সারারাতের ধকলে ক্লান্ত পাঁচ সি. আর. পির কেউ ঘরে ঢুকলো না। নদী পেরোবার সময় কলকাতার পুলিশ সাহেবকে অশ্লীল গাল দিচ্ছিল তারা। জেলায় মিলিটারি নামলেও সরকারের জামাই তারা। পুলিশ, সি. আর. পি ব্যর্থ হলে ফৌজিরা বেরোয়। সে রাতের ঘেরাওতে সামরিক বাহিনীর একজনও ছিল না। সাঁইথিয়া থানার কনস্টেবল, গোকুল নন্দী দু'বছর আগে রাজনগর থানায় কাজ করে গেছে। তার সঙ্গে তখন থেকে দিবাকরের খাতির। আড় বাঁশি বাজায় চমৎকার। নদী পেরোবার সময় দিবাকর দেখলো হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে মুখে, চোখে জল দিচ্ছে গোকুল। তার দুচোখের নিচে ঘন কালি, চোয়াল ভেঙে গেছে। দিবাকরকে দেখে গোকুল বলেছিল, আর পারা যায় না। পাগল হয়ে যাবো।

উত্তেজনায়, ভয়ে কথা ফুটছিল না দিবাকরের মুখে। আঁজলা ভরে নদীর জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে দিবাকর বলল, আমিও বোধহয় মরে যাবো গোকুলভাই।

দিবাকরের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় গোকুল বলল, এই পারুল গাঁয়ে আমার মামাদের ঘর। ছেলেবেলায় কতো এসেছি। এখনও আসা যাওয়া আছে।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে গলা আরও নামিয়ে গোকুল আবার বলেছিল, এখনই যাকে তুমি বাঁচালে, তাকে জন্মাতে দেখেছি আমি।

গোকুলের কথায় ধক করে উঠলো দিবাকরের বুক। নদী টপকে মাঠে গিয়ে পৌঁচেছে সি. আর. পি। গোঁত খেয়ে জলে পড়লো একটা মাছরাঙা পাখি। বাতাসে আঁশটে গন্ধ। দিবাকরের ফ্যাকাসে মুখ দেখে তার কাঁধে হাত রেখে গোকুল বলেছিল, তোমাকে দেখে বুকে বল পেলুম। এ চাকরি ছেড়ে দেবো আমি।

গোকুল কাঁদছিল। দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ নদী পার হলো।

তোমার ছেলের কী খবর?

মাঠ দিয়ে হাঁটার সময়ে গোকুলের প্রশ্ন শুনে কী জবাব দেবে ভেবে পায় নি দিবাকর।

বাইরে রিক্সার প্যাঁকপ্যাঁক ভেঁপু শুনে উঠে দাঁড়ালো দিবাকর। ঘরের ভেতরে ফিকে অন্ধকার। পাশের বাড়ির যতন রিক্সা ডেকে এনেছে। যমুনাকে নিয়ে এখনই সিউড়ির হাসপাতালে যাবে দিবাকর। তার বাড়ির উঠোনে দু'চারজন প্রতিবেশী এসে দাঁড়িয়েছে। পাঁজাকোলা করে যমুনাকে রিক্সায় তুলে তার পাশে দিবাকর বসতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মাধু। কেউ যেন নিংড়ে নিচ্ছে দিবাকরকে। বর্ষায় মাধুর ছ'মাসের ছেলেটা ওলাউঠোয় মরার পর ঠিক এ ভাবে কেঁদেছিল সে। মৃত নাতিকে পুরোনো কাপড়ে জড়িয়ে ময়ূরাক্ষীর চরে পুঁতে দিয়ে এসেছিল দিবাকর। চলন্ত রিক্সায় বসে মাধুর কান্না শুনে দিবাকরের ধারণা হলো হাসপাতাল থেকে যমুনা আর ফিরবে না।

নীল আকাশ। চারপাশে ঝকঝকে রোদ। রাস্তার পাশের বনকলমী ঝোপ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সোঁদা গন্ধ। হাঁ করে শ্বাস টানলে যমুনা। চন্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে রিক্সা চলেছে। তাঁতিপাড়ার ঘরে ঘরে তাঁতের ঠকাচ চং, ঠকাচ চং আওয়াজ। খোলামাঠে সুতো টানা, হাঁটা করছে ঘরের বৌ, অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা। কিছুদিন আগে হ্যাজাক জেবলে এই মাঠেই বিরাট সভা হয়েছিল। অন্ধকারে গা ঢেকে সে সভা দেখেছিল দিবাকর। মনে মনে বলেছিল, আমি দিবাকর মাল, চৌকিদার। সরকারের নুন খেলেও তোমাদের দুশমন নই।

কথাগুলো মুখে বলতে পারেনি। অন্ধকার খিড়কির পথে বাড়ি ফেরার সময়ে তার মনে হয়েছিল, এমন এক পেশায় যে আছে সে সদর রাস্তায় হাঁটার অধিকারও তার নেই। বাড়ির সদরের পাশে দুই ছায়ামূর্তিকে কথা বলতে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সে। কারা কথা বলছে? এক মুহূর্ত ঠাহর করে মাধু, মোতিকে চিনতে পেরেছিল দিবাকর। মাইকের আওয়াজ, হল্লায় দু'জনের কথা শুনতে না পেলেও আর একপা সে এগোয়নি। আলকাতরার মতো ঘন অন্ধকার। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। বাতাসে মিশে ছিল লালমাটির সুবাস। এ সুবাস দিবাকর চেনে। মাধু, মোতির বিষণ্ন, চাপা কথা শুনে উদাস হয়েছিল দিবাকর। অনুতাপ হচ্ছিল তার। মস্ত এক ভুল করেছে সে।

দিবাকরের কাঁধে এলিয়ে পড়েছে যমুনা। রিক্সার ঝাঁকুনিতে কাঁপছে তার শরীর। দিবাকরের মনে পড়লো, যমুনা একদিন বলেছিল, আবার বে দাও মাধুকে।

কে বে করবে?

দিবাকরের প্রশ্নে যমুনা বলেছিল, পাত্র আছে।

কে পাত্র, বুঝেছিল দিবাকর। গুড়গুড় করছিল তার বুক। আর প্রশ্ন করেনি।

বড়ো রাস্তায় পৌঁছে মুরলীর চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চে যমুনাকে শুইয়ে দিল দিবাকর। সেখানে আগেই পৌঁচেছিল যতন। রিক্সা থেকে যমুনাকে

নামাতে হাত লাগালো সে। উঠতি বয়সের দু'তিনজন ছেলে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে এলো। চেনা মুখ। যমুনাকে নামাতে তারাও সাহায্য করল। মুরলীর দোকানে এ ছেলেরা সারাদিন আড্ডা দেয়। আড্ডা আসল নয়। রাস্তার ওপর নজর রাখে তারা। পুলিশ, মিলিটারি এলে আগেভাগে তাঁতিপাড়ায় খবর পৌঁছে দেয়। মোতি, রঞ্জনদের দলে না থাকলেও এ ছেলেরা তাদের সমর্থক। দিবাকরকে দেখে তাদের মুখ, চোয়াল শক্ত হয়ে গেলেও অসুস্থ যমুনার জন্যে এগিয়ে এসেছে তারা। অসুস্থ যমুনাকে দেখছে ছেলেগুলো। যমুনার হুঁশ নেই! দোকানের পেছনে বুনো ঝোপে ডাকাডাকি করছে কয়েকটা শালিক। দুবরাজপুর থেকে একটা ভিড় বাস মুরলীর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। তাঁতিপাড়ার এটাই বাসস্টপ। বাস থেকে দু'চারজন নামলেও গাদাগাদি ভিড় কমলো না। যমুনাকে বাসে তুলতে সাহায্য করল চা-দোকানের ছেলেরা। কাণ্ডাক্টরকে একজন বলল, ইনি আমার মাসিমা। ঠিকঠাক পৌঁছে দেবেন।

বসার জায়গা পেল যমুনা। তার সামনে দাঁড়িয়েছে দিবাকর। কৃতজ্ঞতায় বুক ছলছল করলেও একটা কথা বলতে পারলো না সে। মুখ্যুলোক যে প্রাণের কথাও কখনও বলতে পারে না, ভেবে আক্ষেপ হলো তার।

থানায় খবর না দিয়ে অসুস্থ বৌকে নিয়ে শিউড়ি যাচ্ছে দিবাকর। এ জন্যে গুনাগার দিতে হবে তাকে। তার কথা হয়তো বিশ্বাস করবে না থানার বড়োবাবু। দিবাকর অসহায়। কিছু করার নেই তার। আর ভাবতে চায় না সে। শরীর, মন ভেঙে গেছে। ভাবার শক্তি নেই। গাছপালা, মাঠ, টিলার আড়ালে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তাঁতিপাড়া। চন্দ্রপুর পেরোতে দুটো কনভয় দেখলো দিবাকর। জিপ, পুলিশভ্যান, সি. আর. পি. ভরা ট্রাক এগিয়ে যাচ্ছে তাঁতিপাড়ার রাস্তায়। কোথায় যাচ্ছে ওরা? তাঁতিপাড়ায় কি কোম্বিং হবে আজ?

প্রশ্নটা মনে জাগতে চমকে উঠলো দিবাকর। জেলার বারোটা থানার বড়োবাবু বদলি হবার পর কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছে। কবে, কোথায় ঘেরাও, কোম্বিং হবে কেউ জানতে পারে না। দিবাকর ঠিক করল, সিউড়ি থেকে ফিরে মোতির সঙ্গে দেখা করবে সে। মোতিকে অনেক কথা বলার আছে তার। কথার বিষয় মাধু। তাকে আর আটকে রাখতে চায়না দিবাকর।

মোতিকে ধরতে হলে শিবেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাই করবে দিবাকর। মোতি, মাধুর সম্পর্ক শিবেন বোধহয় জানে। সে অবিশ্বাস করবে না দিবাকরকে। শিবেন একদিন বলেছিল, দিবাকরকাকা, আপনি স্বাধীনের বাবা। আমাদের শত্রু নন আপনি।

বুঝদার ছেলে শিবেন। সব কথা তাকে বলা যায়।

সাঁইত্রিশ

রেসিডেণ্ট মেডিকাল অফিসার পদে যে উৎসাহ নিয়ে রাজনগর হাসপাতালে অনুপ এসেছিল, গত দেড়বছরে তা মুছে গেছে। হাসপাতালে ডাক্তারি করার চেয়েও তার মাথায় ছিল আরও বড়ো এক কাজ। কলকাতা ছাড়ার আগে সেরকম ধারণা দেওয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু হাসপাতালে তাকে যুক্তে দেবার পর কোনো সভা, বৈঠকে ডাক পায়নি সে। দশটা, পাঁচটার চাকরিতে ভরে দেওয়া হয়েছে তাকে। মধ্যবিত্ত এই চাকরিজীবন অনুপের অসহ্য। সে বুঝতে পারছে, মুষড়ে যাচ্ছে তার আদর্শ-বোধ। শুধু বামপন্থী প্রচারপুস্তিকা পড়ে নিজেকে চাঙ্গা রাখতে পারছে না সে! মৃত সুরেনদাকে নিয়ে মাঝখানে কয়েকদিন সে ঝামেলায় ছিল। হাসপাতালে তার জিম্মায় সুরেনদার ডেড্‌বডি রেখে অজিত, বুদ্ধদেব চলে গেল। সুরেনদার বাড়িতে খবর দেবার দায়িত্ব অনুপের ঘাড়ে চাপলো। তখন প্রায় মাঝরাত। ফাঁকা হাস-পাতাল। দশ তারিখে মৃত সুরেনদাকে কাগজপত্রে ন' তারিখে ভর্তি করে নিল অনুপ। আউট ডোর টিকিটে ওষুধ, পথ্য লিখে আইনানুগ ব্যবস্থা করেও অস্বস্তি ছিল তার। আসল নামেই সুরেনদাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল সে। তারপর ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখে সুরেনদার বাড়িতে খবর দিল। বাড়ির লোক আসার আগেই হাসপাতাল ঘিরে ফেললো পুলিশ। সুরেনদার লাশ তুলে নিয়ে গেল তারা। হাসপাতালের একমাত্র নার্স অনসূয়া সামন্তকে সব কথা বলেছিল অনুপ! হাসপাতালে বলেনি। নিজের কোয়ার্টারে অনসূয়াকে ডেকে নিয়ে জানিয়েছিল। দু'বছরের চাকরিজীবনে সেই প্রথম অনসূয়াকে নিজের বাসায় ডেকেছিল অনুপ। তাকে সাহায্য করেছিল অনসূয়া। অনুপের গল্প অনুসূয়া হুবহু শুনিয়েছিল পুলিশকে। অনসূয়াকে পুরো বিশ্বাস না করেও সুরেনদার মৃত্যুর কাহিনী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল রাজনগর থানার বড়োবাবু। নিখুঁত ছিল হাসপাতালের কাগজপত্র। সকাল ন'টা নাগাদ হাসপাতালে এসে পৌঁছোলো সুরেনদার বাড়ির লোকজন। রাজনগর থানা থেকে তারা উদ্ধার করল সুরেনদার ডেড্‌বডি। কড়া পুলিশ পাহারায় দাহ করা হলো সুরেনদাকে।

তখন থেকে অনুপের ওপর নজর রাখছে পুলিশ। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার বলে এখনও সে গ্রেপ্তার হয়নি। কিন্তু যে কোনোদিন হতে পারে। এই ঝুঁকি সত্ত্বেও তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না আঞ্চলিক পার্টি। ফলে অভিমান আছে তার। জেলা জুড়ে যতো ঘটনা ঘটছে, সরাসরি কেউ তাকে জানায় না। শুধু প্যাঁচে পড়লে তার শরণাপন্ন হয়। তাঁতিপাড়ার ছেলেরাও টাকাপয়সা, ওষুধের দরকারে তার কাছে আসে। দরকার মিটে গেলে ছায়া মাড়ায় না। তার মনে

হয়, সে শুধু চাহিদা মেটাবার যন্ত্র। সুরেনদার মৃতদেহ হাসপাতালে রেখে অজিত সেই যে গেল, আর পাত্তা নেই তার। মোতি আসেনি ছ'সাত মাস। অথচ তাঁতি-পাড়ায় নিয়মিত যাতাযাত আছে তার। মোতির বাবার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে অনুপ। হপ্তায় একদিন মোতিদের বাড়ি যায়। কিছু নমুনা ওষুধ, ফল, পথ্যও মাঝে মাঝে দিয়ে আসে।

মোতিদের বাড়িতে যাবার জন্যে শেষ দুপুরে তাঁতিপাড়ার রাস্তায় আজ পা দিয়েই অনুপের গা ছমছম করল। নিস্তব্ধ পাড়া। তাঁতের শব্দ পর্যন্ত নেই। তাঁতিপাড়ায় উত্তেজনা, ভয় যে রোজ বাড়ছে, অনুপ জানে। আজ তবু অন্যরকম। মোতিদের বাড়িতে ঢুকে অনুপ টের পেল, বেশ ক'দিন সম্ভবত হাঁড়ি চড়ছে না সংসারে। অবিনাশ শুয়ছে। মোতির বাবার দিন যে ফুরিয়ে এলো, বুঝতে অসুবিধে হলো না অনুপের। মোতি আত্মগোপন করার পর থেকে এ সংসার বেহাল। এখন আরও বেড়েছে। কখনও সখনও সাহায্য করেছে অনুপ। কিন্তু একা, কতোটা করবে সে? ইচ্ছে থাকলেও পারে না। হাসপাতালের কাজের চাপও কম নয়। তাছাড়া আছে গুজবের ভয়। গুজব বানাতে, ছড়াতে গাঁয়ের মানুষ ওস্তাদ। মোতির বাড়িতে বিবাহযোগ্য এক বোন আছে। ইন্দুর সঙ্গে তাকে জড়িয়ে যদি একটা গল্প রটে যায়, লজ্জা পাবে সে। গল্পটা ষোলআনা কাল্পনিক নয়। ইন্দুর সামনে দাঁড়ালে অনুপ কেমন আবিষ্ট হয়ে যায়। চোখ তুলে না তাকিয়েও ইন্দু হয়তো বুঝতে পারে সব। তার ফ্যাক্যাসে অপুষ্ট শরীরে ঝলমল করতে থাকে এক স্নিগ্ধ মায়া। এই অভাবী সংসারে রূপবতী মেয়েটা যে তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে, দেখে ভারি ব্যাকুল হয় অনুপ। তখনই গ্লানি বোধ করে সে। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। এক, দু'হপ্তা আর তাঁতিপাড়া মাড়ায় না সে।

অবিনাশের নাড়ি, বুক দেখে বিছানার পাশ থেকে উঠে পড়লো অনুপ। অবিনাশের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দু। তার ডাগর, কালো দুটো চোখের পাতায় উপছে পড়ছে জল। অনুপের মুখ দেখে বাবার অবস্থা বুঝে ফেলেছে ইন্দু। ঘোমটায় মুখ ঢেকে ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দুর মা। উপোস, কষ্ট ভুলে অনুপের দিকে তাকিয়ে আছে মোতির ছোট ভাইবোনরা। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো অনুপ। আজ রাত, হয়তো কাল সকাল পর্যন্ত টিঁকে থাকবে অবিনাশ। তার বেশী নয়। মরে বেঁচে যাবে মানুষটা। তারপর? বিপন্ন বোধ করে অনুপ। মোতির ওপর রাগ হয়। নিজের সম্পর্কেও ধিক্কার জাগে। দাওয়া ছেড়ে উঠোনে এসে ইন্দুর দিকে তাকিয়ে অনুপ বলল, কাল দুপুরে আসবো।

দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দু। ঠোঁট কাঁপছে তার। পেছনে বাঁশবনে রঙীন ধোঁয়ার মতো জমে আছে বিকেলের আলো। মোতিদের বাড়ির সামনের রাস্তায় এসে অনুপ দেখলো, মরা বিকেল। ছায়া নেমেছে পৃথিবীতে। কয়েকটা শালিক একঘেয়ে ডেকে যাচ্ছে। সদর রাস্তা ছাড়িয়ে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে রাজনগর পর্যন্ত পায়ে চলা সরু একটা পথ আছে। পথটা নির্জন। হাঁটতে ভালো লাগে। পাঁচ-জনের নজর এড়াতে এ পথেই যাতায়াত করে অনুপ। পাঁচ মিনিট হেঁটে বাঁশবন,

ঝোপঝাড় পেরোলেই ফাঁকা মাঠ। পাথুরে জমি। চাষ, আবাদ হয় না। নিস্তব্ধ, জনহীন বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নানা কথা ভাবছে সে। সুস্থির হচ্ছে এক গোপন বাসনা। মোতির মাকে কথাটা বলা কি ঠিক হবে? অভাবী, নিরক্ষর মহিলা হয়তো আকাশ থেকে পড়বে। ইন্দুকে অনুপ বিয়ে করতে চায়, অসম্ভব মনে হবে। ভয় পেয়ে যাবে মোতির মা। তাকে বোঝাবে অনুপ। বুঝিয়ে রাজি করাবে। এ ঘটনা ঘটতেই পারে। অসম্ভব কিছু নয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে অবিনাশ। লোকের হাট বসবে বাড়িতে। তারপর শুরু হবে অশৌচ। দশ, পনেরো দিন, একমাসও অশৌচ চলতে পারে। অশৌচ, শোক একটু হালকা হলে মোতির মাকে অনুপ জানাবে তার প্রস্তাব। ইন্দুকে বিয়ে করার পাকা সিম্ধান্ত নিয়েছে সে।

বাঁশবনের শেষে কয়েকটা ঝাঁকড়া ছাতিম গাছ। কিছু শালগাছ এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। ছায়া ছায়া, অন্ধকার পথ। ইন্দুকে বিয়ের সিম্ধান্ত নিয়ে ফুরফুরে লাগছে অনুপের মেজাজ। বিধবা মা নিশ্চয় অমত করবে না। বরং খুশি হবে। ছোট বোন সহেলির বিয়ে দিতে হবে অনুপকে। দায়িত্ব পালন করবে সে। ছাতিম, শালের জঙ্গল ধরে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো অনুপ। ডান পাশে হঠাৎ যেন নড়ে উঠলো শ্যাওড়া ঝোপ। একমুহূর্ত তাকালো সে। নাহ্, মনের ভুল। আবার চলতে শুরু করল। তখনই তাকে ঘিরে ফেললো চারজন ছেলে। তার কানের পাশ ঘেঁসে ঝিলিক দিয়ে সরে গেল ধারালো একটা হেঁসো। এক লহমার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার পর অসাড় হয়ে গেল শরীরের বাঁ দিক।

কেউ একজন বলল, নাহ্, সে লোক নয়।

জোর ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল একজন। শুকনো কুটোপাতা মাড়িয়ে দ্রুত চলে গেল চারজন। মাটি আঁকড়ে ওঠার চেষ্টা করলো অনুপ। টলমল করছে শরীর। কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। রাত যেন লাফিয়ে বেড়ে গেছে। আক্রমণকারীদের দু'জনকে চিনেছে অনুপ। তারাও চেনে অনুপকে। ভালোরকম চেনে। কানের ওপর হেঁসো চালাবার আগেই তাকে চিনেছিল। তবু না চেনার ভান করলো কেন? এক কোপ দেবার পরই বা কেন ভুল বুঝলো? ভুল যে সনাক্ত করল, তার ভুল হবারই কথা নয়।

ছাতিম বনে ঘন হয়েছে অন্ধকার। মাটি ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ কানে হাত রেখে অনুপ বুঝলো আমূল উড়ে গেছে কান। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ, গলা, ঘাড়, সোয়েটার। খালি হয়ে যাচ্ছে মাথা। কাটা জায়গায় রুমাল চেপে ধরে রাখার জোর নেই হাতে। মাঠ ছেড়ে বড়ো রাস্তায় এলো সে। অন্ধকার রাস্তা। একটা ফাঁকা সাইকেল রিক্সা পেয়ে চেপে বসলো অনুপ। ডাক্তারকে চিনলেও সে যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে রিক্সাচালক বুঝতে পারলো না। হাসপাতালের গেটে পৌঁছে রক্ত দেখে প্রশ্ন সরলো না তার মুখে।

কানে, মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অনেক রাত পর্যন্ত একা বসে থাকলো অনুপ। একবার ভেবেছিল, অনসূয়ার সাহায্য নেবে। সাত পাঁচ চিন্তা করে নেয়নি।

এ্যাণ্টিটিটেনাস্ ইঞ্জেকশনও নিজে ফুঁড়লো। তবু অনসূয়াকে লুকোনো যায়নি। সে দেখে গেছে অনুপকে। রাস্তায়, হাসপাতালে দু'চারজন লোক দেখেছে তাকে। রক্তও নিশ্চয় তাদের নজর এড়ায়নি। তাদের কেউ থানায় খবর দিলে এখন, যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ আসবে। আইন অনুযায়ী যে কোনো দুর্ঘটনা, রক্তপাতের খবর পুলিশকে জানাতে হয়। এ ক্ষেত্রে খবর পেঁছাবার দায়িত্ব তার। কিন্তু কী করে পুলিশের কাছে নালিশ জানাবে সে? সে জানায়নি। খবর পেয়ে যদি পুলিশ এসে জেরা শুরু করে, কী বলবে সে? এই আত্মঘাতী, ঘরের ঝগড়ার কাহিনী পুলিশকে বলা যায় না। পুরো ঘটনাটা এখনও তার কাছে হেঁয়ালি।

এ্যাণ্টিটিটেনাস্ ইঞ্জেকশন নিয়ে ডেটল ভেজা তুলোয় সে যখন রক্ত ঠেকাতে চাইছে, ঘরে ঢুকেছিল অনসূয়া। আহত অনুপের অবস্থা দেখে ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে অনুপকে ড্রেসিং শুরু করল। নিপুণ হাতে মাথা, গলা জড়িয়ে চটপট বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজ। অনসূয়ার সাহায্য ছাড়া এতো সহজে রক্ত বন্ধ হতো না। ড্রেসিং শেষ করে অনসূয়া বলেছিল, বেশ টেম্পারেচর হয়েছে আপনার।

অনুপ কথা বলেনি। কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তার। এক মুহূর্ত চুপ থেকে অনসূয়া বলেছিল, থানায় ডায়েরি করুন।

কার নামে?

অনুপের প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল অনুসূয়া। আর কথা বাড়ালো না। তাকে এড়াতে অনুপ বলল, ঘুম পাচ্ছে।

অনসূয়া চলে যাবার পরে ঘরে যা ওষুধ ছিল, দু'একটা খেল অনুপ। নিভিয়ে দিল ঘরের আলো। অন্ধকার ঘর। যন্ত্রণায় মাথা, ঘাড়, পিঠ টাটিয়ে উঠছে। ব্যথা বাড়ছিল। বালিশে মাথা ঠেকাতে গিয়ে কষ্টে ককিয়ে উঠলো সে।

বিছানায় বসে অনসূয়ার কথাটাই ভাবছে অনুপ। কার বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করবে সে? থানার লোকেরা হাসবে। নিষ্ঠুর ঠাট্টা করবে বড়োবাবু। বলবে, এ যে সেম্‌সাইড্ হয়ে গেল ডাক্তারবাবু।

অ্যারেস্টও করতে পারে তাকে। হাজতে পোরার জন্যে লোকটা ওৎ পেতে আছে। কড়া নজর রাখছে। এ ঘটনায় মওকা পেয়ে যাবে সে। ফাঁকা, অন্ধকার ঘর। খোলা জানলার গায়ে লেগে আছে আবছা নীল আকাশ। অনেক তারা ফুটেছে। পিচের রাস্তার গায়ে হাসপাতাল। হাসপাতালের চৌহদ্দির একদম পেছনে অনুপের কোয়ার্টার। দু'ঘরের বাংলো বাড়ি। পাঁচিলের পর ধুধু ফাঁকা মাঠ। ঢেউতোলা লাল মাটি। মুখ যে ফুলে উঠছে অনুপ টের পেল। শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে ব্যাণ্ডেজ। আজ অথবা কাল এ খবর জানাজানি হবে। থানাও জানবে। বাতাসে খবর রটে এখানে। তার রক্তভেজা মুখ অনেকে দেখেছে। জ্বর বাড়ছে। অনুপের মাথায় শুধু একটা প্রশ্ন, ওরা কি সত্যি ভুল করে মারলো তাকে? কিন্তু কেন এ ভুল? দুই আক্রমণকারী খুব চেনা তার। নানা দরকারে হাসপাতালেও

তার সঙ্গে দেখা করেছে দু'জন। ছাতিম বনে এমন অন্ধকার ছিল না যে, চেনা লোককে অচেনা মনে হবে। পলকের জন্যে দেখা চেনা মুখ দুটোর নাম মনে আনার চেষ্টা করছে অনুপ। অস্থির লাগছে। স্মৃতি কাজ করছে না।

দেড় বছরের কিছু বেশী রাজনগর হাসপাতালে চাকরি করছে অনুপ। হাসপাতাল আর ডাক্তারখানার সুবাদে এলাকায় সুনাম হয়েছে তার। চাকরি, পেশায় ফাঁকি দেয়নি সে। পেশাকেও সেবার কাজ, জনসংযোগ ভেবেছে। বিনাপয়সায় গরীব মানুষের চিকিৎসা করেছে। ধনী লোকেরা টাকা দিলে না করেনি। তবে গরীব, বড়োলোক, কারও চিকিৎসায় অবহেলা দেখায় নি সে। সবাই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে মানুষ হিসেবে সে এখানে জনপ্রিয়। সকলে ভালোবাসে তাকে। সত্যি কি তাই ? কানের পাশে ঝিলিক দিল তীক্ষ্ণ ব্যথা। নিস্তব্ধ, অন্ধকার পৃথিবী। প্রশ্নটা মাথায় জাগতে ব্যথায় টনটন করছে কাঁধ, পিঠ। অনুপের মনে হলো, সবার ভালোবাসা পায়নি সে। পাওয়া সম্ভব নয়। দু'একজন শত্রু সবসময়ে থেকে যায়। তারও আছে। তাই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সে। জ্বরে পুড়ছে তার শরীর।

শৈলেন ডাক্তারের মুখ হঠাৎ অনুপের মনে পড়লো। রাজনগর হাসপাতালে সে আসার আগে এ অঞ্চলে শৈলেনের ছিল একচেটে পসার। সাবেক আমলের এল. এম. এফ ডাক্তার হলেও তাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি মানতো এলাকার মানুষ। অনুপ পেশায় নামতে মার গেল শৈলেনের পসার। অনুপের ঘরে বাড়তে লাগলো রুগীর ভীড়। কারণ দুটো। প্রথম কারণ হলো শৈলেন ডাক্তারের মতো টাকার খাঁই অনুপের ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তার চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল শৈলেনের চেয়ে অনেক আধুনিক। ফলে তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময় হতো।

শৈলেন ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার ইচ্ছে না থাকলেও অনুপ টের পেয়েছিল, এক ঠাণ্ডাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তার ঘরে বসে কড়া ভাষায় শৈলেন ডাক্তারের সমালোচনা করতো কিছু রুগী। অনুপের সামনেই তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতো অনেকে। নিন্দা, প্রশংসায় কান দেয় নি সে। গভীর আদর্শবোধই ছিল তার কাজের প্রেরণা। ফলে দ্রুত বাড়ছিল তার সুনাম, প্রভাব। তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর সাফল্যে শৈলেন যে চটছে, আভাস পেয়েছিল অনুপ। মাঝখানে এক বিয়েবাড়িতে শৈলেনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। প্রথম আলাপে মানুষটাকে অনুপের খারাপ লাগেনি। দিলখোলা, উদার মনে হয়েছিল। হাসতে হাসতে শৈলেন বলেছিল, আমার ছেলেটা নকশাল হয়ে গেছে।

শৈলেনের কথা শুনে চমকে উঠলেও চুপচাপ ছিল অনুপ। কোনো আগ্রহ দেখায় নি। অনুপ জানে, কথা না বাড়িয়ে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। দু'চার দিনের মধ্যে তার সঙ্গে নার্স অনসূয়াকে জড়িয়ে চোরা অপবাদ রটনা শুরু হয়েছিল। তাকে লম্পট, চরিত্রহীন প্রমাণই ছিল এ প্রচারের উদ্দেশ্য। একজন কলঙ্কিত ডাক্তার দেশ গাঁয়ে, হালে পানি পায় না। তাকে বাড়িতে ডাকতে ভয় পায় ছাপোষা, সাধারণ

মানুষ। একঘরে হয়ে পড়ে সে ডাক্তার। তাকে হঠাবার জন্যে আড়াল থেকে শৈলেন কলকাঠি নাড়ছে, জানতে পেরেও অনুপ চুপচাপ ছিল! বেড়ে গিয়েছিল তার কাজের নিষ্ঠা।

দিনের আলোয় ঘরের জানলা দিয়ে তরণী পাহাড় পর্যন্ত দেখতে পায় অনুপ। ঘন অন্ধকারে আকাশ, পাহাড়, মাঠ, মাটি এখন একাকার। ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাটি থেকে বিশ ত্রিশ ফুট ওপরে জ্বলে উঠলো একটা হাউই। বাজিটা বাতাসে ভাসছে। ছড়িয়ে পড়ছে ঝকঝকে আলো। সাধারণ হাউই এর মতো তেড়েফুঁড়ে জ্বলে উঠে চট করে নিভলো না এ বাজি। তিন, চার মিনিট জ্বললো। আলোর দিকে তাকিয়ে গুলির ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে কান পেতে আছে অনুপ। এখনই শুরু হবে ফায়ারিং। কিন্তু তেমন কিছু ঘটলো না। ফাঁকা মাঠে তার মানে একজনও পার্টিকর্মীকে পায় নি পুলিশ। রাতের অন্ধকারে পার্টির ছেলেদের ধরার জন্যে পুলিশ আমদানি করেছে এই নতুন জাতের হাউই। হাউই-এর প্রখর আলোয় রাইফেল, বন্দুকে লক্ষ্যভেদ করা সহজ। এগুলো সেনাবাহিনীর রসদ। অন্ধকার যুদ্ধের মাঠে এ হাউই ব্যবহার করে তারা। অন্ধকার মাঠের মাঝখানে আবার একটা হাউই জ্বলে উঠতে শৈলেন ডাক্তারের ছেলের নামটা অনুপের মনে পড়লো। বাবলু। হ্যাঁ, শৈলেনের ছেলের নাম বাবলু। হেঁসো হাতে ছেলেটাকে এগিয়ে দিয়ে পরমুহূর্তে যে ডেকে নিয়েছিল, বাবলু ছাড়া আর কেউ নয় সে।

কথাটা ভেবে চড়চড় করে উঠলো মাথা, কান ঢাকা অনুপের ব্যাণ্ডেজ। প্রবল চাপে ব্যাণ্ডেজটা যেন ছিঁড়ে, ছিটকে পড়বে। চার দিন আগে পুলিশের হাতে রঞ্জন ধরা পড়ায় এলাকার নেতা এখন বাবলু। লোকমুখে অনুপ শুনেছিল এ খবর। বুদ্ধিমান চটপটে ছেলে ছিল রঞ্জন। রাজনগর হাসপাতালে অনুপের কাছে বহুবার এসেছে সে। তার সঙ্গে দু'তিনবার বাবলুকে দেখেছে অনুপ। বাবলুর সঙ্গে কথাও বলেছে সে। রঞ্জনের সঙ্গে দু' তিনবার হাসপাতালেও এলেও অনুপের সঙ্গে খুব অল্প কথা বলেছে বাবলু। মিতভাষী বাবলুকে অনুপের খারাপ লাগেনি। ডাক্তার বাপের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় রঞ্জনের আগেই বাড়ি ছেড়েছিল বাবলু। বছর খানেকের বেশী গা ঢাকা দিয়ে আছে সে। বাবলুর যাবতীয় খবর অনুপকে শুনিয়েছিল রঞ্জন।

টুকিটাকি স্মৃতি মনে পড়তে অসহায় বোধ করছে অনুপ। অন্ধকার আকাশের তলায় জটিল এ পৃথিবীতে পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। মুখ দেখাদেখি না থাকলেও বাপ সম্পর্কে আজও বাবলুর দুর্বলতা আছে। থাকতেই পারে। সব ছেলেই ভালোবাসে তার বাবাকে। কিন্তু বাবলুর ব্যাপারটা অন্য। বাইরে বিদ্বেষের কথা বলে গোপনে বাবার উপকার করতে চায় বাবলু। অনুপ যে তার বাবার প্রতিদ্বন্দ্বী, বাবলু বুঝেছিল। টের পেয়েছিল শৈলেন ডাক্তারের পেশাগত অসহায়তা। সেই থেকে ক্ষোভের বদলে বাবার ওপর বাবলুর অনুরাগ বাড়তে শুরু করল। বাবার উপকারে কিছু একটা করার চিন্তা জাগলো তার। অনুপের সামনে এলে তাই বোবা হয়ে যেত বাবলু। শক্ত হতো তার চোয়াল। রাজনগর হাসপাতাল থেকে অনুপকে

হঠালেই যে বাবার সবচেয়ে বড়ো উপকার হবে, আঁচ করেছিল বাবলু। প্রাণে না মেরে অনুপকে তাই অপদস্ত করার ছক কষলো সে। বাবলু বুঝেছিল, কান কাটার লজ্জা সামলাতে পারবে না অনুপ। ঠিক বুঝেছে বাবলু।

আর ভাবতে পারছে না অনুপ। অবশ, ভারহীন লাগছে নিজেকে। গতবছর এ সময়ে বিদেশে যাবার একটা সুযোগ পেয়েছিল সে। আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেসের এক হাসপাতাল সরাসরি চাকরির আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাকে। কলকাতা থেকে ছোট বোন সহেলি রিডাইরেক্ট করে রাজনগরে পাঠিয়েছিল সে চিঠি। দু'মাসের মধ্যে কাজে যোগ দেবার অনুরোধ ছিল চিঠিতে। হিসেব করে অনুপ দেখেছিল, দুটো সংসারের খরচ চালিয়েও বেঁচে যাবে মাইনের অর্ধেক টাকা। সে অর্ধেকও রাজনগর হাসপাতালের ছ'মাসের মাইনের চেয়ে বেশী। সুখ, সম্পদে উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ বয়ে এনেছিল সে চিঠি। অনেক ভেবেও কী করবে, বুঝতে পারেনি। গাড়ি, বাড়ি, স্বচ্ছলতা, পৃথিবীতে কতোদিন, এ প্রশ্ন জেগেছিল তার মনে। পৃথিবীর আয়ু এবং মানুষের পরমায়ুর তুলনামূলক চিন্তায় তিন, চার রাত না ঘুমিয়ে কেটেছে। ঘরের সামনে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে সকাল হয়েছে। তখনই এক ভোর রাতে কিশোর এলো। শান্ত, নিরাসক্ত কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিমেষে মুছে গেল অনুপের মোহ। লস্ এঞ্জেলেসে যাবার কথা ভাবার জন্যে লজ্জা হলো তার। কলকাতায় এক নামী ব্যাঙ্কে মোটা টাকার চাকরি ছেড়ে যে বন্ধু গাঁয়ে চলে আসতে পারে, নিজের আত্মত্যাগের কথা একবারও শোনায় না, তার পাশে অনুপের খেলো মনে হয়েছিল নিজেকে। মুছে গিয়েছিল আকাঙ্ক্ষা, লোভ। কিশোর মনে করিয়ে দিয়েছিল, জীবন এক ব্রতপালন। মরা না পর্যন্ত ব্রতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কিশোরকে দেখেই আমেরিকা যাবার ইচ্ছে ঝেড়ে ফেলেছিল অনুপ। অনেক কাজ, দায়িত্ব আছে।

একটা ক্যাপসুল খেয়ে বারান্দায় চেয়ারে এসে বসলো অনুপ। এ দেশে তার প্রয়োজন শেষ। সন্ধ্যের পর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে। শরীরে যন্ত্রণা, জ্বর। রাজনগর ছেড়ে যাবে কাল। ভোর পাঁচটার প্রথম বাসে বোলপুর পৌঁছে, তারপর ধরবে কলকাতার ট্রেন। এখন মাত্র দু'জন রুগী আছে হাসপাতালে। সংকটাপন্ন নয় কেউ। হাসপাতালের বাকী আটটা বেড খালি। ফসল কাটার সময়ে হাসপাতালে রুগী পাওয়া যায় না। সুতরাং সে চলে গেলে বিপদে পড়বে না কেউ। বিপদ হলেও কিছু করার নেই তার। বিকেল থেকে মুছে গেছে তার উচিত, অনুচিতের ধারণা। বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকলো অনুপ। আলো জেলে একটা চিঠি মুসাবিদা করতে বসল সে। হাত কাঁপছে, লাইন বেঁকে যাচ্ছে, শব্দ খুঁজতে যন্ত্রণায় টনটন করছে মাথা। সাড়ে সাত লাইনে শেষ হলো পদত্যাগপত্র। খামের ওপরে জেলা মেডিক্যাল অফিসারের নাম লিখে চিঠিটা ভরে ফেললো। ভোরে হাসপাতালের লেটার বক্সে চিঠি ফেলে চলে যাবে অনুপ। অনসুয়া সামন্তের হাতে চিঠি পৌঁছে দিলেও পেয়ে যাবে জেলার মেডিক্যাল অফিসার। কিন্তু শেষ রাতে অনসুয়ার ফ্ল্যাটের দরজায় টোকা না দেওয়াই ভালো। চাকরি ছেড়ে তার চলে যাবার খবর

শুনে অনসূয়া হয়তো এমন প্রশ্ন করবে, যার জবাব অনুপ জানে না। ইন্দুর করুণ, স্নিগ্ধ মুখ হঠাৎ মনে পড়লো তার। উদ্বেল কান্নায় কুঁকড়ে গেল বুক। খামে ভরা চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে জাগলো তার। অনুপ সামলে নিল নিজেকে। আবেগে সে আর ভাসবে না। যুক্তিবাদী হবার বয়স হয়েছে তার। পিছুটান কাটাতে হবে। তাছাড়া এক কান কাটা কদাকার এ মুখ নিয়ে ইন্দুর সামনে কীভাবে দাঁড়াবে সে? তাকে হয়তো আর পাত্তা দেবে না ইন্দু।

গভীর হচ্ছে রাত। আলো নিভিয়ে দিতে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হলো ঘর। মুছে ফেলতে চাইলেও ইন্দুর মুখ, চোখ, চুল, চাহনি, নীরবতা অনুপের মনে ঝড় তুলেছে। রাজনগর ছেড়ে তার চলে যাবার খবরে ইন্দু কাঁদবে। হয়তো ভুল বুঝবে কিশোর। তীব্র জ্বালা, অস্বস্তি বোধ করে অনুপ। চেয়ার ছেড়ে আলো জেবলে সুটকেস গোছাতে শুরু করে সে।

আটত্রিশ

জেলায় আড়াইশো বন্দুক দখলের পরেও সি. আর. পি. রাজ্যপুলিশের তৎপরতা কমেনি। দখল করা চল্লিশটা বন্দুক উদ্ধার করেছে তারা। অস্ত্র-মজুতের গোপন জায়গাগুলো জেনে যাচ্ছে। ধরপাকড় বাড়ার সঙ্গে বন্দুকের ভাঁড়ার বাঁচাতে এলাকা-পার্টির তাই ঘাম ছুটে যাচ্ছে। তালগাছের মাথায়, পুকুরের পাঁকে, খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখার জন্যে বেশিরভাগ বন্দুক অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অযত্নে বন্দুকের নলে জমেছে মাটি, ট্রিগার অচল, কুঁদো খুলে গেছে। কার্তুজে প্রাণ নেই। বাকী দুশো বন্দুক উদ্ধারে এখনও ব্যাপক তল্লাসী চালাচ্ছে পুলিশ। বন্দুকের খোঁজে তারা ঘুলিয়ে তুলছে পুকুর, ডোবার জল, খড়ের গাদায় আগুন দিচ্ছে। পুলিশের সঙ্গী এক, দু'জন পাকা গেছো। সন্দেহজনক গাছ দেখলেই, তার টঙে গেছোকে তুলে দিচ্ছে পুলিশ। জীবনের মূল্যে পাওয়া হাতিয়ারগুলো এভাবে বেহাত হওয়ায় গেরিলা-বাহিনীর অনেকে মুষড়ে পড়ছে।

তাঁতলুই থেকে চারটে বন্দুক পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যাবার পরেও গণফৌজ গড়ার সিদ্ধান্ত বহাল আছে। চারটে হাতছাড়া হলেও এলাকায় এখনও থেকে গেছে বাইশটা বন্দুক। বাইশটা কম কথা নয়। কিন্তু আর দেরী করা চলবে না। ভাঁড়ারে যে কটা বন্দুক আছে, সেগুলো জড়ো করে কাজে নামতে হবে। দেরী হলে বাইশটা বন্দুকও হয়তো হাতছাড়া হবে।

গণফৌজ গড়ার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিতে বাহেঙ্গায় সভা ডাকলো রবি হাঁসদা। রাতে সভা। বৃন্দাবনী, টৌংরা, বাঁশকুলি, তিলাকুনি, তাঁতলুই, মাদারপুর, মুরাদগঞ্জ, কালিকাপুর, পরাশিয়া, গুরুলগাছির প্রতিনিধিরা এক এক করে বাহেঙ্গায় হাজির হচ্ছে। বাগজোড়া, দিঘুলি, আমজোড়া থেকে কেউ এলো না। এই তিন গ্রামের কোনো প্রতিনিধি যে সভায় আসবে না, আঁচ করেছিল কিশোর। তিন গাঁয়ে বরুণের ভালো প্রভাব আছে। সভায় আসার বদলে কিশোরের নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছে বরুণ। চিঠি বয়ে এনেছে বাগজোড়ার জিয়ন মুর্মু। সভা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে বরুণ। ব্রজদার জায়গায় বরুণ এখন আঞ্চলিক কমিটির নেতা। পদাধিকার জাহির করেছে সে। চিঠি পড়ে, ট্যাঁকে গুঁজে রাখলো কিশোর। সভা বন্ধের ফতোয়া মানতে রাজি নয় সে। প্রায় একডজন গ্রামের গেরিলা কমান্ডাররা সভায় এসেছে। সভা মুলতুবির কথা শুনে হতাশ হবে তারা।

জিয়নকে সঙ্গে নিয়েই বুধনের বাবার সঙ্গে কথা বলছে কিশোর। বাহেঙ্গায় ঢুকে বুধনের মাকে প্রথমে তার ছেলের খবর জানিয়েছে সে। দুমকা জেলে বুধন আছে। ভালো আছে সে। দুমকার পার্টি এ খবর কিশোরকে পাঠিয়েছে। ছেলের খবর

পেয়ে বুধনের মা খুশি। অজিত, লালমুনির বিয়ের কথা আজই পাকা করতে চায় কিশোর। বুধনের বাবাকে প্রসঙ্গ জানাতে সময় নিচ্ছে সে। সঙ্কোচ হচ্ছে তার। গাঁয়ের ছেলে, মেয়ে সকলেই অজিত, লালমুনির সম্পর্ক জানে। লালমুনির মা-ও যে এ বিয়েতে অরাজি নয়, এ খবর কিশোর পেয়েছে। উঠোনে একটা চারপাই-এর ওপর বসে আছে বুধনের বাবা। পাশে কিশোর। দাওয়ায় বসেছে জিয়ন। জিয়নের সঙ্গে কথা বললেও বুধনের মায়ের কান রয়েছে উঠোনে। স্বামীর সঙ্গে কিশোরের পরামর্শ শুনতে চায় সে। কিশোরের প্রস্তাব শুনে কয়েকটা রেখা জাগলো বুধনের বাবার কপালে। সন্ধ্যের আবছা আলোয় গভীর দেখাচ্ছে কপালের দাগ। বুধনের বাবা গাঁয়ের মাঝিহারাম, মোড়ল। সামাজিক নিয়ম নীতি রক্ষার দায়িত্ব তার। গত দেড় দু'বছরে বুধন এবং এলাকার রাজনীতি বয়স্ক মানুষটাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করলেও ষোলআনা বদলাতে পারেনি। একজন দিখুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া দুঃসাহসী কাজ। তবু কিশোরের মুখের ওপর সরাসরি না বলতে পারলো না বুধনের বাবা। সদর দরজা দিয়ে অজিত ঢুকছে দেখে বুধনের বাবা বলল, ঘরে ধানচাল, হাতে টাকাপয়সা নাই। দু'চার মাস যাক। তারপর।

মানুষটা যে দ্বিধায় পড়েছে, ধরতে পারলো কিশোর। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বুধনের বাবা বলল, একটা শুয়োর লাগবে, মেয়ের জন্যে রুপোর বাউটি।

সুযোগ পেয়ে কিশোর বলল, বুধনের বিয়ের জন্যে যা জোগাড় ছিল, তা দিয়েই লালমুনির বিয়ে হতে পারে। জিনিসপত্রগুলো নষ্ট হবে না। কাজে লেগে যাবে।

কিশোরের গলায় এমন সহজ আন্তরিকতা ছিল, যা স্পর্শ করল বুধনের বাবাকে। মাঝি:হারাম বলল তা বটেক। অজিতের সাথেই লালমুনির সাঙ্গা হবেক। লিচ্চয় হবেক।

বুধনের বাবার কথায় খুশি হলো কিশোর। একটা সমস্যার ফয়সালা হলো। অজিত সামনে এসে দাঁড়াতে তাকে বরুণের চিঠিটা পড়তে দিল কিশোর। গভীর মনোযোগে চিঠি পড়ছে অজিত। গম্ভীর হচ্ছে তার মুখ। কিশোর জানতো এরকম হবে। রবির ডাকা সভাকে পার্টিবিরোধী উপদলীয় চক্রান্ত বলে চিঠিতে লেখা হয়েছে। কিশোর আজকাল গায়ে মাখে না এসব অপবাদ। ঘাবড়ায় না। কিন্তু অজিত ক্ষেপে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, ফেলে দে।

অজিতের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আবার ট্যাঁকে গুঁজে রাখলো কিশোর। বাইরে শান্ত থাকলেও দপদপ করছে তার মাথা। রাস্তায় ঘন হয়েছে ছায়া। ঘরে ফেরার আগে খুব একচোট ডাকাডাকি করে নিচ্ছে একদল ছাতারে পাখি। পুনাই বাস্কের বাড়িতে আজকের সভা। সবাই অপেক্ষা করছে সেখানে। বুধনদের বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এলো কিশোর, অজিত।

পুনাই বাস্কের বাড়ির উঠোনে শোয়ানো রয়েছে বাইশটা বন্দুক। তেল দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে আজ। গণফৌজের সেনা হিসেবে যাদের বাছা হয়েছে, সেই সাত তরুণকে নিয়ে আজ সকালে বন্দুকগুলো সাফা করেছে অজিত।

ধুলো, জং ঝেড়ে ফেলায় অস্ত্রগুলো ঝকঝক করছে। কিশোর, অজিত পৌঁছোতে শুরু হলো সভা।

গণফৌজ গড়ার প্রয়োজনীয়তা রবি ব্যাখ্যা করার পর পুনাই বলল, ই ছাড়া পথ নাই। ফৌজ না থাকলে শেষ হয়ে যাবো আমরা।

সভায় হাজির গেরিলা কম্যাণ্ডাররা সমর্থন করল পুনাইকে। রবি, কিশোর, মোতিকে নিয়ে তৈরি হলো গণফৌজের কমাণ্ড। গণফৌজ সংক্রান্ত সব বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পেল তিনজনের কমাণ্ড। যুদ্ধ ছাড়া চাষাবাদ, উৎপাদনে সাহায্য করবে গণফৌজ। যোদ্ধাদের সংসার দেখভালের জন্য গড়ে তোলা হবে গরীবমানুষের গণকমিটি। তরণী পাহাড়ের গোপন এক জায়গায় থাকবে কামাণ্ডের সদরদপ্তর। গণফৌজের সব সভা বৈঠক বসবে পাহাড়ে। আপাতত আর খতম নয়, সিদ্ধান্তও হলো।

রাত বাড়তে এক কলসী হাঁড়িয়া, কয়েকটা কাঁসার বাটি আনলো পুনাই। ঘন হয়ে বসেছে সবাই। গত সাত, আট মাস পুলিশ, সেনাবাহিনীর অ্যারেস্ট, খুনজখম, তাণ্ডবে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল তারা। গণফৌজ গড়ার সিদ্ধান্ত শুনে তাদের মনে আবার ভরসা জেগেছে। এলাকায় প্রায় সব গ্রাম আক্রান্ত। প্রতিটি গাঁয়ের এক, দুজন মারা গেছে। জেলে পচছে অনেকে। পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা উপলব্ধি করেছে যে, আত্মরক্ষার আয়োজন না থাকলে আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়। আত্মত্যাগ তখন অপচয়। সাধারণ কর্মীদের এ অনুভূতি কিশোর বুঝেছে। কিশোর বলল, আত্মরক্ষায় কোনো লজ্জা নেই। আত্মত্যাগের মতো আত্মরক্ষা করাও জরুরি। আত্মত্যাগ করতে হলে আত্মরক্ষার কৌশলও জানা দরকার। গণফৌজ হলো আত্মরক্ষার মূল শক্তি।

রাত বাড়তে মাদল, বাঁশি নিয়ে কুলিতে হাজির হলো গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। শুরু হলো গণসংগীত,

মাও সেতুং বুদ্ধি গেবন পাঁজায় তাবনা
হহ এয়াবোন জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।
আরা ঝাণ্ডি লাতাররে,
জিউই জীবন চলা অরেহ বাবুন বাতাওয়া।

মাং সে-তুং এর নির্দেশে এগিয়ে যাবো। লালঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেবো। প্রাণ গেলেও আদর্শ ছাড়বো না।

গান, বাজনা চলবে মাঝরাত পর্যন্ত। সভা শেষ। সভার কাছে এগিয়ে আসছে নাচ, গানের দল। গলার স্বর বাড়ছে তাদের। বরুণের চিঠি পকেট থেকে বার করে কিশোর বলল, জরুরি আলোচনা সব শেষ। বাগজোড়া থেকে কমরেড বরুণের একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা পড়ছি আমি। চিঠি সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন।

কেরোসিনের টেমির আলোয় অনেক কষ্টে চিঠি পড়লো কিশোর। সে থামতে

লাফিয়ে উঠে বাঘা বলল, আবার পড়ো।

দ্বিতীয়বার পড়লো কিশোর।

কান খাড়া করে শুনলো সবাই। নিস্তব্ধ ঘর। উত্তেজিত বাঘা হঠাৎ প্রশ্ন করল, ইটা কীরকম হ'লো বটেক? উর কথা আমরা মানতে লারবো।

মুরাদগঞ্জের মানসিং মাঝি প্রশ্ন করল, কিন্তু পার্টির হুকুম কি উড়াতে পারবি তুই?

বাঘা চুপ। কিশোরকে ভাঙা গলায় রবি বলল, ইটা তুই কী করলি কমোরেট! তুকে লিখা চিঠি সভায় পড়লি ক্যানে?

রবির কাধে হাত রেখে নরম গলায় কিশোর বলল, ঘটনা লুকিয়ে কী লাভ? সবকিছু খোলামেলা আলোচনা হওয়া ভালো।

•

উসখুস করছে সবাই। মোতি বলল, বরুণের হুকুম আমি মানি না। মোতির কথায় সায় দিল অনেকে। বাকীরা চুপ। কিশোর বুঝলো, দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে সভার মত। মানসিং প্রশ্ন করল, পার্টি ঐ কথা লিখলো ক্যানে? গুলমাল কোথায়?

কিশোর জানে, এ সভাতেও এক, দু'জন আছে, যারা শুধু গেরিলা যুদ্ধ চায়। এ মুহূর্তে গণফৌজ তৈরির বিরোধী তারা। তারা যে সবাই বরুণের সমর্থক, তা নয়। মূল রাজনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। ফলে খতমের সরল পথটি গ্রহণ করেছে তারা। তাদের নামে মহল্লা কাঁপে। পথেঘাটে তাদের দেখে ভয়ে গুটিয়ে যায় জমিদার, মহাজন। এমন আগে হয়নি। এ সব ঘটনায় মহা খুশি তারা। তাদের বিচারে পার্টিলাইন নির্ভুল। রাষ্ট্রব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্যে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ দরকার এ ধারণা তাদের নেই। বোঝানো হয়নি তাদের। কিন্তু আর দেরী করা যায় না। ক্ষমতাদখলের রাজনীতি বোঝাতে হবে। সকলে না বুঝলেও যারা সৎ, সচেতন, জনযুদ্ধের রাজনীতি তারা বুঝবে। যারা বুঝতে রাজি নয়, তাদের বেশির ভাগ হলো পাতি বুর্জোয়া তরুণ, যুবক, লুম্পেন, ডাকাত। যুবক, তরুণ, এবং ডাকাত, লুম্পেনরা দু'ভাবে ব্যবহার করছে খতমের লাইন।

বরুণের চিঠির ব্যখ্যায় গণফৌজের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বক্তৃতা করছে কিশোর। সভা ছেড়ে চুপচাপ উঠে গেল অজিত, মোতি। দু'তিন মিনিট পরে তাদের সঙ্গে জুটলো বাঘা। অন্ধকার রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকার আগে পেছনে একবার তাকালো অজিত। কুলিমুড়োয় আগুন ঘিরে চলেছে নাচগানের আসর। গানের কলি শুনলো সে।

সিদু, কানু, চাঁদ, ভৈয়ো হুল দেকিন জন্যমলে
দুল দইকো জমান না টোকাং
সায় শহিদ মায়াং চিনহো পাজ্ঞাত্রয়াবোন বৈহাকে।
সিদু, কানু, চাঁদ ভৈববের আরব্দ লড়াই
শেষ করতে দরকারে শহিদ হবো আমরা।

কাঠের আগুনের ফিকে আলোয় অজিত দেখলো মেয়েদের সঙ্গে নাচের লাইনে না দাঁড়িয়ে ধুনিতে কাঠ গুঁজছে লালমুনি। অজিত জানে সে না গেলে লালমুনি নাচবে না। তার জন্যে অপেক্ষা করছে লালমুনি। মাদলে সে কাঠি ছোঁয়ালে নেচে উঠবে লালমুনির সারাশরীর, রক্তস্রোত।

অজিত দাঁড়িয়ে যেতে মোতি বলল, দাঁড়াবার আর সময় নেই। এখনই না পৌঁছোলে ধরা যাবে না তাকে।

জঙ্গলে ঢুকলো তিনজন। অন্ধকার জঙ্গল। পথ দূরের কথা, নিজের পা দুটো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সামনে অজিত। এ জঙ্গল এখন তার হাতের পাতার মতো চেনা। অজিতকে সামনে রেখে সিধনদীর ধারে এসে দাঁড়ালো মোতি, বাঘা। দেখা না গেলেও শোনা যাচ্ছে নদীর স্রোতের মিহি শব্দ।

তরণী পাহাড়ের কোলে তরণী গ্রামের মংলু সোরেণ আজ বিকেলে খবরটা এনেছিল। মংলুর খবর অনুযায়ী আজ রাতে টোংরায় সদানন্দ মন্ডলের বাড়িতে দলবল নিয়ে ডাকাতি করবে কপিল বাগদী। এলাকার দুর্ধর্ষ ডাকাত কপিল। ফি বছর ফসল ওঠার পরে দু' দশটা ডাকাতি করে সে। কপিলের দল ছাড়া আরও তিন, চারটে কুখ্যাত বাহিনী এখানে আছে। বিহার সীমান্ত থেকে কাজ করে দুটো দল। পার্টিসংগঠন বাড়তে গত বছরে ডাকাতি প্রায় বন্ধ ছিল। এ বছর আবার বেড়েছে। বাংলা, বিহার, দু' রাজ্যের ডাকাতরা সীমান্ত গ্রামগুলোতে নিয়মিত হামলা করছে। লুঠতরাজের সঙ্গে বেমক্কা খুন জখম চালাচ্ছে তারা। সবচেয়ে মারাত্মক হলো ডাকাতি সেরে ফেরার সময়ে পার্টির নামে শ্লোগান দিচ্ছে। পার্টির স্লোগানগুলো দিচ্ছে। সবাই-এর আগে এ কৌশল নিয়েছে কপিলের দল। এখন মাধো সিং এবং আরো অনেকে কাজে লাগাচ্ছে কপিলের কৌশল। ফলে এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে নিদারুণ বিভ্রান্তি। বিভ্রান্তি ছড়াতে মদত দিচ্ছে পুলিশ, প্রশাসন।

পরশু রাতে দুমকা ডাকাত সর্দার মাধো সিং বাঁশকুলির দুটো বাড়িতে পরপর ডাকাতি করল। দুটো ডাকাতিতে সময় নিয়েছিল প্রায় তিনঘণ্টা। গাঁয়ের মুখে পুলিশক্যাম্প থাকতেও মাধো সিংকে ঠেকাতে আসেনি তারা। বাঁশকুলি, তাঁতলুই, তিলাবুনি, বাহেঙ্গা, টোংরায় পার্টির গভীর প্রভাব। মজবুত সংগঠন আছে। বাঁশকুলিতে ডাকাতি হলে আরও পাঁচটা গ্রামে হবে। কীভাবে বাঁশকুলিতে ঢোকার সাহস পেল মাধো সিং, এ এক রহস্য। ডাকাত পাঠিয়ে পার্টির জোর যাচাই করতে চাইছে পুলিশ। তাদের ধাক্কায়, মারে পার্টি যে বেসামাল, তছনছ জেনেও বোধহয় শেষবার পার্টিকে পরখ করে নিচ্ছে। পার্টির শক্তি বুঝে লুঠ হওয়া দু'শো বন্দুক উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়বে পুলিশ। তার আগেই ডাকাতি বন্ধের কর্মসূচি নিয়েছে পার্টি। পার্টির মান বাঁচাবার সঙ্গে পুলিশকে নিজেদের তাকত দেখানো এ কর্ম-সূচির উদ্দেশ্য।

বাগদী সম্প্রদায়ের লোক হলেও কপিলের দলে বাউড়ি, পাহাড়িয়া, মাহুলি, ডোম, প্রায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। বেপরোয়া, নিষ্ঠুর তারা। তাদের নামে ভয়ে থরহরি কাঁপে এলাকার ধনী, গরীব, সবরকমের বাসিন্দা। কপিলের দলকে শায়েস্তা

করতে পারলে বাকীরা ভয় পাবে। ঠাণ্ডা থাকবে তাঁরা। পার্টির সুনাম বাঁচাতে ডাকাত বিরোধী কর্মসূচি নিতে হয়েছে। পুলিশ, প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এমনকি কলকাতার সংবাদপত্রগুলোও পার্টির বিরুদ্ধে ডাকাতির অপবাদ রটাচ্ছে। বিশ্বাসও করছে কেউ কেউ। সদলে কপিলকে গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে পার্টির সুনাম বাঁচানো মুশকিল।

আজ হাট ছিল তাঁতলুইতে। হাটে এসেছিল তরণী গ্রাম থেকে মংলু সোবেন। শেষ দুপুরে যখন কমে এসেছে হাটের ভিড়, এক চেনা পাহাড়িয়া হাঁড়িয়া খেতে ডাকলো মংলুকে। পাহাড়িয়া লোকটার হাতে ছিল জিলিপি আর নরম ফুলুরি। দুটোই মংলুর প্রিয় খাবার। খাবারের সুবাসেই পাহাড়িয়ার সঙ্গী হলো মংলু। হাটের বাইরে নির্জন এক বটতলায় মুখোমুখি বসলো দু'জন। সূর্য পাটে নামছে। ছায়া জমেছে বটগাছের নিচে। এক কলসি হাঁড়িয়া কিনে আনলো চেনা মানুষটা। ফুলুরি, জিলিপি ফুরিয়ে যেতে আবার কিনে আনার জন্যে পয়সা দিল মংলুকে। পাহাড়িয়া লোকটার দরাজ মেজাজ দেখে মংলুরও প্রাণে স্ফূর্তি জাগলো। বেশ জমজমাট নেশার মধ্যে পাহাড়িয়া বলল, হাঁড়িয়ার টাকা দিয়েছে কপিল বাগ। তার সঙ্গে আজ রাতে টোংরার সদানন্দ মণ্ডলের বাড়িতে লুঠতে যাবো।

খবর শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠলো মংলুর বুক। বিস্বাদ ঠেকলো গরম ফুলুরি। মংলুর দিকে না তাকিয়ে পাহাড়িয়া লোকটা গরগর করে বলে গেল ডাকাতির পরিকল্পনা। চেটেপুটে কলসী শেষ করে পাশের জঙ্গলে লোকটা যখন ঢুকে গেল, ভয়ে মংলু কাঁপছে। নেশা ছুটে গেলেও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তখনই তার মনে পড়লো রবির কথা। হাটের খুব কাছে রবির বাড়ি। সেখানে গেল মংলু। রবি নেই। পুঁইশা বলল, বাহেঙ্গায় গেছে রবি।

শেষ বিকেলে বাহেঙ্গায় পৌঁছোলো মংলু। পুনাই বাস্কর ঘরে রবির সঙ্গে যখন দেখা হলো, তখনও মংলু কাঁপছে। আলাদা ডেকে নিয়ে তার কাহিনী শুনলো রবি। পাশে ছিল অজিত। কথা শেষ করে আতঙ্কে আধমরা মংলু বলেছিল, আমার নাম যেন ফাঁস না হয়। তাহলে আমাকে গজ করবে কপিল।

তাকে আশ্বস্ত করেছিল রবি। মংলুকে বসিয়ে রেখে রবি, অজিত শলাপরামর্শ করল। তারপর ঘটনাটা কিশোর, মোতি, বাঘাকে শোনালো অজিত।

বাঘা বলল, কপিলের গুষ্টির তুষ্টি করবো আজ।

ভাদু ঢোঁড়ে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, অজিত খেয়াল করেনি। বাঘা থামতে সে বলল, হ, হ।

মংলুর সঙ্গে জঙ্গলে এসেছে ভাদু ঢোঁড়ে। তাকে একটা গাছের মগডালে বসিয়ে দিয়ে যাবে মংলু। গাছের ডগায় বসে কপিলের দলের ওপর নজর রাখবে ভাদু। দরকার মতো অজিতকে সংকেত পাঠাবে। সংকেত মানে পাখির ডাক। ডাক শুনিয়ে গেছে ভাদু। পরিকল্পনা অনুসারে অজিত, মোতি, বাঘা জঙ্গলে আগে ঢুকেছে। সভা শেষ করে বাকীরা আসবে। কপিলের দলকে শেষ করতে হবে। তবে মেরে

ফেলার বদলে জ্যান্ত ধরতে চায় অজিত। কপিলকে সদলে একবার কিশোরের হাতে তুলে দিলে তারা যে ডাকাতি ছেড়ে বিপ্লবী হবে, এ বিশ্বাস অজিতের আছে। কিশোরের পক্ষে কোনো কিছু করা অসম্ভব নয়।

বন্দুক কাঁধে অন্ধকার জঙ্গলে এগিয়ে যাচ্ছে অজিত, মোতি, বাঘা। তিনজন চুপচাপ। তাদের সঙ্গে চলেছে সিধনদীর স্রোত। মংলুর কথা মতো নদীর ধারে এক বিশেষ জায়গায় ঘাঁটি আগলে বসবে তারা। কাছাকাছি কোনো গাছের টং-এ নিশ্চয় অপেক্ষা করছে ভাদু। রাত বারোটার আগে কাজে বেরোয়না কপিল। দু'চার কলসী হাঁড়িয়া খেয়ে ভুষোকালি, সারা গায়ে তেল মেখে যখন তারা এখানে আসবে, প্রত্যেকে এক একটা দৈত্য। মশাল জেৱলে, হাল্লা তুলে বীরদর্পে তারা চড়াও করবে সদানন্দের বাড়ি। কপিলের দলের হাতেও বন্দুক আছে। সতর্ক হয়ে ঘিরতে হবে তাদের। আলোচনায় মুখোমুখি লড়াই এড়িয়ে এ্যামবুশ করা ঠিক হয়েছে। দলবল নিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে কপিল বেরোবার মুহূর্তে মুখোমুখি তাকে চ্যালেঞ্জ করবে রবি। দু'চারটে বোমা, কয়েক রাউন্ড গুলি চালাবে সামনে স্কোয়াড। আচমকা আক্রান্ত কপিল জঙ্গলে পেছিয়ে আসবে। মূল ঝাড়টা তখন পেছন থেকে হবে। এই মোক্ষম ঘা মারার দায়িত্ব আছে অজিত, মোতি, বাঘার ওপর। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে অজিত বলল, এখানেই অপেক্ষা করবো আমরা।

তিনটে শালগাছের আড়ালে বন্দুক বাগিয়ে পাশাপাশি তিনজন বসলো। নিরেট বনাঞ্চলে জমাট অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ঝিঁঝির ডাক, পোকা-মাকড়ের চলাফেরা শুনছে অজিত। একটা বিড়ি টানতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু দেশলাই জৱালা চলবে না। ইচ্ছেটা হজম করতে হলো। একঝাঁক ডাঁশ মশা তিন-জনকে ঘিরে ব্যূহ বানিয়েছে। অবিরাম ভ্যানভ্যান করছে তারা। অজিত ভাবলো, এখন কী হচ্ছে সভায়? বরুণের চিঠি পড়ার পরে গণফৌজ গড়া সম্পর্কে কি নতুন করে আলোচনা শুরু হলো?

হতে পারে। পার্টিতে বিশাল ফাটল ঘাঁটি এলাকা, গণফৌজের কথা ভুলে খতমের নেশায় মেতে উঠেছে পার্টি। এ নেশা কেটে যাবে। কবে কাটবে? কিশোরের ভাবনা যে নির্ভুল, অজিতের সন্দেহ নেই। কিন্তু সামনে ঘোর দুর্দিন, টের পাচ্ছে সে। পার্টি থেকে যে কোনোদিন সে আর কিশোর ছাঁটাই হয়ে যাবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর রাজনগর, রাণীশ্বর ছেড়ে চলে যেতে হবে তাদের। শহরের কিছু নতুন ছেলেকে এখানকার নানা গ্রামে বসাতে শুরু করেছে পার্টি। জেল ভেঙে পালিয়ে আসা কয়েকজন কমরেডও এলাকায় ঢুকেছে। পার্টির নির্দেশে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে কিশোর। কাজ শুরুর আগেই স্থানীয় পার্টিকে সমালোচনায় তুলোধোনা করছে তারা। সমালোচনার লক্ষ্য কিশোর, অজিত, মোতি, রবি। উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না। এলাকায় নবাগতরা প্রায় সবাই বরুণের অনুগামী। কাজ শুরুর সঙ্গে বেপরোয়া অ্যাকশনে নেমেছে তারা। খতম লেগেই আছে। লাউবেড়ের রাস্তায় পুলিশের গুপ্তচর ভেবে একদিন নরহরিকে ধরেছিল তারা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে নরহরি। অজিত জানে, কিশোরের সঙ্গে তার

কোণঠাসা করতে ঘুটি সাজাচ্ছে বরুণ। কিশোর আর সে এলাকা থেকে বেরিয়ে গেলে যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, সে বিষয়ে বরুণ সতর্ক। বরুণের কাজে পার্টির পরোক্ষ সায় আছে।

পার্টি তাকে কী চোখে দেখে, অজিত জানে। সে হুজুগে, রাজনীতি বোঝে না, নাচগান, হাঁড়িয়া, সাঁওতালি মেয়েতে মজে আছে। তাকে নিয়ে পার্টির উদ্বেগ নেই। পার্টির বিচারে কিশোর বিপজ্জনক। অসাধারণ সংগঠক সে। সংগঠন গড়ায় তাকে পাল্লা দেবার এখানে কেউ নেই। সুতরাং এলাকা ছেড়ে তাকে যেতে হবে। তার অনুগামী হিসেবেই দণ্ডিত হবে অজিত।

গত কয়েকমাসে দুশ্চিন্তায় অজিত কাবু হলেও কিশোর শান্ত, নিশ্চুপ। পার্টির সমালোচনায় একটা কথাও অজিতকে বলেনি সে। যা বলার সভা, বৈঠকে বলেছে। কিশোরের এই উদাসীনতা অজিতের কাছে এক মস্ত ধাঁধা। কিশোরের জীবনে ব্যক্তি-সম্পর্কের যেন কোনো গুরুত্ব নেই। রেবা সম্পর্কেও সে নিস্পৃহ। গত একবছরে একটা কথা বলেনি। অথচ অজিত জানতো, খুব তাড়াতাড়ি রেবাকে বিয়ে করে তাঁতলুইতে নিয়ে আসছে কিশোর। অজিতের মাঝেমাঝে মনে হয়, রেবাকে বোধহয় ভুলে গেছে কিশোর।

কিশোরের ওপর রাগ জমে অজিতের মনে। চাপা রাগ। কিশোরকে ঠিক মানুষ ভাবতে কষ্ট হয় তার। মানবিক বিষয়ে এতো ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত কীভাবে থাকে একজন মানুষ? সাধু, মহৎ হিসেবে খ্যাতি রটলেও এ ঘটনায় অপমানিত হয় আসল মানুষ।

শালবনে ছড়িয়ে পড়ছে সিধনদী থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস। মশার কামড়ে ছটফট করছে মোতি। শরীরের রক্ত শুষে মশাগুলো ফুলে উঠছে বুঝেও মারতে পারছে না সে। আদুল শরীরে নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছে মশার পাল। অন্ধকার জঙ্গলে ঘাস, পাতা, মাটির গন্ধ। সরসর শব্দ তুলে একদৌড়ে চলে গেল কোনো বুনো জীব। চাপা গলায় অজিত বলল, আর একটু এগিয়ে যাই আমরা।

তিনজন সামান্য এগোতে একটা ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ থেকে ঝুপ করে নেমে এলো মংলু। চমকে গেল অজিত। বন্দুক তুলে আঙুল রাখলো ট্রিগারে। চেনা গলা বলল, আমি মংলু সোরেন। আমাকে ইখানে গাছে তুলে দিয়ে গেঁইচে ভাদু চোঁড়ে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে অজিতের। দু'বছর অন্ধকারে ঘোরাফেরা করে দৃষ্টিশক্তি বদলে গেছে তার। আর পাঁচজনের চেয়ে অন্ধকারে বেশি দেখে সে। মোতি, বাঘাও চিনেছে মংলুকে। মংলুর ভয় এখনও কাটেনি। তবু ভাদুর কথায় গাছে বসে কপিলের আসার প্রতীক্ষায় ছিল সে।

উরা এসেছে?

চাপা গলায় বাঘা প্রশ্ন করতে মংলু বলল, সাড় পেঁইছি। কাছাকাছি কুথাও আছে।

মংলুর কোনো হাতিয়ার নেই। অন্ধকার জঙ্গলে আরও খানিক এগিয়ে মংলু

বলল, ইখান দিয়ে উরা যাবে, মালুম হয়।

বুনো ঝোপের আড়ালে চারজনে পাশাপাশি বসলো। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। আবার ঘিরে ধরেছে এক দঙ্গল ডাঁশ। শাল, মহুয়ার ঠাসবুনোট পাতার ওপর আকাশ দেখা যাচ্ছে না। শীত কাবার হলেও ঠান্ডা আছে এখনও। হাওয়া আসার পথ না থাকায় এ জায়গাটা গুমোট। নিস্তব্ধ চরাচর। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষের আবছা গুঞ্জন। কখনও চাপা, কখনও জোরালো তাদের গলার আওয়াজ। চারজনই শুনছে।

কতোজন আছে ওরা?

মোতির প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলো না মংলু।

ভাদু কোথায়?

অজিতের প্রশ্নে মংলু বলল, কাছে কোনো গাছের ডগায় আছে।

সিধ নদীর পশ্চিমে উঁচু ক্ষেতে মক্কাই পেকেছে। পাশে ডাঁটো শরীর আখক্ষেত। মকাই, আখের লোভে দুমকা, মশানজেড়ের গভীর জঙ্গল থেকে এসময়ে বুনো শুয়োরের দল এদিকে আসে। মাঝে মাঝে হানা দেয় হাতির পাল। নদী পেরিয়ে এ জঙ্গলেও ঢুকে পড়ে! অন্ধকারে ভারি কোনো শব্দ পেলেই চমকে উঠছে মোতি। শুয়োর, হাতির পাল্লায় পড়ার আশঙ্কা করছে। দলবল সমেত কপিলের জন্যে অপেক্ষা করছে চারজন। অজিতের নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনছে মোতি। মাধুর মুখটা মনে পড়লো তার। জরুরি কাজে মাসখানেক আগে তাঁতিপাড়ায় গিয়েছিল সে। দু'তিন ঘণ্টা ছিল সেখানে। অসুস্থ অবিনাশকে দেখে গিয়েছিল মাধুদের বাড়ি। মোতিকে দেখে ভেঙে পড়েছিল মাধু। ভিজে গলায় বলেছিল, যে কোনোদিন বাবা মারা পড়বে।

ভয়ে কাঁপছিল মাধু। তার কথায় আঁতকে উঠেছিল মোতি। তবু মাধুকে ভরসা দেবার জন্যে বলেছিল, মিথ্যে ভয় পাচ্ছো তুমি। দিবাকর কাকা সামান্য চৌকিদার। রাষ্ট্রযন্ত্রের নাট, বল্টু! আমাদের পার্টির শত্রু নয়। তাছাড়া স্বাধীনের বাবা সে। স্বাধীন আমাদের কমরেড।

কথাগুলো বললেও মনে অস্বস্তি ছিল তার। শহুরে যে সব ছেলেরা নতুন এলাকায় এসেছে, বাছবিচারহীন খতম চালাচ্ছে তারা। দিবাকর মাল কার বাবা, তোয়াক্কা করবে না। রঞ্জন, বাবলু, শিবেনের সঙ্গে এক ফাঁকে মোতির দেখা হয়েছিল। দিবাকর সম্পর্কে তাদের দু'চার কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও মুখ খোলেনি মোতি। লজ্জা, সঙ্কোচের সঙ্গে ভয় ছিল তার মনে। দিবাকরের বিষয়ে তার মতামতে এখানকার পার্টি অনধিকার নাক গলানো ভাবতে পারে। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ, এ রটনাও অসম্ভব নয়। মাধুর উদ্বেগ, আতঙ্ক কমাতে কিছুই করতে পারেনি মোতি।

ঘাস, পাতা থেকে পা বেয়ে কিছু উঠছে। পা ঝেড়ে লুঙির কসি শক্ত করে বেঁধে নিল মোতি। খালি গা। শীত শীত করছে।

এট্টা বিড়ি দে।

মংলুকে মোতি বলল, এখন নয়।

বাড়ির কথা মনে পড়ছে তার। সংসারে লক্ষ্মীছাড়া দশা। উপোসে, অভাবে কালি পড়েছে মায়ের মুখে। ভাইবোনেরা শুকিয়ে যাচ্ছে। আরও রোগা হয়েছে ইন্দু। তবে অচেনা খুশিতে ঝকঝক করছে তার দু'চোখ। তার মুখেই অনুপের খবর পেল মোতি। বাবার চিকিৎসা, ওষুধ, দরকারী যা, সব অনুপ করছে। আগে ফি হপ্তায় অবিনাশকে দেখে যেত সে। পুলিশি ঝামেলা বাড়তে আসা কমলেও যোগাযোগ রেখে যাচ্ছে সে। অনুপের কথা বলতে কেমন গাঢ়, গভীর হয়ে গেল ইন্দুর গলা। বোনের এমন কণ্ঠস্বর আগে শোনেনি মোতি। অবাক হয়েছিল সে। অনুপের সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছে হলেও শেষ পর্যন্ত যায়নি।

চাঁদ উঠতে মকাই ক্ষেতে এক চিলতে ফিকে আলো পড়েছে। পশ্চিমে গাছপালা কম। ধোঁয়াটে জ্যোৎস্না ডাঙা জমি ছুঁয়ে গড়িয়ে এসেছে সিধ নদীর জলে। ডানা ঝটপট করে আলো ছেড়ে অন্ধকারের দিকে উঠে গেল দুটো বাদুড়।

সভা সেরে রাত দশটায় জঙ্গলে ঢুকলো। কিশোর, রবি, পুনাই, মানসিং মাঝি। তাদের সঙ্গে আছে আরও চারজন। বাগজোড়ার জিয়নও সাথী হয়েছে। মানসিং বলল, মাঝরাতের আগে টোংরায় ঘুসবে না কপিল। উর কাজকাম আমি জানি।

ভাঙা চাঁদের ফিকে আলোয় মানসিং এর মুখ ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। কিশোবকে মানসিং বলছে, তু ডরিস না কমোরেট। পাট্টির সাথে বাতচিত চালাবো আমি। ফৌজ না হঁইলে ই লড়াই টিকবেক নাই। ফৌজ চাই। লেকিন পাট্টির মত না নিয়ে ইটা করতে লারবো।

মানসিং-এর কথায় রা কড়লো না কিশোর। জঙ্গলের পথে টোংরার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। ডান হাতে সিধ নদী। দুপাশের কয়েকহাজার গ্রামের শরীর ছুঁয়ে মিশেছে ময়ূরাক্ষীতে। মানসিং নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী। রাজনগর থেকে পাঁচমাইল দূরে গ্রামের নাম ঢাকা, সেখানে সিসেল ফার্মে সে মজুর। সিসেল ফার্মে কাগজ তৈরি হয়। কাগজকারখানার ক্যাজুয়াল দুশো মজুরের পাকা চাকরির দাবিতে গত পাঁচবছরের যে আন্দোলন চলছে, মানসিং সে আন্দোলনের এক নেতা। এ. আই. টি. ইউ. সি. শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মানসিং এর ইউনিয়ন যোগাযোগ সত্ত্বেও যে কোনো মুহূর্তে চাকরি ছেড়ে বন্দুক তুলে নিতে সে রাজি। পার্টির নির্দেশেই চাকরিতে আছে সে। পুনাই এর হাতে লম্বা সড়কির ছায়া পড়েছে মাটিতে। এ জায়গাটা একটু ফাঁকা। গাছপালা কম। ফাঁকা মাঠ পেছনে ছেড়ে আবার জঙ্গলে ঢুকতে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল তারায় ভরা আকাশ।

কিশোর ভাবছে অন্যকথা। পার্টির ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শ্রীকাকুলাম, গোপিবল্লভপুর, উত্তরবঙ্গে প্রচণ্ড মার খেয়েছে পার্টি। মুখ থুবড়ে পড়েছে সংগঠন। সেটা বড়ো কথা নয়। যুদ্ধে জয়, পরাজয় আছে। পরাজয়ও জয়ের অংশ। কিন্তু এ পরাজয়ে কী অভিজ্ঞতা, শিক্ষা পেল পার্টি? পার্টিপত্রিকা বন্ধ। অভিজ্ঞতার খবর, সংকলন পাওয়া যায় না। এক, দু'জন নেতার মুখে কখনও সখনও টুকরো কথা সে যা শুনেছে, যথেষ্ট নয়। অথচ ভুল শুধরে সঠিক পথে হাঁটতে বিশদ তথ্য

জানা চাই। শুধু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশিদিন লড়াই করা যায় না। ইতিহাস, অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ থাকা দরকার। এ সংযোগ শৌখিন জ্ঞানচর্চা নয়। লড়াই-এর ময়দানে সামান্য ভুল রক্তের ভাষায় অনূদিত হয়। এখানেও হচ্ছে। ভুল হলেই কর্মীদের ঘাড়ে সব দায় নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়! বলে, নেতৃত্বের নির্ভুল কর্মসূচি রূপায়নে ব্যর্থ হয়েছে কর্মীরা। সব দোষ কর্মীদের। কিন্তু সারা দেশে হাজার হাজার কর্মী কেন একই ভুল করছে, তলিয়ে ভাবতে চায় না নেতৃত্ব। শ্রীকাকুলাম, গোপিবল্লভপুর, ডেবরা, লখিমপুর, খেরির সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যর্থতার বোঝা আঞ্চলিক কমিটির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হাত ধুয়ে বসে আছে। এখানেও এক কাণ্ড ঘটবে। সংগ্রামে ভাঁটা পড়ার দোষ, দায় বর্তাবে তাদের ওপর।

কিছু ভুল কি তারা করেনি? নিশ্চয় করেছে। সেগুলো কি? শ্রীকাকুলাম, গোপিবল্লভপুর, এবং অন্য এলাকার রিপোর্ট পেলে বুঝতে পারতো কিশোর। সে রিপোর্ট পায় নি। তবে বুঝেছে সবটাই প্রয়োগের ভুল নয়। এলাকাগত কাজের গাফিলতি নয়। মূলে গলদ আছে। পার্টি রাজনীতিতেই গোলমাল। এ গোলমাল কাটাতেই গণফৌজ গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে তারা। রচনা করেছে নতুন ভূমিনীতি। গ্রামের গরীব মানুষকে খেয়ে, পরে বাঁচার সুযোগ করে দিতে হবে। এতো দিন যে দ্বিধার মধ্যে সে ছিল, আজ সভার পর, সব কেটে গেছে। আবার জোয়ার আসবে। হতাশার কারণ নেই। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে পড়ে কিছু প্রিয় মুখ। তারা বন্ধু, কমরেড, বিপ্লবের জন্যে শহিদ হয়েছে। বন্দুক কাঁধ বদল করে কপালের ঘাম মুছলো কিশোর। সামান্য পরিশ্রমে আজকাল খুব ক্লান্ত বোধ করে সে। মাথা ঘোরে। শরীর দুর্বল, টের পায়। দু'চার মাইল হাঁটলে, রাত জাগলে হঠাৎ অন্ধকার নামে দু'চোখে। গত সাতদিন একদানা ভাত পড়েনি পেটে। চালভাজা, মুড়ি, ছোলাভাজা, খুদ, ব্যাঙের ছাতায় পেটের একাংশ ভরেনি। অন্ধকার জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে একথালা গরম ভাত খাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে হলো তার।

টোংয়ার কাছাকাছি সিধ নদীর পাশে একটা গাছের ওপর থেকে হুতোমপ্যাঁচার পাল্টা আওয়াজ দিল রবি। গাছ থেকে তরতর করে নেমে এলো ভাদু।

কমরেড কুথা?

রবির প্রশ্নে অন্ধকারে কোনো একদিকে আঙুল তুলে দেখালো ভাদু। তখনই তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো অজিত, মোতি, বাঘা, মংলু। পেঁচার ডাক শুনেই এসে গেছে তারা। কপিলকে ধরার ছক আর একবার চাপা গলায় আলোচনা করে নিল সবাই। পেছনে মূল ঘাটিতে থাকবে অজিত, রবি, পুণাই, মোতি, ভাদু। সামনে থাকবে বাকীরা। এলোপাথারি গুলি চালাতে বারণ করে কিশোর বলল, সাবধান, নিজেদের মধ্যে যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয়।

দুটো মশাল এনেছিল পুণাই। একটা করে নিল সামনে, পেছনে দুই স্কোয়াড। সদলে কপিলকে ধরে বিচার হবে। আলো চাই। তাই মশাল এনেছে পুণাই।

দু'দল অন্ধকার জঙ্গলে দু'দিকে চলে গেল। হঠাৎ নিস্তব্ধ হলো বনভূমি। ঝিঁঝির ডাকও থেমে গেছে। দমবন্ধ করা নীরবতা।

পুঁইশার কথা ভাবছে রবি। তাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে পুঁইশা। পার্টি থেকে যতো সরে যাচ্ছে তার বিশ্বাস, স্বামীর ওপর ততো আস্থা হারাচ্ছে সে। রবির ধারণা, পুঁইশার পেটে বাচ্চার লড়াচড়া সুরু হতে ইটা হুঁইচে। ঘরে ভাত নাই, পরণে কাছা নাই, থিকে থিকে বন্দুকটা বহুৎ খেপে উঠছে। দু'চারবার রবিকে পুঁইশা বলেছে, কিষাণহড়দের ঘর থিকে দু'এক পালি চাল, গেঁহু, একটো কাপড় নিলে ক্ষতি কী?

খতমের পর মহাজনের ঘর থেকে অনেকেই কিছু জিনিস হাতাচ্ছে। কিন্তু রবি হাঁসদা কীভাবে করবে সে কাজ? সে রবি হাঁসদা, আদিবাসীদের নেতা, সিদু, কানু চাঁদ, ভৈরোর বেটা, সে বাটপাড় নয়। সে জানে, ই কাম উচিত লয়। ধান, চাল, কাপড়ের ধান্দায় সে থাকলে পাঁচজন কেন মানবে তাকে? ঘরে অভাব, বহুর পিছায় কাপড় নাই, ভাত নাই পেটে, ইদিকে পেটে লড়াচড়া করছে একটা জীব, ভাত মাঙছে সে। আগের সনে ই সময়ে ধান, চাল আক্রা হয়নি। লড়ায়ের সাথে চলেছে চায-আবাদের কাজ। এ সনে বদলে গেল সব। ক্যানে?

পুলিশ, মিলিটারি, গ্রামরক্ষী বাহিনী নিয়ে গ্রামে ফিরেছে মুরুব্বি বিজয় মন্ডল। রবির ওপর তার ভারি রাগ। আগের সনে রবিকে ডেকে বিজয় বলেছিল, ইসবে তু থাকিস না রবি। তুর কাঁধে বন্দুক রেখে কাজ হাসিল করে নেতারা কেটে পড়বে। মাঝখান থিকে তুরা মরবি।

মুচকি হেসে বিজয়কে রবি প্রশ্ন করেছিল, আমাদের জন্যে তুমার এ্যাতো দরদ কেন গো মুরুব্বি।

রাগী চোখে রবির দিকে তাকিয়েছিল বিজয়। কথা বলেনি। রবি বলেছিল, বেইমানি করলে নেতাদেরও ছাড়ান নেই।

তখনও কাটাকাটি, খতম শুরু হয়নি। মুখে মুখে ঘুরছিল মুক্তাঞ্চল, গণফৌজের কথা। মাঠের মধ্যে রবির সঙ্গে বিজয়ের হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার শালবনে রবির হঠাৎ মনে পড়লো মৃত গরমবার মুখ। একমাস হয়নি গরমবা মরেছে। গাঁয়ে ছিল না রবি। ঘরে ফিরে দেখল গরমবা নেই। বিনা রোগব্যাধিতে মরে গেল মানুষটা।

অন্ধকার, নিস্তব্ধ বনভূমিকে কয়েকজন মানুষের গলা শুনতে পেল অজিত। তারা কী বলছে বোঝার আগেই জঙ্গলের পশ্চিমে আলোর ফিনিক ফুটলো। দাউদাউ করে জ্বলছে কয়েকটা মশাল। দমকা হুঙ্কারে কেঁপে উঠলো অন্ধকার। গাছে গাছে জেগে উঠেছে পাখি। ভয়ে ডাকাডাকি করছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। কপিল কাজে বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গীদের নিয়ে ঝোপের আড়ালে লেপেট বসেছে অজিত। মশাল হাতে সদলে এগিয়ে আসছে কপিল। জঙ্গলের সীমানা পর্যন্ত যেতে দিতে হবে ওদের। আলোর ঢেউ যতো এগিয়ে আসছে, পেছনে ততো ঘন হচ্ছে অন্ধকার। কপিলের দলে কজন আছে, কী কী অস্ত্র, সরঞ্জাম, শক্তি সে জড়ো করেছে, বুঝতে

চাইলো অজিত। কপিলের নিজের একটা বিদেশী রিভলবার আছে, এখবর রবি দিয়েছে। রিভলবরটা কেড়ে নিজের কাছে রাখতে চায় অজিত। দশ, বারো গজ দূরে দিয়ে সদলে চলে গেল কপিল। বিশ, বাইশজনের বাহিনী। চারটে গাদা বন্দুক, হেঁসো, সড়কি, ভোজালি ছাড়া বিশেষ কোনো হাতিয়ার নেই। দু'চারটে বোমাও থাকতে পারে। তবে বোমে ওদের দারুণ ভয়। বোমা বানানো শেখার জন্যে পার্টির এক, দু'জন কর্মীকে যোগাযোগ করেছিল কপিল। ডাকাতকে বোমা তৈরী শেখাতে পার্টির কেউ রাজি হয়নি।

গাঁয়ের দিকে এগোনোর সঙ্গে ডাকাতদলের হল্লা বাড়ছে। নেশায় তারা মাতোয়ারা। সামনে, পেছনে যে মৃত্যু অপেক্ষা করছে, কপিল জানে না। সঙ্গীদের শালবনে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। লম্বা এক শালগাছের ওপর উঠে গেছে মংলু। বাঘা আর জিয়নের হাতে দুটো করে চারটে বোমা। বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোর। আরও পাঁচ কমরেড ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। কিশোর ভাবলো, অজিত নিশ্চয় পেছনে। এতোক্ষণে আটকে দিয়েছে পেছনের পথ। ভয়ার্ত বুনো প্রাণীরা অন্ধকারে দৌড়ঝাঁপ করছে। অন্ধকারে বড়ো গেলাকার হচ্ছে মশালের টুকরো আলো। কিশোরের পায়ের ওপর দিয়ে তীরের বেগে ছুটে গেল একটা খরগোস। কপিলের দল বেশ বড়ো, কিশোর বুঝেছে। জঙ্গল শেষ হতে আর দেরী নেই। জঙ্গলের সীমানায় পৌঁছেই সদানন্দ মণ্ডলের বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করবে ডাকাতদল। তার আগেই ঘা মারতে হবে। সদানন্দ মন্ডল চতুর জমিদার। বন্দুক আছে তার। সদর দরজায় কোলাপসিবল্ গেট ছাড়াও দোতলার সিঁড়ি। শেষ মাথায় রয়েছে একপাল্লা লোহার কপাট। কপাট লাগানোতে বাহাদুরি আছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কপাট খোলা যায় না। মাথার সঙ্গে সমান্তরাল লোহার কপাট দুহাতে চাড় দিয়ে খুলতে হয়। মাথা দিয়ে ঢু মারা গেলেও এ কপাটে শরীরের ধাক্কা দেওয়া যায় না। এ কপাট ভাঙা কপিলের কর্ম নয়। হাতি লাগবে।

মশালের আলোয় মাথায় লাল ফেট্টি, তেল চুকচুকে শরীর ডাকাতবাহিনীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিশোর। সকলের আদুল শরীর, কোমরে জড়ানো গামছা, নেংটি, ইজের। কপিল কে? ভালো করে এক নজর দেখে খাটো ধুতি, তাগড়া চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ দলের সর্দারকে চিনে নিল কিশোর।

ফাঁকা জায়গায় দলটাকে পেতে বন্দুক বাগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো সে। কিশোর বুঝলো, বন্দুক, বোমা নিয়ে সঙ্গীরা প্রস্তুত। সে বন্দুক দাগলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সবাই। একশো গজের মধ্যে বাহিনী নিয়ে কপিল ঢুকতে গর্জে উঠলো কিশোরের বন্দুক। মুহূর্তে এলোপাথারি শুরু হলো বোমচার্জ। শান্ত পৃথিবী, নিমগ্ন অন্ধকার গোলাবারুদের শব্দে তছনছ হয়ে গেল। থতমত ডাকাতদল দাঁড়িয়ে পড়েছে। কপিলের হুকুমে মুহূর্তে নিভে গেল সব মশাল। তখনই ট্রট্, ট্রট শব্দে একঝাঁক গুলি ছুঁড়ে পেছনের স্কোয়াড ঘিরে ধরলো ডাকাতদলকে। আলকাতরার মতো অন্ধকারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল কপিলের লোকজন। নির্জন জঙ্গলে তুমুল হল্লা। আশপাশে গ্রামবাসীরা জেগে উঠলেও বেরোতে ভরসা পাচ্ছে না কেউ। তিনমাইল

দূরে সি. আর. পি. ক্যাম্প। তাদের কানেও নিশ্চয় গেছে গুলি, বোমার শব্দ। সকাল না হলে তারা বেরোবে না।

তিনটে বন্দুক সমেত কপিলের দলের সাতজন ধরা পড়লেও বাকীরা সিধনদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়েছে। কপূরের মতো উবে গেছে কপিল। মশাল জেবলে সকলের খোঁজ করতে গিয়ে কিশোর দেখলো, মংলু নেই। গাছ থেকে নামেনি নাকি সে? জবলন্ত মশাল হাতে মংলুর নাম ধরে দু'তিনবার ডাকলো পুনাই। সাড়া পেল না। ডাকাতদের ফেলে যাওয়া আধপোড়া মশালগুলো তুলে নিল অজিত। আগামী দু'তিনদিন নাচগানের আসরে আলোর রোশনাই হবে। একটা মশাল জবলছে। কিশোর বলল, এখন ফেরা উচিত।

কথাটা ঠিক। আগে রাতে গাঁয়ে ঢুকতো না সি. আর. পি.। আজকাল সাহস বেড়েছে তাদের। যখন তখন বেকসুর গাঁয়ে ঢুকছে তারা। এ মুহূর্তে সি. আর. পি. জঙ্গল ঘিরে তল্লাসী করলে অবাক হবার কিছু নেই। বন্দী সাত ডাকাতকে নিয়ে জঙ্গলের বাইরে আসতে কিশোরের গায়ে লাগলো সিধনদীর ঠান্ডা বাতাস। এখান থেকে বাহেঙ্গা দেড়, দু'ক্রোশ পথ। পেঁৗছতে সময় লাগবে। মশালের আলোয় রবির গম্ভীর মুখ দেখতে পেল কিশোর। বিকেল থেকেই রবি গম্ভীর। কথা বলেনি বিশেষ। তার বাড়ির অভাব, উপোসের খবর কিশোর জানে। রবিকে পাশে পেয়ে নিচু গলার কিশোর প্রশ্ন করল, বহুর সাথে তু দেখা করছিস না ক্যানে?

সাড়া করল না রবি। পুণাই-এর হাতের নিভে আসা মশালের ম্লান আলোয় কিশোর দেখলো রবির শুকনো মুখ। কিশোর বলল, কালই একবার ঘরকে যা তুই।

কষ্টে চিনচিন করছে রবির বুক। কী করে ঘরে যাবে সে? উনিতুলি ছেঁড়া ট্যানা গায়ে জড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে পুঁইশা। তার ওপর নির্মলার সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে রবি সভা, বৈঠক করছে শুনে পুঁইশা রাগে ফুঁসছে। বাঘিনী হয়ে আছে সে। তার সামনে দাঁড়াবার হিম্মত রবির নেই। মরমে মরে আছে রবি। নির্মলার মনের খবর সে জেনে গেছে। তাকে দেখায় পর বাঘার দুলহার ভুলতে বসেছে নির্মলা। রবিও কি আগের মতো আছে? বোধহয় না। নির্মলা পাশে থাকলে কেন এতো উথাল-পাথাল করে তার বুক? ঘটনা টের পেয়ে পুঁইশা প্রায়ই বলে, উটা একটা ভান বটেক। চেটেপুটে খুটে খাবেক তুকে।

প্রতিবাদ করেছে রবি। পুঁইশার আশঙ্কা যে ভুল, বোঝাতে চেয়েছে তাকে। ভেতর থেকে জোর পায়নি। গরমবার মৃত্যুও বিপাকে ফেলেছে তাকে। নিঃসঙ্গ হয়েছে পুঁইশা। গরমবার দাহের খবরও মর্মান্তিক। সিধনদীর চড়ায় প্রতিবেশীরা দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। কাঠের অভাবে গরমবার আধপোড়া দেহ নদীর চড়ে পুঁতে দিয়েছে তারা। পুঁইশা দাঁড়িয়ে দেখেছে সব। রবির সঙ্গে পার্টির ওপর ঘেন্না ধরে গেছে পুঁইশার।

মুখ নিচু করে হাঁটছে সাত বন্দী ডাকাত। বন্দীদের পাঁচজন ডোম, একজন বাউড়ি, একজন পাহাড়িয়া। তাদের মুখে চোখে মৃত্যুর দিকে হেঁটে চলার আতঙ্ক।

তাদের মুখ দেখে কিশোর বুঝতে পেরেছে যে ঘরবাড়ি, বৌ, ছেলে-মেয়ের চিন্তা করছে তারা। অজিতের পায়ে একজন হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে ডুকরে উঠলো, ছাড়ান দ্যান আমাকে। জীবনে এ কাম আর কখনও করবো না।

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। হুসহাস শব্দ তুলে অন্ধকার নদীর ধার ধরে ছুটে আসছে কেউ। জলে ভেজা সপসপে পোশাকে সামনে এসে দাঁড়ালো মংলু। তার নাকের ফুটোয় জমে আছে কালচে রক্ত। তেকোনা মুখে, বুকে ছড়িয়ে আছে জমাট রক্ত। কপালে, ঘাড়ে কালসিটের দাগ। ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়া কালো চুল জলে লেপ্টে গেছে মাথায়।

কুথায় গেঁইচিলি তু ?

প্রশ্ন করে জবাব পেল না কিশোর। ঠাণ্ডায়, অথবা ভয়ে ঠকঠক করে মংলু কাঁপছে। নিজেকে সামলে মংলু বলল, কপিলের পিছা করেছিলাম আমি। তারপর জড়িয়ে ধরেছিলাম তাকে। বহু- মার সে মারলো আমাকে। আমিও ছাড়ি নাই। উপড়ে নেঁইচি তার কান।

ভিজে ধুতির ট্যাঁক খুলে একটুকরো মাংস বার করল সে। কপিলের কান। নিভু নিভু মশালের আলোয় অবাক হয়ে দেখছে সবাই। বাঘা, ভাদু ঝুঁকে পড়েছে।

মংলু বলল, কাঁদড়ে ঝাঁপ দিল কানকাটা কপিল।. আমিও ঝাঁপালাম। আঁধারে ঠাওর করতে পারলুম। কোথায় যে লুকটা হুস করে মিলায় গেল।

মশাল নিভে যেতে অজিত বলল- জলদি পা চালাও হে।

ঊনচল্লিশ

প্রায় মাঝরাতে বক্রেশ্বর সেতুর ওপর দাঁড়িয়েছিল, বাবলু, পলাশ, কল্যাণ আর অমল। মেদিনীপুর জেল ভেঙে গত হপ্তায় কল্যাণ, অমল পালিয়ে এসেছে। ওরা দু'জন পলাশের বন্ধু। অন্ধকার আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। অল্প আলোয় দেখা যাচ্ছে, পিচের রাস্তায় পড়ে আছে হাত, পা বাঁধা শিবেন। আলোচনার জন্যে ডেকে তার বিচার হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাকে। এখনই কার্যকর হবে দণ্ড।

রঞ্জনের ধরা পড়ার কারণ যে শিবেন, সে-ই যে রঞ্জনের গোপন ডেরা দিবাকরকে জানিয়েছে তথ্য, যা দিয়ে প্রমাণ করেছে বাবলু। খতম সম্পর্কে পার্টির ভেতরের মতান্তর খবরের কাগজে চিঠি লিখে শিবেনই ফাঁস করেছে। চিঠির খসড়া পলাশের ঘরে পাওয়া গেছে। হাতের লেখা শিবেনের। চিনতে ভুল করে নি বাবলু। গত এক, দেড় মাস শিবেনের গা ছাড়া ভাব, উদাসীন চালচলনে বাবলুর সন্দেহ জেগেছিল। আগে থেকে সে সজাগ, সতর্ক হলে রঞ্জন ধরা পড়তো না।

সুদেব মণ্ডল আর তার ছেলেকে ধরার দিনই শিবেন যে খতমবিরোধী টের পেয়েছিল বাবলু। রঞ্জনও বুঝেছিল। কিন্তু এমন এক ভয়ঙ্কর সন্দেহ মনে পুষে রাখতে পারেনি তারা। ইচ্ছে করেই যেন ভুলে গিয়েছিল। সুদেব মণ্ডলের খতমের বিরোধিতা করেই চুপ থাকেনি শিবেন, পরাশিয়ায় বন্দুক দখলের রাতে সবার পেছনে ছিল সে। তারপর সুদেবের ছেলে সুবাসের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার খবর পেয়ে পার্টির তীব্র সমালোচনা করেছিল শিবেন। সুবাস কেন আত্মঘাতী হলো, সঠিক না জেনে কানাঘুষো রটনায় গলা মিলিয়ে শিবেনও বলল যে, বাবার অপমানে লজ্জা, অভিমান, ভয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে সুবাস। অপরাধীর কাঠগড়ায় পার্টিকে দাঁড় করিয়ে দিল শিবেন।

বন্দুক দখলের রাতেই সুবাস গলায় দড়ি দিয়েছিল। খবরটা তাঁতিপাড়ায় পৌঁছোলো দু'দিন পরে। খবর শুনে শিবেন বলল, আমাদের পার্টির দরদী ছিল সুবাস। তার ওপর আমরা অবিচার করেছি।

শিবেনের কথায় রঞ্জন চুপ করে থাকলেও চটে গিয়ে বাবলু বলেছিল, বাজে কথা। পার্টির সঙ্গে সুবাসের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

শিবেনের সঙ্গে তাল দিয়ে ঝানু বলেছিল, ছোটকর্তা মানুষটা খারাপ ছিল না। আমাদের হয়ে বাপের সঙ্গে এক, দু'বার কাজিয়া করেছে।

আলোচনা শেষ হয়নি সেদিন। দ্বিতীয় দফা আলোচনার সুযোগও তার মেলেনি। সুবাসের আত্মহত্যার ঘটনা ভুলে গিয়েছিল সবাই। শিবেনের বিরুদ্ধে

সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণ হলো, যে, রঞ্জন ধরা পড়ার আগের রাতে তাঁতিপাড়ার মাঠের পেছনে ঝোপের আড়ালে দিবাকরের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা সে কথা বলেছিল। ঝোপের অল্পদূরে পোড়ো, নির্জন শিবমন্দিরে জেল পলাতক কল্যাণ, অমল যে ডেরা গেড়েছে, শিবেন জানতো না। খাঁকি পোশাকের দিবাকরের সঙ্গে শিবেনকে কথা বলতে দেখে অবাক হয়েছিল তারা। কথার বিষয় কানে না গেলেও শিবেনের অন্তরঙ্গ ভঙ্গি কল্যাণ, অমল নজর করেছিল। অনুপডাক্তারের ওপর অ্যাকশনেও বাগড়া দিয়েছে শিবেন। শিবেনের জন্যেই প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিতে হলো ডাক্তারকে। দুশ্চরিত্র, সন্দেহভাজন ডাক্তার রাতের অন্ধকারে হাসপাতাল ছেড়ে উধাও হয়েছে।

পিছমোড়া করে বাঁধা শিবেন উঠে বসেছে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে সে। তার মুখের মধ্যে তালপাকানো ছেঁড়া গামছা। টুঁ শব্দ করার উপায় নেই। কল্যাণ বলল, দেরী করে কী লাভ। যা করার তাড়াতাড়ি করাই ভালো।

শিবেনের মুখের গামছা বার করে নিয়ে অমল বলল, কিশোরের সঙ্গে একবার কথা বলা উচিত।

দরকার নেই, কল্যাণ বলল, কিশোরও পার্টিবিরোধী। পার্টি থেকে তাড়ানো হচ্ছে তাকে।

চাঁদের আবছা আলোয় শিবেনের মুখ দেখে মুচড়ে উঠলো বাবলুর বুক। সে প্রশ্ন করল, কিছু বলার আছে তোর ?

কোনো কথা বলল না শিবেন। বাবলু চাইছে, শিবেন একবার বলুক, নির্দোষ, নিরপরাধ সে। অযথা সন্দেহ করা হচ্ছে তাকে।

তাহলে আপাতত তার শাস্তি মুলতুবি রাখার কথা বাবলু বলতে পারে। কিন্তু শিবেন চুপ। বোবা হয়ে গেছে বাবলু আবার প্রশ্ন করল, কিছু বলার আছে ?

বাবলুর দ্বিতীয়বার প্রশ্নের পরেও মৃত্যুদণ্ডিত একজন মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় কেঁপে উঠলো না নির্জন, নিস্তব্ধ বক্রেশ্বর সেতুর অন্ধকার। হার্টফেল কবল নাকি ?

কল্যাণের মস্করার জবাব না দিয়ে বাবলু দেখলো দূরের এক গ্রামে জ্বলে উঠলো হাউই। মানুষের আবচ্ছা গুঞ্জন ভেসে আসছে। গুড়ুলগাছি গ্রামে বোধহয় কোম্বিং হচ্ছে। অপেক্ষার সময় নেই। শিবেনের সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণ প্রশ্ন করল, এই যে প্রাক্তন কমরেড, কীভাবে মরতে চাও ? এককোপ, না তিনকোপ ?

শান্ত গলায় শিবেন বলল, এককোপ।

তার গলার শব্দে বাবলুর গা ছমঝম করে উঠলো। ঝানুর ঝকঝকে, ধারালো হেঁসো এখন কল্যাণের জিম্মায়। একপলক শিবেনের ঘারের দিকে তাকালো সে। তারপর চাঁদের আলোয় হেঁসোর ঝিলিক। বক্রেশ্বর সেতুতে ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে পড়লো তাজা রক্ত।

চল্লিশ

রাজনগর হাসপাতালের বাঁ পাশে উঁচু জমিতে বইছে সি. আর. পি. ক্যাম্প। পাথুরে, অনাবাদী জমিতে এ্যাসবেশটশের ছাউনি, শক্তপোক্ত ক্যাম্পের ইটের গাঁথুনি ক্যাম্পের মধ্যে লক-আপ, অফিস, মালখানা, কম্যাণ্ডারের বসার ঘর। ক্যাম্পের দু'পাশে একডজন ত্রিপলের তাঁবুতে বাহিনীর বাসস্থান। কাঁটাতারে ঘেরা পাঁচ, ছয় একরের চৌকোনা মাঠটা ফৌজি ব্যারাকের চেহারা পেয়েছে। মাঠের মাঝখানে রিলিফের বাঁওড়। খুব গভীর। কাঠকাটা গরমেও এক মানুষ জল থাকে বাঁওড়ে। এলাকার গরীব মানুষের জলকষ্ট মেটাতে এ জমি দান করেছিল ঈশ্বর মণ্ডল। জল ছাড়া দুদিনে বাঁওড় কাটার কাজে দু'পয়সা রোজগার করেছিল বেকার, অভুক্ত গাঁয়ের মানুষ। ঈশ্বর মণ্ডল তার উদারতার পুরস্কার পেয়েছিল। এলাকার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিল সে। বিধায়ক হবার পর ধরা পড়লো আরও মতলব আছে তার। সরকারি টাকায় কাটানো জলকরের ওপর থাবা বসালো সে। পাথুরে জমির পেছনে একলপ্তে সতেরো বিঘে জমিতে আবাদের কাজে বাঁওড়ের জল মোটর পাম্প বসিয়ে টেনে নিতে শুরু করল ঈশ্বর। এক ফসলী জমি তিনফসলী করল। শুধু জল নিয়ে থামলো না। মাছের চাষ লাগিয়ে দিল বাঁওড়ে। মাছের পাহারায় লাগিয়ে দিল স্থানীয় চৌকিদার সুখলালকে। ঈশ্বরের জমিতে দানের ফন্দি চত্বরে সবাই জেনে গেলেও কারও রা কাড়ার সাহস হলো না। গরীব মানুষের রাগ বিষফোঁড়ার মতো টাটিয়ে উঠলে কারও দু' পাঁচ বিঘে বেনাম জমি, সরকারি খাস জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে অনুগতদের দখলের ব্যবস্থা করে দেয়। কখনও বিক্ষুব্ধরাও ছিটেফোঁটা পেয়ে যায়। তখন তারা আবার ঈশ্বরের ন্যাওটা হয়। সাতান্ন সাল থেকে এভাবে বেড়ে চলেছে ঈশ্বরের ভূসম্পত্তি। ক্ষমতায় কোন দল এলো, গেলো, ঈশ্বরের যায় আসে না। ঈশ্বর মণ্ডল সবসময়ে ক্ষমতাশীন দলের সঙ্গে আছে। ক্ষমতায় যে দল আসে জেনে যায় এলাকায় ঈশ্বর মণ্ডল ছাড়া গতি নেই।

বাঁওড়ের লাগোয়া জমি সি. আর. পির জন্যে আগে বাড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছে ঈশ্বর। এক ঢিলে দু'পাখি মেরেছে। বাঁওড়ের মাছ পাহারায় পাকা ব্যবস্থার সঙ্গে জমি ভাড়ার টাকা মিলবে তাছাড়া এই দুর্দিনে সি. আর. পির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দরকারে কাজ দেবে। এতো রকমের বহুমুখী কাজে ঈশ্বরের ডান হাত হলো তার ছোটভাই ভগবান মণ্ডল। নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বজায় রাখতে সবরকম বৈষয়িক ধান্দায় সে সামনে রাখে ভগবানকে। তাকে বিরোধী রাজনীতিতে ঢুকিয়ে দেবার মতলব এঁটেছে ঈশ্বর। দুভাই দু'শিবিরে থাকলে কোনো জমানায় অসুবিধে হবে না।

বাঁওড়ের জমি সি. আর. পি. অধিগ্রহণের সময় রাজনগরের সাতমাইল দূরে বিলকান্দি গ্রামে, নিজের বসতবাড়িতে ছিল ঈশ্বর। ক্যাম্প বসাবার যা তদারকী করেছে ভগবান। দু'বছর আগেও ঈশ্বরের পরিবার থাকতো বিলকান্দিতে। এখন তারা সিউড়ির বাসিন্দা। ভগবানও সিউড়িতে থাকে। বিলকান্দির বাড়ির গোয়াল-ঘরের দু'পাশে দুটো কুঁড়েঘরে থাকে ঈশ্বরের দুই রক্ষিতা। একজন বাউড়ি, অন্যজন মালো। বাউড়ি রাধার বয়স পঁচিশ। মালো পদ্মমনি পঞ্চাশ, ঈশ্বরের প্রায় সমবয়সী। রাজনগরে সি. আর. পি ক্যাম্প পুরোদমে কাজ শুরুর পর সেখানে এক জনসভা ডাকলো ঈশ্বর। সি. আর. পি ক্যাম্প খোলার প্রতিবাদ করে বক্তৃতায় সে বলল, গণআন্দোলনে পুলিশি জুলুম বরদাস্ত করা হবে না।

বসন্তের শেষ বিকেলে রাজনগরের বাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিল ঈশ্বর। এ বাড়িতেই তার পার্টি অফিস। ঈশ্বরকে ঘিরে আছে তার চার, পাঁচজন অনুগত চেলা। মাটি, গাছপালা জড়িয়ে অন্ধকার নামছে। ঘরের ভেতর অন্ধকার ঘন হতে হ্যারিকেন পাঠাতে বাড়ির অন্দরে খবর পাঠালো ঈশ্বর। এলাকার অবস্থা নিয়ে অনুচরদের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছে ঈশ্বর। আজ রাতে সিউড়ি যাবে সে। সঙ্গীদের বীরভূমের ইতিহাস শোনাচ্ছে ঈশ্বরের অন্ধ অনুগামী নগেন। নগেন বলছে, পাঁচশো বছর আগে রাজা বীরসিংহের আমলে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বীরভূম জেলা। তুর্কী রাজা বাবরের আক্রমণের পর শুরু হলো এ জেলার দুর্দশা।

কাহিনী শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো নগেন। তারপর শুরু করল গ্রামের মানুষের দুঃখ কষ্টের বাখানা। নগেনের কথা, আলোচনা ষোলআনা বানানো জেনেও চুপ করে আছে ঈশ্বর। রাগে পিত্তি জ্বলে গেলেও নগেনকে ধমকাবার সাহস নেই তার। নগেনের মুঠোয় তিনটে গাঁয়ের সাতশো ভোট। ছ'শো নব্বইটা ঈশ্বর পায়। তাছাড়া লতায়-পাতায় নগেনের সঙ্গে কি এক আত্মীয়তা আছে। বাড়ির ভেতর থেকে টিমটিমে এক আলো হেলেদুলে এগিয়ে আসছে।

ক্রিংক্রিং বেল্ বাজিয়ে সদরের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা সাইকেল। সাইকেল আরোহীর আবছা চেহারা দেখে মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠলো ঈশ্বরের বুক। পাশে রাখা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ তুলে আরোহীর মুখে ফোকাস্ করে দেখলো রাজনগর থানার সাবইন্‌স্‌পেকটর কুণ্ডু। সাধারণ পোশাকে দেখার অভ্যেস নেই বলে গোড়ায় তাকে চিনতে পারেনি ঈশ্বর। টর্চ নিভিয়ে চেয়ার থেকে উঠে কুণ্ডুকে ঈশ্বর বলল, আসুন, ভেতরে আসুন।

আজ নয়, সাইকেলে বসেই কুণ্ডু বলল, সি. আই সাহেব সেলাম দিয়েছেন আপনাকে। খুব জরুরি। এখনই যেতে হবে।

থতমত ঈশ্বর বলল, যদি কাল যাই।

নাহ স্যার, আজ, এখনই।

আমাকে কেন?

ঈশ্বরের বিরক্ত গলায় প্রশ্ন শুনে কুণ্ডু বলল, বলতে পারছি না স্যার।

সাহেব কোথায় ?

ক্যাম্প্ অফিসে।

কথাটা বলে ঈশ্বরের দিকে একপলক তাকিয়ে কুণ্ডু বলল, আপনি আসুন। আমি যাই।

ঘণ্টা বাজিয়ে সাইকেল নিয়ে কুণ্ডু অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে চেয়ারে কয়েক সেকেণ্ড গুম হয়ে বয়ে থাকলো ঈশ্বর। তার সামনে চ্যাটাইয়ে বসে আছে চেলারা। হ্যারিকেনের ধোঁয়াটে আলোয় আবছা দেখাচ্ছে তাদের। নগেনকে ঈশ্বর প্রশ্ন করল, যাবে নাকি আমার সঙ্গে ?

চমকে উঠে নগেন বলল, বাড়িতে যে একটা কাজ আছে দাদা।

কী কাজ ?

আমার বকনা গরুটা আজ রাতেই বিয়োবে। প্রথম বেন। আমি না থাকলে।

নগেনের ওপর ব্যাজার হয়েও মুখে কিছু বলল না ঈশ্বর। ভূষণকে বলল, তুই চল ভূষণা।

এই ভয় করছিল ভূষণ। কিন্তু ঈশ্বরের ডাক অগ্রাহ্য করার সাহস তার নেই। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো সে। থানায় যাবার নাম শুনে তার পিলে চমকে গেছে। থানার সব কাজ এখন হচ্ছে সি. আর. পি ক্যাম্প থেকে। কী হয়, না হয় সেখানে কেউ জানে না। শুধু নানা ভয়ানক গুজব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে সাহায্য করতে থানায় যারা যায়, তাদের ওপর অদৃশ্য চোখ নজর রাখে। প্রাণ বাঁচাতে দেশ, ঘর ছেড়ে তাদের পালাতে হয়। তবু থৈ থৈ অন্ধকারে ঈশ্বরের সঙ্গে থানার দিকে এগোয় ভূষণ। ঈশ্বরের হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। টর্চ জ্বালছে না সে। রাস্তার দুপাশের দোকানে টেমি জ্বলছে। ম্যাড়মেড়ে আলোয় ভূতুড়ে দেখাচ্ছে দোকানগুলো। রাস্তার মোড়ে একটা মাত্র দোকান, দালাল এণ্ড্ সন্সে হ্যাজাগ জ্বলছে। দালাল এণ্ড সন্স্ এ চত্বরে একচেটিয়া কাপড় ব্যবসায়ী। দিনের আলো থাকলে শালবনের ভেতরের পায়ে চলা পথ ধরে থানায় পৌঁছে যেত ঈশ্বর। শর্টকাট পথ। সময়ও কম লাগে। রাতে জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পেল না সে। সি. আর. পি. ক্যাম্পের সামান্য আগে বাঁ পাশে রাজনগর থানা। থানায় বড়োবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলার জন্যে ঢুকলো ঈশ্বর। বড়োবাবু নেই। সি. আর. পি ক্যাম্পে সি. আই-এর সঙ্গে আছে। ক্যাম্পের লোহার গেটের সামনে ভূষণকে নিয়ে এসে দাঁড়ালো ঈশ্বর। হেডলাইট জেবলে একটা কালো ভ্যান গাঁক-গাঁক করে ক্যাম্পের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে আসতে ছিটকে সরে গেল ঈশ্বর। তাঁতিপাড়ার রাস্তায় চলে গেল ভ্যান : গেটের মুখে ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে রাইফেলধারী দুই প্রহরী। ঈশ্বর, ভূষণকে আটকে দিল তারা। জায়গাটা চারপাশের চেয়ে উঁচু। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমের চেনা জগৎ অন্ধকারে ডুবে আছে। এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে নিজের পরিচয় দিল ঈশ্বর। দুই প্রহরী কিছু বুঝলো না। নাজেহাল ঈশ্বর কী করবে যখন ভাবছে, তখনই অফিস থেকে কুণ্ডু বেরিয়ে এলো। ঈশ্বরকে দেখে একগাল হেসে বলল, আসুন স্যার।

ভয়ে আমসি হয়ে গেছে ভূষণের মুখ। সে ভাবছে এম. এল. এর চেয়ে বন্দুক-ধারী সিপাইএর ক্ষমতা অনেক বেশি। এম. এল. এ কে রুখে দিতে পারে তারা। কুণ্ডুর সঙ্গে ঈশ্বর, ভূষণ যে ঘরে ঢুকলো, সেখানে একটা বড়ো টেবিল ঘিরে আট-দশটা চেয়ার। টেবিলের শেষ মাথায়, তিনটে চেয়ারে বসে আছে জাঁদরেল চেহারার তিন অফিসার। তাদের ডানদিকে দুটো চেয়ারে পোষা মেনি বেড়ালের মতো সি. আই. নিখিল পাল আর থানার বড়োবাবু বসে হাত কচলাচ্ছে। তিন অফিসারের একজন ডি. আই. বি-র মাখন দাসকে আগে দেখেছে ভূষণ। মাখনের মুখ গম্ভীর। ঈশ্বরকে দেখেও মাখনের মুখের ভাবান্তর হলো না। ঈশ্বরকে বসতে বলল বড়োবাবু। পাশের কোনো ঘর থেকে অমানুষিক যন্ত্রণায় ডুকরে উঠলো কেউ। ভূষণ তাকালো ঈশ্বরের দিকে। আমল দিল না ঈশ্বর।

গত তিন, চারমাসে ক্যাম্পের ভেতরটা একদম বদলে গেছে। মালখানার পাশে তিন, চারটে ঘর উঠেছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এতো ঘর কেন? প্রশ্নের সদুত্তর পেল না ভূষণ। শুধু একটানা কাতর গোঙানি শুনে শুকিয়ে যেতে থাকলো তার গলা, বুক। ক্যাম্পের রদবদল ঈশ্বরও নজর করেছে। মাঝেরপাড়ার রাস্তাটা পাকা করার জন্যে গত দশবছরে নানামহলে বহুবার হত্যে দিয়েছে ঈশ্বর। টাকার অভাবে আজও পাকা হয় নি সে রাস্তা। বিধানসভাতেও মিনমিনে গলায় একাধিকবার নিজের আর্জি পেশ করেছে ঈশ্বর। কিছু হয়নি। অথচ সি. আর. পির জন্যে খরচ হচ্ছে অঢেল টাকা। ঈশ্বরের মেজাজটা তেঁতো হয়ে গেল। সার্কেল্ ইন্স্পেক্টর নিখিল পাল প্রশ্ন করল, চা খাবেন?

নাহ্ ঈশ্বর বলল।

ভূষণ ভয়ে বসেনি। ঈশ্বরের চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। তাকে একবার দেখে ঈশ্বরকে সি. আই নিখিল বলল, কাজের কথায় আসি। তাঁতিপাড়ায় বোম্বিং করে কয়েকজন মাতব্বরকে ধরেছি আজ। তাদের আইডেণ্টিফাই করতে হবে আপনাকে। নামগুলো বলতে হবে। একমাত্র আপনি পারবেন।

বিব্রত ঈশ্বর বলল, আমি? আমি কেন?

আপনি স্থানীয় বিধায়ক। জনপ্রতিনিধি। আপনার মতো গণসংযোগ কার আছে?

একবার কেসে গলা সাফ করে নিয়ে নিখিল আবার বলল, যারা ধরা পড়েছে, গত নির্বাচনে তাদের এক, দু'জন আপনার হয়ে খেটেছিল।

পেছনে তাকিয়ে ঈশ্বর দেখলো ভূষণ নেই। এক ফাঁকে কেটে পড়েছে সে। মনে মনে চটলেও ঈশ্বর ভাবলো, ভালোই হয়েছে। সাক্ষীসাবুদ রেখে এসব কাজ করা যায় না। পেছনের খোলা জানলার গায়ে ফুলঝুরির মতো জ্বলছে একরাশ জোনাকি। কান পেতে ঈশ্বর শুনলো একাধিক গলার কাতরানি। ঈশ্বর জানে বিধায়ক হলেও সে অসহায়। তাকে গুলি করে মেরে উগ্রপন্থীদের ঘাড়ে পুলিশ দায়িত্ব চাপালে কোথাও কোনো প্রতিবাদ হবে না। সময় খুব খারাপ। ঈশ্বর বলল, ঠিক আছে। বন্দীদের নিয়ে আসুন।

দুই অচেনা অফিসার স্থির চোখে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের ঘনঘন স্যার বলছে সি. আই নিখিল। বন্দীদের আনার জন্যে নিখিল ইসারা করতে বড়োবাবু হাঁকলো, পাহারা !

ঢিপঢিপ করছে ঈশ্বরের বুক। ডিউটি সিপাই ঘরে ঢুকে সেলাম করতে অচেনা অফিসারদের একজন বলল, এ্যাকিউসড্‌দের না এনে ঈশ্বরবাবুকে লকআপে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

ঠিক আছে স্যার।

কথাটা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সি. আই। বড়োবাবুও দাঁড়ালো। বড়োবাবুর হাতে টর্চ। ঈশ্বরকে বড়োবাবু বলল, চলুন। ঘরের বাইরে করিডোরে এসে ঈশ্বর দেখলো ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে.দুপাশের ফাঁকা মাঠ। কাঠের পাটাতন পাতা করিডোরের মাঝখানে একটা টিমটিমে আলো। থেকে থেকে ভেসে আসছে গোঙানির আওয়াজ। ঈশ্বরের শরীরের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। মহা ঝামেলা, ঈশ্বর ভাবলো। সে বিধায়ক। পুলিশের হুকুম তামিল করা তার কাজ নয়। ঝুঁকি থাকলেও ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে সে। কিন্তু সম্ভব নয়। পুলিশকে তার দরকার। পুলিশ ছাড়া সে ঠুঁটো জগন্নাথ। সি. আইকে বড়োবাবু প্রশ্ন করল, এম. এল. এ সাহেবকে কি এভাবে বন্দীদের চিনিয়ে দেওয়া ঠিক হবে ?

প্রশ্ন শুনে করিডোরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল সি. আই। এক মুহূর্ত ভেবে বলল, বোরখাটা নিয়ে আসুন।

বড়োবাবু দ্রুত চলে গেল। আদল করিডোরে সি. আই. ঈশ্বর পাপাপাশি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। করিডোরের ম্লান আলোয় সি. আইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না ঈশ্বর। এক মিনিটের মধ্যে কুণ্ডুকে নিয়ে বড়োবাবু ফিরলো। কুণ্ডুর হাতে কুচকুচে কালো ছাতার কাপড়ে তৈরি ভাঁজ করা এক পোশাক। ঈশ্বরকে কুণ্ডু বলল, পরে নিন স্যার।

ঈশ্বর কিছু বলার আগেই তার মাথার ওপর থেকে পা পর্যন্ত বোরখায় ঢেকে দিল কুণ্ডু। ফিক করে হেসে কুণ্ডু বলল, একদম মাপসই হয়েছে স্যার।

বোরখায় ঢুকে ঈশ্বরের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ঘেমো গন্ধ। গা ঘুলোচ্ছে। দুচোখ শুধু খোলা। দেখতে পাচ্ছে সব। ঈশ্বরের বুকের ঢিপঢিপানি আরও বেড়ে গেছে। পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। করিডোরের দু'পাশের ঘরগুলোয় কাতর কান্নার শব্দ। ঈশ্বরকে সি. আই বলল, আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই।

একটা হলঘরে মানুষ প্রমাণ পার্টিশন দিয়ে তিন, চারটে লকআপ বানানো হয়েছে। অনেক উঁচু সিলিং-এ ঝোলানো একটা হ্যারিকেনের আলো ছড়িয়ে আছে সবগুলো লকআপে। ফলে লকআপের অন্ধকার না কেটে জমে আছে ধোঁয়াশা। প্রথম ঘরে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা তাঁতিপাড়ার অমর ডাক্তারের গোঁয়ার ছেলে বাবলুকে চিনতে ঈশ্বরের অসুবিধে হলো না। গত বিধানসভা নির্বাচনে তাঁতিপাড়ার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঈশ্বরের পোলিং এজেন্ট ছিল বাবলু। বোরখা পরা ঈশ্বর খুপরি ঘরের লোহার ফাটকের সামনে দাঁড়াতে বাবলুর ঘাড় ধরে তুলে

দাঁড় করালো ডিউটি সিপাই। বাবলুর পাজামার বাঁ পায়ের চোঙা হাঁটু থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। খালি পা। পায়ের পাতায় জমাট রক্ত। বড়োবাবুর টর্চের তেজী আলো মুখে পড়তে বাবলু চোখ বুজলো।

চিনতে পারলেন ?

সি. আই-এর প্রশ্নে ঈশ্বর ঘাড় নাড়তে টর্চ নিভে গেল। পাশের ঘরে মাগো বলে কেঁদে উঠলো কেউ। পাশের ঘরটা বেশ বড়ো। এটাই আসল লক্‌আপ্। সেখানে ঝানু, নিতাই, পলাশকে চিনতেও ঈশ্বর বেগ পেল না! মারের চোটে তিনজনই কাহিল। লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। একদা ঈশ্বরের দলের কর্মী ছিল তিনজন। এখন নেই। করিডোরের দু'পাশের ঘরে সদ্য দাড়িগোঁফ ওঠা বন্দী ছেলেরা অবাক চোখে বোরখা পরা ঈশ্বরকে দেখছে। সি. আই. বড়োবাবুর সঙ্গে ইসারায় কথা বললেও বুকের মধ্যে একটানা গুড়গুড় শব্দ শুনছে ঈশ্বর। মূল লকআপ পেছনে রেখে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে ঈশ্বর দাঁড়ালো। যমদূতের মতো ফটকের সামনে দুই পাহারা। ঘরে বড়োবাবু টর্চের আলো ফেলতে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ পাকানো শরীর বাইশ, তেইশ বছরের যে ছেলেটাকে ঈশ্বর দেখলো, সে একবারে অচেনা। বোরখার ফুটো দিয়ে ছেলেটাকে একবার দেখে চোখ সরিয়ে নিল ঈশ্বর। ছেলেটা একদম নাঙ্গা। শরীরে একটা সুতো নেই। দু'কস বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে রক্ত। তাকে দেখিয়ে ফিসফিস করে বড়োবাবু বলল, এর নাম মোতি। একে জ্যান্ত বা মৃত ধরার জন্যে দু'হাজার টাকা রিওয়ার্ড আছে। রাজনগর থানাই পাবে সে রিওয়ার্ড।

নিস্তব্ধ ক্যাম্প। সামনের রাস্তায় কুকুর ডাকছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া ঈশ্বর ভাবছে পদ্মমণির মুখ। বিলকান্দির বাড়ি থেকে ঈশ্বরকে আসতে বারণ করেছিল পদ্মমণি। বলেছিল, মাসখানেক ইখানে থিকে যাও। রাজনগরে যাবার কী দরকার তুমার ?

বোরখার গরমে ঘামে ভিজে জবজবে ঈশ্বর ভাবলো, পদ্মমণির অনুরোধ উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত হয়েছে। আধঘণ্টা বাদে ক্যাম্পের গেটে এসে দাঁড়ালো ঈশ্বর। রাস্তায় সে পা দিতে কেউ তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ভয়ে সিঁটকে গেল ঈশ্বর। টর্চ জেবলে দেখলো, পাশে ভূষণ। খেঁকিয়ে উঠলো ঈশ্বর, কোথা ছিলি এতোক্ষণ ?

কাঁচুমাচু ভূষণ বলল, লাগাড়ে প্রীতিক্ষা করছিলাম আপনার।

আর প্রশ্ন না করে হাঁটা দিল ঈশ্বর। পাশে ছায়ার মতো সেঁটে আছে ভূষণ। কেউ কথা বলছে না। বাজারের কাছে পেঁাছে ভূষণ বলল, উফ্ কী শাস্তি! ধুমসো একটা বোরখা পরায়ে একজন মানী মানুষকে এভাবে হেনস্তা করতে হয় ? ছি ছি!

ঈশ্বরের মনে হলো বরফগলা জলের ঝাপটায় হিহি কাঁপুনি জাগছে শরীরে। ভূষণকে ফিসফিস করে ঈশ্বর বলল, বোরখার কথা কাউকে বলিসনি।

ভূষণ বলল, কোন শালা বলে ?

ঈশ্বরের মাথার ওপর দিয়ে একটা কুটুরে পেঁচা উড়ে গেল।

একচল্লিশ

ছুঁচের মতো মোতির কানে বিঁধছে পলাশের কাতর গলা। একটু আগে থেমেছে বাবলুর গোঙানি। ফাঁকা ঘরে মোতি একা। একটানা দু'ঘণ্টা মোতিকে পিটিয়ে চা পানির খোঁজে গেছে, ক্লান্ত দুই পালোয়ান। তাদের সঙ্গী অফিসার ওপরওলার সঙ্গে পরামর্শে বসেছে। ফাটকের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছে উর্দিপরা দুই সিপাই। ঘর অন্ধকার হলেও নিজের নগ্ন শরীরের জন্যে লজ্জা পেল মোতি। রাত বাড়তে শীত করছে। মাথার মধ্যে ঘুনপোকার কুরে কুরে খাওয়ার শব্দ। ঠাণ্ডা মেঝে। মোতি জানে, উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। অন্ধকারে দেখতে পেল রুগ্ন বাবার মুখ।

প্রায় এক মাস পরে আজ সকালে তাঁতিপাড়ায় অসুস্থ বাবাকে দেখতে গিয়েছিল মোতি। তখনও সকাল হয়নি। ভোর রাতের ফিকে অন্ধকার ছিল পৃথিবীতে। বাবাকে দেখে, সংসারের খবরাখবর নিয়ে তাড়াতাড়ি বাহেঙ্গায় ফেরার পরিকল্পনা ছিল তার। তিন মাস আগে তাঁতিপাড়ার মাঠে সমাবেশের দিন বাড়িতে আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসার সুযোগ পেয়েছিল সে। সেটাই শেষ। তারপর এক, দুবার বাড়িতে এসে, বলা যায় উঁকি দিয়ে সে চলে গেছে। বসার সময় হয়নি। এক পলক দেখেই বুঝেছে, বাবার দিন শেষ হয়ে আসছে। আর হয়তো দেখা হবে না।

ফি বার বাড়ি ছেড়ে যাবার চোরা অনুশোচনায় সপসপে হয় তার মন। সে ভাবে, বাবাকে এভাবে কষ্ট দেওয়া বোধহয় অন্যায় হলো। অভাবী সংসারের জন্যে কিছু করার ছিল তার। শেষ দেখার দিন অসহায় চোখে মোতির দিকে অবিনাশ তাকিয়ে ছিল। সম্ভবত চিনতে পারছিল না তাকে। অবিনাশের কানের পাশে মুখ নিয়ে মোতি ডেকেছিল, বাবা?

এখন রাত আটটা, সাড়ে আটটা। টেমি হাতে বিছানার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল মা। টেমির কালচে আলো পড়েছিল অবিনাশের মুখে। হয়তো মোতিকেও ছুঁয়েছিল সামান্য আলো। বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে অবিনাশ চিনতে পারলো মোতিকে। কিছু বলতে গেল অবিনাশ। গলায় দুর্বোধ্য ঘড়ঘড় শব্দ হলো। কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টায় জল জমলো দুচোখে। সরু সুতোর মতো গড়িয়ে পড়লো দু'তিন ফোঁটা জল। অবিনাশের চোখের মরা জমি দেখে মোতি বুঝলো, বাবার চোখের জলও ফুরিয়ে গেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের মাঠে বাজছিল ব্যান্ড বিউগল্। স্লোগানের ঝড় বইছিল মাঝে মাঝে। খালি বাড়ি। ছোট ভাইবোনেরা মাঠে গেছে। মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে

ছিল ইন্দু। সবাই চুপচাপ। বাড়ির বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ পেল মোতি। সামনে হপ্তায় আসার কথা দিয়ে মোতি সেই যে গেল আবার বাড়ি ঢুকলো একমাস পরে। বাবা শুষছে। দু'তিন মিনিটের বেশি বাড়িতে থাকতে পারলো না সেদিন। মুখে কিছু না বললেও বাড়ি যাবার জন্যে ছটফট করছিল সে। কপিলের দলের সাতজনকে নিয়ে গত রাতে তাঁতলুই পেঁাছে মোতি তার মনের বাসনা কিশোরকে বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল কিশোর। বলল, সাবধানে যাবি।

কিশোরের হুঁশিয়ারিতে হেসেছিল মোতি। এ মুহূর্তে মোতির তাঁতিপাড়ায় যাওয়া অপছন্দ করেছিল অজিত। মুখে কিছু বলেনি। অজিত নিষেধ করলেও ঠেকানো যেতো না মোতিকে। বাবাকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল সে। অজিত শুধু প্রশ্ন করেছিল কবে ফিরবি ?

কাল, অথবা পরশু।

মোতির জবাব শুনে অজিত বলেছিল, বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকবি না।

এক সেকেন্ড থেমে আবার বলল, একবাণ্ডিল বিড়ি আর একটু গুঁড়ো চা আনবি।

তাঁতিপাড়া জাগার আগে ঘরে পেঁাছে গিয়েছিল মোতি। এ ঋতুতে এগিয়ে আসে সূর্য ওঠার সময়। পূব আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠছিল। টকটকে লাল আকাশ। বাড়ির উঠোনে হল্লা করছিল একঝাঁক শালিক। ডানায় ঢেউ তুলে এক ঝাঁক বক নামলো রিলিফের বাঁধের পেছনে। সারারাত জেগে কাটানোয় মোতির মনে হচ্ছিল, ঘুমের ভেতরে হাঁটছে সে।

লকআপের বাইরে কয়েকজোড়া বুটের ভারি শব্দে সজাগ, হলো মোতি। লোকগুলো ফিরে আসছে। দেওয়ালের মাথার ওপর লোহার শিক লাগানো চিলতে জানলার বাইরে অন্ধকার আকাশ। দু'দশটা তারা ঘরে বসে দেখা যাচ্ছে। এখনই নিভে যাবে আলো, অন্ধকার। পলাশের কান্না আর শোনা যাচ্ছে না। মারের হাত থেকে কি রেহাই পেল পলাশ ? বাবলুর ঘর থেকে ভেসে আসছে কাপড় কাচার মতো আওয়াজ। শানবাঁধানো মেঝেতে বাবলুকে আছড়াচ্ছে নাকি ? পুরো দেওয়াল না থাকায় পাশাপাশি সব ঘরের কথা, শব্দ প্রত্যেকে শুনছে। বাবলুর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে দু'তিন ঘণ্টা তুলকালাম কাণ্ড চলেছে। মোতি শুনেছে সব। কাপড় কাচার শব্দ এখন ঝিঁঝির ডাকের মতো শোনাচ্ছে। দাঁত টিপে নিষ্ঠুর জেরার বাবলু যে মোকাবিলা করছিল, মোতি বুঝেছে। পাশা-পাশি আধখানা দেওয়াল ঘর হবার জন্যেই বোধহয় কেউ তার কান্না অন্যকে শোনাতে চাইছে না। কান্না মানে পরাজয়, হেরে যাওয়া। হারতে রাজি নয় কেউ। মুখ বুজে আধঘণ্টা অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে প্রথমে ভেঙে পড়লো পলাশ। গণসঙ্গীত গাওয়া পলাশের মাজা গলা কান্নায় দুমড়ে গেল। আরও একঘণ্টা বাদে বাবলু যখন নেতিয়ে পড়লো, তখনও কাঁদেনি সে। কান্নার বদলে হেঁচকি তুলছিল। মোতির ডান হাতের মধ্যমায় তখন আলপিন ঢুকিয়ে দিয়েছে প্যান্ট, বুশশার্ট পরা লম্বাটে এক লোক।

তিনকোনা চোয়াল লোকটার হাতে নিজের ঘামে আর মোতির রক্তে ভিজে যাচ্ছিল বারবার। একটা গামছায় ঘন ঘন হাত মুছছিল সে। লোকটার কপাল, মুখ, গলা, জামার বোতাম খোলা বুকে, কোথাও ঘাম নেই। শুধু হাত ঘামছিল।

নখের তলায় আধখানা পিন ঢুকে যেতেও কোনো ব্যথা অনুভব করল না মোতি। মনে হলো, কাদার শরীর তার। হাত পাগুলো পাটকাঠির চেয়ে নরম। শরীরের সব হাড় ভেঙে দিলেও এক ফোঁটা কষ্ট পাবে না সে।

তিনকোনা চোয়াল লোকটা অবাক চোখে মোতিকে দেখছিল। সব ঘরে জেরার মূল প্রশ্ন হলো, কিশোর কোথায়? অজিত কোথায়? বরুণ, রবি, বাঘার ঠিকানা কি? ফেরার সকলের খুঁটিনাটি সব খবর পুলিশ জানে। কার আড্ডা কোন গাঁয়ে, কতোটা হাঁড়িয়া খায় অজিত, কিশোর, বরুণের মতানৈক্য, কিছুই পুলিশের অজানা নয়। মোতির সামনে সাদা পোশাকের পুলিশেরা নিজেদের ভেতরে এসব নিয়ে আলোচনা করেছে। কিশোর, অজিত, বরুণ, রবি, বাঘার সঙ্গে লুঠ হওয়া দুশো বন্দুকও উদ্ধার করতে চায় পুলিশ। তাদের একশো প্রশ্নের তিন, চারটের মামুলি জবাব দিয়েছিল মোতি। আসলে কারও কথা শুনতে পাচ্ছিল না সে। গভীর গুহায় শব্দের যেমন গুমগুম ধ্বনি হয়, তার কানে মানুষের কথা সেরকম আওয়াজ তুলছিল। কানের ভেতরটা যেন উদোম, নির্বোধ, অন্ধকার এক গুহা। তার অবস্থা অফিসাররা বুঝতে পারছিল না। ধৈর্য হারাচ্ছিল তারা। বদলে যাচ্ছিল তাদের গলার স্বর, আচরণ। অল্প সময়ে স্বমূর্তি ধরলো তারা। কিশোর কোথায়? অজিত কোথায়? বরুণ কোথায়? রবি কোথায়? কোন কোন গাঁয়ে বন্দুকগুলো লুকোনো আছে? কোথায় লুকোনো আছে? রবির ডান কপালে কাটা দাগটা কি মিলিয়ে গেছে? বাঘা, নির্মলার সাগাই হয়েছে? নানা দিক থেকে তিন, চার জনের ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্ন মোতি কখনও শুনছে, কখনও শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে কষ্ট হচ্ছিল তার। রাগে টং প্রশ্নকর্তারা জবাব পেতে আস্তিন গোটালো।

বাইরে অন্ধকার করিডোরে কারা যেন কথা বলছে। একটা বর্ণ বুঝতে পারছে না মোতি। জিভ দিয়ে হাওয়া কাটার শব্দ শুনছে শুধু। তিন ঘরের জেরাকারী অফিসাররা প্রায়ই ঘরের বাইরে চাপা গলায় শলাপরামর্শ সেরে নিচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে বিশ, পঁচিশ মিনিটের বিরতি ঘটছে। অনেক উঁচুতে টাঙানো হ্যারিকেনের ভুষো জমা কাচের চিমনি বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর আলো। সেদিকে তাকিয়ে মোতির মনে হলো, হ্যারিকেন গলে যাচ্ছে। খাঁকি হাফপ্যাণ্ট, সাদা গেঞ্জি গায়ে এক সেপাই বাইরে থেকে বিপন্ন চোখে দেখছে মোতিকে। কোটরে ঢুকে গেছে তার দুচোখের মনি। ঘুমে জুড়ে যাচ্ছে মোতির চোখের পাতা। তবু জেগে থাকতে চায় সে। ঘুমোলে নরম হয়ে যায় শরীর মন। অল্প চাপে বেশি ব্যথা লাগে। মাথায় কাজ করছে আরও এক ভয়। আশঙ্কা জাগছে, ঘুমোলে আর হয়তো জাগবে না সে।

অনেক চেষ্টাতেও এড়াতে পারছে না এই অনুভব।

সকালের ঘটনা আবার তার স্মৃতিতে ফিরে এলো। মা জাগার আগেই বাড়ি পৌঁছেছিল সে। সোজা বাবার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিছানা খালি, বাবা নেই। মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়েছিল সে। দুচোখ কচলে তাকিয়ে বিছানায় মিশে যাওয়া অবিনাশকে দেখতে পেল মোতি। আরও এক পা এগিয়ে অবিনাশের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলো। আবছা ক্ষীণ ধ্বনি। বাবা বেঁচে আছে। বাবা জেগে, না ঘুমিয়ে, বুঝতে না পেরে বাইরে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল সে। মা জেগে গেছে। উঠোনে বাসন ধুচ্ছিল মা। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দু। পাশের ঘরে মেঝেতে চ্যাটাই-এর ওপর ঘুমোচ্ছে চার ভাই বোন। মোতিকে দেখে মা, ইন্দু অবাক। বাঁশবনের পেছনে ঝলমল করছিল সকালের আলো। বাঁশবনের ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক হরিয়াল পাখি। উঠোন ছেড়ে মোতির পাশে এসে দাঁড়ালো মা। তারপর এলো ইন্দু। হাত ধরে মোতিকে ঘরে নিয়ে গেল মা। ঘরে বসে শিবেনের খুনের খবর শুনলো মোতি। রাজনগর হাসপাতাল ছেড়ে অনুপের চলে যাবার কথা বলার সময়ে কেঁদে ফেললো ইন্দু। কান্না লুকোতে মুখে আঁচল চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। তার সঙ্গে মোতিও দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ইন্দু। নির্জন পুকুরঘাটে অথবা বাঁশবনে, অনেকক্ষণ কেঁদে বুকের ব্যথা হয়তো কমাতে গেল সে। দাওয়ার খুঁটি ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল মোতি। ভোরের আলো, বাতাস, পাখির ডাক, পলকের জন্যে তার চেতনা থেকে মুছে গিয়েছিল।

কালো ভুষোয় ঢেকে যাচ্ছে হ্যারিকেনের চিমনি। হাফপ্যান্ট, গেঞ্জিপরা সিপাইকে বাইরে আর দেখা যাচ্ছে না। সকালের ঘটনা আবার ফিরে এলো তার মাথায়। সি. আর. পি. আর পুলিশের এক বিশাল বাহিনী যে তাঁতিপাড়া ঘিরেছে, টের পায়নি মোতি। শুধু সে কেন, বাবলু, পলাশ, ঝানু, উঠোনের ছোট ঘরে যারা সভা করছিল, বুঝতে পারেনি কেউ। ইন্দুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে বাবলু, পলাশ, ঝানুকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল মোতি। ইন্দু খবর দিয়েছিল পলাশকে। বাকীদের জড়ো করেছিল পলাশ। অমল কল্যাণও খবর পেয়েছিল। তারা আসেনি। মোতির সঙ্গে আলোচনায় বসতে আপত্তির কথা সরাসরি পলাশকে বলেছিল তারা। পাড়া ঘেরাও হয়েছে জানার আগের মুহূর্তে বাবলু বলছিল, শিবেনকে খতম করা ছাড়া উপায় ছিল না। পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়েছিল সে। দিবাকর মালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো।

বাবলুর কথায় ধড়াস করে উঠেছিল মোতির বুক। কী বলবে, ভেবে পেল না সে। দু'হাতে মাথা চেপে বসে ছিল ঝানু। ফোঁস করে শ্বাস ফেলে সে বলল, নিজেদের মধ্যে ইভাবে কাটাকাটি, কাজিয়ায় আমি নেই। ইভাবে চললে পার্টি উঠে যাবেক।

বাজে কথা, বাবলু বলল, পার্টিবিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

কারা পার্টিবিরোধী ?

মোতির প্রশ্নে চড়া গলায় বাবলু বলেছিল, তোমরা।

তুমি, কিশোর, অজিত।

বাবলুর কথা শেষ হবার আগে ঝানু ডুকরে উঠলো, চুপ মার, চুপ মার। ইটা কি শুরু করলি তুরা ?

ডানহাতের পাতা মুখে চেপে হঠাৎ হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল ঝানু। হাতের কড়ে আঙুল নেই। বন্দুক দখলের রাতে পরাশিয়ায় উড়ে যাওয়া আঙুলের ক্ষত থেকে গেছে।

ঝানুর কাঁধে মোতি হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে উঠোনের মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠলো একদল সশস্ত্র পুলিশ। তাদের হাতে রাইফেল, বন্দুক। রাইফেলের মাথায় তীক্ষ্ণ-মুখ, ঝকঝকে বেয়োনেট। গোটা তাঁতিপাড়ায় তখন শুরু হয়েছে হৈহৈ। প্রায় প্রতি বাড়িতে পুলিশ, সি. আর. পি ঢুকে তল্লাশীর নামে ভাঙচুর, মারধোর, তাণ্ডব লাগিয়ে দিয়েছে। পুলিশ দেখে কালো হয়ে গেল মোতির মুখ। বাবলু, পলাশ, ঝানুকে সাতসকালে বাড়িতে সে ডেকে এনেছে। তারা ধরা পড়ে গেল।

একটানা হুইসিল বাজছিল বাইরে। দাওয়ার ওপর ইন্দুর আর্ত গলা শুনে মোতি তাকাতে তার কোমরে পড়লো বুটের সজোর লাথি। সোজা হয়ে সে বসার আগে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার ঘাড়ে মারলো একজন। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল মোতি।

লকআপের কাছে কোনো গাছে থেকে থেকে ডেকে উঠছে একটা পেঁচা। আফশোস হচ্ছে মোতির। কিশোর, অজিত তাঁতিপাড়ায় যেতে বারণ করেছিল তাকে। সতর্ক থাকতে বলেছিল। তাদের কারও পরামর্শে কান দেয়নি সে। কান দিলেও সেভাবে কাজ করেনি। চোখের পলকে অন্যরকম হয়ে গেল পরিস্থিতি। ধিক্কারে তছনছ হচ্ছে বুক। বাবাকে দেখার সঙ্গে আরও এক চোরা ইচ্ছের টানে তাঁতিপাড়ায় এসেছিল সে। বাবাকে দেখার চেয়েও বোধহয় তীব্র ছিল সেই গোপন তাগিদ। একটা জরুরি কথা মাধুকে সে বলতে চেয়েছিল। অপূর্ণ থেকে গেল সাধ। মাধু কি কখনো জানতে পারবে সে কথা ?

কিন্তু কোথা থেকে খবর পেয়ে তার বাড়িতে সোজা ঢুকে পড়লো পুলিশ ? বাড়ি চেনালো কে ? গত এক, দেড় বছরে চার, পাঁচবার তাদের বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়েছে। তাকে পায়নি। আজ পেয়ে গেল। তার বাড়িতে আসার খবর কি পুলিশ জেনেছিল ? কীভাবে জানলো ? চিন্তাটা জাগতেই মোতির মনে এলো দিবাকরের নাম। দিবাকর মাল, চৌকিদার, তার দিবাকরকাকা, মাধুর বাবা, কি এতোবড়ো শত্রুতা করল ? মোতির ঘোলাটে মাথা আরও ঘোলা হয়ে গেল। মাধু আর তার বাবা, পৃথিবীর দুপ্রান্তে যেন দাঁড়িয়ে আছে দুজন। কিন্তু নাহ্, তা হতে পারে না। চৌকিদারি করলেও লোকটা বেইমান নয়। একই ভিটের মধ্যে, এক সংসারে গা ঘেঁসাঘেঁসি করে আছে বাপ, মা, মেয়ে। তাদের মধ্যে কোনও পাপ, গ্লানি কখনও দেখেনি মোতি। তবু সন্দেহ যায় না। মাধু কি জানে, মোতিকে পুলিশের

হাতে তুলে দিয়েছে, তার বাবা ? অভিমানে টনটন করে উঠলো মোতির বুক। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে দিবাকরকে দেখেনি মোতি। তার নজর এড়াতে হয়তো আড়ালে ছিল দিবাকর। ছিল কি ? লুকিয়ে পড়ার সেরকম জায়গা তো কাছে পিঠে ছিল না। বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল সে। জ্ঞান ফিরতে আবছা শুনতে পাচ্ছিল ছুটোছুটি, চিৎকার, কান্না, গুলির শব্দ। তাঁতিপাড়া তছনছ করে দুপুর দুটো নাগাদ কালো প্রিজনভ্যানে তোলা হলো তাকে। আরও অনেকে ছিল ভ্যানে। বসার শক্তি নেই কারো। সবাই চিৎপাত। মোতি বুঝেছিল, নতুন পর্ব শুরু হলো। আচ্ছন্ন মাথা। ভাবতে পারছিল না কিছু। জাপটে ধরেছে আতঙ্ক। পালাবার উপায় নেই। চেষ্টা করলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। প্যাণ্ট, বুশশার্ট পরা রোগা, লম্বা এক অফিসার বন্দীদের তদারক করছিল। অকারণে মোতির মনে হলো, তার আসল পরিচয় জানতে পারেনি অফিসার। কিংবা জেনেও উদাসীন ভঙ্গিতে কোনো কূট প্যাঁচ কষছে। ভ্যানের মেঝেতে আধশোয়া মোতি দুঃস্বপ্ন দেখছিল। পুলিশে ধরা পড়েছে, মেনে নিতে পারছিল না। বহুরাতে গ্রেফতারের দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে উঠে যে প্রশান্তি পেয়েছে, আজও সেরকম কিছু ঘটার প্রত্যাশা ছিল তার। কিন্তু তা যে অসম্ভব, মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল। ভয়, আতঙ্কের বদলে মনের মধ্যে ধীরে ধীরে তৈরি হলো প্রতিরোধ।

সবুট লাথি, বন্দুকের কুঁদোয় যে ঘটনার শুরু, ক্যাম্পে পৌঁছে তা চরম চেহারা নিল। চোখের সামনে আলো মুছে যেতে থাকলো বারবার। কষ্ট পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, আরও বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারে সে। কিশোরের মুখে যে মানুষগুলোর গল্প অনেকবার শুনেছে, সেই ফুচিক রোজেনবাগ, নগুয়েন ভান এয়, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেনকে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। আলো, অন্ধকারে সেই মহৎ মানুষদের মুখগুলো মাখামাখি। দূরে কোথাও কান্নার মতো সুর করে তিতির ডাকছিল। ধুতি, শার্টপরা দোহারা স্বাস্থ্যের একজন লোক একটা একটা করে টেনে তুলছিল মোতির জুলপির চুল। লোকটার নিরীহ মুখ। বাদামভাজা খাওয়ার মতো সহজভঙ্গিতে কাজ করছিল সে। একঝলক বাতাসে ভেসে এলো আমন শস্যের গন্ধ। ঘাড়ে বন্দুকের ঘা পড়ার পর জ্ঞান ফিরতে মোতি টের পেয়েছিল শরীরের কোথাও কিছু নড়ে গেছে। ঠিক কী হয়েছে বুঝতে পারছিল না সে। নির্যাতনে কাবু হয়নি। শুধু ঘুরে ফিরে মাথায় জাগছিল নানা মুখ, ছবি, স্বপ্ন। এতো স্বপ্ন মাথায় ছিল, সে জানতো না। জিপের পেছনে বেঁধে মাটিতে ঘষটাতে ঘষটাতে একজন মানুষকে থানায় নিয়ে যাবার কাহিনী মনে পড়লো তার। এ কাহিনীর কিশোরের মুখে শোনা। পাথুরে রাস্তায় দু'হাত বাঁধা মানুষটা গাড়ির সঙ্গে চলেছে। তার শরীর বিক্ষত, রক্তাক্ত, মুখে যন্ত্রণার ছাপ নেই। ছোটখাটো, রোগা সেই মানুষটার নাম হো চি মিন।

তৃতীয়বার বেহুঁশ হবার আগে হো চি মিনকে পরিষ্কার দেখেছিল মোতি। জ্ঞান ফিরতে মনে পড়লো, ব্যারাকপুরের মাঠে ভোররাতে ফাঁসিকাঠে একজন মৃত মানুষকে

লটকে দেওয়া হলো। ফাঁসি দেবার আগেই মেরে ফেলা হয়েছিল তাকে। তার গলায় ফাঁস লাগাতে কলকাতার কোনো ডোম রাজি হয়নি। কী যেন তার নাম। মনে পড়েছে। মঙ্গল পাঁড়ে। মঙ্গল পাঁড়ের সঙ্গে মোতি দেখলো কলকাতা থেকে লখনৌ পর্যন্ত রাস্তার দুধারের গাছে ঝুলছে বুলেটে ঝাঁঝরা হাজার হাজার বিদ্রোহীর মৃতদেহ। শিক্ষামূলক শাস্তি। স্বাধীনতার জন্যে আর বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখবে না দেশের মানুষ।

কিশোর কোথায়? অজিত কোথায়? বরুণ, রবি, বাঘা কোথায়? কোথায় লুকোনো আছে বন্দুক?

টাঙিয়ে কচুয়া ধোলাই-এ গলা শুকিয়ে যেতে মোতি বিড়বিড় করল, জল!

জহ্লাদ চেহারার একজন লুঙি তুলে ছরছর করে তার মুখে ঢেলে দিল শরীরের গরম জল। প্রায় ইউরিনালের উচ্চতায় ঝুলছিল মোতির হাঁমুখ। জহ্লাদের শরীরের শেষ বিন্দু পর্যন্ত মুখ,গলা হয়ে মোতির পেটে চলে গেল।

মুখ ঘোরাবার উপায় ছিল না তার। পলাশের আর্তনাদ, বাবলুর গোঙানি শুনতে পাচ্ছিল সে। একজন মানুষের প্রস্রাব পুরো গলাধঃকরণের পরেও তিহেবাহা ফুলের মিঠে গন্ধ পাচ্ছিল সে। মনে মনে সে উচ্চারণ করেছিল, কিশোরদা, অজিতদা, তোমরা দেখে যাও আমি হারিনি।

ঝুলন্ত মোতিকে লুঙিপরা প্রশ্ন করেছিল, কিরে শালা কেমন লাগলো জল?

ঘামে ভেজা দু'হাতের পাতা তোয়ালেতে মুছে মোতির দিকে বিব্রত চোখে তাকিয়েছিল অফিসার।

রাত বয়ে যায়। নিস্তব্ধ ক্যাম্প। মাঝরাতে হঠাৎ মূল লকআপে মোতি, বাবলু, পলাশকে একসঙ্গে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো ঘরে আছে ঝানু। পাশাপাশি তিনজন শুয়ে আছে। কারো কথা বলার শক্তি নেই। লকআপের মেঝেতে গায়ে গা, মাঝখানে পলাশ, তার ডানদিকে বাবলু, বাঁয়ে মোতি। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে পলাশের শরীর। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করলেও মোতির গলা থেকে শব্দ বেরোচ্ছে না। ঘাড়ে বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো খেয়ে শরীরে যেন কী হয়েছে! কোথায়, কেন, কাদের সঙ্গে ভুলে যাচ্ছে। উঁচু জানলার বাইরে ফিকে নীল আকাশ। সোনালি রঙ এক রাজপথ ফুটে উঠলো আকাশে। দশ ঘোড়ার রথ ছুটিয়ে কে যায় ওই? মুখটা চেনা। মুখে স্নিগ্ধ হাসি।

ভোরবেলায় একজন চা'ওলাকে নিয়ে লকআপে ঢুকে এক সিপাই বলল, চা!

তিন ভাঁড় চা রেখে সিপাই, চা'ওলা বেরিয়ে যেতে বন্ধ হলো লকআপের গেট। বাবলুর সারা শরীরে ব্যথা। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে। পলাশকে ডাকতে পাশ ফিরে শুলো সে। পলাশ একবার তাকাতে টকটকে লাল তার দু'চোখ বাবলুর নজর এড়ায়নি। আড়মোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে উঠে বসলো বাবলু। মোতিকে দেখলো। অকাতরে ঘুমোচ্ছে সে। পলাশকে আবার ঠেলা দিতে চোখ খুলে উঠে বসার

চেষ্টা করল সে। ব্যথায় ডুকরে আধশোয়া ভঙ্গিতে তুলে নিল চায়ের ভাঁড়। শিশির ভেজা ঘাস, পাতার গন্ধ পেল বাবলু। চা শেষ করে পলাশের শরীরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মোতিকে ধাক্কা দিল বাবলু। মাটির ঢেলার মতো মোতি উল্টে যেতে ভয়ে বাবলু কেঁদে ফেললো। ঘুমের মধ্যে মারা গেছে মোতি। মৃত মোতিকে পাশে নিয়ে দু'বন্ধু সারারাত ঘুমিয়েছে। বাবলুর কান্না শুনে ছুটে এলো ডিউটিসিপাই। তারপর এলো অফিসাররা। খুদে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে সকালের টুকরো রোদ। ময়লা লুঙিপরা আদুল শরীর মোতির দিকে তাকিয়ে আছে বাবলু, পলাশ। মোতি আর জাগবে না

বিয়াল্লিশ

হাসপাতাল ছেড়ে রাস্তায় এসে হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল দিবাকরের বুক। সে বুঝতে পারলো, যমুনা আর বাড়ি ফিরবে না। যমুনার বিছানার পাশে যেতে ভক করে যে গন্ধ দিবাকর পেয়েছিল, সে গন্ধ তার খুব চেনা। মানুষের শরীরে মৃত্যু ঢুকলে এ গন্ধ বেরোয়। এ মৃত্যুর গন্ধ। এ গন্ধ আগে, বাপ, পিতামোর এমন কি মাধুর কচি ছেলেটার মৃত্যুর আগেও সে পেয়েছে।

হলুদ, দোতলা হাসপাতাল বাঁড়ির পেছনের বারান্দায় মেঝেতে একটা চটের বিছানায় যমুনাকে রেখে যেতে কষ্ট পেল দিবাকর। বাড়ি থেকে হাসপাতালে আসার পথে এমন গন্ধ সে পায়নি। ঝাঁঝালো ওষুধ, রুগীর পথ্যের গন্ধ তার চেনা। বারবার সে গন্ধই পেয়েছে দিবাকর। গন্ধের চরিত্র আজ একদম বদলে গেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে হাসপাতালের দোতলা বাড়ির দিকে তাকাবার সাহস পেল না সে। তার মনে হলো, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ইস্টিশন খালি করে এবার চলে যাবে গাড়ি। যারা যাবে, ফেরার গাড়ি তারা পাবে না। এ যাওয়া শেষ যাওয়া।

যাবার বার্তা যমুনাও বোধহয় পেয়েছে। শেষ বিকেলে তার বিছানার পাশ থেকে উঠে দিবাকর যখন বলল, যাই, তখন অবোধ, ঘোলাটে চোখে তাকিয়েছিল যমুনা। তার দৃষ্টির সামনে কষ্টে ফুটিফাটা হয়েছে দিবাকর। ত্রিশ বছর সংসার করেও যমুনার দুচোখে ছলছল করছিল আরো বহুদিন সংসারী থাকার সাধ। তবু মুখ ফুটে কিছু বলেনি সে। এঝফোঁটা চোখের জল ফেলেনি। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা শুনে সে যেন বুঝে গিয়েছিল, আর কথা বলার কোনো মানে হয় না। যমুনার পাশ থেকে উঠে এসে হাসপাতালের অফিসঘরে ঢুকে ডাক্তারবাবুর পায়ে লুটিয়ে দিবাকর বলেছিল, আমার বউটারে বাঁচায়ে দ্যান ডাক্তারবাবু। সংসারে কেউ নেই আমার।

পা গুটিয়ে বিব্রত ডাক্তার প্রশ্ন করেছিল, কে অপনার বউ ? কী হয়েছে ?

দিবাকরের মুখে কথা সরছিল না। তাকে নিয়ে যমুনাকে দেখতে এলো ডাক্তার। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর অফিসে ফিরে দিবাকরকে হরেক প্রশ্ন করল। একজন শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে ইংরিজিতে ঝগড়া করতে করতে ঘরে ঢুকলো কোট, প্যান্টুল পরা বড়ো ডাক্তার। তাকে দেখে ছোকরা ডাক্তার, নার্সরা তটস্থ। যমুনার কাছে আবার ফিরে গিয়েছিল দিবাকর। সবুজ ডুমো মাছি বসছে যমুনার মুখে। তার সাড় নেই। মাছির উৎপাত বুঝতে পারছিল না সে। অসহায় দিবাকর আবার ছুটে এলো অফিসঘরে। খালি ঘর। বড়ো ডাক্তার, ছোট ডাক্তার, নার্স কেউ নেই।

বেলা প্রায় বারোটা। সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে দিবাকর। দাঁতে কুটো

কাটে নি। তবু খিদে তেষ্টার বোধ নেই। ঝাঁঝা রোদে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে বক্রেশ্বরের যে বাসে দিবাকর উঠলো, চন্দ্রপুরে পৌঁছে বিগড়ে গেল সে গাড়ি। বনেট খুলে, কলকব্জা নেড়ে, ঠেলাঠেলি করে প্রায় একঘণ্টা পরে ছাড়লো বাস। শেষ দুপুরে তাঁতিপাড়ার বাসস্টপে নেমে দিবাকর দেখলো থমথম করছে চারপাশ। স্টপে একজন মানুষ নেই। মাধাই-এর চা দোকান বন্ধ। দোকানের পেছনে অশথ গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। মাধাই কখনও এ সময়ে দোকান বন্ধ রাখে না। রাস্তার দু'পাশের গাছপালায় একটা পাখিও ডাকে না। ব্যাপার কী? দিবাকর কেমন ঘাবড়ে গেল। বড়ো রকমের একটা গোলমালের আভাস পেল সে।

দোকানের ঝাঁপ সামান্য ফাঁক করে দিবাকরকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো মাধাই। খাড়া খাড়া হয়ে আছে তার চুল। মুখে আতঙ্ক। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মাধাই শোনালো সকালের ঘটনা। বলল, পুলিশের জন্যে চা বানিয়ে হাতে ব্যথা। কতো কাপ চা করেছি, ক'পয়সা পেয়েছি জানি না। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও তুমি।

ঘটনা গুছিয়ে বলতে পারলো না মাধাই। তবু বাতাসে বারুদের গন্ধ পেল দিবাকর। হনহন করে বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করল সে। তাঁতিপাড়ার আকাশে ধুলো, ধোঁয়ার নিশ্চল জট। পুলিশের গাড়ি, বুট, গুলিতে যতো ধুলো, ধোঁয়া উড়েছে, এখনও থিতোয়নি। রাস্তার ডানদিকে নফর ময়রার মিষ্টির দোকান, বাঁয়ে বটু নন্দীর কয়লার আড়ত, পাশে নরেন মুদির দোকান, সব বন্ধ। গাঁয়ের ভেতরে মানুষের গলার মিহি আওয়াজ। তারা কথা বলছে, না কাঁদছে বুঝতে পারলো না দিবাকর। হাঁটার গতি বেড়ে গেল তার। বসন্তের বিকেলের চড়া রোদ চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় ছড়িয়ে আছে। অর্জুন তাঁতির বাড়ির কাছে গিয়ে কার কান্নার শব্দ দিবাকর যেন শুনতে পেল। কাঁদে কে? একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো সে। প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকতে ডাকতে পোলেদের ডোবা থেকে হেলেদুলে উঠে আসছে একজোড়া হাঁস। বাড়ির উঠোনে দু'তিনটে চেনামুখ দেখে ছলাৎ করে উঠলো দিবাকরের বুকের রক্ত। দাওয়ার খুঁটি ঘেঁসে বসে আছে যতনের মা। উঠোনে দাঁড়িয়ে যোগমায়া মাসি। তার পাশে ভুবন মালের মেয়ে বিন্তি। দিবাকরকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো যতনের মা। গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো পাড়ার চেনা কুকুর। চাঁচের সদর ঠেলে উঠোনে এসে মাধুকে দেখতে পেল না দিবাকর। দাওয়ায় উঠলো সে। সামনে ঘর। দরজা বন্ধ। বোবা চোখে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে আছে দিবাকর। আকাশ ফাটিয়ে গাল পাড়ছে যোগমায়া মাসি। কাকে গাল দিচ্ছে?

যোগমায়ার খ্যানখেনে গলা দিবাকরের কানে গেল না। যতনের মা চাপা গলায় বলল, মাধুকে একা পেয়ে তিন, চারটে জনোয়ার!

কথা শেষ না করে মুখে আবার আঁচল চাপলো যতনের মা। যোগমায়া সমানে চেঁচাচ্ছে, ওরে আবাগীর বেটারা, তুদের ঘরে কি মা, বুন নেই। কার ইজ্জত লুটে নিলি তোরা? তুদের বংশে বাতি দিতে থাকবে না কেউ।

ঝিমঝিম করছে দিবাকরের মাথা। ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সাহস নেই তার। তবু ঠেলা দিয়ে দরজা খুললো সে। ধোঁয়াটে, অন্ধকার ঘর। চোখ

অন্ধ হয়ে যেতে উঠোনের দিকে তাকালো দিবাকর। গোয়ালের পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঝিঙে মাচা। মাটিতে ছড়ানো হলুদ ঝিঙেফুল। হাঁস, মুরগির খাওয়ার কুঁড়োর মালসা টুকরো টুকরো। ভাঙা মালসা ঘিরে চরে বেড়াচ্ছে ক্ষুধার্ত পোষা জীবের দল। না খেয়ে ঘরে ঢুকবে না তারা। হাসপাতালে যাবার আগে যমুনা বলেছিল, এ সনে খুব ঝিঙে হবে। নজর রেখো পোকা যেন না হয়। হাঁস, মুরগিদের দুবেলা কুঁড়ো দিও।

যমুনার কথা মাধুও শুনেছিল। সে বলেছিল, মা, আমি তো আছি।

চোখ জ্বালা করছে দিবাকরের। অন্ধকার ঘরের মেঝেতে মাধুকে এতোক্ষণে দেখতে পেল দিবাকর। আদুল মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে মাধু। ঘরে দিবাকর ঢুকেছে টের পেয়েও সে তাকালো না। যমুনার কথা আবার দিবাকরের মনে পড়লো। রিকশায় বাসে বারকয়েক যমুনা বলেছিল, অসহায় মেয়েটা যেন ভেসে না যায়! তুমি দেখো।

যমুনার আরও কিছু বলার ছিল। বলতে পারেনি। যমুনা যা বলেনি, সে কথাগুলো দিবাকর জানে। কিন্তু মোতি কোথায়? অনেকদিন তাকে দেখেনি দিবাকর।

লণ্ডভণ্ড ঘর। মত্ত হাতি ঘরে ঢুঝে সব যেন ছারখার করে দিয়েছে। জামা-কাপড়, বাসন ছড়ানো, ভাঙা হাঁড়ি, কলসী, ধরাশায়ী কুলুঙ্গীর লক্ষ্মী, গণেশ যতনের মা, যোগমায়া, বিন্তি চলে যেতে বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরাশিয়ার শিব মন্দিরে সন্ধিপুজোর কাঁসর বাজছে, কাঁইনানা, কাঁইনানা: দরজায় দাঁড়িয়ে একবার ভাঙা ঝিঙেমাচা, একবার মাধুকে দেখছে দিবাকর। হঠাৎ দৃষ্টিভ্রম হলো তার। দিবাকর দেখলো, চটকানো ঝিঙেলতার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে যমুনা। যমুনার মুখে হাসি। বয়স কমে গেছে তার। বিয়ের কনের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

ধাঁধাঁ খেল দিবাকর। বুক দিয়ে আগলে রাখা এই ভিটে, সংসার, সাধের লাউমাচার দিকে যমুনার নজর নেই। অপলকে সে দেখছে দিবাকরকে। সিরসির করে উঠলো দিবাকরের শরীর। দুহাতে মুখ ঢাকলো সে। দিন শেষ। পুব আকাশে জ্বলজ্বল করছে সন্ধ্যাতারা। সামনের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছে কেউ। দিবাকরের উঠোনে এসে দাঁড়ালো যতন। সে হাঁপাচ্ছে। দু'তিন সেকেন্ড পরে দম নিয়ে সে বলল, শিবেন খুন হয়ে গেছে। ময়ূরাক্ষীর জলে পাওয়া গেছে তার লাশ। শরীর ফুলে ঢোল, ধড় থেকে মুণ্ডুটা ঝুলছে।

আতঙ্কে যতনের গলা বুজে গেল। খবর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল সে। দিবাকর পাথর। যতনের সব কথা কানে না ঢুকলেও শিবেন খুন হয়েছে, বুঝতে পারলো। অন্ধকার ঘন হতে উত্তরের শালবনে শিয়াল ডাকতে শুরু করেছে। টেমিটা জ্বালানো দরকার। অবশ শরীর চলতে চায় না। মাধুর সামনে সে দাঁড়াবে কী করে? কীভাবে মুখ দেখাবে? শিথিল পায়ে অন্ধকার ঘরে ঢুকে মাধুর পাশে বসলো দিবাকর। হাত, পা গুটিয়ে ময়লা পুঁটলির মতো মাধু পড়ে আছে। মেয়ের পিঠে হাত রেখে দিবাকর ডাকলো, মা!

সাড়া দিল না মাধু। তার পিঠ থেকে হাত সরালো না দিবাকর। তিন, চার সেকেন্ড চুপ থেকে সে আবার ডাকলো, মা!

তাল পাকানো মাধুর শরীর সটান, সোজা হয়ে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। কান্নার দমকে যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার শরীরের সব কলকব্জা। দিবাকরের বুকে নিঃশব্দ হাহাকার। অসহায় মেয়েটাকে লোপাট করে দিয়ে গেছে শয়তানরা। বাপ হয়ে সে বাঁচাতে পারেনি মেয়েকে। মাধুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিবাকর বিড়বিড় করল, কাঁদিস না মা, কাঁদিস না।

দিবাকর টের পেল তার তলপেট ঠেলে উঠে আসছে কান্না। আর একটা কথা বললেই নোনা জলে ভেসে যাবে সে। মেয়ের পিঠ ছুঁয়ে তাই চুপ করে বসে থাকলো দিবাকর। সারাদিনের টানাপোড়েনে সে ক্লান্ত। কুয়াশা জমে আছে মাথায়। বাইরে পাতা খসার টুপটাপ শব্দ। মন শক্ত করে মেয়েকে দিবাকর বলল, লাজ বাসিস না মা, লাজ বাসিস না।

তেতাল্লিশ

দিন বড়ো হলেও ছ'টার মধ্যে এখনও অন্ধকার হয় পৃথিবী। বিকেল পাঁচটায় ধূসর ছায়া নামে। জিপিওর চাতালে এই সাড়ে চারটেতেই আলো মরে গেছে। বিশাল গম্বুজের কার্নিসে, ঘুলঘুলিতে গলা ফুলিয়ে বকবকম করছে এক দঙ্গল পায়রা। পায়রাদের সুখের ঘরকন্না দেখে লালদিঘির দিকে তাকালো রেবা। দিঘির জল কালো হচ্ছে। পোড়া মোবিল, ডিজেলের ধোঁয়া, ধুলোয় চোখ জ্বালা করছে। রুমালে চোখ মুছলো রেবা। গম্বুজের ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে চারটের ঘণ্টা পড়লো। চারটেতে অতীনের আসার কথা। এখনও এলো না। পার্টির গোপন এক চিঠি রেবাকে দেবে অতীন। কালিঘাটে, কাঁসারিপাড়ার এক ঠিকানায় চিঠিটা পৌঁছে দেবে রেবা। চিঠিটা শুধু গোপন নয়, ভীষণ জরুরি।

সকাল দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে রেবা। দক্ষিণ কলকাতার নানা গলিতে এক-ডজন টেলিফোন সাফ করে, তারপর চাকরির খোঁজে দু'টো অফিসে ঢু মেরে এখন নেতিয়ে পড়েছে তার শরীর। ক্লান্তিতে ঝাপসা দেখছে। বোধ-বুদ্ধি অসাড়, ভোঁতা। ধোঁয়ায় চোখদুটো আবার কটকট করতে চোখে রুমাল বোলালো সে। গত পরশু প্রভাদির বাড়িতে অতীন, সন্তুর সঙ্গে রেবার দেখা হয়েছিল। প্রায় বছরখানেক বাদে দু'জনকে দেখলো। অতীন, সন্তু যে ফেরার, শুট্ এ্যাট সাইটের ফর্দে তাদের নাম উঠে গেছে, রেবা জানতো না। সন্তুই সব বলল। প্রভাদির মার্কামারা বাড়িতে তাদের দেখে ধড়ফড় করছিল রেবার বুক। দ্যুতি, দীপ্তি মারা গেলেও পুলিশের নেকনজরের বাইরে নয় প্রভাদির বাড়ি। রেবা চাইছিল প্রভাদির সঙ্গে কাজের কথা সেরে তাড়াতাড়ি বিদায় হোক অতীন, সন্তু। কিন্তু তাদের বকবকানি থামে না। কথার শেষ নেই। প্রভাদিও গল্পে মশগুল। অতীন, সন্তু দুজনেই দ্যুতির স্কুল, কলেজের বন্ধু। মা বলে প্রভাদিকে ডাকছিল তারা। দু'চার মিনিটে রেবা বুঝেছিল, প্রভাদির সন্তানশোক ভোলাতেই অতীন, সন্তু এসেছে। প্রায়ই আসে। তারা এলে প্রভাদি ছাড়তে চায় না। কথা চালাচালির মধ্যে এসব তথ্য রেবা পেয়েছিল। সন্তুর প্রশংসায় প্রভাদি বলল, দ্যুতির যেবার টায়ফয়েড হলো, দিনের পর দিন তার সেবা করেছিল সন্তু। রাত জেগে জলপটি দেওয়া, ওষুধ আনা, কী করেনি?

মাতৃত্বে উথলে ওঠা প্রভাদির পাথরের মতো মুখে পরশু হাসি দেখেছিল রেবা। শুধু প্রভাদি কেন, অতীন, সন্তুও মা মা করে অস্থির। রেবার কানে বানানো লাগেনি দু'জনের মা ডাক, আবেগ, অনুরাগ। প্রভাদির কোলে মাথা রেখে শিশুর মতো শুয়েছিল অতীন। মুছে গেছে তার মুখ চোখের উদ্বেগ, চাপ। জানলার

বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্তু বোধ হয় ভাবছিল দ্যুতি, দীপ্তির কথা। অতীনের কপালে হাত রেখে প্রভাদি বলেছিল, এ ছেলেও কম নয়। অতীনের জিম্মায় বাড়ি দিয়ে একবার গিরিডি বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা। দ্যুতি, দীপ্তিও গিয়েছিল। এক হপ্তার জায়গায় দশদিন পরে গিরিডি থেকে বাড়ি ফিরে দেখলাম, ভাঁড়ার ঘরে চাল, ডাল, আলু, আনাজ, চা, চিনি যা ছিল, সব পড়ে আছে। কাজের মেয়েটাকে ছুটি দিয়ে দোকানের চা, বিস্কুট খেয়ে দশদিন কাটিয়েছিল এ ছেলে। কাঠি হয়ে গিয়েছিল ওর শরীর! প্রশ্ন করতে বলল, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র যে ওর জন্যে, জানতো না। কী লজ্জার কথা! মাটি হয়ে গেল আমাদের বেড়ানোর আনন্দ।

প্রভাদির মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নিজের নয়, রূপকথার গল্প শুনছিল অতীন। এক গল্পের টানে চলে আসছিল নতুন, নতুন গল্প। গল্প নয়, সবই স্মৃতি, বাস্তব জীবনের কাহিনী। সন্তু শোনালো মানিকতলায় পার্টির এক গোপন সভার বিবরণ। সভা ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ। সভায় হাজির সবাইকে পেছনের দরজা দিয়ে নিরাপদে বার করে দেবার পরে সেখানে আটকে গেল দ্যুতি। দমে যাবার ছেলে নয় সে। উঠে গেল বাড়ির ছাতে। ঘিঞ্জি পাড়া। গায়ে গা লাগানো লাইনবন্দী দোতলা, তিনতলা বাড়ি, ছাত। ছাতের পর ছাত টপকে হাওয়া হয়ে গেল দ্যুতি। পুলিশের গুলির আঁচড় লেগেছিল তার কনুই-এ। গ্রাহ্য করেনি।

ছেলের এ কাহিনী বহুবার শোনা সত্ত্বেও জ্বলজ্বল করছিল প্রভাদির চোখ। ফর্সা মুখ আরক্তিম। সন্তু বলছিল, স্কুলের সামনে ঝালমুড়িওলার কাছ থেকে একদিন দশ পয়সার ঝালমুড়ি কিনেছিল দ্যুতি। পয়সা দিতে ভুলে গিয়েছিল। দ্যুতি চেনা খদ্দের। হয়তো পয়সা নেই, পরে দেবে ভেবে, দাম চায়নি মুড়িওলা। সন্ধ্যের পর পড়তে বসে দ্যুতির মনে পড়লো মুড়ির দাম দেওয়া হয়নি। তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো সে। স্কুলের সামনে এসে মুড়িওলার ঠিকানা জোগাড় করে চোরবাগানের এক বস্তিতে হাজির হলো। দ্যুতিকে দেখে মুড়িওলা অবাক! দশ পয়সা তাকে দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল দ্যুতি। স্কুলের অঙ্কের স্যার বিজনবাবুকে এ গল্প নিজে বলেছিল মুড়িওলা। স্কুলের প্রায় সব ক্লাসে বিজনবাবু আবার এ গল্প করেছিলেন।

শ্বাস বন্ধ করে মৃত দুই ছেলের কাহিনী শুনছিল প্রভাদি। এ সব কাহিনী অমলিন। প্রভাদির কাছে কখনও পুরোনো হবে না। পরশু রাতে প্রভাদির বাড়িতে রেবাকে খেতে হয়েছিল। রাত হয়েছিল খেতে। খাওয়ার পর ছাতে গিয়েছিল অতীন, সন্তু। বাড়ি ফিরতে হবে রেবাকে। যাবার আগে অতীন, সন্তুর সঙ্গে দেখা করতে ছাতে গেল সে। অন্ধকার ছাতে দুটো সিগারেট ধরিয়ে চাপা গলায় দু'জনে কিছু আলোচনা করছিল। রেবা যেতে চুপ করে গেল তারা। আকাশে চোখ রেখে এমনভাবে অতীন তাকিয়ে থাকলো, যেন, এক নতুন নক্ষত্র আবিষ্কার করেছে সে। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে থাকলো সন্তু। প্রভাদির সামনে হাসি, গল্পে উজ্বল যে অতীন, সন্তুকে একটু আগে রেবা দেখেছে অন্ধকার

ছাতে এসে হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল তারা। তাদের হাবভাবে বিব্রত রেবা বলেছিল, যাচ্ছি।

সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি দু'ধাপ সে নামতে সন্তু প্রশ্ন করল, কিশোরদার কী খবর?

সন্তুর দিকে তাকিয়ে নীরস গলায় রেবা বলল, জানি না।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে সন্তু বলল, একটা দায়িত্ব দেবো আপনাকে। করবেন?

এক মুহূর্ত ভেবে রেবা প্রশ্ন করল, কী দায়িত্ব?

একটা জরুরি চিঠি কালিঘাটের এক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে।

কার চিঠি?

পার্টির।

জিপিওর ফুটপাতে ভিড় বাড়ছে। সামনে বাসস্টপ। একটু পরে অফিস ছুটি হলে জনস্রোত বইবে। চিঠি নিয়ে অতীনের আসার কথা। সে না এলে সন্তু আসবে। তবে অতীনের আসার সম্ভাবনাই বেশি। তার দেরিতে উদ্বেগে অধীর হচ্ছে রেবা। সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে চিঠিটা পৌঁছে দিতে হবে। অতীন আরও দেরি করলে ঠিকানা খুঁজে সাতটার মধ্যে কীভাবে পৌঁছোবে সে? পিঠের ওপর আলতো টোকা পড়তে চমকে ঘুরে দাঁড়ালো রেবা। অতীন নয়, সন্তু দাঁড়িয়ে আছে। জিপিওর ভেতরে এক নির্জন কোনে রেবাকে চোখের ইসারায় ডেকে নিল সন্তু। কাঁধের ঝোলা থেকে মুখ আঁটা একটা সাদা লেফাফা বার করে রেবার হাতে দিয়ে বলল, ব্যাগে ভরে নিন।

লেফাফার ওপরে কোনো ঠিকানা লেখা নেই দেখে রেবা অবাক চোখে সন্তুর দিকে তাকালো। নিচু গলায় সন্তু বলল, ঠিকানাটা শুনে নিন।

একবার, দু'বার, তিনবার ঠিকানা আওড়ে সন্তু প্রশ্ন করল, মনে থাকবে?

হ্যাঁ।

রেবার জবাব শুনে দ্রুতপায়ে রাস্তায় এসে ভিড়ে মিশে গেল সন্তু। জিপিওর ভেতরে, এপাশে লোকজন কম থাকলেও ডান দিকের কাউন্টার থেকে চওড়া জুলপিওলা একজন লোক দেখছে রেবাকে। পা চালিয়ে ডাকঘরের বাইরে এলো সে। ট্রাম, বাসে এখন গাদাগাদি ভিড়। একটা গাড়িতে যে কোনো ভাবে উঠতে হবে। পার্টির গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ, অনেকদিন পরে পেয়ে রেবা খুশি। আজও তাকে পার্টি ভোলেনি। সকালে ঘুম ভাঙলে রোজ তার মনে হয়, আজ হয়তো কিশোর আসবে।

রেবা জানে তার ভাবনা আকাশকুসুম, অবাস্তব। তবু ভাবে। ভেবে ভরসা পায়। আজও ভেবেছে। কিন্তু রোদ বাড়ার সঙ্গে ভাবনাটা মুছে যায়নি। মাথায় থেকে গেছে। গুনগুন করছে সারাদিন। স্টিফেনহাউসের সামনে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো, চিঠি পৌঁছে বাড়ি ফিরেই হয়তো দেখতে পাবে কিশোরকে।

চাপা উত্তেজনায় ছমছম করে উঠলো শরীর। ঘরমুখো এক জটলার মধ্যে দাঁড়িয়েছিল সে। জটলার ভেতরের চার, পাঁচজন ষণ্ডামার্কা লোক দু'পাশ থেকে চাপ দিতে সে বিরক্ত হলো। লোকগুলো গ্রাহ্য করল না। রাস্তা ছেড়ে রেবা ফুটপাতে উঠে এলো। তার মাথায় নানা চিন্তা। বাড়ি ফেরার পথে প্রভাদির সঙ্গে একবার দেখা করবে। কথা দিয়েছে সে। বিশুর দলে নাম লিখিয়ে গোরা ঘরে ফিরেছে। বীরবিক্রমে দলের কাজ করছে সে। রেবাকে অবশ্য গোরা বলে, এ আমার চালাকি। কিশোরের দলেই আমি আছি। গোপন খবর জানার জন্যে বিশুর দলে ঢুকেছি।

বস্তিতে বিশুর দলের প্রভাব বাড়ছে। তপতীকে একদিন বিশু বলেছে যে রেবা মহিলা কংগ্রেসে ঢুকলে তাকে একটা চাকরি দেওয়া হবে।

কথাটা শুনে হামলে পড়েছে জ্যোৎস্না। মহিলা কংগ্রেসের দপ্তরে এখন রোজ যাচ্ছে সে। বিশুদা বলতে সে পাগল। মাঝখানে এক সন্ধ্যেতে শ্বশুরবাড়িতে এসে নিজের বীরত্বের বিবরণ শুনিয়েছে বিশু। প্রতিরোধবাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের পাশে জিপে বসে বরানগর গিয়েছিল সে। জিপের পেছনে একটা টেম্পোয় ছিল তার চেলারা। নানা এলাকা থেকে বরানগরে এসেছিল প্রতিরোধবাহিনীর কয়েকশো কর্মী। এলাকা চষে ফেলেছে তারা। কয়েক শো নকশালের লাশ নামিয়ে দিয়েছে।

পকেটের রিভলভরটা সামনে রেখে বিশু বলেছিল, এই ঘোড়াটা তিনবার চালিয়েছি। তিনটে লাশ পড়েছে। এখন আমার টিপ পাকা। ফসকাবে না।

বিশুর কথা শুনে অসাড় হয়ে গেল রেবা। কাগজে এ গণহত্যার বিবরণ সে পড়েছিল। ব্যথায় বুক টনটন করলেও একটা কথা বলে নি। বিশুর বরানগর অভিযানের কাহিনী শুনে উদ্ভাসিত দেখাচ্ছিল জ্যোৎস্নাকে। অথচ এই জ্যোৎস্না এক সময়ে কিশোরের ভক্ত ছিল। অন্ধকার ঘরে বসে কিশোরের মুখে দেশ, দুনিয়ার গল্প শুনতো। থামতে দিত না কিশোরকে।

খুব তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে সব। চিন্তায় ভাঙচুর হচ্ছে। রেবার মনে হলো, বাড়িতেও হেরে গেছে সে। এ পরাজয়ে মাঝে মাঝে এমন মনমরা লাগে যে, বাঁচার ইচ্ছে চলে যায়। থরথর করে কাঁপতে থাকে বিশ্বাসের মাটি। বুকের মধ্যে তখন একাধিক, অনেক রেবা জেগে উঠে উল্টোপাল্টা নানা মন্ত্রণা দেয়। ফুসলোতে থাকে। আত্মরক্ষার জন্যে কাতর মুখে প্রভাদির কাছে এসব মুহূর্তে চলে যায় সে। প্রভাদির পাশে কখনও পাঁচ, সাত মিনিট বসে, কখনও অন্ধকার ছাতে গিয়ে দাঁড়ায়। ছাতের মাঝখানে ইজিচেয়ারে আধশোয়া বিরাজবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী ভাবছে, বুঝতে পারে না রেবা। তার মনে হয়, এই মানুষটার সঙ্গে কথা বললে সঠিক পথের হদিশ পাওয়া যাবে। কিন্তু বিরাজবাবুর সামনে তার কথা আটকে যায়। মানুষটা কথার নাগালের বাইরে।

রেবা এখন প্রায়ই ভাবে, মেয়ে হয়ে জন্মানোটা এক অপরাধ। সারাজীবন এ অপরাধের মাশুল দিতে হয়। মাশুল দিচ্ছেও সে। কুঁড়িতেই মেরে ফেলেছে

বিস্তর ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা। সবচেয়ে বড়ো অপমান হলো, মেয়েদের শরীর। সে শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ওৎ পেতে বসে আছে সংসার, সমাজ, মানুষ। রাস্তায়, ট্রামে বাসে রোজ যে কতো পেষণ, নোংরা শব্দ শুনতে, সহ্য করতে হয়, কাকে বলবে ? বাড়ি ফিরতে সামান্য রাত হলে বুক দুরদুর করে। যখন তখন রাস্তায় বেইজ্জত হবার আশংকা আছে। সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র কেউ বাঁচাবে না। বরং জবরদস্তি করবে।

চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ, যাদবপুরের বাস। কালিঘাট ছুঁয়ে একটা, দুটো গেলেও পাদানি উপচে পড়েছে ভিড়। দিন শেষ। ঘন হচ্ছে ছায়া। স্টপে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে ধূসর দেখাচ্ছে। বোঁচা নাক, টোপা টোপা গাল, দুচোখের তলায় মাংসের গুলি, একজন অচেনা লোক রেবাকে বলল, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

আত্মবিশ্বাসে লোকটার গলা স্থির। হুকুমের মতো শোনালো তার কথা। স্টপে দাঁড়ানো অসংখ্য মানুষ বাড়ি ফেরায় ব্যস্ত। ঘটনাটা খেয়াল করে দেখার কারও সময় নেই। দু'একজন যে নজর করেনি, এমন নয়। কিন্তু বোঁচা লোকটার দাঁড়ানো, কথার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে রেবা তার পরিচিত। কী করবে ভেবে পেল না রেবা। তখনই সে টের পেল ষণ্ডা চেহারা সেই চার মূর্তি ঘিরে ধরেছে তাকে। এ নাটক দেখেও রাস্তার ভিড় মাথা ঘামালো না। আসলে ভিড়ের কোনো মাথা নেই। তাছাড়া সন্ধ্যের এই গাঢাকা অন্ধকারে রোজ এ নাটক এখানে হয়। রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের অভাব তো কলকাতায় নেই। রেবা যে তাদের একজন নয়, কে বলতে পারে ? পাঁচজন পুরুষ মালার মতো তাকে ঘিরে মূল ভিড় থেকে আলাদা করে নিয়েছে। জটলার বাইরে নিজেকে একা আবিষ্কার করে শিউরে উঠলো রেবা। আলকাতরার মতো কালো দেখাচ্ছে দীঘির জল। জলের ওপর ধোঁয়ার জট। প্যাণ্ট, বুশশার্ট, চোখে চশমা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে রেবাকে বলল, একবার লালবাজারে যেতে হবে আপনাকে।

ধড়াস করে উঠলো রেবার বুক। চশমা চোখে লোকটার পেছনে রেবা, তার পেছনে বোঁচা নাক, দু'পাশে চারজন দশাসই লোক কীভাবে যেন ভিড় ছেড়ে দূরে সরিয়ে এনেছে তাকে। অচেনা মানুষগুলোর সঙ্গে পুতুলের মতো হেঁটে রাস্তা পেরোলো রেবা। লালদিঘির ধারে এক গাছতলায় কালোভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে টের পেয়ে বাসস্টপে দাঁড়ানো দু'একজন মানুষ রাস্তা পার হলো। পুলিশ ভ্যান দেখে মুহূর্তে ফিরে গেল তারা। রেবাকে তুলে ভ্যান ছাড়লো। বাঘের চাপা ডাকের মতো ইঞ্জিনের আওয়াজে চমকে গেল রেবা। ভ্যানের মধ্যে রেবার দুপাশে বসেছে দ'জন মহিলা পুলিশ। বিশাল লালবাড়ির চত্বরে ঢুকলো কালো ভ্যান।

লালবাড়ির তিনতলার এক ছোট ঘরে রেবাকে একা বসিয়ে রেখে চলে গেল মাঝ-বয়সী দুই মহিলা পুলিশ। ঘরে টিমটিমে আলো। একটা টেবিলের দুপাশে দুটো বেঞ্চ। একটা বেঞ্চে রেবা বসেছে। অন্যটায় চোখ পড়তে দেখলো, সেখানে লম্বা

হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে একজন। সাদা দেওয়ালে একটা নধর টিকটিকি স্থির চোখে একটা কালো দাগের দিকে তাকিয়ে আছে। খোলা দরজার বাইরে টানা করিডোরে মানুষের পায়ের শব্দ। ফিসফিস করে কারা কথা বলছে। কী ঘটছে বুঝতে পারছে না সে। বুকের মধ্যে শুনছে রক্তের কুলকুল ধ্বনি। আতঙ্কে মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বরফ হয়ে গেছে। ব্যাগে রয়েছে সন্তুর দেওয়া পার্টির গোপন চিঠি। পুলিশের হাতে চিঠিটা গেলে কী হবে, ভেবে ঝিমঝিম করছে তার মাথা। টিকটিকিটা হঠাৎ ডেকে উঠতে কেঁপে গেল সে। চিঠিটা গিলে নেবার কথা মনে জাগলো তার। কীভাবে গিলবে? ওজনে মনে হচ্ছে টুকরো কাগজ নয়, লম্বা একাধিক পাতার চিঠি। এক গ্লাস জল পেলে গেলার চেষ্টা করতো। কিন্তু এখানে কেন আনা হলো তাকে? পুলিশ কি তাকে গ্রেপ্তার করল, অথবা শুধু জেরা করতে চায়? সঠিক কিছু বুঝতে না পেরে ভয়ে, দুশ্চিন্তায় কাঁপছে সে। বাড়িতে একটা খবর পাঠানো দরকার। প্রভাদিকে জানানো সবচেয়ে ভালো। সে বিপদে পড়েছে শুনলে এখনই ছুটে আসবে প্রভাদি। এই ভয়ানক দুর্গ থেকে কীভাবে প্রভাদিকে খবর পাঠাবে, ভেবে পেল না সে।

ক্রমশ নিস্তেজ হচ্ছে ঘরের আলো। উল্টোদিকের বেঞ্চে ঘুমন্ত লোকটা পাশ ফিরে শুলো। লোকটা ঘুমোচ্ছে, না ঘুমের ভান করে তার ওপর নজর রাখছে, বুঝতে পারছে না রেবা। দরজায় উঁকি দিয়ে দু'একজন দেখে যাচ্ছে তাকে। অচেনা লোকগুলোর চেহারা, দেখার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণ, ধারালো হচ্ছে তার আতঙ্ক। রক্ত, মৃত্যু, নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা, দুঃস্বপ্ন জেগে উঠছে। এ মুহূর্তে দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি সে। পরশু রাতে এক দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। স্বপ্নটা মনে পড়লো। লাল হয়ে উঠছে এক বিশাল দীঘির জল। দীঘির চারপাশ নির্জন। আঁশটে পচা গন্ধ ভেসে আসছে দীঘি থেকে। ভালো করে তাকিয়ে সে দেখলো সামনে রক্তদীঘি। নিথর দীঘিতে ফুটে আছে হাজার হাজার রক্তপদ্ম। মুহূর্তে পরিষ্কার হলো তার নজর। যেগুলো রক্তপদ্ম ভেবেছিল, সেগুলো আসলে মানুষের জোড়া পা। মাথাগুলো পাঁকে পোঁতা। পা ভাসছে। শীর্ষাসনে রাখা লাশগুলোর মুখও একসময় দেখতে পেল সে। অনেক চেনা মুখ। ভয়ে ডুকরে উঠেছিল রেবা।

স্বপ্নটা মনে পড়তে গলা শুকিয়ে গেল তার। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বাইরে ট্রাম, বাস, গাড়ির শব্দ। একটার পর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। নারকেলডাঙায় অসীমা পোদ্দারকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে যে নির্যাতন হয়েছিল, খুঁটিনাটি সব শুনেছে রেবা। পানিহাটির কল্যাণী ব্যানার্জীর তলপেটে বুটের লাথি মেরেছিল পুলিশ। তারপর তাকে তুলে দিয়েছিল কংগ্রেসের গুণ্ডাদের হাতে। কল্যাণীর কাপড় কেড়ে নিয়েছিল তারা। উলঙ্গ কল্যাণীকে রাস্তায় ঘুরিয়েছিল। এই লাল বাড়িতে জলন্ত চুরুটের ছ্যাঁকায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল শিপ্রা রায়। ধর্ষণও করা হয়েছিল তাকে। ঘটনা, কাহিনী, স্মৃতি, শ্রুতির নিষ্ঠুর ঝড় বইছে রেবার মনে। ঝড়ে মিশে আছে পঁয়তাল্লিশ বছরের পদ্মরাণী রক্ষিত, অর্চনা, মীনাক্ষী, রাজশ্রী, নন্দিতা, বিজলী

কুন্ডুর কান্না, ক্রোধ, সাহস। তাদের কারো গলা, বুক, পেট চুরুটে পোড়া, কারো গোপন অঙ্গে গরম লোহার শিকের দাগ, দু'একজন পুলিশের কৃপায় গর্ভবতীও।

আবছা আলোয় পাতলা কাপড়ের মতো দুলছে সামনের হলুদ দেওয়াল। তাকাতে কষ্ট পাচ্ছে রেবা। খোলা দরজার সামনে উর্দিপরা এক সিপাই দেখে রেবা বলল, এক গ্লাস জল।

অল্পবয়সী, রোগা কনষ্টেবল্‌টির মুখচোখে গোবেচারা ভাব। রেবার কথা শুনতে পেল না সে। রেবার অন্তত তাই মনে হলো। সে আবার বলল, এক গ্লাস্‌ জল।

তার কথায় মুহূর্তের জন্যে সিপাইটি দিশেহারা হলো। এদিক, ওদিক একলহমা দেখে বলল, গ্লাস নেই এখানে।

কথাটা বলে কিছু ভাবলো সে। তারপর রেবাকে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রেবা। লম্বা করিডোরে সামান্য এগিয়ে বাঁ হাতে কলঘর। এক মুহূর্ত রেবার মুখে চোখ রেখে আঙুল তুলে সিপাই বলল, জল পাবেন ওখানে।

কলঘরে দরজা থাকলেও বন্ধ করতে ভরসা পেল না রেবা। জোরালো আলো জ্বলছে। বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দ্রুত ওঠানামা করছে তার বুক। বেসিনের কল খুলে মুখে, মাথায় জল লাগালো সে। করিডোরের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। চিঠিটা গায়েব করার এই সুবর্ণ সুযোগ। দরজার দিকে চনমনে নজর ফেলে ব্লাউজের ভেতর থেকে চামড়ার ব্যাগটা বার করল সে। ব্যাগ খুলে ভাঁজ করা চিঠি নিল। হৃৎপিন্ডের ধড়াস ধড়াস শব্দ শুনতে পাচ্ছে। দু'পা এগিয়ে পায়খানার প্যানের সামনে দাঁড়ালো। পায়খানায় ঢুকে দরজা ভেজিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়লো চিঠি। কাগজ ছেঁড়ার শব্দ এমন বিকট, জানতো না সে। ভয়ে ধকধক করে কাঁপছে শরীর। দলাপাকানো কাগজ প্যানে ফেলল্যে সে। জল ঢাললো দু'মগ। কিছু টুকরো কাগজ নেই আকড়ার মতো প্যানে ভাসছে। আরও চার, পাঁচ মগ জল ঢেলে দরজা খুলে বাইরে এসে সে দেখলো বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিরীহ মুখ সিপাই। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রেবার মুখ। কিছু অনুমান করে পায়খানায় উঁকি দিয়ে রোগা লোকটা থমকে দাঁড়ালো। ভয় পেলেও সহজ গলায় বলল, ঘরে গিয়ে বসুন। পায়খানা সাফ করে যাচ্ছি আমি।

নিজের দু'কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রেবা। অবাক চোখে রেবা তাকিয়ে আছে। সিপাই বলল, চলুন।

রেবাকে ঘরে রেখে লোকটা চলে গেল। উল্টোদিকের বেঞ্চে যে ঘুমোচ্ছিল, সে নেই। ফাঁকা বেঞ্চ্‌। ক্লান্তি, আতঙ্কে মাথা ঝিমঝিম করলেও সিপাইটির আচরণে ভরসা পেয়েছে রেবা। এ মানুষটির সাহায্য পেতে পারে সে। প্রভাদিকে খবর পাঠাতে এই সিপাই-এর ওপর নির্ভর করা যায়। শুধু একটা ফোনের মামলা। খবর পেলে এখনই চলে আসবে প্রভাদি। তাকে ছাড়াতে একটা কিছু ব্যবস্থা করবে।

ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে বাইরের অন্ধকার পৃথিবী। গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা তুললো কেউ। অধৈর্যে উসখুস করছে রেবা। এই ঘরে ফ্যাকাসে হলুদ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে কতোক্ষণ বসে থাকতে হবে?

অর্থহীন এই অপেক্ষার মানে কী? বোধহয় এভাবে বসিয়ে রাখাও একরকমের শাস্তি। রেবা জানে জেলের সেলে দিন, মাস, বছর একা থেকে পাগল হয়ে গেছে অনেকে। কেন তারা পাগল হলো, বুঝতে পারছে সে। নিঃসঙ্গ, অলস জীবন যেমন মানুষকে বিদ্রোহী করে, পাগলও বানায়। পাগলামিও একধরণের বিদ্রোহ।

রোগা কনস্টেবলটি ফিরে এসেছে। দরজার বাইরে থেকে আড়চোখে একবার রেবাকে দেখে সে বলল, রাত দশটার আগে ডাক পড়বে না আপনার।

রেবা তাকিয়ে থাকতে সে যোগ করল, সাহেব আসবেন রাত দশটায়। তখন জেরা শুরু হবে। জেরার পর হয় আপনাকে লকআপে পাঠানো হবে, অথবা ছেড়ে দেওয়া হবে।

রেবার ভয় অনেকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। হাতছানি দিয়ে সিপাইকে ভেতরে ডাকলো সে। করিডোরের দু'পাশ দেখে লোকটা ঘরে ঢুকতে রেবা বলল, আমাকে একটু সাহায্য করুন। বাঁচান।

ব্যাগ থেকে কাগজ, কলম নিয়ে খসখস করে একটা ফোন নম্বর লিখলো সে।

কাগজের টুকরো সিপাই-এর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, দয়া করে এই ফোননম্বরে প্রভাদিকে ডেকে বলবেন, রেবা লালবাজারে, পুলিশ হেপাজতে আছে।

দরজার দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঁপছে নিরীহ লোকটা। প্রভাদি, রেবা, দুটো নাম, বিড়বিড় করে বলল সে। পকেটে রাখলো কাগজের টুকরো। রেবা বলল, খুশি করে দেবো আপনাকে।

তার দিকে বোকা চোখে লোকটা তাকিয়ে আছে। করিডোরে পায়ের শব্দ শুনে ছিটকে ঘরের বাইরে চলে গেল সে। এক মিনিট পরে ঘরে ঢুকলো পাতলা ধুতি, টেরিকটের হাত গুটোনো ফুলশার্ট, তেল চকচকে শরীর, চওড়া কব্জি, শক্ত চোয়াল, পাথরের মতো ভাবলেশহীন মুখ এক পালোয়ান। পুলিশী অভিধানে এদের নাম, স্পেশাল। দৈত্যাকার লোকটা শীতল চোখে তাকাতে ভয়ে গুটিয়ে গেল রেবা। পেটে কামড়ের ব্যথা অনুভব করল। অফিসারদের সঙ্গে স্পেশালরাই বন্দীদের ঠেঙায়, নির্যাতন করে। জাঁদরেল চেহারার লোকটা হঠাৎ কেন এলো, বুঝতে পারছে না রেবা। সন্দেহের কোনো কারণ ঘটেছে নাকি? রেবা আতঙ্কিত। সে জানে ভয়, আতঙ্ক এমন অনুভূতি, যা কার্যকারণ মানে না। গায়ে হাত পড়ার আগেই একজন বন্দীকে কাবু করে দেয় ভয়ের অনুভূতি। তাছাড়া এই লাল বাড়ি, এখানকার মানুষজন, তাদের কথা, হাঁটা, চলা, দৃষ্টি, ম্লান আলো, নোনা গন্ধ, পরিবেশ, এ বাড়ি সম্পর্কে নানা কাহিনী, রটনা, রেবার মনে পেতে রেখেছে ভয়ের এক নিষ্ঠুর

ফাঁদ। জেরা, জুলুমের আগেই তাই ফুটিফাটা হচ্ছে তার স্নায়ু, ধমনী। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা সিপাই-এর সঙ্গে নিচু গলায় স্পেশাল কথা বলছে। তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না রেবা। শোনার শক্তি নেই।

কিশোর বলতো, জেল, পুলিশ, হাসপাতাল, দোকান, বাজার মানুষের শিক্ষালয়। এ সব জায়গা থেকে মানুষ অনেক শেখে।

কিশোরের কথা মনে পড়তে রেবা ভাবলো, কী শেখার আছে এ মুহূর্তে? খতিয়ে ভাবতে চাইলো সে। ধীর, শান্ত, নির্ভয় থাকতে হবে। হ্যাঁ, এ মুহূর্তের এটাই শিক্ষা। কিন্তু সংক্রামক দুশ্চিন্তার জীবাণু মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। কী প্রশ্ন তাকে করবে পুলিশ? জেরা করার জন্যেই কি ধরে আনা হয়েছে তাকে? যদি কিশোরের খবর জানতে চায়?

কিশোরের ঠিকানা জানে না রেবা। বীরভূম জেলার সীমান্ত এলাকায় রাজনগর, রানীশ্বর, অচেনা নানা নামের সাঁওতাল পল্লীতে ঘুরে বেড়ায় সে। তরণীপাহাড়, শালবন আছে সেখানে। সেখানে মাটির রঙ লাল। কিন্তু এ তথ্যে, নিশ্চয়ই খুশি হবে না পুলিশ। আরও তথ্য, আরও খবর জানতে চাইবে তারা। কিশোরকে ধরার জন্যে দশ হাজার টাকার পুরস্কার আছে। কম টাকা নয়! তবে এ টাকা পেতে কারও কোনো সাহায্যে লাগবে না রেবা। কিশোরের সঙ্গে কলকাতার পার্টির খবর জানতে তাকে চাপ দিতে পারে পুলিশ! গণপতি কোথায়? পার্টির গোপন ডেরা কোথায়? কিছুই জানে না রেবা। পার্টির সঙ্গে কখনও সরাসরি যোগাযোগ ছিল না তার। সম্পর্কটা ছিল একতরফা। গণপতি রাখতো। কিন্তু তার স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করবে না পুলিশ। মিথ্যে, অজুহাত ভাববে। তারপর শুরু হবে খবর বার করার নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া। অবিশ্বাস করা তাদের কর্তব্যের অঙ্গ। অবিশ্বাস করে আরাম পায় তারা।

ভালোমানুষ সিপাইটি যদি কোনোভাবে খবরটা দেয়, তাহলে তাকে বুক দিয়ে আগলাবার চেষ্টা করবে প্রভাদি। জেরা শুরুর আগে প্রভাদি কি খবর পাবে? কতো রাত এখন? ক'টা বাজলো? একটু আগে সিপাইটিকে যে ইঙ্গিত সে দিয়েছিল, এখন ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। লোকটা কি ঘুষের কথাটা বুঝেছে? অনুতাপ হচ্ছে রেবার। কিন্তু ঘুষ ছাড়া পুলিশ কোনো কাজ করে না, এমন এক জনশ্রুতি শোনা থাকায় কথাটা বলেছে সে। কোনো উপায় ছিল না তার। তবে সব জনশ্রুতি নির্ভুল নয়। চালু ধারণাগুলো বদলানো দরকার। ঘুষ দেবার কথাটা কনস্টেবলটি কখনও বাইরে কাউকে নিশ্চয় বলবে না।

তার মনে হঠাৎ এক বেখাপ্পা চিন্তা জাগলো। শুরু হলো নতুন অশান্তি। ভালোমানুষ সেজে সিপাইটা তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে বোধহয়! এরকম ঘটনা অনেক শুনেছে রেবা। এ হলো পুরোনো চাল। সহানুভূতি দেখিয়ে, ছোটখাটো কিছু সুযোগ দিয়ে একজন বন্দীকে মুঠোয় পুরে ফেলে পুলিশ। ইনফরমার, দালাল তৈরীর এ এক কৌশল। গোবেচারা সিপাইটা হয়তো আসলে কর্তাদের সাজানো লোক।

দপদপ করছে রেবার কপালের দু'পাশের রগ। পুলিশকে বিশ্বাস করার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে সে। চিঠি ছেঁড়ার খবর হয়তো ইতিমধ্যে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। প্যানের ভেতর থেকে কাগজের টুকরোগুলো উদ্ধার করে, শুকিয়ে, জুড়ে চিঠির বিষয়বস্তু জেনে গেছে পুলিশ। দুশ্চিন্তায় অস্থির রেবার মনে হলো প্রভাদির ফোননম্বর সিপাইটাকে দেওয়া ভুল হয়েছে। ফোননম্বর ধরে প্রভাদির ঠিকানা পুলিশ সহজেই পেতে পারে। তারপর মাঝরাতে বাড়িতে চড়াও হয়ে প্রভাদিকে তুলে আনা পুলিশের পক্ষে কঠিন কাজ নয়। প্রভাদিকে অবশ্য ভালোই চেনে পুলিশ। দুই ছেলের মৃত্যুর পর প্রভাদির যে হারাবার কিছু নেই, এখবরও পুলিশের অজানা নয়।

দরজার বাইরে ফ্যাকাসে আলোয় কনস্টেবলটাকে দেখার চেষ্টা করল রেবা। করিডোর ফাঁকা। কেউ নেই। আড়ালে দাঁড়িয়ে তার ওপর হয়তো লোকটা নজর রাখছে। বিপদের মুখোমুখি হয়ে আজ নিজের নতুন পরিচয় পাচ্ছে সে। তার পুঁজি বড়ো কম। সাহস, আত্মবিশ্বাস, শিক্ষা, কিছু নেই। এই সামান্য সম্বল নিয়ে বড়ো কাজ করা যায় না। তার ওপর মেয়ে হয়ে জন্মাবার অসুবিধে তো আছেই! ভয়, আতঙ্কের সবচেয়ে সূক্ষ্ম, অনুভূতিপ্রবণ জায়গা হলো তার নারীত্ব। দেহই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন করছে তাকে। জেরার সময়ে তাকে উলঙ্গ করে, শরীরের যত্রতত্র চুরুটের ছ্যাঁকা দিলে কী করবে সে? একাধিকবার ধর্ষণে শরীর তছনছ হলে কী করবে সে? কিশোরকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে? সন্তুর মুখে শোনা কালিঘাটের ঠিকানা বলে দেবে?

রেবা আর ভাবতে পারছে না। ঘেমে উঠছে তার কপাল, মুখ, গলা। রুমালে ঘাম মুছে নড়েচড়ে বসলো সে। দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে নিজেকে বোঝালো, সব পুলিশ অমানুষ নয়। যতো খারাপ পেশাই হোক, দু'চারজন ভালো লোক সব জায়গাতে থেকে যায়। এ বিশ্বাস রাখতেই হবে। অন্ধকার দুর্যোগের রাতে বিশ্বাস হারালে চলবে না। তাছাড়া অবিশ্বাস পাপ। সাংঘাতিক ব্যাধি। এ রোগ যেচে ডেকে আনতে চায় না সে। ডেকে আনার যুক্তিও নেই। সবাইকে বন্ধু ভাবাও যেমন ভুল, তেমনই শত্রু ভাবা আরও বড়ো ভুল। কোন ভুলই করবে না সে।

সবুজ পাড় শাড়ি, টানটান খোঁপা জাঁদরেল চেহারার দুই মহিলাপুলিশ ঘরে ঢুকলো। যার বয়স বেশি, রেবাকে সে বলল, চলো।

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রেবা। শাড়ি পরা দুই পুলিশের সঙ্গে করিডোরে পা দিয়ে সে দেখলো, বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিরীহ মুখ কনস্টেবলটা। তার মুখ দেখেই রেবা বুঝলো, প্রভাদি খবর পেয়ে গেছে।

চুয়াল্লিশ

নরহরিকে বরদাসুন্দরী বলেছিল, আমার জমিনটো তুরা ছাড়ান দে। উ জমিন গেইলে আমি বাঁচবো কুথা থিকে ?

ফসল কাটা, বেনামী জমি, ভেস্‌ট্‌ জমি দখলের জন্যে এলাকা জুড়ে তখন সর-গোল চলেছে। লড়াই-এব সামনে রবি। মহা দাপট তার। রবির সঙ্গে নরহরির যোগাযোগ আছে শুনে তার কাছে কেঁদে পড়েছিল বরদাসুন্দরী। দাখিলা, পরচা-বিহীন দেড় দুশো বিঘে চুরি করা জমি তখন কৃষকসমিতির দখলে। বছরের পর বছর জোতদাররা ভোগ করছিল এ সমস্ত জমি। সরকারী জমি কেউ কেউ বেচে পর্যন্ত দিয়েছিল।

জে. এল. আর ও দপ্তরে বারবার অভিযোগ করেছে কৃষকসমিতি। সুরাহা দূরের কথা, বিরক্ত জে. এল. আরও ধমক দিয়েছে কৃষক সমিতির নেতাদের। অফিসারের সঙ্গে সমানে চোখ রাঙিয়েছে দপ্তরের কেরানীরা। এসব গেরিলা যুদ্ধ শুরুর আগের ইতিহাস।

সাঁওতাল, মহুলি, পাহাড়িয়া, ঘাটোয়াল সম্প্রদায়ের নিরুপায় গরীব কৃষকরা রবির ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লড়াই-এ। বেনাম, ভেস্‌ট্‌ জমির ধান কেটে সেখানে তুলে দিয়েছিল দখলের ঝাণ্ডা। লাঠালাঠি, রক্তপাতের সেই দিনগুলোতে অনেকের অনেক কেচ্ছা ফাঁস হয়ে গেল। জানা গেল, রক্ষিতা বরদাসুন্দরীর নামে যে আট-বিঘে জমি নারায়ণ তাপুরিয়া দানপত্র করে দিয়েছে, তা সরকারের ভেস্‌ট্‌ জমি। নারায়ণ জমির মালিক নয়। সে জমিতেও কানুনগোর সামনে লালঝাণ্ডা পুঁতেছিল রবি। কিশোরের সঙ্গে রবির তখন সদ্য পরিচয় হয়েছে। আলাপ, আলোচনার সঙ্গে কিশোরের পরামর্শ চাইছে রবি। দখল করা জমি এলাকার গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার প্রস্তাব রেখেছিল কিশোর। প্রস্তাব রবি মেনে নিলেও পাঁচ, সাত গাঁয়ের গরীব মানুষের সভায় ভাদু চোঁড়ে বলেছিল, জমিন বিলির দরকার নাই। উ জমিন কৃষক সমিতির জিম্মায় থাকুক।

সায় দিয়ে পুনাই বলেছিল, আমরা হাল লাগাবো, ফসল তুলে বেটে লিব সবাই।

লেহ্জ কথা বটেক !

পুনাই-এর পরামর্শ মেনে নিয়েছিল অনেকে। সেই ঘোর দুর্দিনে আরও বড়ো লড়াই যে ঝেঁপে আসছে, টের পেয়েছিল সাত গাঁয়ের মানুষ। কৃষক সমিতি ছাড়া এ লড়াই সামাল দেওয়া যাবে না। সমিতির স্বার্থে মুঠোয় পাওয়া জমির অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিল গরীব চাষী। তাঁতলুই, বাহেঙ্গা, টোংরা, বাঁশকুলি,

বাগজোরা, মাদারপুরের চাষীরা নিজেদের হাল বলদ নিয়ে চাষ করল সেই জমি। যাদের হালবলদ নেই, গতরে খাটলো তারা। ফসল উঠলো কৃষকসমিতির দু'টো গ্রাম গোলায়। কিশোর আগে এ লড়াই কখনও দেখেনি। গরীব চাষীদের নিঃস্বার্থ চরিত্র মুগ্ধ করেছিল তাকে।

ধান যখন পেকে উঠেছে, তখনই নরহরিকে একদিন ধরেছিল বরদাসুন্দরী। তার কথা রবিকে শোনালো নরহরি। পুনাই, বাঘা সেখানে ছিল। পুনাই বলল, পেটের জ্বালায় মেয়েমানুষ মান খুয়ায়। ব্যাপারটা ভেবে দেঁইখো।

পুনাইকে বাঘা প্রশ্ন করেছিল, তুর গাঁয়ের সব মেয়ে কি পেটের জ্বালায় ইজ্জত বিকাইছে?

বাঘার প্রশ্নের জবাবে নরহরি নিরুত্তর থাকলেও অজিত বলেছিল, বরদাসুন্দরীর জমির ফসল তার ঘরে পৌঁছে দেবো আমরা।

তাই হয়েছিল। কৃষক সমিতির পরের সভায় সিদ্ধান্ত করে ফেরৎ দেওয়া হলো বরদাসুন্দরীর ধান। খুশি হয়েছিল বরদাসুন্দরী। হাত তুলে রবিকে আশীর্বাদ করে বলেছিল, ভালো হবে তুমাদের।

তাপুরিয়ার সঙ্গে বরদাসুন্দরীর গোপন সম্পর্ক তারপরেও বজায় ছিল। কিন্তু পার্টির সঙ্গে কখনও বেইমানী করেনি সে। তাপুরিয়ার খুনের সাক্ষী হিসেবে তাকে পেতে চেয়েছিল পুলিশ। বরদাসুন্দরী বলেছিল, কিছুই জানে না সে। পার্টির ওপর আস্থা বেড়ে গিয়েছিল তার।

গত দেড় বছরে সংগঠনের চেহারা বদলে গেছে। কৃষকসমিতি তুলে দিতে গরীব মানুষ সবে গেল। জোতদার, মহাজনেরা গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্যে গত মরশুমে ফাঁকা মাঠে ছাড় ঘুরিয়েছিল গরীব মানুষ। মাঠের ফসল ঘরে তুলেছিল। এ বছর অবস্থা ঘোরালো। ধান ক্ষেতে সোনালি আভা ফুটতেই সদলে গাঁয়ে ফিরছে মহাজন, জোতদাররা। স্পর্ধা, সাহসে টগবগ করে ফুটছে। ভয়ংকর এক লড়াই অনিবার্য জেনেও অসহায়ের মতো হাত গুটিয়ে বসে আছে গরীব মানুষ। কৃষক-সমিতির নিরাপদ ছাতা যে মাথার ওপর থেকে সরে গেছে, টের পেয়েছে তারা।

ভুল হচ্ছে জেনেও মুখ বুজে আছে কিশোর। নতুন কৃষকসমিতি গড়া আর সম্ভব নয়। গণসংগঠন তৈরির বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে পার্টি। ভয় পাচ্ছে সবাই। অনেকে সন্দেহ করছে। সাধারণ মানুষ থেকে পার্টি আজ বিচ্ছিন্ন। বন্দুক হাতে শুধু কয়েকজন বিদ্রোহী, বিপন্ন কর্মী এলাকায় টিঁকে আছে। সশস্ত্র লড়াই-এর সঙ্গে গণআন্দোলনকে এবারেও মেশানো গেল না। অথচ রক্তে ভিজে আছে লালমাটি।

মাদারপুর থেকে কিশোর, ভাদু, পুনাই, তাঁতলুইতে ফিরছে। দু'পাশের নিচু জমিতে ধান পাকতে শুরু করেছে। বাতাসে ডাঁসা ধানের গন্ধ। মিলিটারি, পুলিশ গ্রামরক্ষীবাহিনী নিয়ে এ বছর ধান কাটবে জোতদার, মহাজনদের সংগঠন কৃষিউন্নয়ন

সমিতি। অস্ত্র শানাচ্ছে তারা। গরীব মানুষকে ভাতে মারার আয়োজন করছে। প্রায় মাঝরাত। চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পুরোনো স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের চিন্তায় ডুবে আছে কিশোর। গাঁ, গঞ্জে নিরীহ মুখে নরহরি ঘুরে বেড়ায়। নানা খবর নিয়ে আসে। আলপথ শেষ করে অনাবাদী উঁচু জমিতে উঠলো চারজন। ডাঙ্গাজমির পরে আবার ধানক্ষেত। ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

ধানক্ষেতে শিরশির শব্দ। আকাশে অনেক তারা। হঠাৎ মোতিকে মনে পড়তে কষ্টে টনটন করে উঠলো কিশোরের বুক।

ভালো ধান হয়েছে এবছর। ধানকাটা নিয়ে আলোচনা করছে পুনাই, ভাদু। মাঠের চেহারা দেখে কৃষক, মাহিন্দাররা খুশি। কে কতোটা ধান তুলবে. জল্পনা চলছে সারাদিন। মাঠের ফসল পেটে না যাওয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তা কাটে না তাদের। মুনিষ, ক্ষেতমজুরের সংখ্যাও এলাকায় কম নয়। ধান কাটার মরশুমে তাদের কদর বাড়ে। তাদের সঙ্গে জোতদার, মহাজনরা হেসে কথা বলে। ঢেলে দেয় খোরাকির ভাত, মুড়ি। এমন সুখের সময়েও এ মরশুমে মুনিষ, মাহিন্দারদের মুখ থমথমে, গম্ভীর। ফসল কাটার দু'তিন মাস আগে ফি বছর গাঁয়ের মোস্তাগীরকে ডেকে পাঠায় জমির মালিক। মোস্তাগীর গ্রামপ্রধান। মুনিষ, মাহিন্দারদের সর্দার। গাঁয়ের মানুষদের কাজ ভাগ করে দেয় সে। গত বছর জোতদার, মহাজনের ডাকে সাড়া দেয়নি কোনো গাঁয়ের মোস্তাগীর। দেবার উপায়ও ছিল না। বেশীরভাগ জোতদার ছিল শহরে। এ সনে গাঁয়ে ফিরে মোস্তাগীরদের একজনকেও ডাকেনি তারা। শোনা গেছে, পাশের জেলা থেকে ধানকাটার মজুর আনছে কৃষিউন্নয়ন সমিতি। এলাকার গতরে খাটা মানুষদের শাস্তি দিতে এই ব্যবস্থা। ঘরে বসে পেটের জ্বালায় ছটফট করে মরবে তারা। অনেক ভেবেই এ ছক তৈরি করেছে সমিতি। ফলও পেতে শুরু করেছে। ক্ষিধেয় অস্থির বিশ, পঞ্চাশ জন করে মানুষ দল বেঁধে কাজের আশায় পাশের জেলাতে ঢুকে পড়ছে। এ খবর রোজ পাচ্ছে কিশোর। তার হিসেবে রানীশ্বর, রাজনগর ছেড়ে দেড়, দু'হাজার ক্ষেতমজুর মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, আরও দূরে হুগলি চলে গেছে। যে কোনো মজুরিতে কাজ করতে তারা রাজি। আগামী তিন, চার মাস ঘরে ফিরবে না কেউ। কাজ যে সবাই পাবে, এ স্থিরতা নেই। সব জেলাতেই কাজের লোক, ক্ষেতমজুর বেড়েছে। কাজ বাড়েনি। মানুষ উদ্বৃত্ত। গাঁ, জেলা ছেড়ে ভিন্ন জেলায় গিয়ে কাজ জুটবে কিনা সন্দেহ আছে। তবু যাচ্ছে। অচেনা দেশ, গাঁয়ে জোতদার, মহাজনের দরজায় নাছোড় বসে থাকে এই ভবঘুরে কৃষিমজুররা। নিছক পেটভাতায় কাজ করতে রাজি হয় কেউ কেউ। ভবঘুরে মজুররা এলে স্থানীয় গরীব চাষী, ক্ষেতমজুরদের কাজের সুযোগ কমে যায়। তাদের মজুরি কমিয়ে দেয় জমি, ক্ষেতের মালিক। যাযাবর মজুরদের সঙ্গে এলাকার মজুরদের বিভিন্ন জেলায় দাঙ্গা হয়েছে কয়েকবার। বিপদে পড়েছে পার্টি। বীরভূমের প্রতিবেশী জেলায়, যেখানে পার্টি সংগঠন আছে, কথা বলে সমস্যার সুরাহা করতে চেয়েছে কিশোর। কাজ বিশেষ এগোয়নি। জেলা ছেড়ে হাজার হাজার কৃষিশ্রমিকের চলে যাওয়া ঠেকাতে না পারলে, কিছু করা সম্ভব নয়,

সে জানে। ঠেকাতে পারেনি। এবছরও একই ঘটনা। সমর্থ মানুষরা গাঁ ছেড়ে চলে গেলে লড়াই করবে কারা ? পার্টি সংগঠন ঝিমিয়ে পড়ার এটাও একটা কারণ। এ ঘটনায় গুরুত্ব দেয়নি পার্টি নেতৃত্ব। এলাকায় কৃষকদের থাকা, না থাকায় পার্টির কিছু যায় আসে না। গেরিলা স্কোয়াড থাকলেই চলবে। স্কোয়াড আর খতম নিয়ে পার্টি তুষ্ট। পার্টির বেহাল দশা দেখে ভড়কে গেছে গরীব মানুষ। তবে একটাই ভরসা, পার্টির হাতে কিছু বন্দুক আছে। গণফৌজ গড়ার কাজ চলছে। ফসল দখল করে গ্রামগোলায় তুলবে ফৌজ। আজ সন্ধ্যেতেই ফৌজের দশজন মিলে মাদারপুরে এ্যাকশন করেছে। খতম নয়। জোতদারদের হেপাজতে বন্দী নির্মলাকে ছিনিয়ে এনেছে। মাদারপুরের জোতাদার ঘনশ্যাম সিংএর বাড়িতে আটক ছিল নির্মলা। ঘনশ্যামের বাড়িতে পুরোদস্তুর সামরিক অভিযান চালিয়েছে দশজন!

খতমের লড়াই-এ যারা ছিল, গণফৌজে তাদের জড়ো করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে অজিত, রবি। গণফৌজের জন্যে একহাজার সৈনিক চাই। ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ছে কিশোর। ঝাপসা দেখছে দু'চোখে। অন্ধকার রাস্তায় হোঁচোট খেল একবার। মাথায় বয়ে যাচ্ছে সারাদিনের ঘটনাস্রোত।

আজ মাঝদুপুরে পুনাই-এর বাড়িতে এসে নির্মলার খবর কিশোরকে দিল বাঘা। তাঁতলুই আসার পথে বাঘা বাহেঙ্গায় গিয়েছিল। অজিত, রবি বাহেঙ্গায় নেই, বাঘা জানতো না। নির্মলার খবর শুনে হতবাক হলো কিশোর। পুনাই-এর দাওয়ায় বসে জল খেয়ে তখনও ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে বাঘা। আজ ভোর রাতে তিলাবুনি ঘেরাও করেছিল পুলিশ। তাদের সঙ্গে ছিল কৃষিউন্নয়ন সমিতির প্রতিরোধ বাহিনী। তিলাবুনি তছনছ। গাঁ ছেড়ে বেশীরভাগ লোক জঙ্গলে পালিয়েছিল। যারা পালাতে পারেনি, ধরা পড়েছে। বাঘার মায়ের যাই যাই অবস্থা। গত একহপ্তা রাতে বাড়ি থাকছে সে। ভোররাতে আসে নির্মলা। সে এলে ছুটি পায় বাঘা। জঙ্গলে গাছতলায় গিয়ে ঘুমোয়। গাঁয়ে পুলিশ ঢোকার এক ঘণ্টা আগে বাঘার বাড়িতে এসেছিল নির্মলা। পুলিশের সাড়া পেয়ে নির্মলাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল সে। মুমূর্ষু রুগী ফেলে নির্মলা যেতে চায়নি। অনেক বুঝিয়েও তাকে রাজি করতে না পেরে ঘরের দাওয়ায় এসে বাঘা বুঝলো, গাঁ ঘেরাও। পালাবার উপায় নেই। কাছেই একটা মজা কুপের মধ্যে লাফ দিয়েছিল বাঘা।

ঘটনা বলার সময়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল বাঘা। তাকে একবাটি হাঁড়িয়া দিল পুনাই। একচুমুকে হাঁড়িয়া শেষ করল সে। বাঘার দুচোখ লাল। শরীরে, মাথায় শুকনো পাঁক, কাদা। তার মুখেই কিশোর শুনলো, সি. আর. পি, পুলিশের চোখের সামনে নির্মলাকে তুলে নিয়ে গেছে প্রতিরোধবাহিনী।

দুপুর রোদে ঝিমোচ্ছিল তাঁতলুই। একটা চিত্রী ডাকলো। দাঁতে করে ভ্যারেণ্ডার ডাল ছিঁড়ে আনলো পুনাই এর ছেলে সুগোল। সুগোলের বয়স বছর বারো, তেরো। হাত, পা কাঠিকাঠি। গত দশদিন পেটের ব্যামোয় ভুগছে। পেটে কিছু থাকে না। মুখে খাবার দিলে বমি করে। দাঁতে ভ্যারেণ্ডার ছাল ছিঁড়ে বাড়ি পর্যন্ত এনে সে ছাল সুতোয় বেঁধে, হাত অথবা পায়ে ধারণ করলে ব্যামো

সেরে যায়। এক টুকরো সুতোর খোঁজে ঘর, দাওয়া, উঠোন চষে ফেলেছিল পুনাই-এর বৌ।

বাঘার কাহিনী শুনে পুনাই-এর বৌ থমকে দাঁড়িয়েছিল।

কিশোর ভাবছিল, নির্মলাকে উদ্ধারের পথ। মেয়েটার জন্যে কষ্ট হচ্ছিল তার। নির্মলাকে শুধু পুঁইশা কেন, পুরুষদের সঙ্গে তার ওঠাবসা উজানী, লালমুনি, মেঘনা, এমন কি আন্নাও সহ্য করতে পারে না। রবির সংসারে তুমুল অশান্তি। পুঁইশাকে একদিন রাগে মারতে গিয়েছিল রবি। শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে। রবি নিজে এ ঘটনা বলেছিল কিশোরকে। সেদিনই কিশোর জেনেছিল পুঁইশা সন্তানসম্ভবা। তার ঘরে চালের অভাবে উনুনে হাঁড়ি চড়ছে না। ছেঁড়া একটা কাপড় ছাড়া পুঁইশার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই।

উপোস, অভাবের সঙ্গে নির্মলার ইতিহাসও সন্দিগ্ধ করেছিল পুঁইশাকে। টুকরো টুকরো কথায় পুরো ইতিহাস সেদিন কিশোরকে বলেছিল রবি।

পাঁচ বছর আগে একবার ডান হয়ে গিয়েছিল নির্মলা। চিমন জানের দরবারে তিনকুড়ি টাকা জরিমানা হবার পর গাঁ ছেড়ে তিলাবুনিতে পালিয়েছিল সে। সেখানে নানার ঘরে লুকিয়েছিল। জরিমানার টাকার অভাবে গাঁ থেকে মেয়েকে লোপাট করে দিয়েছিল নির্মলার বাবা। তারপর প্রচার করেছিল, মেয়ে ভেগেছে।

তিলাবুনিতে থাকার সময়ে নির্মলার সঙ্গে ভানুচাঁদের পরিচয়, দুলহার, বিয়ে। চিমনজানের মৃত্যুর পরেও এলাকার বৌ, মেয়েদের বিশ্বাস যে জরিমানার টাকা ফাঁকি দেওয়ায় নির্মলা আজও ডান। ডান বিয়ে করে কুষ্ঠে ভুগছে ভানুচাঁদ। ঘরে ডান আনলে যা হয় আর কি! ডানরা আবার শুধু পুরুষদের শুষে খায়। ভানুচাঁদকে খেয়ে এখন বাঘাকে খেতে চাইছে নির্মলা। বাঘার সঙ্গে বাপলা, বিয়ের পথ পরিষ্কার করতে ভানুচাঁদের কাছে রেপুত, ছাড়ান চাইছে সে। স্বামীর রেপুত না পেলে একজন মেয়ে নতুন বাপলা করতে পারে না। করলে, তা হবে বেআইনী। ভানুচাঁদ যাতে নির্মলাকে ছাড়ান না দেয়, এলাকার মেয়েরা মনে মনে তাই চায়। তাদের আশা পূর্ণ করেছে ভানুচাঁদ।

বাঘার কাছে নির্মলার বিপদের খবর শোনার এক, দেড় ঘণ্টা পরে শুরু হয়েছিল পার্টির বৈঠক। সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগলো না। সামান্য আলোচনার পরে ঠিক হলো, নির্মলার উদ্ধারে মাদারপুর যাবে গণফৌজ। কৃষিউন্নয়ন সমিতির সভাপতি ঘনশ্যাম সিংকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে। প্রতিরোধবাহিনীরও সংগঠক ঘনশ্যাম। পয়সাওলা লোক সে। জমিজমা বিস্তর। পুলিশ প্রশাসনে রীতিমতো যোগাযোগ আছে। পনেরো দিন আগে মাদারপুরে ঢেড়া পিটিয়ে সে ঘোষণা করেছে, তিনমাসে এলাকা থেকে পার্টিকে মুছে ফেলা হবে। তার ভয়ে পার্টির সমর্থক, দরদীরা কাঁপছে। তিলাবুনি থেকে নির্মলাকে তুলে নিয়ে যাবার খবর রটে গেলে, আরও বাড়বে ঘনশ্যামের দাপট। ধরাকে সরা জ্ঞান করবে সে। মাটিতে মিশিয়ে দেবে পার্টির সম্মান। সেরকম কিছু ঘটতে দেবে না পার্টি। ফৌজ যাবে মাদারপুর। চলো মাদারপুর। তরণীপাহাড়ে ফৌজের সদব দপ্তরে খবর নিয়ে গেল নরহরি।

সন্ধ্যের পর অজিত, রবি কেউ একজন সেখানে থাকে। খবর পাঠিয়ে হাতের কাছে যে ক'জন পাওয়া গেল, তাদের নিয়ে মাদারপুর অভিযানে তৈরী হলো কিশোর। ভাদুর নেতৃত্বে সন্ধ্যের আগেই মাদারপুর রওনা হলো দশজনের বাহিনী। আধুনিক হাতিয়ার নিয়ে আজই প্রথম আক্রমণাত্মক অভিযান চালালো গণফৌজ। আটজনের হাতে ছিল বন্দুক, দু'জনের রাইফেল। একজনের হাতে ছিল টর্চ, আর বল্লম। অন্ধকার শালবনের মধ্যে দিয়ে দু'মাইল গিয়ে তারপর মেঠোপথ ধরবে সবাই।

মাদারপুরের পথে কিশোরের মনে পড়লো, আজ বিকেলে পুঁইশার কাছে যাবার ইচ্ছে ছিল তার। যাবার আগে গুণীন মুমুর্র কাছে গিয়ে দু'তিন কেজি চাল নেবে। বন্দুক বেহাত হলেও পার্টির বিরুদ্ধে গুণীনের কোনো বিদ্বেষ নেই। বন্দুক লুঠের খবর আইন মাফিক থানায় ডাইরি করেছে সে। বন্দুক ফিরে পেতে ব্যস্ত নয়। কেউ না জানলেও আজও সে পার্টিদরদী। পুঁইশা খেতে পাচ্ছে না শুনলে গুণীন নিশ্চয় সাহায্য করতো। হয়তো খবর পেয়ে রবি বা পুঁইশার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছে গুণীন। রবির আবার প্রখর সম্ভ্রমবোধ। গুণীনের কাছে হাত পাতবে না। স্বামীর জেদ পুঁইশাতেও আছে। গুণীনের ঘর থেকে চাল নিয়ে পুঁইশাকে পৌঁছে দেবার ইচ্ছে গতকালই পুনাইকে জানিয়েছিল কিশোর। রবির খবরও পুঁইশাকে দেওয়া দরকার। পুঁইশা মা হতে চলেছে। এ সময়টা, কিশোর শুনেছে, ধরাকাটে থাকতে হয় মেয়েদের। কিন্তু সে খবর পেয়েছে, এখনও গভীর জঙ্গলে রোজ জ্বালানি কাটতে যায় পুঁইশা। কী করবে ? কথায় কথায় পুঁইশার মন থেকে নির্মলা সম্পর্কে ঘৃণার ভাবটাও মুছে দেবার বাসনা ছিল কিশোরের। নির্মলার বিপদের খবর শুনে পুরো ছক বদলাতে হলো।

কয়েক বাটি হাঁড়িয়া খেয়ে বাঘা ঝিমোচ্ছিল। ঠিক ঝিমুনি নয়, আচ্ছন্ন ভাব। সারাদিনের ঘটনা মনে পড়ছিল তার। মজা কুয়োটা ছিল গভীর। সপাটে পড়ার পর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আঁধার নেমেছিল চোখে। কুয়োর ওপর হল্লা, দাপাদাপি চলছে। মুখ গুঁজে শামুকের মতো বসে ছিল বাঘা। হঠাৎ কানে এলো নির্মলার গলা। নির্মলা কাতরাচ্ছে, ছাড়ান দাও আমাকে। ছাড়ান দাও।

একজন অচেনা গলা বলল, বঢ়িয়া মাল। কাপড় খুলে দে।

টানাটানি, ধস্তাধস্তির সঙ্গে নির্মলার শ্বাসের ফোঁসফোঁস শব্দ শুনছিল সে। রাগে মাথা তেতে উঠলেও শব্দ করেনি বাঘা। একজন বলল, সাতদিন ঘনশ্যাম সিং এর ঘরে থাকার পর ছাড়ান মিলবে তুর।

বুটের শব্দ, বাঁশির আওয়াজ, মেয়ে, বাচ্চার কান্নায় তিলাবুনি সরগরম। অন্ধকার কুয়োয় বসে বাঘা টের পেল, নির্মলাকে ধরে নিয়ে গেল বদমাসরা। পাঁক কাদায় আধডোবা শরীর কুয়োর বাইরে ছিটকে চলে আসতে চাইলেও সংযত ছিল বাঘা। পার্টি আছে। গণফৌজ আছে, মনে পড়েছিল তার।

অন্ধকার শালবনে গলা ছেড়ে ভাঁদু গান ধরেছিল, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈঁরো নির রকপে কান।

সঙ্গীরা গলা মেলালো। বাঘা চুপ। মাদারপুরে ঢোকার আগে পাতলা হচ্ছে

শাল, মহুয়ার জঙ্গল। ঘন অন্ধকারে এক চমক আকাশ চোখে পড়লে বোঝা যায়, গাছপালার ভিড় কমছে। রাত একটু বাড়লে মাদারপুরে ঢোকার কথা। গণফৌজের জন্যে এ জঙ্গলের সীমানায় অপেক্ষা করবে মাদারপুরের সুন্নো মাঝি। সুন্নো মাঝি পার্টির কর্মী। সুন্নোকে নিয়ে মাদারপুরে ঢুকবে গণফৌজ। তরণীপাহাড়ে যাবার পথে সুন্নোকে নরহরির খবর দেবার কথা। নিশ্চয় দিয়েছে। সুন্নোর রিপোর্ট শুনে ঘনশ্যাম আর তার প্রতিরোধবাহিনীকে মোকাবিলার পাকা নক্সা বানাবে গণফৌজ। প্রথম কাজ, নির্মলাকে খুঁজে বার করে নিরাপদ জায়গায় সরানো। জঙ্গলের প্রান্তে ফাঁকা একটা জায়গায় ছড়িয়ে বসে গেছে সবাই। দলে আছে মোট এগারোজন। সুন্নো এলে হবে বারো। তরণীপাহাড় থেকে বাহিনী নিয়ে অজিতও পৌঁছে যাবে মাদারপুর। একটু বেশী সময় লাগবে তার। বাঘার পিঠে সস্নেহে হাত রেখেছিল কিশোর। কাজ দিল তার স্পর্শ। খাড়া হয়ে উঠলো বাঘার আদুল, খরখরে পিঠের রোমকূপ। ঠাণ্ডা লাগতে কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বাললো দলের দু'জন। আগুনের তাপে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল বাঘা। তার পিঠে হাত রেখে কিশোর ভাবছিল, নির্মলার সঙ্গে বাঘার সাঙ্গার ব্যবস্থা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, করতে হবে। চাঁদা তুলে সে জোগাড় করবে বাঘার বিয়ের খরচ। নির্মলার বিয়ে হয়ে গেলে রবির সংসারে অশান্তি মিটে যাবে। বাঘাও স্বস্তি পাবে।

নতুন ফসল না উঠলে লালমুনির সঙ্গে অজিতের বিয়ে হবে না। বুধনের বাবার কথা শুনে সেরকমই কিশোরের মনে হয়েছে। বুধনের তিলকচুরিতে শুয়োর কেটেছিল বসন মাঝি। সে বিয়ে ভেস্তে গেলেও মেয়ের বিয়েতে আরও বেশি জাঁক-জমক, শুয়োর এবং খাসি, দুটোই কাটতে চায় বসন। দুটোই কিনতে হবে। টাকা চাই। ফসল না উঠলে কোথা থেকে মিলবে টাকা? তাছাড়া এলাকার আবহাওয়া খারাপ। বুধন জেলে। লালমুনির বিয়েতে যারা নাচ, গান, আনন্দ করবে, তারা গাঁয়ে নেই। কেউ কেউ ভিন জেলায় কাজের খোঁজে গেছে। পুলিশের ভয়ে গা ঢেকে আছে কেউ। বসনের কথাটা মিথ্যে নয়। বেশিরভাগ পার্টিকর্মী আশ্রয়হীন। ভবঘুরের মতো মাঠে, জঙ্গলে বেড়াচ্ছে তারা।

আরও এক মুশকিল হলো শহর ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ ছেলেরা চলে আসছে এখানে। আশ্রয় চাইছে তারা। গ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই তাদের। অনেকে প্রথম গ্রামে পা দিল। মার্কসবাদের ছিটেফোঁটা না জেনেই আবেগে ফুটছে। তাড়াতাড়ি একটা খতম করতে চায়। একটা খতম হলেই যেন হুহু করে ছড়িয়ে পড়বে গেরিলা যুদ্ধ, গড়ে উঠবে গণফৌজ। এই তরুণদের পাঁচ, সাতজনকে একাধিকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে কিশোর। পারে নি। বরং কিশোরকে ভুল বুঝেছে তারা।

দিন সাত আগে একগোছা পুরোনো সংবাদপত্র পেয়েছিল কিশোর। কাগজগুলো পড়ে বুঝেছে, কলকাতার অবস্থা ভয়ঙ্কর। শুধু শহর কলকাতা কেন, কাশীপুর,

বরানগর, বারাসত, শিবপুর, কোন্নগর, ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত পার্টিকর্মীদের রক্তে ভেসে গেছে! মানবের কাছে সেদিন পুরোনো এককপি ফ্রন্টিয়ার পত্রিকা পেয়েছিল কিশোর। ফ্রন্টিয়ারের পাতায় ছিল বরানগর, কাশীপুরে গণহত্যার মর্মান্তিক বিবরণ। সেখানে ঠিক কতোজন খুন হয়েছে, হিসেব পায় নি পার্টি। তবে দেড়, দুশোর কম নয়। পরিচয় চাপা দেবার জন্যে অনেক মৃতের মুখে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছিল খুনীরা। মুণ্ডহীন কিছু লাশ পাওয়া গেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা চলেছিল এই গণহত্যা। যারা তরুণ এবং যারা তরুণ নয়, সব মিলে খুনের সংখ্যা দেড়শো। বেশিও হতে পারে। বরানগর কুঠিঘাট রোডের ওপর একটা মঞ্চ বানিয়ে হত্যাকারীরা ঝুলিয়ে দিচ্ছিল মৃতদের নামের ফর্দ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে ফর্দে নতুন নাম যোগ হতে আনন্দে ফেটে পড়ছিল প্রতিরোধবাহিনী। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় ষাটটি নাম ফর্দে উঠেছিল। মৃতের সংখ্যা যখন গোনার উপায় থাকলো না, তখন বন্ধ হলো, নাম নথিবদ্ধ করার কাজ। পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবার এ এক নিষ্ঠুর কাহিনী। দিনের আলোতে প্রকাশ্য রাস্তায় মৃতদেহগুলি পড়েছিল। রিক্সা, ঠেলায় তুলে হুগলি নদীতে ফেলে দেওয়ার পরে মৃতদেহগুলি জোয়ারে ভেসে যায়। পৈশাচিক, বীভৎসতম কায়দায় ঘটেছিল হত্যাকাণ্ডগুলি। এক ভাইপোর খবর দিতে না পারায় ষাট বছরের এক বৃদ্ধের শরীরে পেট্রল ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

দুর্ঘটনার তিনদিন পরে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছিল, যারা মারা গেছে, তারা আদৌ শান্তিপ্রিয় ছিল কিনা, আগে দেখতে হবে।

কাগজ পড়ে সেদিন মানবের সামনে বোবার মতো বসে ছিল কিশোর। মানব বলেছিল, এই গণহত্যার প্রতিবাদে সিউড়ি বন্ধের ডাক দিয়েছে পার্টি।

নিচু গলায় মানব জানিয়েছিল, সিউড়ি, বোলপুরের কমরেডরা আবার গণসংগঠন, গণআন্দোলন করার কথা ভাবছে। নেতৃস্থানীয় ছেলেদের নিয়ে তোমার সঙ্গে বসতে চায় বুদ্ধদেব।

অন্ধকার শালবনের দক্ষিণ পশ্চিমে চাঁদ উঠেছে। বুদ্ধদেব এখনও দেখা করেনি। আগুন নিভে এসেছে। উসখুস করছে সবাই। ভাদু বলল, ইবার উঠতে হবেক।

উঠে দাঁড়াবার সময়ে মুহূর্তের জন্যে ঘুরে গিয়েছিল কিশোরের মাথা। কেউ কিছু বোঝার আগে নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে।

মাদারপুর যাবার পথে যে অবসাদ, ক্লান্তিতে দু'পা টলছিল, অভিযান শেষ করে ফেরার সময়ে তা আরও বেড়েছে। হাঁটতে পারছে না সে। অন্ধকার রাস্তায় তিন সঙ্গী নজর করছে না তাকে। শরীর ভেঙে গেছে, সে জানে। দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথা ঝিমঝিম লেগেই আছে। কিছু করার নেই। তবে ভয় পায় সে। অসুস্থ হলে, শরীর ভেঙে গেলে কী দশা হবে তার? পার্টির কী হবে? কাজ শেষ করতে এখনও যে অনেক দিন বাকি। বর্ষার শুরু থেকে দু'বেলা পেট ভরে বহুদিন

খেতে পায়নি সে। পাবার কথা নয়। এলাকার বারো আনা মানুষ এখন রোজ দু'বেলা ভাত পাচ্ছে না। গরীব মাঝিপাড়ায় নিয়মিত উপোস চলছে। শুকিয়ে আমসি তাদের মুখ, শিরাজাগা শীর্ণ চেহারায় দুঃসময় মিশে আছে। অভাব, অভিযোগ, রাগ, ক্ষোভ প্রকাশ করে না কেউ। মুখে কিছু বলে না। রোদ বৃষ্টি, দুর্যোগের মতো উপোসও এক প্রাকৃতিক ঘটনা। এখানে কেউ রোগে ভুগলে, ধরে নেওয়া হয় মারা যাবে সে। হাসপাতাল, জেলে গেলে খরচের খাতায় নাম তুলে ফেলা হয় তার। দুচোখ দেখে বোঝা যায়, পৃথিবী, জীবন সম্পর্কে তাদের নিরাসক্তি।

তবে ফসল কাটা শুরু হলে ছক উল্টে যায়। মাঝিপাড়ার মানুষদের মুখ, চোখে স্বাভ্যাবিক রঙ ফিরে আসে। মেলা, পরব, নাচগানে বইতে থাকে খুশির জোয়ার। পনেরো, বিশ দিন দুবেলা পেট পুরে ভাত খেলেই স্বাস্থ্যে ফেটে পড়ে হাভাতে মানুষগুলোর দুমড়োনো শরীর। দড়িপড়া শিরা ফুলে উঠে। ফসল তোলার পরে মানুষগুলোকে কিছুদিন মানুষের মতো দেখায়।

উপোসের দিন শেষ হতে দেরি নেই। এক, দেড়মাস পরেই শুরু হবে ফসলকাটার মরশুম। আর সামান্য কিছু দিন উপোসে কাটাতে হবে। ফসল উঠলে দু'বেলা তারও ভাত জুটবে। পেটে দু'বেলা ভাত পড়লে উবে যাবে শরীরের অবসাদ, দুর্বলতা, ক্লান্তি।

কথাটা ভেবে খুশি হলো কিশোর। মাদারপুর অভিযানের স্মৃতি আবার আচ্ছন্ন করেছে তাকে। আজ গণফৌজের প্রথম অভিযান সফল হয়েছে। ফৌজ জিতেছে।

চাঁদ ওঠার পাঁচ, সাত মিনিট পরে শালবনে এসে দাঁড়ালো সুন্নোমাঝি। টুকরো চাঁদের দুপাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ। কতোদিন রেবার সঙ্গে দেখা হয়নি, ভেবেছিল কিশোর। কলকাতায় একবার যাওয়া দরকার। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

মাদারপুরের যাবতীয় বৃত্তান্ত শোনাচ্ছিল সুন্নো। ডাকাত, গুণ্ডা, মস্তানদের হাতে অস্ত্র দিয়ে তৈরি হয়েছে রক্ষীবাহিনী। রাত দশটার পর টহলে বেরোয় তারা। রাস্তায়, ঘাটে তারা এমন হল্লা করে যে গাঁয়ের মানুষ রাতে ঘুমোতে পারে না। সন্ধ্যের পরই শুরু হয় বাহিনীর লোকেদের খানাপানা। খাওয়ার চেয়ে বেশি হয় পান। টহলে বেরিয়ে তাদের বেশিরভাগ হাঁটতে পারেনা। রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে শুয়ে থাকে।

নির্মলা কোথায় আটক আছে, কোন পথে গাঁয়ে ঢোকা সুবিধে, খুটিনাটি জানিয়ে চুপ করল সুন্নো।

শালবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো একডজন মানুষ। প্রায় মাঝরাত। মাদারপুরের সীমানায় সবাইকে আরও একবার কিশোর মনে করালো, নির্মলাকে খুঁজে বার করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া মূল কাজ।

মাদারপুরে ঢুকতেই উঁচু জমিতে গোবর্ধন দাশের বাড়ি। অন্ধকারে ডুবে আছে দোতলা মাঠকোঠা। রাস্তার ধারে ধানক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেঠো ইঁদুর। ধান

সংগ্রহ করে গর্তে জমাচ্ছে। এ তল্লাটের নামী লোক গোবর্ধন। সে একই সঙ্গে জোতদার, ব্যবসায়ী, মহাজন। সিউড়ি শহরে ভুষিমালের ফলাও কারবার তার। বছরে সাত, আট মাস শহরে থাকে। মাদারপুরের বাড়ি পাহারা দেয় বন্দুকধারী ভোজপুরী দারোয়ান। বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনো করে নায়েব। ফসল ওঠার মরশুমে দু'তিন মাসের জন্যে মাদারপুরে আসে গোবর্ধন। গোবর্ধনের সদর দরজার কড়া নাড়লো ভাদু। একবার, দুবার, তিনবার জোরালো, ধাতব শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। দরজা খুললো না কেউ। শরীর শক্ত করে পাহাড়ের মতো কাঠের বন্ধ দরজায় একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো পাঁচজন। মড়মড় করে ভেঙে গেল কাঠের হুড়কো। খোলা দরজা। নিকোনো, পরিষ্কার উঠোনে টর্চের আলো ফেললো সুন্নো। ফাঁকা খামার। খামারের শেষ মাথায় চারপাই-এ শুয়ে ঘুমোচ্ছে দারোয়ান মাধো সিং। দরজা ভাঙার বিকট আওয়াজেও জাগেনি সে। টর্চের আলোয় কিশোর দেখলো মাধোর চারপাই-এর পাশে একটা বন্দুক, একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। নিমেষে দুটোই হাতিয়ে নিল ভাদু। গাঁয়ের দু'তিনটে কুকুর উঠোনে ঢুকে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। মাধোর নাক ডাকার আওয়াজ তবু থামেনি। তার মুখে আলো ফেলে ভাদু বলল, বহুৎ মহুল টেনেছে বটেক।

দরজা ভাঙার শব্দে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল মাদারপুরে। গাঁয়ে যে বাইরের লোক ঢুকেছে, টের পেয়েছে রক্ষীবাহিনী। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল বাঘা। লড়াই-এর জন্যে সবাই তৈরী। পুনাই বলল, ঢোকলা বুড়ি সকাল থেকে নথ বাজাইছে। তখনই ইয়াদ কঁইরেচি জোর লড়াই বাঁধবে আজ।

বাড়িতে গোবর্ধন দাশকে না পেয়ে রাস্তায় এলো সবাই। বন্দুক, সড়কি, লাঠি হাতে গ্রামের ভেতরে হল্লা করছিল রক্ষীবাহিনী। এগিয়ে আসার আগে সাত, পাঁচ ভাবছে তারা। উঁচু গলায় ভাদু বলল, আমরা চোর, ডাকাত নই। পার্টির গণফৌজ। আমাদের ঠেকাতে চাইলে জানে খতম হয়ে যাবে তোমরা।

ভাদুর কথা শেষ হতে স্লোগান শুরু করল পুনাই। গলা মেলালো সকলে। সমবেত ধ্বনিতে কাঁপছে নিস্তব্ধ মাদারপুর। স্লোগানের তাপে উদ্বেল হলো গণফৌজ। দশটা বন্দুক বাগিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা প্রস্তুত। দূর থেকে তর্জন গর্জন করলেও সামনে আসতে ভরসা পাচ্ছিল না রক্ষীবাহিনী। বাহিনীর সামনে কে থাকবে, এ নিয়ে তাদের কথা চালাচালি শুনতে পেল কিশোর। সামনে দাঁড়াতে রাজি নয় কেউ।

ভজা কোথায় ?

রক্ষীদলের একজনের প্রশ্নের জবাবে কেউ বলল, সন্ধ্যে থেকে মাল খেয়ে লটকে পড়ে আছে সে।

যত্তো সব বেটো আদমি।

তাদের কথার মাঝখানে গলা তুলে পুনাই বলল, আমাদের সঙ্গে যারা দুষমনী

করবে, নখের ডগায় তাদের কলজে উপড়ে ফেলবো।

তখনই সামনে টর্চের আলো ফেললো সুন্নো। আলো জ্বলতে পরপর দু'বার বন্দুক দাগলো ভাদু। গুড়ুম, গুড়ুম গুলির শব্দে চমকে গেল অন্ধকার রাত। হুটপাট করে ছুটে পালাচ্ছে রক্ষীবাহিনী। ভয় পাওয়া পাখিরা ডাকাডাকি করছে। রক্ষীবাহিনী পালাচ্ছে আন্দাজ করে তেড়ে গিয়েছিল গণফৌজ। পালাবার সময় রাস্তার ধারে গোবরেরর গাড্ডায় রক্ষীদলের একজন পড়ে গেছে। গলাপর্যন্ত গোবরে ডুবে দু'হাত তুলে সে ককিয়ে উঠেছিল, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।

তার মুখে আলো ফেলে লম্বা বল্লমের হাতল এগিয়ে দিল সুন্নো। সরু বাঁশের হাতল ধরে লোকটা গাড্ডা থেকে উঠে আসতে তাকে চিনতে পারলো কিশোর। নির্মলার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামী ভানুচাঁদ। নেশায় সে চুর। গোবর মাখা দু'হাতে বাঘাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো ভানুচাঁদ। তারপর বলল, জেতের সঙ্গে, বহুর সঙ্গে বেইমানী ক'ইরেচি আমি। তুরা সাজা দে আমাকে।

গোবর মাখা ভানুচাঁদকে কিল, চড়, লাথি কসাতে শুরু করেছিল বাঘা। মাটিতে পড়ে ভানুচাঁদ চুপচাপ হজম করছে বাঘার মার। গ্রামরক্ষীবাহিনীকে তাঁড়িয়ে নিয়ে চলেছে গণফৌজ। চোর, চোর শব্দ তুলে রক্ষীরা পালাচ্ছে। বেশিরভাগ ভিন গাঁয়ের লোক। অজানা গাঁয়ে, অন্ধকারে কে কোথায় লুকোবে, হদিশ পাচ্ছে না। বাঘার হাতে ভানুচাঁদকে জমা করে ঘনশ্যামের বাড়ির সদরদরজা খুলতে আগে চলে গিয়েছিল সুন্নো। দরজা খুলে গণফৌজের জন্যে অপেক্ষা করবে সে। অন্ধকার রাস্তায় কিশোরের পায়ের ওপর অচেনা একজন লোক লুটিয়ে পড়ে বলল, আমাকে জোর করে দলে ঢুকিয়েছে ওরা। আমি চাইনি। জানে মারবেন না আমাকে।

তাকে ঘাড় ধরে ভাদু দাঁড় করাতে দেখা গেল লোকটা খোঁড়া। বাঁ পায়ের চেয়ে তার ডান পা ছোট।

ঘনশ্যামের ঘর কুথা ?

ঘাড় ধরে ভাদু প্রশ্ন করতে আঙুল তুলে লোকটা দেখিয়ে দিল ঘনশ্যামের বাড়ি। বিপদ বুঝে বৌ, ছেলেমেয়ে নিয়ে দোতলায় উঠে গিয়েছিল ঘনশ্যাম। তার বাড়ির উঠোনে বন্দুক হাতে দশজন ঢুকতে মেয়ে, বাচ্চারা আকাশ ফাটিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। আগের মতো ভিড় না করলেও গাঁয়ের কিছু গরীব মানুষ ঘনশ্যামের উঠোনে জড়ো হয়েছিল। খোলা দরজার বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল দু'চারজন। উঠোনে রাখা জ্বালানি কাঠের স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিল কেউ। হুহু করে জ্বলে উঠলো শুকনো কাঠ। লাল লকলকে আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো চারপাশ। চক-মেলানো বিশাল উঠোনের পুবে গোয়াল। গোয়ালে আট, দশটা গরু, মোষ। জাবর কাটতে কাটতে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তারা। গোয়ালের পাশের ছোট চালাঘরে প্যাঁকপ্যাঁক করে হাঁস ডাকছিল।

ঘনশ্যামের বাড়িব দোতলার সিঁড়ির মুখে লোহার পাতের দরজা। এ দরজা ডাইনে, বাঁয়ে খোলে না। তলা থেকে ধাক্কা দিয়ে কৌটোর ঢাকনার মতো খুলতে

হয়। এখানকার প্রায় সব ধনী লোকের মাঠকোঠার দোতলায় এই ধাঁচের দরজা আছে। তলা থেকে ধাক্কা মেরে এ দরজা খোলার মতো শক্তি কোনো পালোয়ানের নেই। মাথা দিয়ে ধাক্কা মারলে মাথা ফেটে রক্তারক্তি হবার সম্ভাবনাই বেশি। বন্ধ গেটের মুখে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় ভাদু হুকুম করল, খিড়কি খোল।

কাজ হলো না ভাদুর হুকুমে।

চুপচাপ দেখছিল গাঁয়ের মানুষ। ছ'মাসে আগে কারও বলার অপেক্ষা না করে এই মানুষগুলোই দরজা ভাঙতে লেগে যেত। হাওয়া ঘুরে গেছে। ঘনশ্যামের শত্রুতা করার সাহস আজ পাচ্ছে না তারা। পুনাই চেঁচিয়ে বলল, সদর না খুললে আগ লাগায়ে দেবো ঘরে।

মুরগির ঘরের পাশে তালা লাগানো ঘর থেকে কিছু একটা শব্দ শুনে সেদিকে ছুটে গেল বাঘা। তাড়াতাড়ি একটা শাবল এনে দরজার বন্ধ তালা ভেঙে ফেললো সে। দরজা খুলতেই তার সামনে এসে দাঁড়ালো নির্মলা। বিধ্বস্ত চেহারা। খোলা চুল, দুচোখে আগুন। তার চুলে, শাড়িতে লেগে আছে ধুলো, খরকুটো। গরু, বাছুরের জাবনার ঘরে আটক ছিল সে। ঘনশ্যামের বাড়িতে ভানুচাঁদকে টেনে এনেছিল বাঘা। উঠোনের এক কোনে দাঁড়িয়েছিল ভানুচাঁদ। নির্মলাকে দেখে অন্ধকার রাস্তায় চোঁচা দৌড় মারলো সে।

গণফৌজের চারজনকে নিয়ে দোতলার লোহার কপাটে ঘা মারছে ভাদু। দরজা খোলার জন্যে বারবার হুঙ্কার দিচ্ছিল সে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম মিনতি করছিল, শেষবারের মতো তুরা ছাড়ান দে আমাকে। মরা মা, বাপের কিরা, কালই ইখান থিকে চইলো যাবো।

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কেঁদে চলেছে বাড়ির বৌ, মেয়ে, বাচ্চারা। দোতলার ঘরের জানলা খুলে একতলার উঠোনে তারা ছুঁড়ে ফেলছিল গয়না, টাকাপয়সা, শাড়ি। নির্মলার প্রলয় মূর্তি। ভয়ঙ্কর কিছু করতে চাইছিল সে। বাঘার কানে কানে কিশোর বলল, নির্মলাকে নিয়ে আন্নার ঘরে চলে যা এখনই।

কিশোরকে একপলক দেখে নির্মলার হাত ধরে সদরের দিকে টেনে নিয়ে গেল বাঘা। জ্বলন্ত কাঠের স্তূপে ধিকিধিকি আগুন। যে কোনো মুহূর্তে নিভে যাবে। উঠোনে ছড়ানো গয়না, টাকা,শাড়ির দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়েছিল গাঁয়ের গুটিকয় মানুষ। দু'একটা জিনিস হাতসাফাই করার হয়তো সুযোগ খুঁজছিল তারা। অন্ধকার রাস্তায় হঠাৎ তারস্বরে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, পুলিশ। পুলিশ আসছে।

উঠোনের জটলা চোখের নিমেষে ভেঙে গেল। গাড়ির ইঞ্জিনের রিরি আবছা গুঞ্জন কান পেতে শুনলো কিশোর। পুলিশ, সি. আর. পি, মিলিটারি, যে কোনো একটা বাহিনী ছুটে আসছে। শব্দটা ভাদুও শুনেছিল। উঠোন ফাঁকা করে চলে গেছে গাঁয়ের মানুষ। আবছা আলোয় পুনাই-এর শুকনো মুখ দেখলো কিশোর। পুলিশ, মিলিটারির মোকাবিলা করবে, না মাদারপুর ছেড়ে গণফৌজ চলে যাবে,

সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তখনই ভাদু বলল, নির্মলাকে যখন পেঁইয়ে গেঁইছি, আর ঝামেলার কী দরকার ?

ন্যায্য কথা, সায় দিল দু, তিনজন। ঘনশ্যামের উঠোন ছেড়ে রাস্তায় এলো সবাই। দূর থেকে ভেসে আসা ইঞ্জিনের শব্দ আবার শুনতে চেষ্টা করেছিল কিশোর। গুনগুন আওয়াজ, ঝিঁঝির ডাকও হতে পারে। ধাঁধা লেগে গেল তার। ভুল শুনলো নাকি ? ইঞ্জিনের শব্দটা যেন মিলিয়ে গেছে। দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল গণফৌজ। বুরুং মাঝি, কির্তা, বীরসিংকে নিয়ে বাহেঙ্গার জঙ্গলের দিকে রওনা দিয়েছিল সুনো মাঝি। কিশোর, ভাদু, পুনাই ধরেছিল দক্ষিনের ঘুরপথ। কাল বিকেলে বাহেঙ্গার জঙ্গলে আবার বসার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

মাথাটা এতো ঝিমঝিম করছে কেন ? ভয় পেল কিশোর। তাঁতলুই পেঁাছোতে পারবে তো সে ? অসুস্থ মাথাতে একটা প্রশ্ন জাগছে, পুলিশ আসার আওয়াজটা কে দিল ? সত্যি কি পুলিশ আসছিল ?

তার সন্দেহ হলো, রক্ষীবাহিনীর কেউ গণফৌজকে ঠকিয়েছে। গুজব রটিয়ে আতঙ্কিত করেছে তাদের। আতঙ্কিত গণফৌজের ওপর হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব এঁটেছিল রক্ষীরা। কেন পেছিয়ে গেল তারা ? পালিয়ে আসার জন্যে লজ্জা বোধ করছে কিশোর। দলবল নিয়ে অজিতও এলো না। নরহরি কি অজিতের দেখা পায়নি ? চাষাবাদ নিয়ে ভাদু, পুনাই একটানা কথা বলছে। এক, দেড় ঘণ্টা আগে মাদারপুর অভিযান যেন তাদের মাথা থেকে উবে গেছে। ক্রমশ বাড়ছে কাঁধে ঝোলানো বন্দুকের ওজন। বইতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের।

ফিকে আলো ফুটছে পুব আকাশে। ভোর হচ্ছে। হাল্কা কুয়াশায় ঘেরা তরণীপাহাড়। তরণীপাহাড়ের শরীরে সবুজের আভা। পাহাড়ের রাস্তায় কে যেন এগিয়ে আসছে ! মাটির ওপর হঠাৎ বসে পড়লো কিশোর। তখনই দূরে পরিষ্কার দেখা গেল নরহরিকে। একা ফিরছে নরহরি।

পঁয়তাল্লিশ

লকআপে সাতদিন কাটিয়ে আদালতে জামিন পেল রেবা। জামিনদার, জামিনের খরচ নিয়ে প্রভাদি এসেছিল কোর্টে। বদ্ধ কোর্টঘরে ভিড়, হল্লা। দম বন্ধ হয়ে আসছিল রেবার। খনা গলায় আসামীদের নাম, কেস্ নম্বর জানিয়ে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ছে কোর্ট ইন্স্পেক্টর।

রেবার এ্যারেস্টের পরের দিন বেলা এগারোটার আগেই একজন উকিল নিয়ে পুলিশের সদরদপ্তরে পৌঁচেছিল প্রভাদি। লকআপ থেকে প্রভাদির সামনে পুলিশকে নিয়ে এলো এক সিপাই। দপ্তরের তিনতলায় একটা ঘরে প্রভাদি বসেছিল। পাশে উকিল। উদ্বেগে শুকনো প্রভাদির মুখ। নানা কথার মধ্যে ফিসফিস করে একটা ভুতুড়ে ফোন পাবার খবর শুনিয়েছিল প্রভাদি। রেবার এ্যারেস্টের খবর জানিয়ে নীরব হয়েছিল ফোন। কে ফোন করল, বুঝতে পারেনি প্রভাদি।

গত সাতদিন রোজ একবার লালবাড়িতে প্রভাদি এসেছে। রেবার সঙ্গে দেখা না হলেও তার খবর নিয়েছে। একদিনের বেশি দেখা না হলেও শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, পেস্ট্, সাবান এবং টুকিটাকি জিনিস অনেক তম্বির করে লকআপে রেবাকে পাঠিয়েছে প্রভাদি। লকআপে বসে প্রভাদির আসার খবর পেত রেবা। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জামিন হবার রায় শুনে একফুঁয়ে উড়ে গেছে তার সব দুশ্চিন্তা, ভয়। কি যন্ত্রণায় কেটেছে গত সাতদিন! গায়ে হাত না তুললেও যে সব কদর্য শব্দ, গাল তাকে শুনিয়েছে পুলিশ, বস্তিতে সেগুলো কখনও শোনেনি সে। দিন, রাত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরার সময়ে খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে তাকে। ধর্ষণের জন্যে একাধিকবার শাড়ি ধরে টানাটানি করেছে এক অফিসার, আর তার সহকারী পালোয়ান। পুলিশকে ফাঁকি দিলেও সহকর্মী কমরেডদের হাতে কিশোরের মৃত্যু যে অবধারিত, এ কথা শুনিয়েছে কেউ কেউ।

জামিনের কাগজ সই করার মুহূর্তে, আনন্দে সব হুমকি, অপমান ভুলে গেল রেবা। কানে কখনও না শুনেও সে বুকের মধ্যে টের পাচ্ছে মাদলের শব্দ। মাদল বাজছে বুকে। তার মনে হচ্ছে, কোর্টঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। ক্লান্ত দেখাচ্ছে প্রভাদিকে। রেবার জামিনের জন্যে গত সাতদিন বিস্তর দৌড়ঝাঁপ গেছে তার। যুক্তফ্রন্টের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে ধরে রেবার ওপর যাতে নির্যাতন না হয়, ব্যবস্থা করেছিল প্রভাদি। রেবার জামিন পেতেও নানা মহলে প্রভাদি তম্বির করেছে। এই মেহনত, ছুটোছুটি সফল হতেই জমাট অবসাদ চেপে ধরেছে তাকে।

এজলাসের দরজায় কাঁদো কাঁদো মুখে তপতী দাঁড়িয়ে আছে। তপতীর পেছনে রোগা, নিরীহ সেই কনস্টেবল। রেবার চোখে চোখ পড়তে লোকটা পেছনে তাকালো। পৃথিবী, মানুষ, চারপাশ সম্পর্কে একহপ্তায় অনেক বদলে গেছে রেবার ধারণা। মনের এক অংশ ভারি নরম, গভীর হয়ে গেছে। ভাবনার ছকটা ঠিক আগের মত নেই। ছক ভেঙে গেছে। খুব স্পষ্ট না হলেও তার মনে হচ্ছে জ্ঞানের অন্য নাম নমনীয়তা। উদারতাই হলো পাণ্ডিত্যের লক্ষণ। জীবনকে অচল করে দেয় গোঁড়ামি, ছকবাঁধা অন্ধতা। চিন্তাভাবনাগুলো ঠিকঠাক সাজাতে না পেরে মনে হলো, আরও একটু লেখাপড়া, শিক্ষা দরকার ছিল তার। তাহলে অনেক নিখুঁত হতো পৃথিবী, মানুষকে তার দেখা, বিচারের শক্তি।

এজলাস থেকে রঙওঠা দেওয়াল, কাগজপত্র ঠাসা অফিসঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। কম পাওয়াড়ের বাল্ব ঝুলছে ঘরে। ম্যাড়মেড়ে আলো। তেলচিটে কয়েকটা চেয়ার, দুটো পুরোনো বেঞ্চি এলোমেলো ছড়ানো। ঘরের বাতাসে স্যাঁত-সেঁতে ভ্যাপসা গন্ধ। প্রভাদির সঙ্গে রেবা সই করল তিনটে কাগজ। কাগজে কী লেখা পড়লো না। ইংরিজি ভাষা পড়েও পুরো বুঝতো না সে। অফিসঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সেই কনস্টেবল। তাকে দেখে প্রভাদির কানে ফিসফিস করে রেবা বলল, এই সিপাই ফোনে খবর দিয়েছিল আপনাকে।

কনস্টেবলটিকে দেখলো প্রভাদি। দরজার আড়ালে লোকটা সরে যেতে প্রভাদিকে রেবা বলল, আজ ওর কোর্ট ডিউটি। আমাকে কোর্টে নিয়ে এসেছে ও।

পেশকারের হাতে দুটাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে অফিসের বাইরে এসে দাঁড়ালো প্রভাদি। পেছনে রেবা। প্রভাদির হাতের মুঠোয় ভাঁজ করা একটা পাঁচ টাকার নোট নজর এড়ায়নি তার। অফিসের সামনে চাতাল। তিনটে সিঁড়ি ভেঙে সামনে একটা ঝাঁকড়া নিমগাছ। নিমগাছের ঘনপাতায় লেগে আছে শেষ বিকেলের ম্লান আলো। নিমগাছের ডানদিকে লোহার গেট। গেটের বাইরে পিচের রাস্তা। নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে তপতী। চাতালের প্রান্তে কনস্টেবলটিকে দেখে এগিয়ে গেল প্রভাদি। পাঁচটাকার নোটটা তার হাতে প্রভাদি গুঁজে দেবার মুহূর্তে চমকে গেল সে। ভাঁজ খুলে দু'আঙুলে ধরা নোটের দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকালো, যেন ময়লা কিছু হাতে নিয়েছে সে। অল্প হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে পাঁচ-টাকার সবুজ নোট। কিছু লোক ঘটনাটা লক্ষ্য করছে। নিমগাছে পরিত্রাহি ডেকে চলেছে একদঙ্গল কাক। উর্দিপরা নিরীহ মানুষটার ফ্যাকাসে মুখ সামান্য লাল হয়েছে। প্রভাদির দিকে নোটটা বাড়িয়ে ধরে সে বলল, টাকাটা রাখুন।

থতমত খেয়ে নোটটা প্রভাদি নেবার পর কনস্টেবলটি বলল, সবাই ঘুষখোর নয়। লজ্জা পেল প্রভাদি। বলল, মাপ করবেন।

কথা না বাড়িয়ে উর্দিপরা লোকটা অফিসে ঢুকে গেল। প্রভাদি চুপ। হঠাৎ যেন খালি হয়ে গেল রেবার বুক।

ছেচল্লিশ

মাদারপুরের উত্তরে তাঁতলুই। হাঁটা পথে পাঁচ মাইল। মাথা ঘুরে যেতে জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে পড়েছিল কিশোর। তখনই সেখানে এসে গেল নরহরি। ভোরের ফ্যাকাসে আলোয় তার মুখের চেহারা দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তিন সঙ্গী। অদূরে সিধ নদী। নদীর জলে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে এলো ভাদু। জলের ঝাপটা দিল কিশোরের মুখে। গামছায় মুছে দিল মুখ, গলা। আধঘণ্টার মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। পুনাই বলল, কমোরেট, তুরে কাঁধে তুইলে লিয়ে যাবো।

কিশোর হেসে বলল, দরকার নেই। ঠিক হয়ে গেছি আমি।

তিনজনকে ছেড়ে বাড়ির পথে একা এগিয়ে গেছে নরহরি। তার ঘরে নির্মলাকে নিয়ে বাঘা গেছে শুনেই চলার বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে সে। তরণীপাহাড়ের ডেরায় অজিত, রবি, কারো দেখা পায়নি নরহরি। বাঘা, নির্মলা এতোক্ষণে নিশ্চয় তাঁতলুই পেঁাছে গেছে। সিধ নদীর দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, চান করবো আমি।

ভাদু বলল, আমিও।

বেলে মাটি, নুড়ি পাথর মাড়িয়ে জলে নামলো দু'জন। তাদের দুটো বন্দুক পাহারা দিচ্ছে পুনাই। পূব দিকের বাবলা বন ছুঁয়ে নদীর জলে পড়েছে ভোরের আলো। বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা কোমর জলে নেমে টুপটুপ করে তিন, চারটে ডুব দিল কিশোর। ঠাণ্ডায় অসাড় শরীর ধীরে ধীরে সতেজ হচ্ছে। খাটো ধুতি, চাদর পাড়ে ছেড়ে উদোম ভাদু জলে নেমেছে। লজ্জার কোনো ব্যাপার নেই। শিশুর মতো সাঁতার কাটছে। স্নানের আরামে বুজে আসছে কিশোরের দু'চোখ। স্নায়ু, শিরায় অগাধ প্রশান্তি। খিদেতে আবার চনমন করছে পাকস্থলী। গুণীন মুর্মুর বদলে নরহরির ঘর থেকে দু'পালি চাল নিয়ে পুঁইশার সঙ্গে আজ দেখা করতে যাবে কিশোর। আজই যাবে। জরুরি এ দায়িত্ব আর একদিনও ফেলে রাখবে না। নরহরির ঘরে চাল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তার ঘরে আমেদপুর থেকে সম্বন্ধী মাধব এসেছে। আমেদপুর থানায় বন্দুক দখলের পরে মাধবের সঙ্গে কিশোরের আর দেখা হয়নি। তবে তার কিছু খবর নরহরির মুখে কিশোর শুনেছে। মাধবকে সন্দেহ করেনি কেউ। তার চাকরি বজায় আছে। মাধব এলে নরহরির ঘরে ভাতের অভাব হয় না। পুঁইশার জন্যে দু'পালি চাল জোগাড় অসম্ভব হবে না। একটা শাড়িও পুঁইশার চাই। তার দুটো শাড়ি উলিডুলি ছেঁড়া। আন্নার বাড়তি শাড়ি নেই, কিশোর জানে। এ অঞ্চলের কোনো গরীব বৌ, মেয়ের দুটোর বেশী শাড়ি নেই। কে একটা শাড়ি দিতে পারে, ভেবে পেল না কিশোর। নতুন ফসল ঘরে না ওঠা পর্যন্ত

শাড়ি পাবার চিন্তা দুরাশা। কিন্তু এ বছর কার ঘরে ফসল উঠবে, এখনও অনিশ্চিত। গত মরশুমের মতো ফসলের একতরফা অধিকার এবার গরীব মানুষ পাবে না। সিধনদীর দু'পাশের ক্ষেতে কৃষকের কতোটা রক্ত এ সনে ঝরবে, কে বলতে পারে!

এই অভাব, অনটনেও কৃষকদের বাঁচাতে হবে। যারা শহিদ হয়েছে, যারা জেলে, তাদের সংসার, বৌ ছেলেমেয়েদের ভেসে যেতে দিতে পারে না পার্টি। পার্টি পালন করবে দায়িত্ব। ছেঁড়া কাপড়ে রবির বৌ উপোসে দিন কাটালে পার্টির দুর্নাম হবে। গত বছর কয়েক হাজার মন ধান দখলে নেতৃত্বে দিয়েছিল রবি। নিজে দাঁড়িয়ে গ্রামগোলো বানিয়েছে সে। গরীব কৃষকদের ধান বিলি করেছে। এককণা ধান নিজে নেয় নি। সেই রবির সংসারে আজ হাঁড়ি চড়ছে না। শুকিয়ে মরছে তার গর্ভবতী বৌ। দিন দশ আগে রাগের ঝোঁকে স্বামীকে গাল দিয়ে পুঁইশা বলেছিল, একপয়সা নাই ঝুলিতে, লাফ দিয়েছে কুলিতে।

পুঁইশার খোঁটা চুপচাপ হজম করেছিল রবি। রবি মুখে না বললেও সে যে বেকায়দায় আছে- কিশোর জানতো। কিন্তু মুখ ফুটে নিজের দারিদ্রের কথা শোনাবার মানুষ রবি নয়।

পাড়ে উঠে সূর্যের দিকে তাকিয়ে গামছায় আদুল শরীর মুচছে ভাদু। পেটানো ইস্পাতের মতো কুচকুচে কালো দেহ। টকটকে লাল একটা নেংটি পরে কাপড় জড়ালো কোমরে। জাঙিয়া পরে জলে নেমেছিল কিশোর। স্নান শেষ করে ভিজে জাঙিয়া ছেড়ে লুঙি পরলো সে। গতবছর ফসল ওঠার পরে যে সব গাঁয়ে পার্টির মুখিয়া আছে, সে গ্রামগুলোতে চালু হয়েছিল প্রাথমিক স্কুল। স্কুল খোলার উদ্যোগ নিয়েছিল পার্টি। বর্ণপরিচয়, অংক, ইতিহাসের সঙ্গে অলচিকিতে হাতে লেখা পাঠ্যবই পড়ানো শুরু হয়েছিল। অলচিকি ভাষায় ছাপা কিছু বইও এসেছিল শহর থেকে। সে সব স্কুল এখন পরিত্যক্ত। উঠে গেছে বলাই ভালো। ছাত্র আসে না, শিক্ষক নেই। পার্টির অবহেলা এ ঘটনার জন্যে পরোক্ষে দায়ী। ভিয়েতনাম সংক্রান্ত তিন, চারটে সচিত্র ইংরিজি বই দেখে টোংরার ছেলেরা ত্রিশটা ছবি এঁকেছিল। পোড়ামাটি, চুন, কাঠকয়লায় আঁকা সে ছবিগুলো দেখে তাক লেগে গিয়েছিল কিশোরের। প্রতি ছবির সঙ্গে অলচিকিতে মন্তব্য লিখে টোংরায় ভিয়েতনাম প্রদর্শনী হয়েছিল। শালবনে গাছের গুঁড়িতে সারি দিয়ে ঝুলছিল ছবি। ছবি দেখতে ভীড় করেছিল ছেলে, মেয়ে, বুড়োবুড়ি। দূর দূরান্তের গাঁ থেকেও এসেছিল অনেক মানুষ। কয়েকদিন জমজমাট মেলা বসে গিয়েছিল টোংরায়। গরীব মানুষের মুখে মুখে রটে গিয়েছিল ভিত্নাম মেলার খবর। প্রদর্শনীর মূল গায়েন ছিল মগন টুডু। দর্শকদের ছবির বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিল সে।

টোংরার মেলা শেষ হতে চারপাশের গ্রাম থেকে ছবি চেয়ে তাগাদা আসতে লাগলো। নিজেদের গাঁয়ে ভিত্নাম মেলা বসাতে সবাই আগ্রহী। ধান কাটার পর থেকে বাদনা পরব পর্যন্ত আট, দশ গ্রামে ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। সাঁওতাল পরগণার সুদূর গ্রামের আদিবাসীরা জেনে গিয়েছিল হো চি মিনের পরিচয়,

নোগুয়েন ভান ত্রয়ের জীবন, সায়গন, হ্যানয়, মাই লাই-এর নাম। হো চি মিন হয়ে গেল নানা হো, সিধু, কানুর ভাই। দুমকা, ভাগলপুরের পাশেই দেখা গেল হ্যানয়ের সীমানা। ছেলেমেয়েদের মুখে দেশদুনিয়ার খবর দিনরাত শুনে শুনে তাক লেগে গেল বয়স্কদের। আঠারো, বিশ বছরের ছেলেরা, ভাদু, দীনু, কির্তা, বীর সিং, তখন পার্টিতে এসেছিল। এই চারজন আবার হাঁড়িয়া খায় না। মেয়ে ধরা ফাঁদ পাতে না। তাদের অনুসরণ করেছিল এলাকার আরও কিছু তরুণ। চিন্তার পালে লেগেছিল নতুন বাতাস। কিছু করার জন্যে অস্থির হয়েছিল তারা। রবির নেতৃত্বে ফসল দখল অভিযান তখন শুরু হয়েছে। গ্রামে গ্রামে তৈরি হচ্ছে গ্রামগোলা। শিশু, বয়স্কদের স্কুল বসছে। তরুণেরা ঝাঁক বেঁধে দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছিল। তাদের একজন ছিল টোংরার মগন টুডু। সতেরোটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তার শরীর। প্রায় সাতমাস হলো মগন মারা গেছে। ভিয়েতনামের ওপর আঁকা ছবিগুলোও নিরুদ্দেশ। গ্রামে গ্রামে পড়ে আছে গ্রামগোলা আর পাঠশালার ধ্বংসাবশেষ। কিশোরের চোখের সামনেই সব ঘটেছে। সে মুখ খোলেনি। ভুল হচ্ছে জেনেও পার্টির কাজে অন্ধ আনুগত্য দেখিয়েছিল। কেন দেখালো? এ প্রশ্ন করে নিজেই লজ্জা পায় সে। মুখে না বললেও প্রচ্ছন্ন এক স্বার্থ ছিল তার। পার্টির কাছে ষোল আনা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে। এলাকায় নিজের নেতৃত্ব মজবুত করতে চেয়েছিল। সাধারণ মানুষকে এভাবে প্রতারিত করেছে সে। এ এক গুরুতর অপরাধ। ক্ষমার অযোগ্য।

শীতে কাঁপছে সে। স্নানের সময় আরাম লাগলেও এখন মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বন্দুক কাঁধে তুলে পুনাই বলল, তু এ্যাতো ভাবিস ক্যানে? সব ঠিক হঁয়ে যাবেক।

বাবলা বনের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে তিনজন। দুই সঙ্গীর দিকে তাকাতে লজ্জা পাচ্ছে কিশোর। সরল, নিরীহ এই দুই যুবকের চোখের মনিতে সবসময়ে এক প্রশ্ন যেন ঝুলে আছে। তারা বোধহয় টের পেয়েছে, কিশোরের স্বার্থপরতা, বেইমানী। পেয়েছে কি? তার আশঙ্কা যে কোনো মুহূর্তে রবি, বাঘা, ভাদু, পুনাই, যে কেউ হয়তো প্রশ্ন করে বসবে, অনেক আগে থেকে ভুল টের পেয়েও কেন আমাদের বলোনি তুমি? কেন চেপে গেলে?

এ প্রশ্নের জবাব কিশোর দিতে পারবে না। দেবার মতো নৈতিক শক্তি তার নেই। সহযোদ্ধা সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছে সে। নিজেও ঠকে গেছে। তিক্ত আত্মসমীক্ষায় ঝিমঝিম করছে তার মাথা। পার্টি রাজনীতির গলদ গত বছর কলকাতায় গিয়ে বুঝতে পেরেছিল সে। আত্মবিশ্বাসের অভাবে কথাটা কাউকে বলে নি। বরং উল্টো বলেছিল। পার্টি রাজনীতি যে নির্ভুল, নিখাদ বিপ্লবী, প্রচার করেছিল। সে ভেবেছিল, পঁচিশ, ত্রিশ বছরের নানা উত্থান, পতনে অভিজ্ঞ, পোড় খাওয়া নেতারা যে তত্ত্ব হাজির করেছে, তা ভুল হতে পারে না। তাদের রাজনীতি অব্যর্থ, নির্ভুল।

তাঁতলুইতে তিনজন যখন পৌঁছোলো, তখন বেশ রোদ উঠেছে। নিচের

পাড়ায় নিজেদের ঘরে ভাদু, পুনাই, চলে যেতে মাঝের পাড়ায় নরহরির বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। শরীরে রোদ লাগতে শীত কমেছে। নিচের পাড়া থেকে মাঝেরপাড়া যেতে পেরোতে হয় তেকাঁটা, বনকলমির ঝোপে ভরা একফালি পাথুরে জমি। মাঝের পাড়া ছেড়ে ওপর পাড়া। সেখানে বর্ণহিন্দু আর ধনীদের বসতি। একটা সরু লালমাটির পথ তিন পাড়াকে তীরের মতো বিঁধে আছে। মাঝেরপাড়ায় গোবর জলে নিকোনো হচ্ছে দু'তিনটে বাড়ির উঠোন। এক বাড়িতে উঠোনের গর্ত বোজাচ্ছে এক বধু। ফসল তোলার তোড়জোড় চলেছে। সকাল হলেও কাজে লাগেনি গাঁয়ের সবাই। নিস্তব্ধ পাড়া। অবাক হলো কিশোর। তার পেছনে গাঁয়ের তিন, চারজন বালক। তাদের চেনে কিশোর। কিশোরের পেছনে পেছনে নরহরির বাড়ি পর্যন্ত এলো তারা। নরহরির বাড়ি চুপচাপ। সদরে, দাওয়ায় কাউকে না দেখে অবাক হলো কিশোর। তার পাশে দাঁড়িয়ে নরহরির পোষা হলুদ রঙের কুকুরটা লেজ নাড়ছে। উঠোনে এসে কিশোর দেখলো ঝাঁপ তুলে খুপরি ঘর থেকে ছাগল বার করছে আন্না। ছাগল চরাতে মাঠে যাবে সে। তার পাশে নরহরি। মুখ চুন করে কিশোরকে দেখছে তারা। তাদের ফ্যালফেলে চোখের ওপর নজর রেখে কিশোর প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার ? নির্মলা, বাঘা কোথায় ?

ঘরের দিকে আঙুল তুলে নরহরি বলল, নির্মলা ঘুমাচ্ছে। মাকে দেখতে তিলাবুনি গেঁইচে বাঘা।

কথা শেষ করে দু'পা এগিয়ে এসে কিশোরের হাত চেপে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো নরহরি। ক্লান্ত, শরীর, ঝাপসা মাথা কী হয়েছে প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছে না কিশোর। সে দেখলো, মুখে আঁচল চেপে কান্না ঠেকাতে চাইছে আন্না। তার হাত থেকে খসে পড়েছে ছাগলের দড়ি। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছাড়া পাওয়া ছাগল। কিশোর কাঁধে হাত রাখতে ভেজা গলায় নরহরি বলল, পাট্টি থিকে তুকে তাড়ায়ে দেঁইছে উরা।

নরহরির কথা বুঝতে পারলো না কিশোর। নরহরি আবার বলল, আমার বন্দুক, জমা কঁইরে নেইচে।

নরহরির বাড়ির উঠোন, সদরে এসে দাঁড়িয়েছে গাঁয়ের কিছু মানুষ। তাদের বিষণ্ণ মুখ। একটু ধাতস্থ হয়ে নরহরি বলল, তুর আর অজিতের খোঁজে পাট্টির হুকুম নিয়ে ইখানে এঁইচে বরুণ। তার সঙ্গী অমল, কল্যাণ, জিয়ন, ডগর। ইখানের সব বন্দুক তুলে নিয়ে বাহেঙ্গায় গেঁইচে তারা।

ঘন হয়েছে রোদ। কারও মুখে কথা নেই। চাপা কান্না দলা পাকাচ্ছে কিশোরের বুকে। ঠোঁট টিপে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকলো সে। আন্নাকে প্রশ্ন করল, মাধব কোথায় ?

বরুণদের দেখে পালায় গেঁইচে।

আন্নার ভাঁড়ার থেকে একপালি চাল গামছায় বেঁধে বাইরে এলো কিশোর। পুঁইশার কাছে চাল পৌঁছে দিয়ে তারপর যা করার করবে। কিশোর জানে তাঁতলুই গাঁয়ের মানুষ পাঁচিলের মতো ঘিরে আছে তাকে। তার গাঁ ছাড়ার হুকুম, পার্টি

কেন, ঈশ্বর পাঠালেও বরদাস্ত করবে না গ্রামবাসী। চারপাশে দাঁড়ানো চেনা মুখ-গুলোর ওপর এক লহমা নজর ফেলে কিশোর বলল, পুঁইশার ঘরে চাল পৌঁছে বাহেঙ্গায় যাবো। কালই ফিরবো এখানে। আমার জন্যে তোরা ভাবিস না। কাজ করে যা। অবিশ্বাস করিস না পার্টিকে।

দমকা কান্না গলায় উঠে আসছে। চোখ উপচে যে কোনো মুহূর্তে জল পড়বে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছে সে। কাঁদার সময় এখন নয়। সামনে অনেক কাজ। চালের পুঁটলি হাতে নিচের পাড়ার দিকে হাঁটা দিল কিশোর। তার পাশে নরহরি, গাঁয়ের পাঁচ, সাতজন পার্টিকর্মী। নিচের পাড়ায় খবর নিশ্চয় পৌঁছে গেছে। এখনই ভাদু, পুনাই এসে হাজির হবে। পার্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। জেহাদ জানাবে। তাদের শান্ত করার দায়িত্ব কিশোরের। দায়িত্ব সাধ্যমতো পালন করবে সে। পার্টি ভাঙতে দেবে না।

অসাড় হয়ে গেছে কিশোরের মন। পার্টি থেকে বহিষ্কারের আশঙ্কা থাকলেও, তা যে এতো তাড়াতাড়ি ঘটবে, ভাবেনি সে। খিদে, ঘুম, ক্লান্তি উবে গিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যথায় চিনচিন করছে বুক। রাস্তার দুপাশে, বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে বৌ, মেয়েরা তাকে দেখছে। ছলছল করছে সকলের চোখ। তারা যেন জেনে গেছে, এ গাঁয়ে আর ফিরবে না কিশোর। গাঁয়ের মা, বৌ, বোনেদের কারো চোখে সে ভাই, কারো কাছে ঘরের ছেলে। মাথা তুলে তাকাতে পাচ্ছে না সে। ঘাড় হেঁট করে পাড়ার বাইরে মাঠে এসে চোখ তুললো কিশোর। সামনে তরণীপাহাড়। সকালের ঝলমলে আলোয় পাহাড় যেন মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সবুজ দিগন্তরেখা হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যায়। জোরে শ্বাস টানলো সে। লম্বা শ্বাস ফেললো। টলটলে নীল আকাশে চোখ রাখতে সাহস ফিরে পেল। কষ্ট, হতাশা মন থেকে সরে যাচ্ছে। এক নির্ভুল আদর্শের জন্যে লড়াই করছে সে। সঠিক আদর্শ সাময়িক মার খেলেও শেষপর্যন্ত হারে না। ফুরিয়ে যায় না। আজ হারলেও কাল জিতবে সে। বুকে জোর পেল কিশোর। তাঁতলুই-এর মানুষের আকুলতা বাড়তি প্রেরণা দিয়েছে তাকে। গাঁয়ের মানুষের ভালেবাসা পেয়েছে সে। এ ভালোবাসা ফালতু নয়। আকাশ থেকে পড়েনি। আলো, বাতাসের মতো তাঁতলুই-এর জীবনে মিশে গেছে সে। গাঁয়ের মানুষকে চেতনার উঁচু ধাপে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। চেষ্টায় ফাঁকি ছিল না। নিজের বিবেকের কছে কোনো জবাবদিহি করার নেই তার। তবু তাঁতলুই ছেড়ে চলে যাবার কথা ভেবে বেদনায় টনটন করছে বুক। পার্টির নির্দেশ, যেতেই হবে। পেছনে তাকালো কিশোর। নরহরি দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে নরহরির শরীর। হাঁটতে হাঁটতে কিশোর ভাবছে, কোথায় যাবে সে? দায়িত্ব, কাজ মাঝ রাস্তায় ফেলে রেখে চলে গেলে সংগঠনের কী দশা হবে? বরুণ, অমলরা কি সব দিক সামলাতে পারবে? স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে সংগঠন মজবুত করতে উদ্যোগ নিয়েছিল সে। গণফৌজ, গণসংগঠন, গণআন্দোলনের ছক বানাচ্ছিল। অনেকটা এগিয়ে ছিল কাজ। সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। পার্টির সামনে এখন ঘোর দুর্যোগ। সহকর্মীরা অসহায়, বিপন্ন। তাদের পথ দেখাবে কে?

কিন্তু কি করার আছে তার ? গণফৌজ গড়ার জন্যে কি তাকে শাস্তি দিল পার্টি ? গণসংগঠন, গণআন্দোলনের কথা বলার জন্যে কি এই শাস্তি ? তার বিরুদ্ধে পার্টির অভিযোগ কি ? অভিযোগগুলো জানার, জবাব দেবার অধিকার আছে তার। সে সুযোগ কি পাবে না সে ? ব্যক্তি স্বাধীনতা এভাবে ছেঁটে দেওয়া পার্টির গঠনতন্ত্র বিরোধী। পার্টিনেতৃত্ব হঠাৎ এমন একগুঁয়ে, স্বৈরাচারী হলো কেন ? অসংখ্য প্রশ্ন মাথায় গুলতানি করলেও জবাব পেল না কিশোর। ঝাপসা, জটিল হচ্ছে চিন্তা। বরুণের সঙ্গে দেখা না হলে কিছু জানা যাবে না। কিন্তু জেনে কি লাভ ? পার্টি নেতৃত্ব এ মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দেবে না। ব্যাখ্যা এড়িয়ে যাওয়া রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। কোনো কারণ না দেখিয়েই বাতিল হয়েছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা রিজিওনাল্ কমিটি। খারিজ হবার দিন গুনছে নদীয়া জেলা কমিটি। অকারণে বহু কর্মীকে পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। পার্টিতে তুমুল নৈরাজ্য। তবু কিশোরের ক্ষীন আশা, পার্টি তাড়াবে না তাকে। হুঁশিয়ারি দিয়ে নতুন এলাকায় কাজ করতে দেবে। এ শাস্তি মাথা নিচু করে মেনে নিতে সে রাজি। নতুন সংগ্রামের এলাকা গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে নেমে পড়বে। কিন্তু রাজনীতিটা কি ? গলাকাটা, খতম ?

নিচের পাড়ায় পা দেবার আগে পেছনে আবার তাকালো কিশোর। কেউ নেই। নরহরি দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখা যাচ্ছে না তাকে। নিচের পাড়াও থমথমে, নিঝুম। খবর নিশ্চয় এখানে পেঁাছে গেছে। রাস্তায় একটা চেনা মুখ নেই। একপাল বাচ্চা নিয়ে একটা মা মুরগী খুঁটে খুঁটে রাস্তা পরখ করছে। কিশোরের পায়ের সাড়া পেয়ে চটপট রাস্তা খালি করে দিল তারা। রাস্তার দুপাশে সাদা, কালো রঙ করা মাটির দেওয়াল। দোকান থেকে কেনা রঙ নয়। গাঁয়ের মাটি, পাথর গুঁড়িয়ে তৈরি। কোনো বাড়ির দেওয়ালে গাছ, পশুপাখি, ফুল আঁকা। পরিষ্কার রাস্তা, দেওয়াল, বাড়ি। নোংরা, ময়লা নেই। রাস্তার শেষ মাথায় রবির বাড়ির সদরে এসে দাঁড়ালো কিশোর। খোলা দরজা। দরজা পেরিয়ে উঠোনে ঢুকে সে ডাকলো, রবি, রবি ?

উঠোনের মাঝে নিকোনো ঝকঝকে উনুন দেখে কিশোর বুঝলো, অনেকদিন সেটা জ্বলেনি। রবি বাড়িতে নেই জেনেও নিজের আসার খবর দিতে ডাকছে সে। পুঁইশা ঘরে থাকলে তার গলা শুনে বেরিয়ে আসবে। আরও দু'বার ডাকলো সে। কারও সাড়া না পেয়ে দাওয়ার দিকে এগিয়ে গেল। ডান পাশের ছোট ঘরটা খালি। এ ঘরে থাকতো রবির গরমবা। ধামায় মুড়ি, কাঁসার বাটিতে হাঁড়িয়া খেত। খালি বাটি বাজিয়ে গান গাইতো, পান দিলি, সুপারি দিলি, বিড়ি দিলি না।

গরমবা নেই। খাঁ খাঁ করেছে তার ঘর। মাটির তিনটে সিঁড়ি ভেঙে দাওয়ায় উঠলো কিশোর। সামনে হাট করে দরজা খোলা রবির ঘর। মানুষের সাড়া নেই। রবির নাম ধরে কিশোর আবার ডাকতেই ঝকঝকে ধারালো বঁটি হাতে ঘর থেকে পুঁইশা বেরিয়ে এলো। পুঁইশার শরীরে ময়লা, ছেঁড়া কাপড়, দুচোখ ফোলা,

চোখের জমি লাল, রুক্ষ চুলে টানটান খোঁপা। পুঁইশার এরকম ক্ষ্যাপাটে চেহারা আগে দেখেনি কিশোর। এ অবস্থায় কোনো সাঁওতাল মেয়েকেই দেখেনি সে। হাজার অভাব উপোসেও ভেঙে পড়ে না আদিবাসী মেয়ে। পেটে ক্ষিধে চেপে তেলচুকচুকে খোঁপায় গুঁজে রাখে সাকামবাহা ফুল। পুঁইশাকেও তাই দেখেছে। আজ পুঁইশা অন্যরকম। উদ্যত বঁটি হাতে পায়ে পায়ে কিশোরের দিকে এগিয়ে আসছে সে। তার দু'চোখে আগুন! ঘৃণা, রাগে খর দৃষ্টি। চালের পুঁটলি দুহাতে ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। অস্বাভাবিক কঠিন, নিষ্ঠুর পুঁইশার মুখ। কিশোর-কে একটা মোক্ষম কোপ মারতে সে তৈরি। এই বঁটিতে রবিকে একবার শুয়োর কাটতে দেখেছিল কিশোর। পুঁইশার হাতে সেই বঁটি দেখেও এক পা পিছু হটলো না সে। হিসহিসে গলায় পুঁইশা বলল, আমার মরদকে তুই কেড়ে নিয়েছিস। আজ আমি কাটবো তুকে।

নিস্তব্ধ বাড়ি। কাছে কোথাও একটা ঘুঘু ডাকছে। দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাস বুকের মধ্যে ভেঙে পড়ার শব্দ শুনছে কিশোর। অহমিকা, বাঁচার ইচ্ছে শেষ হয়ে গেছে। পেটের মধ্যে পাকিয়ে উঠছে কান্না। তার মনে হলো, তার অসাধুতা, বেইমানী ধরে ফেলেছে পুঁইশা। রাজনৈতিক উচ্চাশায় রবিকে ঘুটি করেছিল সে, পুঁইশা জেনে গেছে। পুঁইশার সুখের সংসার নষ্ট করার শাস্তি তাকে পেতেই হবে। তার রেহাই নেই। রেহাই সে চায় না। তার মৃত্যুতে পুঁইশার সংসারে সুখ, শান্তি ফিরে এলে মরতে অরাজি নয় সে। কাল রাত থেকে মাথায় জমা ক্লান্তি, অবসাদের কুয়াশা হঠাৎ শীতল মেঘ হয়ে গেল। পুঁইশার সামনে এক পা এগিয়ে গেল কিশোর। চালের পুঁটলি দু'হাতে বাড়িয়ে ধরে মাথা নিচু করে সে বলল, পুঁইশা, তুই আমাকে মার। শেষ করে দে আমাকে।

দু'চোখ বুজে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। চোখের জল তার মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে! কাঁদলেও সে এখন নির্ভয়। ভয়ে নয়, মমতায় কাঁদছে। গ্লানি, হাহাকার নেই মনে। চোখ বুজেও দেখতে পাচ্ছে প্রথম শীতের উজ্জ্বল রোদ। শুনছে ঘুঘুর ডাক। বঁটির ঘা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভারি একটা কিছু উঠোনে পড়ার শব্দ শুনে চোখ খুললো কিশোর। উঠোনে পড়ে আছে পুঁইশার আঁশবঁটি। দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে পুঁইশা কাঁদছে। বাঁধভাঙা, প্রবল কান্না! এ কান্নায় সান্ত্বনার ভাষা নেই। থরথর করে কাঁপছে কিশোর। দাঁড়াবার শক্তি নেই তার। দাওয়ার ওপর বসে পড়লো সে। আবছা গলায় বলল, চাল এনেছি।

সাতচল্লিশ

দু'তিনবার বড়োবাবুর তলব পেয়েও থানায় গেল না দিবাকর। অবাধ্যতা, অনিয়মের অভিযোগে চাকরিতে সাসপেন্ড হলো সে। ডিউটি করার শক্তিও তার ছিল না। দেহ অচল। মন বিকল। বাড়ির দাওয়াতে সারাদিন গুম মেরে বসে থাকে। রাতে ঘুমোতে পারে না। ফাঁকা চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চ্যাটাই-এ শুয়ে ছটফট করে। দিন, রাত নাওয়া, খাওয়া ভুলে রাস্তায়, বনবাদাড়ে ছুটে যে সরকারের সেবায় সে বিশ বছর কাটালো, সেই সরকারের বাহিনী তছনছ করেছে তার ভিটে। মেয়েটাকেও রেহাই দেয়নি। মিলিটারি, সি. আর. পি, রাজনগর থানার পুলিশের সঙ্গে ছিল চৌকিদার শুকলাল, প্রাণকৃষ্ণ। তারা দুজন ছাড়াও থানার কনস্টেবলেরা চেনে দিবাকরের ঘর। তবু সর্বনাশ হয়ে গেল তার! অভিমান, বিদ্বেষে সবসময়ে জ্বালা করে দিবাকরের বুক। গ্রামের পাঁচজন মানুষের মতো অসহায় বোধ করে সে। সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো বাড়তি জোর নেই। থানা, পুলিশ, সরকার, কেউ রেয়াৎ করবে না তাকে।

চাকরির আকর্ষন চলে গেছে তার। বরং অন্যরকম বিহ্বলতা জেগেছে মনে। তার লেখা হ্যান্ডনোট্ নিঃশর্তে ফেরৎ দিয়েছে মহাজন পশুপতি কুণ্ডু। ঘটছে আরও নানা ঘটনা। সত্যিমিথ্যে, কানাঘুষো, গুজব মিশে খবরের ঢেউ বইছে। দিবাকরের মনে হয়, সাগরের তলা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠতে চাইছে এক পাহাড়। ভয়ঙ্কর এক খবর কানে এলেও গুজব ভেবে উড়িয়ে দিয়েছে সে। মাধুকে বলেনি। গুজবকে সত্যি ধরে নিয়ে কষ্ট পাবে মাধু। তার চেয়ে চুপচাপ থাকা ভালো। মোতি বেঁচে আছে। সে মরতে পারে না। তবু আতঙ্কে রাতে ঘুম হয় না দিবাকরের।

কিছুক্ষণ উসখুস করে চ্যাটাই-এর ওপর উঠে বসলো দিবাকর। দাওয়ায় চ্যাটাই পেতে শুয়েছে সে। মাঘ মাসে ঘরে ঘুমোয়। নাহ্, ঘুম আর হবে না। হঠাৎ মনে পড়েছে মোতির মুখ। নিমেষের জন্যে স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখতে পেল মোতিকে। থানা ভেঙে ছেলেটা পালিয়ে এলো নাকি? ঘরের ভেতরে মাধু ঘুমাচ্ছে। ঘুমোচ্ছে, না জেগে আছে? হিমেল বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ। মাধুকে ডাকতে গিয়ে চুপ করলো দিবাকর। মেয়েটার ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই। পেছনের রাস্তায় খুটখুট করে হাঁটছে কেউ। শব্দটা ধীরে ধীরে তাঁতিপাড়ার দিকে মিলিয়ে গেল। দিবাকর ঠিক করল, মোতির খবর নেবে কাল। খবর পাওরা কঠিন। তবু চেষ্টা করবে। সামনে অন্ধকার পৃথিবী। সংসার, চাকরি, সামান্য সুখসুবিধের জন্যে এতোদিন হ্যাংলামি করার কথা ভেবে লজ্জা পেল দিবাকর।

ঘরের দক্ষিনের বাতায় টুকটুক করে টোকা দিচ্ছে কেউ। শব্দ শুনে সজাগ হলো দিবাকর। কে এলো? চ্যাটাই ছেড়ে সে ওঠার আগেই দরজা খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মাধু। ধক করে উঠলো দিবাকরের বুক। দাওয়া থেকে নেমে ডাইনে গেল মাধু। চাপা গলায় দু'তিনজন কথা বলছে। দিবাকর আর শুয়ে থাকতে পারলো না। ফিসফিস করে একজন বলল, থলিটা সাবধানে রেখো।

একঝলক ঠান্ডা বাতাস লাগলো দিবাকরের মাথায়। পা টিপে দাওয়া থেকে নেমে দক্ষিনে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে চমকে গেল তাঁতিপাড়ার ভোলা, শ্রীধর, পটল। তিনজনই তরুণ, আঠারো বিশের মধ্যে তাদের বয়স। দিবাকরকে দেখে গা ঢাকা দিতে চাইছে তারা। পালানো এখন বিপদ। হল্লা তুলে চৌকিদার পাড়া জাগালে আর এক গোলমাল পাকিয়ে উঠতে পারে। কিছু ঘটার আগে চৌকিদারকে মেরে দেওয়া যায়। ভোজালি বার করল শ্রীধর। দিবাকরের ভ্রূক্ষেপ নেই। মাধুকে বলল, থলিটা দে। ঘরের চালে তুলে রাখি।

মাধু অবাক। তার হাত থেকে থলি নিয়ে বাড়ির উঠোনে এলো দিবাকর। উঠোনে শোয়ানো মই লাগালো ঘরের চালে। তারপর পাকা ঘরামির মতো মই বেয়ে উঠে গেল। চালের খড় ফাঁক করে গুঁজে দিল থলি। নিপুন হাতে খড় সাজিয়ে যখন সে নেমে এলো, অন্ধকারেও বোঝা গেল, কাজে গলদ নেই তার। দিবাকরের কান্ড দেখে শ্রীধর, ভোলা, পটল অবাক। মইটা ঠিক জায়গায় শুয়ে রাখার সময়ে দিবাকর শুনলো, শ্রীধর বলছে, কাকা একদম বদলে গেঁইচে।

মই রেখে তিন তরুণের সামনে এসে নিচু গলায় দিবাকর বলল, খুব সাবধান! আঁধারেরও চোখ আছে।

দিবাকরকে পাশে পেয়ে শ্রীধর, ভোলা, পটল বেজায় খুশি। অন্ধকারে মেয়ের জ্বলজ্বলে দু'চোখ দেখতে পেল দিবাকর। তাকে পাশে পেয়ে বেড়ে গেছে তিন তরুণের আত্মবিশ্বাস। পৃথিবীতে কিছুই যে অসম্ভব নয়, বুঝতে পারছে তারা। মাধুরও মনে হচ্ছে, আনকোরা নতুন এক বাবাকে দেখছে। ভীষণ ভালো লাগছে তার। দিবাকর ভাবছে অন্যকথা। সাতদিন আগের চরম লাঞ্ছনা, অপমান ঝেড়ে ফেলে কীভাবে এতো তাড়াতাড়ি মাধু সতেজ, স্বাভাবিক হলো, ধরতে পেরেছে দিবাকর। উৎসাহ, উদ্দীপনায় ভরপুর এই ছেলেগুলোর সাহচর্যেই মেয়েটার নিরাময় হয়েছে। বাঁচার ভরসা পেয়েছে সে। অসম্ভব তৃপ্তি পেল দিবাকর। মাধুর কাঁধে হাত রেখে সে বলল, ডর বাসিস না। ডরের কোনো ঠাঁই নাই।

বাবার মুখের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে ঘরে ঢুকলো মাধু। পটলকে দিবাকর বলল, রাতটা এ দাওয়ায় ঘুমিয়ে তুরা কাটিয়ে দে। ভোর ভোর চ'ইলে যাস।

দিবাকবের দিকে তাকিয়ে আছে তিন তরুণ। ঘর থেকে চ্যাটাই, বালিশ দাওয়ায় এনে তিনজনকে দিবাকর বলল, শুয়ে যা।

সকাল হতে দেরী নেই। অন্ধকার ঘরে ঢুকে মেঝেতে শুয়ে পড়লো দিবাকর।

চারপাইতে শরীর বিছিয়ে দিয়েছে মাধু। কিছু বলার জন্যে উসখুস করছে সে। দিবাকরেরও ঘুম নেই। সে কিছু বলতে চায়। কীভাবে শুরু করবে, ভেবে পাচ্ছে না। কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে দিবাকর বলল, মোতির একটা খোঁজ করতে হবেক।

তার কথা শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলো মাধু। অন্ধকারে মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে না দিবাকর। বোকার মতো মাধুর দিকে তাকিয়ে আছে সে। মাধু নিস্তব্ধ, কথা বলছে না। দিবাকর আবার বলল, একবার মোতির খবর নিতে হবে বটে।

শান্ত গলায় মাধু বলল, মোতিদা নেই। পুলিশ হাজতে সে খুন হ'ইয়ে গেছে।

খবর শুনে কেঁপে উঠলো দিবাকর।

আটচল্লিশ

শাল, শিয়াশোল, কেঁদু, বহেড়ার জঙ্গল ভেদ করে হাঁটা পথ। ঘন জঙ্গল। মাঝ-দুপুরেও জঙ্গলে আলো নেই। থিকথিকে অন্ধকার। বাঘা, নরহরিকে নিয়ে বাহেঙ্গায় যাচ্ছে কিশোর। বুরুং, কির্তা, বীরসিং, সুন্নোমাঝি বাহেঙ্গার জঙ্গলে অপেক্ষা করবে। অসুস্থ মাকে দেখে একঘণ্টা আগে তাঁতলুই এসেছে বাঘা। তার একটু পরেই মাঝের পাড়া থেকে হাজির হয়েছে নরহরি। কিশোরকে ছাড়তে রাজি নয় সে। পুঁইশার বাড়ি থেকে বেরোতে সামান্য দেরী হয়েছে কিশোরের। পাঁচ, সাত মিনিট কান্নাকাটি করে শান্ত হয়েছিল পুঁইশা। লজ্জায় কিশোরের দিকে তাকাতে পারছিল না সে। তারপর চুলো জেলে ভাত বসালো। কিশোরকে খেয়ে যেতে আবদার করল। পুঁইশার অনুরোধ এড়াতে পারেনি সে। একথালা গরম ভাতের সঙ্গে কুচড়োর তেলে মাখা মেটে আলুভাতে, শুকনো লঙ্কা দিয়ে পেটভরে খেয়ে কেটে গেল তার শরীরের ক্লান্তি, দুর্বলতা। ঘুমে বুজে আসছিল চোখের পাতা। ঘুমোবার সময় নেই। মুখ, চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঘুম তাড়িয়েছিল। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বাহেঙ্গায় পেঁছোতে হবে। বরুণের মুখে পার্টিসিদ্ধান্ত শুনে বাহেঙ্গায় হয়তো হৈচৈ শুরু হয়েছে। দাঙ্গা বেঁধে গেলেও অবাক হবার কিছু নেই। অজিতের মাথা গরম। তার অনুগামীরাও তাই। কিশোর ছাড়া আর কেউ সামলাতে পারবে না এ পরিস্থিতি।

নিচের পাড়া খালি করে প্রায় সবাই জঙ্গল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে কিশোরকে। থমথমে, গম্ভীর তাদের মুখ। কষ্টে ফেটে যাচ্ছে বুক। যে কোনো মুহূর্তে কেঁদে ফেলতো তারা। ঘরে ফেরার পথে হয়তো কেঁদেছে কেউ কেউ। কিশোরের বুকেও থমকে ছিল কান্না। কিশোর, ভাদু, বাঘা, নরহরি চুপচাপ হাঁটছে। এ পথেই আসছিল কির্তা, বীরসিং, সুন্নোমাঝি। টোংরা ছুঁয়ে সঙ্গীদের নিয়ে বরুণ বাহেঙ্গায় যাবার পথে তাদের সঙ্গে এই জঙ্গলে কির্তা, বীরসিং, সুন্নোর দেখা হয়েছে। বরুণের মুখে পার্টি সিদ্ধান্ত শুনে তাঁতলুই আসছিল তিনজন। বাহেঙ্গার জঙ্গলে ঢোকার আগেই তাই দেখা হলো। কিশোর, বাঘা, ভাদু, নরহরিকে দেখে আবেগে বেসামাল হলো কির্তা। কিশোরের একটা হাত চেপে ধরে কির্তা বলল, কমোরেট, তু হুকুম দে। বরুণের বুকে গুল্লি ফুটিয়ে দি। ও বহুৎ শয়তান বটেক।

রাগে ঠকঠক করে কাঁপছে বীরসিং। কথা বলার শক্তি নেই তার। দু'চোখ জ্বলছে। কির্তা, বীরসিং দু'জনের কাঁধে ঝুলছে বন্দুক। তারা বন্দুক দেয়নি বরুণকে। কির্তার মুঠো থেকে আলতো করে হাত টেনে নিয়ে নরম গলায় কিশোর বলল, ক্ষেপে গেলি নাকি তোরা? বরুণ আমাদের কমরেড, পার্টির নেতা। পার্টিকে

ভুল বুঝিস না।

গুম হয়ে গেল কির্তা। লম্বা শ্বাস ফেললো বীরসিং। কিশোরের কথায় বাঘা সায় দিল।

বরুণ কোথায় ?

কিশোরের প্রশ্নে বীরসিং বলল, বাঁশকুলি হ‘ইয়ে বাহেঙ্গায় যাবেক সে।

এক মুহূর্ত ভেবে বীরসিং, কির্তাকে কিশোর বলল, তোরা এখন ঘরে যা। ঘুমো। পার্টির ডাক না পেলে এলাকা ছেড়ে কোথাও যাস না। সাবধানে থাকিস।

কির্তার গোঁ কিশোরের সঙ্গে বাহেঙ্গায় যাবে সে। বীরসিংও ঘরে ফিরতে নারাজ। কিশোরের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল তারা। যাবার আগে কেঁদে আকুল কির্তা। তার পিঠে হাত রেখে কিশোর হাসলো। বলল, বন্দুকগুলো যত্নে রাখিস।

কিশোরের অনুমান বাহেঙ্গা এখন গরম। দুই বন্দুকধারী সেখানে গেলে ঝামেলা হবে। জঙ্গল ছেড়ে ফাঁকা জমিতে সঙ্গীদের নিয়ে কিশোর যখন হাজির হলো, বেলা পড়ে এসেছে। ছায়া জমছে তরণীপাহাড়ের বুকে। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে নরহরি বিড়বিড় করল, শয়তান পিছা ক‘ইরছে।

কিশোর হাসলো। উদ্বেগ, ক্লান্তিতে বাঘার মুখ পাঁশুটে। ভাদু চুপ। কিছু ভাবছে। তার চোখে পার্টি মানে কিশোর আর অজিত। তারা চলে গেলে লড়াই চালাবে কে ? কে দাঁড়াবে এলাকার মানুষের পাশে ?

বাঘার ভাবনাও তাই। তার মনে হলো বাবু, মুরুব্বিরা যে কথা বলতো, লড়াই-ফড়াই গরীব মানুষদের জন্যে নয়, কথাগুলো ঠিক। সে এখন কীভাবে তিলাবুনি ফিরবে ? ফিরে করবে কী ? রুগ্ন মা, যে কোনদিন মরে যাবে। পুলিশ খুঁজেছে তাকে। তাছাড়া আছে রক্ষীবাহিনীর জুলুম। নির্মলাকে নিয়ে তিলাবুনি ছেড়ে পালাতে হবে। এই প্রথম বাঘার মনে হলো, বুড়ি মা তাড়াতাড়ি মরলে বেঁচে যায় সে।

বাঁশকুলির রাস্তায় জঙ্গলের ধারে মাদারপুরের দু’জন চাষীর সঙ্গে দেখা হলো। সুন্নোর পরিচিত তারা। তাদের একজন বলল, গণফৌজ চলে যাবার ঘন্টাখানেক পরে মাদারপুরে ঢুকলো বিরাট পুলিশবাহিনী। প্রতিরোধবাহিনীর সঙ্গে মিলে তারা তছনছ করেছে গাঁয়ের গরীব মানুষের ঘরবাড়ি। সবচেয়ে বেশি তান্ডব করেছে মাঝিপাড়ায়। সুন্নো এবং আরও চারজনের ভিটে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। ভাগলপুর, দুমকার দিকে গাঁয়ের অনেকে পালিয়েছে। বাঁশকুলির জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তারা দু’জন। আরও কেউ কেউ আছে।

মাদারপুরের এই দু’জন মানুষ পার্টিদরদী। তাদের একজন কিশোরকে বলল, আমাদের গাঁয়ে ফৌজ নিয়ে যেতে হবে তুকে।

সন্ধ্যের আবছা আলোয় ঝাপসা হয়ে আসছে জঙ্গল। লোকটার অনুরোধ শুনে কিশোর চুপ। সুন্নো কথা বলছে না। নিরক্ষর, গরীব হলেও মাদারপুরের দু’জন

মানুষ বোকা নয়। সবাই চুপচাপ দেখে সুন্নোকে দ্বিতীয় মানুষটা প্রশ্ন করল, বেপার কি বটেক ?

কিছু বলতে গিয়ে সুন্নোর গলা বুজে এলো। আধচেনা লোকটার কাঁধে হাত রেখে কিশোর বলল, নিশ্চয় যাবো মাদারপুরে। আজ নয়, দু'চারদিন পরে।

কথা বলতে কিশোরের কষ্ট হচ্ছে। এখনও তার বিশ্বাস, তাকে তাড়াবে না পার্টি। মাদারপুরে যাবার সুযোগ পাবে সে।

সিধ নদী পেরোতে লুঙি ভিজে গেল। শীত লাগছে কিশোরের। উত্তরে হাওয়ায় ভিজে লুঙি কোমরে, পায়ে সেঁটে যাচ্ছে। গ্রামের পেছনের রাস্তা ধরে চারজন সঙ্গী নিয়ে বাহেঙ্গায় ঢুকলো কিশোর। এ পথে মানুষের যাতায়াত কম। পথের দু'পাশে তেকাঁটার ঝোপ, দু'একটা তেঁতুল আর ঘুনির্গাছ। ঘরে ফেরা পাখিদের ডাকাডাকি বুঝিয়ে দেয়, দিন শেষ। কিষ্টো মালের ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে তার মেয়ে, বৌ। কিশোর আর তার সঙ্গীদের অবাক চোখে দেখছে তারা। পাঁচজনকে একসঙ্গে দেখে চিল্লে পাড়া সরগরম করছে দুটো কুকুর। বাহেঙ্গার মতো ফুর্তিবাজ গাঁ নীরব, নিঝুম। ফসল ওঠার আগে সব সাঁওতাল গ্রামই একটু ঝিমিয়ে পড়ে। কেরোসিনের অভাবে কোথাও একটা টেমি জ্বলে না। ভর সন্ধ্যেতে মনে হয় মাঝরাত। কিন্তু বাহেঙ্গার একটা আলাদা চরিত্র আছে। অভাবের দিনেও নাচ, গান, হল্লা লেগে থাকে এখানে। অজিত আসার পরে গ্রামে হুজুগ, হল্লা যেন আরও বেড়েছে। রাজনীতি ছড়াতে না পারলেও বাহেঙ্গার মানুষের প্রাণশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে অজিত। উৎসব, মেলা বসাবার ফিকির বার করতে জুড়ি নেই তার। সে ফিকিরে মিশে থাকে আদিবাসী জীবনের ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন। অজিত নিজেও জানে না যে, আদিবাসী হয়ে গেছে সে। কিশোর বুঝতে পারে। রাজনীতির সঙ্গে আরও নানা উপাদান মিশে যে মানুষের চরিত্র তৈরি হয়, এ বিষয়ে কিশোরের সন্দেহ নেই। সন্দেহ যেটুকু ছিল, অজিতকে দেখে ঘুচে গেছে। অরাজনৈতিক এই সব উপাদান মানবিক, বাস্তব। মানবিক বলেই বোধহয় সাধারণ বাস্তবের চেয়ে বেশি বাস্তব। গাঁয়ের মাঝখানে পুনাই-এর সঙ্গে দেখা হলো কিশোরের। পুনাই-এর মুখে ভয়, হতাশা। কিশোর প্রশ্ন করল, অজিত কোথায় ?

বুধনদের বাড়ির দিকে আঙুল তুলে চাপা গলায় পুনাই বলল, বরুণ এঁইচে। সব বন্দুক জমা করার হুকুম হঁইচে।

নরহরি বিড়বিড় করে কী বলল, শুনতে পেল না কিশোর। বুধনদের বাড়ির সদরে একটা জটলা। ভিড় করে আছে কিছু মানুষ। জটলার কাছে চার সঙ্গী নিয়ে কিশোর আসতে সামান্য দূরত্ব রেখে তাদের ঘিরে ধরলো পাঁচ, ছ'জন বন্দুক-ধারী অচেনা ছেলে। এক লহমা তাদের দেখেও আমল দিল না কিশোর। আবছা অন্ধকারে ঘোলাটে দেখাচ্ছে গাঁয়ের কুলি। বুধনদের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কিশোর দেখলো, উঠোনে একটা চারপাই-এর ওপর অজিত, বরুণ পাশাপাশি বসে আছে। তাদের পেছনে অমল, কল্যান, জিয়ন। তিনজনের হাতেই বন্দুক। তিনটে বন্দুকই ঝকঝকে, পরিষ্কার। দখল করা বন্দুক বরুণ কাজে লাগিয়েছে দেখে খুশি হলো

কিশোর। তাকে দেখে চারপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বরুণ বলল, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। একটা জরুরী নির্দেশ পাঠিয়েছে পার্টি।

হাতে লেখা এক টুকরো কাগজ কিশোরকে ধরিয়ে দিল বরুণ। পাঁচ লাইনের পার্টি সার্কুলার। কিশোর, অজিতকে এলাকা ছেড়ে এখনই চলে যাবার হুকুম দিয়েছে পার্টি। পার্টির পরবর্তী নির্দেশের জন্যে কলকাতায় অপেক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দু'জনকে।

রিজিওনাল কমিটির সম্পাদকের হিজিবিজি সই করা কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিশোর। এ সই তার চেনা। সার্কুলারটা জাল নয়। কিন্তু এলাকা থেকে কেন তাদের সরানো হচ্ছে, পার্টি ' চিঠিতে উল্লেখ নেই। কিশোরের মাথা ঘুরছে। হাত কাঁপছে। চারপাই-এ বসে বিকারহীন অজিত বিড়ি টানছে। ধীর, শান্ত সে। পার্টি চিঠি, বহিষ্কার, কিছু স্পর্শ করেনি তাকে। অজিতকে নিয়ে দুশ্চিন্তার জন্যে কিশোর নিজেই লজ্জা পেল। উঠোনে, সদরে গুলতানি করছে কিছু মানুষ। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখ যাচ্ছে না কাউকে। চাপা, থমথমে পরিবেশ।

রবি কোথায় ?

কিশোরের প্রশ্নে অজিত বলল, বৃন্দাবনী হয়ে রাজনগরের দিকে গেছে।

কবে ফিরবে ?

দু'তিনদিনের মধ্যে।

একমুহূর্ত থেমে অজিত আবার বলল, কাল বিকেল পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলাম আমরা।

বরুণের মুখে উদ্বেগ। মাটিতে বন্দুকের কুঁদো ঘসছে কল্যান।

সত্যি কি এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে আমাদের ?

কিশোরের মুখ থেকে আচমকা প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো। কথাটা শুনেছে অনেকে। জটলার মানুষেরা নড়ে উঠলো। কিশোরের দিকে তাকালো অজিত। মাথা নিচু করে বরুণ বলল, পার্টির নির্দেশ। কিছু করার নেই।

ছড়ানো জটলা মিলেমিশে একাকার। টানটান উত্তেজনায় অজিত, কিশোরের মুখের একটা কথা শোনার অপেক্ষা করছে। একটা টেমি ঘর থেকে জেবলে আনলো কেউ। ঝিরঝির হাওয়ায় কাঁপছে টেমির হলুদ শিখা। চারপাই-এর সামনে দাওয়ার ওপরে বসেছে কিশোর। টেমির আলোয় উঠোনে পড়েছে তার কিম্ভূত ছায়া। পাশে বসেছে মাধব। কিশোরের কানের পাশে মুখ এনে ফিসফিস করে মাধব বলল, তুরা যাস না।

তার চাপা গলার কথা শুনতে পেল অনেকে। কটমট করে মাধবকে দেখছে কল্যাণ। মাধবও জোরে বেঁধে নিল কোমরের কসি। অবস্থা বেগতিক টের পেয়ে কিশোর বলল, ঠিক আছে। এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা। পার্টির কাছে শুধু একটা অনুরোধ, তরণীপাহাড়ের ওপাশে শাকবাড়ি, মহিষবাথান এলাকায় কাজের

সুযোগ দেওয়া হোক আমাদের।

পার্টিতে আলোচনা করবো, বরুণ বলল, কলকাতায় গিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে তোমরাও কথা বলতে পারো।

কিশোর বুঝলো, তরণীপাহাড়ের চারপাশে, কোথাও আপাতত তাদের থাকার উপায় নেই। কলকাতায় ফিরতেই হবে। মেঘনা, উজানী দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে লালমুনিকে মনে পড়লো কিশোরের। লালমুনি কোথায়? অজিত চলে গেলে লালমুনির কী হবে? বরুণের সঙ্গে এলেও উঠোনের এক পাশে বন্দুক কোলে বসে আছে ডগর। বিপন্ন মুখ। কিশোরের দিকে তাকাতে পারছে না। দাওয়া ছেড়ে কিশোর উঠোনে এসে দাঁড়াতে কল্যাণ বলল, তোমাদের বন্দুক-গুলো পার্টির হাতে জমা করে দিতে হবে।

অজিতের পায়ের কাছে রয়েছে তার বন্দুক। কিশোরের বন্দুক দাওয়ার ওপর। বরুণকে কিশোর বলল, অজিত আর আমার বন্দুক এখানে আছে। বাকী বন্দুকের হিসেব রবি এসে বুঝিয়ে দেবে।

বরুণ বলল, ঠিক আছে।

অজিতকে কিশোর বলল, চল, এখনই রওনা হয়ে যাই। রাত শেষ হবার আগে পাহাড় টপকে মশানজোড়ে পৌঁছে যাবো। তারপর কলকাতা।

মেয়েলি গলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কিশোর দেখলো, মেঘনা কাঁদছে। কান্না সংক্রামক। আঁচলে মুখ ঢাকলো উজানী। কান্না ঢাকার চেষ্টা করল না কেউ কেউ। কারও দিকে তাকাচ্ছে না কিশোর। বরুণের পাশে খাটিয়ায় বসা অজিতের কাঁধে হাত রেখে কিশোর বলল, চল্।

উঠে দাঁড়ালো অজিত। কিশোর, অজিত যে এতো সহজে, বিনা উপদ্রবে চলে যাবে, বরুণ ভাবতে পারেনি। খাটিয়া ছেড়ে কিশোরের সামনে এসে বরুণ বলল, ভুল বুঝো না আমাকে। আমি শুধু পার্টির হুকুম তামিল করছি। তোমরা এখানে আবার ফিরে এলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবো আমি।

কিশোর কথা বলল না। বরুণ বলল, আমার বিশ্বাস কলকাতায় সূর্যদার সঙ্গে তোমরা কথা বললে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে।

টেমির আবছা আলোয় কিশোর দেখছে, এলাকার মানুষের মুখে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ। উঁচু গলায় সকলকে শুনিয়ে কিশোর বলল, কোনো ডর নাই তুদের। পার্টি আছে। পার্টি থাকবে। পার্টির কথা শুনবি। আবার ফিরে আসবো আমরা।

কান্না ভেজা শীতল বাতাস বইছে। কিশোরের কথায় শীতলতর হলো বাতাস। অজিতের হাত ধরে কুলিতে এসে দাঁড়ালো কিশোর। বাড়ির বাইরে আসার আগে উঠোনের পাশে মুরগির ঘরের মাথা থেকে কিছু একটা বার করে নিয়েছিল অজিত। রাস্তায় এসে কিশোর দেখলো, অজিতের হাতে রঙওঠা, মলিন হোমিওপ্যাথি

ওষুধের সেই চেনা বাক্স। হালচাল দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে মাধব। চাপা গলায় কিশোরকে সে প্রশ্ন করল, গণফৌজে যে আমি নাম লিখাতে এঁইচিন্। এখন কী হবেক ?

রবির সঙ্গে কথা ব'লো।

কিশোরের জবাবে মাধব বিড়বিড় করে বলল, আমার আর ভরসা নাই। পার্ট্টি ইবার উঠে যাবেক।

পার্টি উঠবে না।

মাধবের কাঁধে হাত রেখে আশ্বাস দিল কিশোর। কিশোর, অজিতের সঙ্গে পা মিলিয়ে রাস্তায় হাঁটছে গাঁয়ের মানুষ। মেয়ে, পুরুষ, বুড়ো, বাচ্চা, ভেঙে পড়েছে গ্রাম। চাপা গলায় কেউ ফোঁপাচ্ছে। শব্দ করে কাঁদছে অনেকে। অন্ধকার রাস্তা ফুঁড়ে সামনে উঠে দাঁড়ালো বুধনের বাবা বসনমাঝি। শক্ত করে কিশোরের হাত ধরে বসন বলল, যেতে দিব না তুদের। আমার বেটা না ফিরা তক তুদের যেতে দিব না। তুরাও তো আমার বেটা। তুরা চ'ইলে গেলে।

কান্নায় বুজে গেল বসনমাঝির গলা। কথা শেষ করতে পারলো না সে।

আমরা ফিরে আসবো।

কিশোরের গলায় এমন কিছু ছিল, শুনে অন্ধকারে সরে গেল বসন। পেছনে, পাশে পায়ের শব্দ, কান্নার আওয়াজ। কুলিমুড়োয় এসে দাঁড়ালো কিশোর। বাহেঙ্গা গ্রাম এখানে শেষ। সামনে মাঠ, পাথুরে জমি, টুকরো ধানক্ষেত, শালবন, গাঁয়ের মানুষের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, তুরা ঘরকে যা। আবার ফিরে আসবো আমরা।

কিশোর, অজিতকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাঘা, ভাদু, নরহরি, পুনাই, মাধব। বাঘার কাঁধে হাত রেখে কিশোর বলল, পার্টিকে ছেড়ে যাবি না। কলকাতা থেকে ফিরে যেন দেখতে পাই তোদের।

রাতটা গাঁয়ে থেকে যা, পুনাই বলল, কাল সকালে যাবি।

পুনাই-এর কথায় সায় দিল নরহরি। কিশোর বলল, নাহ্, রাতে যাওয়াই ভালো। আপদ, বিপদ কম। জলদি কলকাতায় পৌঁছোলে জলদি ফিরে আসবো।

কুলিমুড়ো ছেড়ে আলপথ ধরলো কিশোর। পেছনে অজিত। দুজনের কেউ পেছনে তাকাচ্ছে না। তাকাবার সাহস নেই। এক, দেড় ঘণ্টা একটা কথা বলে নি অজিত। বুঁদ হয়ে কিছু ভাবছে। গোপন কোনো ফন্দি আছে তার। দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখ উদাসীন, বেপরোয়া। পার্টিরাজনীতির কুটকচালি স্রোতে গা ডুবিয়ে থেকেও রাজহাঁসের মতো নির্লিপ্ত সে। ডাকাবুকো, গোঁয়ার অজিত কী জাদুতে এতোটা বদলে গেল, ঠাহর পায় না কিশোর। তাদের সবার আগে কি ডিক্লাস্‌ড্ হলো অজিত ? শ্রেণীপরিচয় ছিন্ন করে সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরবের উত্তরাধিকার পেল ?

অজিতের মুখে কথা ফোটাতেই কিশোর বলল, এলাকা ছেড়ে আমাদের চলে

আসার সিদ্ধান্তে ভুল নেই। সঠিক কাজ করেছি আমরা। পার্টির নির্দেশ সহজেই অগ্রাহ্য করতে পারতাম। তাহলে রক্তারক্তি হতো। এই দুর্যোগে ঘরোয়া যুদ্ধ! নাহ্, ঠিক করেছি আমরা।

অজিত চুপ। কিশোরের কথা যেন কানে ঢুকছে না তার। দু'জনের সঙ্গে সমান তালে মাথার ওপরে আকাশে হেঁটে চলেছে একঝাঁক তারা। ডান পাশে ধান ক্ষেতে খরখর হেঁটে গেল এক জীব। চিতি বা খড়িশ সাপ। গর্ত ছেড়ে দল বেঁধে এখন এদের বেরোবার সময়।

আমি জানি, পার্টি বুঝবে আমাদের, কিশোর বলল, এলাকার সঠিক রিপোর্ট পার্টি পায় নি। এখানে আবার ফিরে আসবো আমরা।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়ালো কিশোর। অজিতও দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে একজন মানুষ। আরও কাছে আসতে মাধবকে চিনতে পারলো কিশোর। দু'হাতে কিশোরের ডান হাত চেপে ধরে মাধব বলল, উদের সঙ্গে থাকতে ডর লাগছে আমার। তাই তুদের পিছাঁ করেছি। আমাকে তুরা সঙ্গে নে। আমি যাবো তুদের সঙ্গে।

কোথায় যাবি ?

কিশোরের প্রশ্নে মাধব বলল, সিউড়ি।

অজিত বলল, চল্।

মাদারপুরের পেছন দিয়ে টোংরা ছুঁয়ে বৃন্দাবনীর কাছে তিনজন যখন পৌঁছোলো, তখন মাঝরাত। অন্ধকার, নিঝুম পৃথিবী। হাতের পাতার মতো চেনা পথ। ভুল হবে না। মাধব আসার পর কথা বলতে শুরু করেছে অজিত। তার মুখে রবির বিশদ খবর শুনলো কিশোর। গণফৌজের কাজে জান লড়িয়ে দিয়েছে রবি। সাঁওতাল গাঁয়ে, যেখানে রবি যাচ্ছে, তাকে ঘিরে ধরছে গ্রামবাসী। তার কথা শুনে তোলপাড় হচ্ছে আদিবাসী সম্প্রদায়। তিনদিন আগে, রানীশ্বরের কাছে রবিকে পাকড়াও করেছিল প্রতিরোধবাহিনীর কিছু লোক। খবর রটে যেতে আশপাশের গাঁ উজাড় করে তীরধনুক, বল্লম, টাঙ্গি হাতে হাজার দুই, তিন মানুষ ঘিরে ধরেছিল প্রতিরোধবাহিনীকে। রবিকে মাঝ মাঠে ফেলে পালিয়েছিল প্রতিরোধ-বাহিনীর লোকেরা।

সিধ নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকলো তিনজন। তরণী পাহাড় পর্যন্ত চলে গেছে জঙ্গল। জমাট অন্ধকারে জোনাকি উড়ছে। আমেদপুর থানার বন্দুক লুঠের পর থেকে নরহরির সম্বন্ধী মাধবের সঙ্গে পার্টির ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। যোগাযোগ রাখছিল কিশোর। মাধবকে টেনে এনেছিল পার্টির কাছে। পুলিশের চাকরি ছেড়ে পার্টিতে যোগ দেবার চিন্তা মাধবের মাথায় ছিল। গণফৌজ তৈরির খবর পেয়ে তাই দেরি করেনি সে। সিউড়ি থেকে তাঁতলুই চলে এসেছিল। তাঁতলুইতে তিনদিন থেকে হাওয়া খারাপ, বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। তবু অজিত, রবির সঙ্গে দেখা করতে বাহেঙ্গায় গিয়েছিল সে। বন্দুক ছিনতাই-এর পর চাকরি না গেলেও

সাসপেন্ড হয়ে আছে মাধব। সে একা নয়। থানার মেজবাবু এবং আরও পাঁচজন কনস্টেবলও সাসপেন্ড। সে হুকুম আজও ওঠেনি। বাড়ি বসে মাস মাইনের অর্ধেক পাচ্ছে মাধব। ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এরকম চলবে। তদন্ত রিপোর্ট তৈরি। যে কোনদিন বেরোবে। মাধব শুনেছে, রিপোর্টে নির্দোষ বলা হয়েছে তাকে। সুতরাং চাকরি যাবে না। চাকরি গেলেও ভয় পেত না সে। চাকরির মায়া ছেড়েই তাঁতলুই এসেছিল। স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা নিয়ে এখন সিউড়ি ফিরছে।

আকাশে চাঁদ উঠতে ফিকে হয়েছে অন্ধকার। পেছনে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মিশে গেছে তাঁতলুই, বাহেঙ্গা, মাদারপুর, বাঁশকুলি। সামনেও অন্ধকার। চাঁদের আলো অল্প ছড়িয়ে আছে। তিন, চার হাত দূরে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে গেল কিশোর। মেয়ে মনে হচ্ছে। সে কিছু বোঝার আগেই মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়লো অজিতের বুকে। দু'হাতে অজিতকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে সেই মেয়ে। লালমুনিকে চিনতে কিশোর ভুল করল না। লালমুনির কান্ড দেখে সামান্য সরে গেছে মাধব। লালমুনিকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অজিত। কয়েক হাত এগিয়ে অপেক্ষা করছে কিশোর। লালমুনিকে শান্ত করে একটা বিড়ি ধরালো অজিত। বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে অজিত বলল, কলকাতায় যাওয়া হবে না আমার।

অজিতকে মাধব বলল, কলকাতায় তুমার যাবার দরকার নাই। সিউড়িতে আমার বাসায় থাকো তুমি।

কিশোর বলল, তা হয় না। কলকাতায় না ফিরে অজিত এখানে থেকে গেলে পার্টিতে ভুল বোঝাবুঝি বাড়বে। সেটা ঠিক নয়।

অজিতের মুঠোর মধ্যে ধিকধিক করে জ্বলছে বিড়ির আগুন। বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে অজিত বলল, আমার সন্তানের মা হতে চলেছে লালমুনি। তাকে ফেলে কীভাবে যাবো ? আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

অজিতের কথায় আঁতকে উঠেছে কিশোর। মাধবও হতবাক। অজিতের চাঞ্চল্য নেই। কিশোরের দুকাঁধে দু'হাত রেখে অজিত বলল, পাহাড়ের ওপর গণফৌজের সদর দপ্তর। লালমুনিকে নিয়ে সেখানে থাকবো আমি। আমার জন্যে তুই ভাবিস নি।

কিশোরের মুখে কথা নেই। তার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে অজিত বলল, ভুল বুঝিস না আমাকে। যা করেছি, জেনেশুনে করেছি। পাপ নেই কোথাও। সাঁওতাল সমাজ পাপী ভাববে না আমাকে।

অজিতের কথা ঠিক। এ ঘটনায় অজিতকে সাঁওতালরা অপরাধী না ভাবলেও পার্টিতে অপবাদ রটবে। কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। অজিতের সঙ্গে কিশোরকেও জড়ানো হবে। আবার হাঁটতে শুরু করেছে চারজন। সবার আগে মাধব, তারপর কিশোর, পেছনে অজিত, লালমুনি পাশাপাশি আসছে। কান্না, শোক ভুলে মুখচোরা লালমুনি কথা বলছে। মাঝে মাঝে তার হাসির দমকে ভেঙে যাচ্ছে অন্ধকার জঙ্গলের

স্তব্ধতা। ঘাড় ঘুরিয়ে লালমুনিকে কিশোর বলল, তোমার বাবা কিন্তু দোষী করবে আমাদের।

আবার দমকা খিলখিল হাসি ছড়িয়ে দিল লালমুনি। অজিত বলল, লালমুনির বাবা সব জানে। অন্ধকার জঙ্গলে মেয়েকে পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকার বুদ্ধি বসন মাঝি নিজে দিয়েছে। পাহাড়ে মেয়ে, জামাইকে রোজ খাবার দিয়ে যাবে সে।

খবর শুনে কিশোর তাজ্জব। তার মুখে কথা নেই। খাড়া পাহাড়। শুরু হয়েছে পাকদণ্ডি পথ। বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই, দু'একটা গুহা। গুহাতে কখনও কখনও নেকড়ে, হেঁড়েল ডেরা করে। আরও দেড়, দুশো ফুট উঠে গণফৌজের দপ্তর। পাহাড়ী গুহা,গর্ত, এলাকার মানুষ চেনে। অজিত হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, আমরা আর যাবো না।

কিশোরও দাঁড়িয়েছে। তাকে বুকে জড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে অজিত প্রশ্ন করল, কবে ফিরবি তুই ?

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কিশোরের জবাবে অজিত বলল, তোর জন্যে অপেক্ষা করবো।

অনেক দূরে টিপটিপ করে জ্বলছে মশানজোড় বাঁধের আলোর মালা। অজিতের হাত ধরে কিশোর বলল, সাবধানে থাকবি।

তুই কোথায় যাবি ?

অজিতের প্রশ্নে কিশোর বলল, সিউড়ি হয়ে কলকাতায়।

কাল তো সিউড়ি বন্ধ্।

মাধবের মুখে খবর শুনে কিশোর বলল, তাহলে মশালজোড় পৌঁছে অন্য পথে কলকাতায় যাবো।

তরণীপাহাড়ের অন্ধকার, নিস্তব্ধ জঙ্গলে অজিত, লালমুনির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলো কিশোরের। দু'জনকে পেছনে রেখে মাধবকে নিয়ে মশানজোড়ের পথে এগিয়ে চললো কিশোর। অজিত তাকিয়ে আছে টের পেয়েও ঘাড় ফেরালো না সে।

ঊনপঞ্চাশ

ঘড়িতে আটটা বাজার শব্দ শুনে রেবাকে প্রভাদি বলল, ডাল হয়ে গেলে সাঁতলে রাখিস। বাজার থেকে ঘুরে আসছি আমি।

আপনি কেন যাবেন, রেবা বলল, আমি যাচ্ছি।

নাহ্, আজ আর তোকে যেতে হবে না। আধঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরবো।

বাজারের থলি হাতে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হারুদাকে প্রভাদি বলল, আমি না আসা পর্যন্ত আপনি কিন্তু থাকবেন।

রান্নাঘরের চৌকাঠে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল হারুদা। প্রভাদির কথায় বলল, আমি আছি।

রেবা ছাড়া পেয়েছে শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে হারুদা। প্রথমে গিয়েছিল রেবাদের বাড়ি। সেখান থেকে খবর পেয়ে প্রভাদির বাসায় এসেছে। প্রভাদি বেরিয়ে যেতে রেবার মনে হলো, তার একটা অনুরোধ হারুদা নিশ্চয় ফেলতে পারবে না। কথাটা কীভাবে শুরু করা যায়, ভাবছে সে। মিনিট পনেরো আগে হারুদাকে দেখেই চিন্তাটা মাথায় এসেছে তার। হারুদাকে বিশ্বাস করা যায়। নিরীহ, সাদাসিধে এই মানুষটা রেবার সুখে, দুঃখে বহুবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কমুনিষ্ট পার্টির পুরোনো বন্ধু হারুদা। তবে খুব সাবধানী, সতর্ক। সবসময়ে গোপন রাখতে চায় নিজেকে। রেবার মুখোমুখি হয়ে চাপা গলায় হারুদা প্রশ্ন করেছিল, কেমন আছো?

মৃদু হেসে রেবা বলেছিল, ভালো।

হারুদার হাবভাব দেখে রেবার মনে হচ্ছিল, এ বাড়িতেও পুলিশের গন্ধ পাচ্ছে সে। চারপাশে সতর্ক নজর ফেলে হারুদা বলেছিল, তোমার জন্যে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। মেয়েদেরও আজকাল রেহাই দিচ্ছে না পুলিশ।

হারুদার মুখে পাড়া, পার্টির টুকরো কিছু খবর পেল রেবা। অতীন, সন্তুর কাছ থেকে এসব খবর পেয়েছে হারুদা। সূর্যদা খুব অসুস্থ। পার্টিতে গভীর সংকট। ভারতীয় পার্টির কড়া সমালোচনা করেছে চীনা কমুনিষ্ট পার্টি। তারা বলেছে বিপ্লবের সঙ্গে খতমের কোনো সম্পর্ক নেই। চীনা পার্টির বক্তব্য নিয়ে এখানে তুমুল বিতর্ক লেগেছে। হারুদার কথার মধ্যেই গোপন বাসনাটা দানা বাঁধছিল রেবার মনে। হারুদা বলছিল, আমার ধারণা, চীনাপার্টির সমালোচনা নির্ভুল। নতুন করে ভাবতে হবে।

রাঁধতে রাঁধতে এক, আধটা কথা বলছিল প্রভাদি। রেবা চুপ। মনের গোপন

বাসনার কথা হারুদাকে বলা ঠিক হবে কিনা, ভাবছিল সে। হারুদার সঙ্গে আলাদা, একান্তে একটু কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল।

গত সন্ধ্যেতে জামিন পেয়ে কোর্ট ছাড়ার পর থেকে বারবার কিশোরকে মনে পড়ছে রেবার। রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে কিশোরকে। কিশোরের কাছে যাবার তাগিদ তীব্র হয়েছে। কোনো নিয়ম, নিষেধ শুনতে আর রাজি নয় সে। এখনই সাঁওতাল পরগনায় কিশোরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চায়। কীভাবে, কেমন করে যাবে জানে না। দেশভাগের পর কলকাতায় এসে আর কখনও এ শহরের বাইরে যাবার সুযোগ ঘটে নি। হাওড়া, শিয়ালদা স্টেশন চেনা হলেও কখনও ট্রেনে চাপেনি। তাছাড়া কিশোর ঠিক কোথায় থাকে, কী তার ঠিকানা, রেবা জানে না। নানা চিন্তায় কাল রাতে অনেকক্ষণ জেগে ছিল সে। ঘুমোতে পারছিল না। আলোর রুপোলি রেখার মতো শেষ পর্যন্ত একটা সমাধান পেয়েছিল। অনুপদা রাজনগর থানার ডাক্তার। হাসপাতালে একবার পৌঁছোলে কিশোরের হদিশ অনুপদা করে দিতে পারে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে অনুপদা। একটা রাস্তা পেয়ে স্বস্তি বোধ করেছিল রেবা।

সিউড়ি থেকে রাজনগরে বাস যায়, কিশোরের মুখে এ খবর রেবা শুনেছে। সিউড়ি পৌঁছোলে সেখান থেকে বাসে অনায়াসে রাজনগরে চলে যাবে সে। রাজনগরে গেলে হাসপাতাল খুঁজে বার করতে অসুবিধে হবে না। সিউড়ি পর্যন্ত একজন সঙ্গী দরকার। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে বিশ্বস্ত একজনের মুখ মনে করতে চাইছিল রেবা। প্রথমে মনে এসেছিল গোরার নাম। মুহূর্তে নাকচ করল গোরাকে। বিশুদের দলে ভিড়েছে গোরা। কিশোরের ক্ষতি হয়তো গোরা করবে না, তবু নির্ভর করা যায় না তাকে। মাথায় নানা নাম, মুখ চালাচালি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রেবা।

সকালে হারুদা আসতে খুশিতে ভরে গেছে তার মন। সবচেয়ে বিশ্বাসী মানুষটা হাতের কাছে থাকতেও কাল রাতে কেন তাকে মনে পড়েনি, ভেবে অবাক হয়েছিল রেবা।

পাঁচ, সাত মিনিট হলো বাজারে গেছে প্রভাদি। ডাল সাঁতলে হারুদাকে এক কাপ চা তৈরি করে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকলো রেবা। আড়চোখে দু'তিনবার দেখলো হারুদাকে। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, আমাকে একটা সাহায্য করবেন হারুদা?

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে রেবার দিকে তাকালো হারুদা। এক সেকেন্ড চুপ থেকে প্রশ্ন করল, কী সাহায্য?

সিউড়ি পৌঁছে দেবেন আমাকে?

সিউড়ি?

হ্যাঁ।

কেন? সিউড়ি যাবে কেন?

সিউড়ি থেকে রাজনগর যাবো। কিশোরকে খুব দরকার। তাড়াতাড়ি।

রেবার মুখ, চোখ, কণ্ঠস্বরের আকুতি হারুদাকে বিচলিত করল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে হারুদা প্রশ্ন করল, কিশোরের ঠিকানা তুমি জানো?

নাহ্, রাজনগরে গেলে পেয়ে যাবো।

অনুপডাক্তারের নাম চেপে গেল রেবা। শেষ চুমুক চা খেয়ে সামান্য চিন্তা করে হারুদা বলল, কিশোরের সঙ্গে যোগাযোগ না করে তোমার যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। কিশোর বিপদে পড়তে পারে। বরং তোমার চিঠি নিয়ে রাজনগরে আমি যেতে পারি। চিঠি যাতে কিশোর পায়, সে ব্যবস্থাও হতে পারে।

হারুদার কথায় যুক্তি থাকলেও মানতে কষ্ট পাচ্ছে রেবা। সে বলল, তবু একবার যেতে চাই।

একজন অচেনা মেয়ে কিশোরের খোঁজখবর করলে জানাজানি হয়ে যাবে। আমি গেলে সেরকম কিছু হবে না।

হারুদার কথায় গুম হয়ে গেল রেবা। চেহারা, চালচলনে হারুদা এমন মামুলি যে তাকে নজর করে না কেউ। এ সত্য রেবা জানে। তবু তার মনে কিশোরকে দেখার অসম্ভব আকুলতা! এক মুহূর্ত চুপ থেকে রেবা বলল, বেশ, আপনি যান। চিঠি, যাতাযাতের খরচ আমি দেবো। কবে যাবেন?

কাল।

হারুদার তাড়া নেই। প্রভাদি না আসা পর্যন্ত হারুদা থাকবে। মাঝবয়সী, ভবঘুরে এই লোকটাকে রাজনগরে পাঠানো উচিত হবে কিনা, ভেবেও চুপ করে আছে রেবা। মনে যুক্তি সাজাচ্ছে সে। হারুদা পুরুষমানুষ। মারাত্মক কোনো বিপাকে পড়ার আশঙ্কা নেই। হারুদা প্রশ্ন করল, কিশোর কি তার নিজের এলাকায় আছে?

আছে।

হারুদা আর প্রশ্ন করল না।

রেবা বলল আরও একটা অনুরোধ আছে।

কী অনুরোধ?

যাবার কথা কাউকে, এমন কি প্রভাদিকেও বলবেন না।

কিন্তু বাড়িতে দাদা, বৌদিদের একবার জানাতে হবে।

রাজনগর বাদে যে কোনো জায়গার নাম বলবেন।

তাই হবে।

আধঘণ্টার মধ্যে বাজার থেকে ফিরলো প্রভাদি। সদর দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ পেয়ে হারুদা বলল, আজ বিকেলে তোমার বাড়িতে যাবো। তখন কথা হবে।

দরজা খুলতে গেল রেবা।

পঞ্চাশ

বীরভূম, বরানগর, কাশীপুরে গণহত্যার প্রতিবাদে পুরোপুরি বন্ধ হলো সিউড়ি। স্বতস্ফূর্ত হরতাল। স্কুল, কলেজ, দোকান, বাজার, অফিস, আদালত অচল হলো। বরানগর, কাশীপুরে গণহত্যার আড়াই মাস পরে সিউড়িতে এমন সফল বন্ধের কারণ হলো বীরভূম জেলায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। জেলা জুড়ে রক্ত বইছে। পুলিশ, সি. আর. পির গাড়ি ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সিউড়ি শহরে কোনো যানবাহন দেখা গেল না। পোস্টার, মিছিল, জনসভা না ডেকে বন্ধ সফল করার নজির বিশেষ নেই। আসলে প্রচার হয়েছিল মুখে মুখে, কানে কানে, বাতাসে। পার্টির নামে এরকম সফল গণআন্দোলন সিউড়ির মানুষ আগে কখনও দেখেনি।

রাত সাড়ে আটটায় সিউড়িতে মাধবের ডেরায় পৌঁচেছে কিশোর। মাধবের ঘরে বসে বন্ধের নানা খবর শুনে সে বেজায় খুশি। ভোর রাতে মশানজোড় থেকে বাস ধরে আটটায় রামপুরহাট পৌঁচেছিল কিশোর, মাধব। সারাদিন রামপুরহাটে কেটেছে। শেষ বিকেলে তারাপীঠ থেকে তীর্থযাত্রীদের একটা বাসে অনেক মিনতি করে জায়গা পেয়েছিল দু'জন। মাধব যে পুলিশের লোক, এখবরও জায়গা পেতে সাহায্য করেছিল। ভিড় বাসে সিউড়ির বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছিল অনেকে। তাদের আলোচনা শুনেই সিউড়ির ছবি দেখতে পেয়েছিল কিশোর।

কিশোরকে ঘরে রেখে বুদ্ধদেবের খোঁজে বেরিয়েছে মাধব। বুদ্ধদেবের সঙ্গে মাধবকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল কিশোর। মাধবের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখে বুদ্ধদেব। সিউড়িতে তার গোপন ডেরা মাধব জানে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে মাধব বলল, তিনি বোলপুর গেঁইচেন।

খবর শুনে একটু দমে গেল কিশোর। সম্প্রতি রিজিওনাল কমিটিতে গেছে বুদ্ধদেব। চিন্তায় কিশোরের অনুগামী সে। কলকাতায় যাবার আগে রিজিওনাল কমিটির নির্দেশ নিয়ে তার সঙ্গে কিশোর কথা বলতে চাইছিল। তার অনুমান, এ নির্দেশে বুদ্ধদেবের সায় ছিল না। কিশোর, অজিতকে এলাকা থেকে বহিষ্কারের আদেশ বুদ্ধদেবের পক্ষে অনুমোদন করা অসম্ভব। ঠিক কী ঘটেছিল, জানতে চায় কিশোর। বুদ্ধদেব বোলপুরে গেছে শুনে হতাশ হলো সে। বুদ্ধদেবকে সিউড়িতে পেলে এ জট হয়তো খোলা যেত। পাশাশাশি এক দুশ্চিন্তা মনে কাজ করছে। পার্টি যদি বহিষ্কারের আদেশ নাকচে অরাজি হয়, তাহলে কী হবে? কীভাবে পার্টিতে ফিরবে সে? কেন ফিরবে? আদর্শে জোড়াতালি মেরে পার্টি করতে রাজি সে নয়।

অন্ধকার ঘরের মেঝেতে সতরঞ্চিতে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে কিশোর। মাধব

প্রশ্ন করল, ঘুম আসছে না ?

আবছা শব্দ করে পাশ ফিরে শুলো কিশোর। সারারাত পাহাড় ভেঙেছে কাল। আজও সারাদিন বিশ্রাম মেলেনি। গোটা শরীর পাকা ফোঁড়ার মতো দপদপ করছে। ঘুম উধাও। মাধব বলল, বোলপুর থিকে কমোরেট ফিরলেই ইখানে চ'ইলে আসবেক। খবর দিয়ে এ'ইচি।

কিশোর সাড়া করল না। সে ভাবছে অন্যকথা। এলাকায় ফেরার অনুমতি না পেলে কী করবে সে? এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে পার্টির আশ্রয় না পেলে কলকাতায় থাকা যাবে না। পুলিশ খুঁজছে। বাগে পেলে গুলি করে মারবে। পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেলে তো কথাই নেই। খুন করার জবাবদিহি পর্যন্ত করতে হবে না পুলিশকে। শুধু পুলিশ কেন, দল থেকে বহিষ্কৃত একজনকে মেরে ফেলতে পার্টির জঙ্গী কর্মীদের হাত কাঁপবে না। পাশ ফিরে শুলো কিশোর। মাধব ঘুমিয়েছে। বড়ো অসহায়, একা লাগছে কিশোরের।

ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করছে সে। রাজনৈতিক বন্ধু ছাড়া বাইরে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেনি। তার আলাপ, আড্ডার বিষয়ও ছিল রাজনীতি। রাজনীতি ছাড়া জীবনের যে কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে, জানতো না সে। ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমা, থিয়েটার, প্রেম, পিক্‌নিক, জলসায় জমজমাট ছাত্রজীবনের কোনো হাত-ছানিতে সাড়া দেয় নি সে। আকর্ষণ বোধ করেনি। রাজনীতি বিবর্জিত জীবন অর্থহীন, আলুনি ভেবেছে। ফলে পাড়া, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে সরে গেছে সে। এই দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতার জন্যে কখনও কষ্ট পায় নি। মাথা ঘামায়নি। মাথা ঘামাবার সময়ও ছিল না। রাজনীতির তীব্র, টগবগে স্রোত, অসংখ্য সহকর্মীদের সাহচর্যে ভরে ছিল প্রতিটা দিন। দম ফেলার ফুরসৎ পেত না। সহকর্মীরাই ছিল আত্মীয়, বন্ধু, প্রিয়জন। একাকীত্বের চিন্তা কখনও মাথায় জাগেনি। সে ভেবেছিল, এভাবেই চলবে। সমাজতন্ত্র আসবে।

অন্ধকার ঘরে মাঝরাতে গুলিয়ে গেল তার সব চিন্তা, বিশ্বাস। মনে হলো, এক অতল খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সে। পা কাঁপছে। যে কোনো মুহূর্তে খাদে পড়ে যাবে। নরম, করুণ একটা মুখ মনে পড়লো। রেবা এখন কী করছে? নিরাপদে আছে তো সে? বুকে অচেনা চিনচিন ব্যথা। রেবাকে অবহেলা করেছে সে। সে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। আদর্শের অজুহাতে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। তার তুলনায় অজিত অনেক বেশি দায়িত্ববান, বড়ো মাপের মানুষ। লালমুনির জন্যে সর্বস্ব বাজি রেখেছে অজিত। সে পারেনি। নানা কৌশলে রেবাকে প্রতারণা করেছে।

শেষরাতে বন্ধ দরজায় মৃদু খুটখুট শব্দ শুনে প্রথমে খেয়াল করেনি কিশোর। মাধব জেগেছে। এক, দু সেকেন্ড শব্দটা শুনে চ্যাটাই ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। অন্ধকার ঘর। নিঃশব্দে দরজার একটা পাল্লা খুলতে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরে। বাতাসের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো একজন মানুষ। চাপা গলায়

সে বলল, আমি মানব।

ঘুম ছুটে গেছে কিশোরের। গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না সে। বাতি জ্বালালো মানব। মিটমিটে আলোয় মানবকে চিনতে পেরেছে কিশোর। ঠকঠক করে মানব কাঁপছে। শেষ রাতে মানব কোথা থেকে এলো, আঁচ করতে চাইছে কিশোর। কিশোরের পাশে চ্যাটাই-এর ওপর বসে মানব বলল, বুদ্ধদেব মারা গেছে।

ঘরে বাজ পড়লো।

ঘুমজড়ানো মাথায় কিশোর বুঝতে পারলো না মানবের কথা। দু'হাতে চোখ কচলে মানবের দিকে তাকালো সে। কাঁপুনি ঠেকাতে বিড়ি ধরিয়েছে মানব। হুসহুস করে দু'তিন টান দিয়ে সে বলল, কাল সন্ধ্যেতে বোলপুরে একটা ঘরোয়া বৈঠক ছিল আমাদের। গোপন সভা। তবু খবর পেয়েছিল পুলিশ। সভা ঘিরে ফেলেছিল। পুলিশের বেড়া টপকে বুদ্ধদেব, আমি তবু পালিয়েছিলাম। শান্তিনিকেতনে এক আশ্রমিকের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল বুদ্ধদেব। সেই বাড়ির পেছনে এক ঝোপে গা ঢাকা দিয়েছিলাম আমি। নিস্তব্ধ আশ্রমপাড়া হঠাৎ গুলির শব্দে কেঁপে উঠলো। আশপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো কিছু মানুষ। বুদ্ধদেব যে বাড়িতে ঢুকেছিল সেখান থেকে রিভলভর হাতে বেরিয়ে এলো এক ভদ্রলোক। প্রতিবেশীদের বলল, এক ডাকাত ঢুকেছিল আমার বাড়িতে। গুলি করেছি তাকে। তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দিন।

রিভলভর হাতে লোকটি আমার চেনা। অবসরপ্রাপ্ত রবীন্দ্রভক্ত আই. সি. এস। তার কথা শুনে প্রতিবেশীরা হৈ চৈ শুরু করল। রিটায়ার্ড আই. সি. এস-এর সাহসের তারিফ করল কেউ কেউ। পুলিশ আসার আগে পালাতে চাইছিলাম আমি। হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে ভুবনডাঙায় পৌঁছে গেলাম। তারপর শুরু করলাম দৌড়। রাস্তায় সিউড়িগামী এক কাঠের লরি থামিয়ে উঠে পড়লাম।

মানবের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁতে চেপে আছে নিভে যাওয়া বিড়ি। ফিকে হচ্ছে অন্ধকার। বাতাস কাঁপিয়ে ডেকে উঠলো একটা মোরগ। কিশোর বলল, বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করতে সিউড়ি এসেছিলাম।

এক সেকেন্ড চুপ থেকে কিশোর বলল, অজিত আর আমাকে এলাকা থেকে বার করে দিয়েছে রিজিওনাল কমিটি।

খবর শুনে চমকে গেল মানব। তার মাথা থেকে নিমেষে মুছে গেছে গত সন্ধ্যের স্মৃতি। সোজা হয়ে বসে সে প্রশ্ন করল, মানে?

নিজেদের এলাকা থেকে আমরা বিতাড়িত।

কিশোরের জবাবে উত্তেজিত মানব বলল, এ সিদ্ধান্ত রিজিওনাল কমিটির নয়। আর. সি-র একজন সদস্য আমি। তবে রাজ্যকমিটি এরকম এক নির্দেশ পাঠিয়েছিল। রাজ্যকমিটির সে নির্দেশ আর, সি অনুমোদন করেনি। খবরটা জানানো হয়েছে রাজ্যকমিটিকে।

মানবের কথায় আকাশ থেকে পড়লো কিশোর। রিজিওনাল কমিটির সম্পাদকের সই করা সার্কুলার গতকাল দেখেছে সে। অথচ রাজ্যকমিটির নির্দেশে সায় দেয়নি রিজিওনাল কমিটি। পুরো ঘটনা কিশোরের মনে হলো হেঁয়ালি। কলকাতায় না গেলে এ হেঁয়ালির জবাব মিলবে না।

কাচের তিনটে ছোট গ্লাসে চা নিয়ে মাধব যখন ঘরে ঢুকলো, তখন ভোর হয়েছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে গুঁড়ো আলো। কিশোরের কথায় সায় দিয়ে মানব বলল, এখনই আপনি কলকাতায় যান। নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করুন।

একাত্ম

খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফ, ময়লা পাজামা, পাঞ্জাবি, ফুটো র‍্যাপার জড়ানো কিশোরকে সাতসকালে সদর দরজায় দেখে বিদ্যুৎ প্রথমে চিনতে পারেনি। তার বিস্মিত চাহনির সামনে দাঁড়িয়ে কিশোর বলল, আমি কিশোর।

কিশোরকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলো বিদ্যুৎ। সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে সকালের সংবাদপত্র দিয়ে গেল কাগজওলা। সংবাদপত্রের টাটকা গন্ধ অনেকদিন পরে কিশোরের নাকে ঢুকলো। তার হাত ধরে বিদ্যুৎ বলল, ভেতরে আয়।

কিশোরের ব্যাঙ্কের সহকর্মী বিদ্যুৎ। তার চোখে চোখ রেখে হাসলো কিশোর। বিদ্যুৎ বলল, ভাবা যায় না।

সদর দরজা পেরিয়ে বিদ্যুতের সঙ্গে বাড়িতে ঢুকলো কিশোর। এ বাড়ি তার চেনা। একশো বছরের পুরোনো পলেস্তরা খসা মোটা দেওয়াল, স্যাঁতসেঁতে, বিবর্ণ এ বাড়িতে অনেকবার কিশোর এসেছে। একতলার উঠোনের কোণে জালে ঘেরা মুরগির ঘর। ঘরে পাঁচ, ছটা ধবধবে সাদা লেগহর্ন মুরগি। বাঁদিকে তালাবন্ধ একটা অন্ধকার ঘরে ডাঁই করা কয়েকশো বই। সাত, আট বছর আগে নবীন লেখকদের উপন্যাস, গল্প ছেপে বাজার মাত করার পরিকল্পনা নিয়েছিল বিদ্যুতের বাবা সুধাংশু ভট্টাচার্য। সে পরিকল্পনা মার খেয়েছে। বেশ কিছু বই এবং বিশ, পঁচিশ হাজার টাকা জলাঞ্জলি দিয়ে প্রকাশন সংস্থা তুলে দিয়েছে সুধাংশু ভট্টাচার্য। প্রকাশনী তুলে দেবার পরেও সুধাংশুর ঘাড়ে চেপে আছে বই-এর পাহাড়। বিদ্যুৎ বলল, সের দরে বইগুলো বিক্রি না করলে আমাদের থাকার জায়গা হচ্ছে না।

কোনো বই বিক্রি হয় নি?

কিশোরের প্রশ্নে বিদ্যুৎ বলল, মুরগিপালন পদ্ধতি, আর লেদ্‌মেশিনের গুণাবলী, এ দুটো বই ভালো কেটেছে। বাকী সব ফ্লপ্‌, ভুষিমাল।

দোতলার বারান্দার বাঁদিকে বিদ্যুতের ঘর। ভেতরে ঢুকলো বিদ্যুৎ। দরজায় দাঁড়িয়ে অল্পবয়সী শ্যামলা ছিপছিপে এক তরুণীকে ঘরে আলনা গোছাতে দেখলো কিশোর। দরজার দিকে পেছন ফিরে কাজ করছে তরুণী। তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। কিশোর দাঁড়িয়ে পড়তে বিদ্যুৎ বলল, নমিতা, আমার বৌ।

নমিতা ঘুরে দাঁড়ালো। মাজা শ্যামলা রঙ, লাবণ্য ছড়িয়ে আছে শরীরে। রীতিমতো সুশ্রী। অবাক চোখে সে দেখছে কিশোরকে। বিদ্যুৎ বিয়ে করেছে, কিশোর জানতো না। জানার কথা নয়। ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়ার পর বিদ্যুতের

সঙ্গে তার দেখা হয় নি। কিশোরকে দেখিয়ে বিদ্যুৎ বলল, এ আমার সেই বন্ধু। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে।

বিদ্যুৎ শেষ করার আগে নমিতা বলল, বুঝেছি!

মিষ্টি হেসে কিশোরকে নমিতা বলল, বসুন।

বিছানার ওপর তখনই একজোড়া শিশুকে দেখলো কিশোর। মুচকি হেসে বিদ্যু বলল, লব, কুশ। আমার যমজ ছেলে।

কিশোর বিছানার দিকে এগোতে কাঁদতে শুরু করল লব, কুশ। আলুথালু চুল, শাড়ি ঠিকঠাক করছে নমিতা। তার দুচোখে ঘুম। দুটো বাচ্চা নিয়ে সে যে নাস্তানাবুদ, বোঝা যায়। বিদ্যুতের সংসার দেখে কিশোরের রোমাঞ্চ লাগছে। দুই শিশুর কান্না শুনে ঘরে ঢুকলো বিদ্যুতের মা দয়াময়ী। ঘরে অচেনা একজনকে দেখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে দয়াময়ী বিছানায় বসলো। দুই নাতির বুকে আলতো হাত রাখতে কান্না থামলো তাদের। দয়াময়ীকে কিশোর প্রশ্ন করল, আমাকে চিনতে পারছেন মাসিমা ?

ঘরে আলো কম। একপলক তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে কিশোরের সামনে এসে দাঁড়ালো দয়াময়ী। দুহাতে অঞ্জলিবন্ধ করল কিশোরের মুখ। দয়াময়ীর মুখে হাসি, চোখে জল।

কিশোরের মুখের ওপর নজর রেখে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকলো দয়াময়ী। আবেগ সামলে সহজ গলায় বলল, ছেলেকে কি মা কখনও ভুলতে পারে ?

দয়াময়ীর স্নেহে জুড়িয়ে গেল কিশোরের মন।

কখন এলে ?

দয়াময়ীর প্রশ্নের জবাব দিল কিশোর। চেনা মানুষ, বাড়ি, পরিবেশে খুব নিরাপদ লাগছে। কিশোর এসেছে শুনে তাকে দেখতে এলো বিদ্যুতের বাবা সুধাংশু। সুভাষচন্দ্র বোসের সহকর্মী ছিল সুধাংশু। এ বাড়িতে কিশোর এলেই সুধাংশু পাকড়াও করতো তাকে। শুরু করতো রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা। বছর ষাটের মানুষটি বোধহয় নিজের যুবক বয়সকে খুঁজতে চাইতো। কিশোরের পাশে একটা চেয়ারে বসলো সুধাংশু। বিস্তর কথা জমে আছে। দুই নাতিকে দু'হাতে কোলে তুলে দোলাচ্ছে দয়াময়ী। ফোকলা মুখে তারা হাসছে। দয়াময়ী বলল, পাঁচ মাসের বাচ্চা কে বলবে ? যা বিচ্চু হয়েছে!

শাশুড়ির হাতে বাচ্চাদের গছিয়ে ঘরের বাইরে গেছে নমিতা। কিশোরের জন্যে জেলি মাখানো গরম টোস্ট্, ফুলকাটা কাচের কাপে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো সুনীপা। বিদ্যুতের ছোটবোন সুনীপা। কলেজে পড়ে। কিশোরের সামনে টোস্ট্, চা রেখে সুনীপা বলল, খেয়ে নিন।

পাশের ঘরে রেডিওতে নিচু লয়ে বাজছে সেতার। ওই ঘরে থাকে বিদ্যুতের ছোট ভাই বিষাণ। টোস্‌টে কামড় দিল কিশোর। জানলার হালকা সবুজ পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে সকালের আলো। ঘরের বাতাসে চায়ের সুবাস। চায়ের কাপে চুমুক দিতে কিশোরের চোখের সামনে বদলে গেল দৃশ্যপট। সে দেখতে

পেল, লালচে, উঁচুনিচু ঢেউতোলা রুক্ষ মাঠ। মাঝে মাঝে শাল, শিয়াশাল, কেঁদু, পলাশের জঙ্গল। ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে সিধনদী। দিগন্তে স্থির দাঁড়িয়ে তরণীপাহাড়। পাহাড়ের মাথায় মাদল বাজছে। মাদলের দ্রিমদ্রিম, সেতারের সুর, নগর কলকাতা, জঙ্গল একই মূর্ছনায় কাঁপছে।

কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে ঘরে ঢুকলো বিষাণ। নড়েচড়ে বসলো কিশোর। রাজনীতি আলোচনার এখন সুযোগ নেই বুঝে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুধাংশু বলল, তোমার সঙ্গে বিকেলে কথা হবে। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, নেতাজী বেঁচে আছেন।

ঘরে ঢুকেছে নমিতা। সুধাংশু চলে যেতে বিষাণ বলল, আমার বিশ্বাস বাবাই নেতাজী।

বিষাণের কথায় নমিতা, বিদ্যুৎ হেসে উঠলো। কিশোরও হাসলো। বিষাণকে বিদ্যুৎ বলল, কিশোরের খবর যেন বাড়ির বাইরে না যায়!

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিদ্যুৎ, নমিতাকে এলাকার খবর বলছে কিশোর।

দুজনে অবাক হয়ে শুনছে কিশোরের কথা। নমিতার ভাসাভাসা দু'চোখ বড়ো হয়ে গেছে। বন্দুক দখল, গেরিলা অভিযান, খতমের কাহিনী শুনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে তার।

এখন কী অবস্থা?

বিদ্যুতের প্রশ্নে এক মুহূর্ত চুপ থেকে কিশোর বলল, অজিত আর আমাকে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিয়েছে পার্টি।

সে কি?

আঁতকে উঠলো বিদ্যুৎ। কিশোর বলল, সে বিষয়ে পার্টির সঙ্গে আলোচনা করতে কলকাতায় এসেছি।

গুম হয়ে বসে আছে বিদ্যুৎ। তার ফর্সা, মসৃণ কপালে সুতোর মতো তিনটে রেখা জেগেছে। পাশের ঘরে স্প্যানিশ গিটারে অচেনা সুর বাজাচ্ছে বিষাণ। বিষাণ সংগীতপ্রেমী। ছেলেবেলা থেকেই নানারকম বাজনা নিয়ে মেতে আছে সে। বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে দুই শিশু। কিশোর, বিদ্যুৎ বোবার মতো বসে আছে দেখে ঘরের বাইরে গেল নমিতা। সে বুঝেছে, বিদ্যুতের মতো কিশোরও মুখচোরা, লাজুক। চুপচাপ বসে থাকাটাই এদের আড্ডা। কিশোর আসায় আজ অফিসে ডুব দিয়েছে বিদ্যুৎ। জানলার বাইরে হাল্কা রোদের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎ ভাবছে কিশোরের বিপন্নতার কথা। সৎ, ত্যাগী, এরকম এক কর্মীর ওপর পার্টি কীভাবে করল এতো বড়ো অবিচার? চাকরি না ছাড়লে ব্যাঙ্কে আজ অফিসার হতো কিশোর। দু'হাজার টাকা মাইনে পেত। চাকরি ছেড়ে গত আড়াই, তিন বছর সাঁওতাল পরগণায় পড়ে আছে সে। তুলনাহীন তার নিষ্ঠা। সেই কিশোরকে উৎখাত করে দিল পার্টি! কিশোর এখন কী করবে?

প্রশ্নটা বিদ্যুৎ তুলতে কিশোর বলল, নেতাদের সব কথা খোলাখুলি বলবো।

কপালে ডান হাতের তর্জনী চেপে বিদ্যুৎ কিছু ভাবছে। একটা ফ্লাস্ক্ হাতে ঘরে ঢুকে দুই বন্ধুকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো নমিতা। ছেলেদের দুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। তবু তাদের ঘুম ভাঙাতে চাইছে না সে। বিদ্যুৎ, কিশোরকে কথা বলাতে কোনো একটা প্রসঙ্গ পাড়ার কথা ভাবছে নমিতা। তখনই কিশোর নিচু গলায় বিদ্যুৎকে বলল, রেবাকে একটা খবর দিতে হবে।

রেবা কি বাড়িতে আছে ?

বিদ্যুতের প্রশ্নে তার মুখের ওপর চোখ রাখলো কিশোর। বিদ্যুৎ বলল, তিন, চার মাস আগে রেবাদের ঘরের সামনে একটা খুনোখুনির ঘটনা হয়েছিল। ঠিক কী ঘটেছিল জানিনা। কানাঘুষো শুনেছিলাম, রেবা বাড়িতে নেই।

খবর শুনে ধড়াস করে উঠলো কিশোরের বুক। শুকনো ঠোঁট চেটে সে প্রশ্ন করল, কী শুনেছিলি ?

বিশুর এক সাকরেদকে কেউ মেরে আধমরা করে দিয়েছিল। হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল তাকে। তারপর কী হলো, খবর করিনি।

আলোচনায় ঘুরে ফিরে একটা মেয়ের নাম উঠতে নমিতার কৌতূহল বেড়েছে। বিদ্যুৎ থামতে নমিতা প্রশ্ন করল, রেবা কে ?

জবাব খুঁজে না পেয়ে কিশোর তাকালো বিদ্যুতের দিকে।

বিদ্যুৎ বলল, রেবা হলো কিশোরের স্ত্রী। এখনও বিয়ে হয় নি। তবে হবে। বিয়ের পর রেবা হবে কিশোরের বৌ।

কবে বিয়ে হবে ?

নমিতার প্রশ্নে মজা করে বিদ্যুৎ বলল, কাল।

বাহ্, কী মজা! নেমতন্ন পাবো তো আমরা ?

বিদ্যুৎ আর কথা বাড়ালো না। নমিতা দমে যাবার মেয়ে নয়। সে প্রশ্ন করল, কোথায় থাকে রেবা ?

কাছেই।

বিদ্যুতের জবাবে নমিতা বলল, ঠিকানা পেলে রেবাকে এখানে নিয়ে আসতে পারি আমি।

সোজা হয়ে বসলো বিদ্যুৎ। বলল, সেই ভালো। নমিতা ডাকতে গেলে সন্দেহ করবে না কেউ। রেবার সঙ্গে দেখা না হলেও বাড়ি থেকে তার খবর পেয়ে যাবে নমিতা।

ঘর থেকে দেখা না গেলেও আকাশে অল্প মেঘ জমেছে। রোদে তেজ নেই। বাইরেটা ছায়া ছায়া। সকালে একঝলক নজর করে কিশোর বুঝেছিল, নমিতা আবার সন্তানসম্ভবা। তাড়াতাড়ি মা হতে চলেছে সে। রেবাকে ডাকতে যাবার ঝামেলা নমিতার ঘাড়ে তাই চাপাতে চায় না কিশোর। রেবার বাড়ির হদিশ নমিতাকে বোঝাচ্ছে বিদ্যুৎ। করার মতো একটা কাজ পেয়ে উৎসাহে নমিতা এক পায়ে খাড়া। কিশোর সঙ্কুচিত। সে প্রশ্ন করল, আপনার অসুবিধে হবে না তো ?

নমিতা হেসে বলল, একদম নয়।

বিদ্যুৎদের পরিবার কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ। জীবনযাপনে ব্রাহ্ম রীতিনীতি চালু না থাকলেও এ বাড়ির মানুষগুলো চালচলনে খুব পরিচ্ছন্ন, সরল, সাবলীল। নমিতা হঠাৎ প্রশ্ন করল, আমাকে বিশ্বাস করবে তো রেবা?

স্বাভাবিক প্রশ্ন। রেবার সঙ্গে নমিতার আলাপ নেই। সে হঠাৎ কিশোরের খবর নিয়ে গেলে রেবার অবিশ্বাস করার কারণ আছে। কিশোরকে বিদ্যুৎ বলল, এক লাইন লিখে দে তুই।

কাগজ, কলম দিল বিদ্যুৎ। কিশোর লিখলো, পত্রবাহিকার সঙ্গে চলে এসো।

নিজের নাম লিখল না কিশোর। লেখার দরকার নেই। তার হাতের লেখা রেবা চেনে।

চিঠি নিয়ে হাসিমুখে নমিতা আবার প্রশ্ন করল, বিয়েটা হচ্ছে কবে?

প্রশ্ন শুনে লজ্জা পেলেও কিশোর বলল, রেবাকে নিয়েই বীরভূমে ফিরবো।

দারুণ!

খুশিতে উচ্ছ্বসিত নমিতার দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, মজা করে বিদ্যুৎ যে কথাটা বলল, আমি সেরকমই ভাবছিলাম। কাল, পরশু, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলতে চাই। বিয়ের জন্যে একটা বাড়ি দরকার। বিদ্যুৎ রাজি হলে এখানে হতে পারে। তা না হলে প্রভাদির বাড়ি আছে।

শেষ দুটো কথা বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল। নমিতা, কিশোরের কথা চালাচালি শুনছিল বিদ্যুৎ। কিশোরের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলে গেল সে। বলল, এ বাড়িতেই বিয়ে হবে। বরকর্তা আমি।

বিদ্যুতের কথায় নমিতা হেসে কুটিপাটি। সে বলল, আমি কন্যাকর্ত্রী. কনে সাজাবো, নতুন বৌকে বরণ করবো।

পনেরো মিনিট পরে রেবার খোঁজে বাড়ি থেকে নমিতা বেরোলো। পথের হদিশ তাকে ভালো করে বুঝিয়ে ঘুমন্ত দুই ছেলের পাশে বিছানায় উঠে বসেছে বিদ্যুৎ। মুগ্ধ চোখে দেখছে সন্তানদের। ছেলেরা জাগলে বোতলভরে দু'জনকে দুধ দেবে। বিছানায় তার মুখোমুখি বসেছে কিশোর। তাকে আচ্ছন্ন করেছে বিদ্যুতের ভরপুর সংসার। বিদ্যুৎ হঠাৎ প্রশ্ন করল, বিয়ে করার কথাটা কি আগেই ভেবেছিলি তুই।

হ্যাঁ, কিশোর বলল, বিয়ে করে রেবাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছেটাও কলকাতায় আসার একটা কারণ। এক মুহূর্ত থেমে যোগ করল, তোর সংসার দেখে আরও জোরদার হয়েছে ইচ্ছে।

হিংসে হচ্ছে?

তা একটু হচ্ছে।

হাসলো দু'জনে। তিন বছর আগে পার্টির সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যুতের ছিল, এখন নেই। কথার ছলে বিদুৎ বলল, তার ধারণা, পার্টির আর প্রয়োজন নেই তাকে। বিদ্যুৎ বলল, আমি গেরিলা নই। পার্টির কোন কাজে লাগবো?

তার কথার ভঙ্গিতে ধরা যায়, পার্টির কাজে ক্ষুব্ধ, আহত হয়েছে সে। বিদ্যুৎ বলল, পার্টির বাইরে থেকে বেঁচে গেছি। পার্টির মধ্যে এখন এক ডজন দল, উপদল। গালাগাল, কাদাছোঁড়াছুড়ির শেষ নেই। রোজ ঝাঁকে ঝাঁকে এতো দলিল বেরোচ্ছে যে, পড়ার সময় পাই না। দু'একটা পড়ে মাথামুণ্ডু বুঝতে পারি না। চাঁদার জন্যে নানা উপদলের লোকজন, ব্যাঙ্কে, আমার কাছে আসে। যাকে যা পারি দিই।

ডান হাতের তর্জনী কপালে রেখে কিছু ভাবছে বিদ্যুৎ।

এ পাড়ার খবর কী ?

কিশোরের প্রশ্ন শুনে বিদ্যুৎ বলল, ছ'মাস আগে রোজ সন্ধ্যে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কয়েকশো বোমা পড়তো এখানে। বারুদের গন্ধ, ধোঁয়া জমাট বেঁধে থাকতো বাতাসে। বোমা বাবদ খরচের একটা হিসেব তৈরি করেছিলাম আমি। গড়ে রোজ দু'শো বোমার জন্যে পঞ্চাশ কেজি মশলা দরকার। পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে পঞ্চাশ কেজির দাম আড়াই হাজার টাকা। মাসে মশলার খরচ, পঁচাত্তর হাজার টাকা! মশলা ছাড়া সুতলি, খোল, এবং আরও নানা জিনিস বোমা বানাতে লাগে। সব দাম হিসেবে ধরিনি। মশলার দাম পঁচাত্তর হাজার টাকা দু'পক্ষে বেটে দিলে প্রতি ভাগে পড়ে সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার। এতো টাকা কোথা থেকে পায় ওরা ? এ প্রশ্নের জবাবও পেলাম। চাঁদা দেবার জন্যে কিছু লোক আছে। তাছাড়া কালী, কার্তিক, শীতলা, শনি এবং নানা দেবদেবীর সর্বজনীন পুজোর নামে জোরজুলুম করে টাকা আদায় যেভাবে বেড়েছে, বলার নয়। বোমা বানাতে টাকার তাই অভাব হয় না। চাঁদা আদায়কারীদের আড়াল থেকে সাহায্য করে কিছু পৃষ্ঠপোষক। তারা কেউ সমাজসেবী, কেউ ধর্মগুরু, রাজনৈতিক নেতা। তারাই নাচাচ্ছে, রক্তাক্ত করছে দেশের মাটি।

স্বল্পভাষী বিদ্যুতের মুখ যন্ত্রনায় কুঁচকে গেছে। কিশোরকে পেয়ে উগরে দিচ্ছে সব যন্ত্রনা।

বিকেল শেষ হবার আগেই দিগ্বিজয়ীর মতো ফিরে এলো নমিতা। বলল, খবর দিয়ে এলাম রেবাকে। প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না আমাকে। ভাগ্য ভালো, নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার লেখা চিরকুট। তারপর বললাম আমার কর্তার নাম। ধরে আনতে চেয়েছিলাম তাকে। সে এলো না। খুব সাবধানী মেয়ে রেবা। বলল, সন্ধ্যের পর নানা রাস্তা ঘুরে এখানে আসবে।

কথা শেষ করে কিশোরকে নমিতা প্রশ্ন করল, খুশি ?

মুচকি হেসে কিশোর বলল, দারুণ।

বাহান্ন

প্রভাদিকে নিয়ে পা টিপে, সন্তর্পণে বিদ্যুতের বাড়িতে রেবা যখন এলো, তখন রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। অন্ধকার হয়েছে অনেক আগে। নিস্তব্ধ, পুরোনো বাড়িটার সদর দরজায় দাঁড়ালো রেবা। পেছনে প্রভাদি। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে টুকরো কথা, বাজনার শব্দ। গলির শেষ মাথায় বাড়ি। বাড়ির বিবর্ণ, মোটা দেওয়াল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বেরোচ্ছে। একতলার চাতালে টিমটিমে আলো জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলো দু'জন। তাদের প্রথমে দেখলো নমিতা। ঘরে নিয়ে গেল দুজনকে। কিশোরের দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল রেবা। আতুর নয়নে কিশোরকে দেখছে প্রভাদি। কিশোরের মুখে দ্যুতি, দীপ্তিকে খুঁজছে। প্রভাদির কাতরতা বুঝেছে কিশোর। দমকা আবেগ ঝেড়ে ফেলে প্রভাদি প্রশ্ন করল, কবে এলি ?

আজই। সকালে।

বিদ্যুৎ বাড়ি নেই। কিছু কেনাকাটা করতে দোকানে গেছে। বাচ্চাদুটো ঠাকুমার ঘরে। রেবা, প্রভাদিকে বিছানায় বসতে বলল নমিতা। বিছানায় কিশোরের পাশে প্রভাদি বসলো। রেবা বসলো চেয়ারে।

অজিতের কী খবর ?

প্রভাদির প্রশ্নে কিশোর বলল, ভালো !

প্রভাদিকে দেখে কিশোর খুশি। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে প্রভাদির সাহায্য পাওয়া যাবে। সুযোগ মতো প্রভাদিকে কথাটা বলবে সে। এই মুহূর্তে সে প্রশ্ন করল, কেমন আছেন প্রভাদি ?

কিশোরের মাথায় হাত রাখলো প্রভাদি। দু'চোখ বুজে গেল। প্রভাদির হাতের পাতা থেকে অভয় ছড়িয়ে গেল কিশোরের সারা দেহে। রেবার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চায় কিশোর। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের কথাটাও প্রভাদির সামনে পাড়তে হবে। কোন কথাটা আগে, কীভাবে শুরু করবে ভাবছে সে। তাকে বাঁচিয়ে দিল প্রভাদি। প্রশ্ন করল, তোর আসার খবর পার্টি পেয়েছে ?

নাহ্, কিশোর বলল, কাকে এখন পাবো বুঝতে পারছি না।

এক মুহূর্ত ভেবে প্রভাদি বলল, দেখি, কী করা যায় ?

প্রভাদির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে কিশোর বলল, পার্টির সঙ্গে আলোচনা সেরে তাড়াতাড়ি এলাকায় ফিরতে চাই।

এলাকার খবর কী ?

এলাকার রিপোর্ট শেষ করে, কেন পার্টির সঙ্গে দেখা করতে চায়, প্রভাদিকে

বলল কিশোর। অস্থির প্রভাদি বারবার শুধু বলছে, কী অন্যায়, কি অন্যায়!

ঘরে ঢুকলো বিদ্যুৎ। কিশোরের রিপোর্ট শুনে অবাক হয়েছে রেবা। অপলকে সে দেখছে কিশোরকে। বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে প্রভাদি বলল, পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে এখনই আমার যাওয়া দরকার।

এককাপ চা খেয়ে যান।

নমিতার অনুরোধে তার কাঁধে হাত রেখে প্রভাদি বলল, আর একদিন। সাতটার মধ্যে না গেলে কাজটা ভেস্তে যাবে।

ঘরের দরজায় পৌঁছে প্রভাদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, কলকাতা ছাড়ার আগে বিয়ে করে যাবে। রেবাকে এভাবে ফেলে রেখে যেতে দেবো না তোমাকে।

হকচকিয়ে গেছে কিশোর। রেবা লজ্জায় লাল। সুযোগ পেয়ে নমিতা বলল, সে কথাই তো একটু আগে হচ্ছিল।

দরজার পর্দা ফাঁক করে বিদ্যুৎ বলল, পাঁজিপুঁথি দেখে তো বিপ্লবীর বিয়ে হয় না। শুভস্য শীঘ্রম্। পরশুই এ বাড়িতে ওদের বিয়ে হবে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে প্রভাদিকে বিদ্যুৎ বলল, আপনি কন্যাকর্ত্রী আমি বরকর্তা।

খুব ভালো, মৃদু হেসে প্রভাদি বলল। ঘরের দরজা পর্যন্ত প্রভাদির সঙ্গে কিশোর এলো। নিচু গলায় প্রভাদি বলল, কাল সকালের মধ্যে একটা খবর পেয়ে যাবি। সাবধানে থাকবি।

প্রভাদি চলে যেতে ঘরে ফিরলো কিশোর। নমিতাকে চোখের ইসারা করে বিদ্যুৎ বলল, সিগারেট কিনতেই ভুলে গেলাম। আবার দোকানে ছুটতে হবে।

একটু আগে ঘুমন্ত লব কুশকে নিয়ে গেছে দয়াময়ী। নিজের হাতে দুধ খাওয়াবে নাতিদের।

ঘর ছেড়ে বিদ্যুৎ চলে যেতে রেবার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নমিতা বলল, খুদে ডাকাতদুটো কি করছে দেখে আসি।

কিশোর বুঝলো, তার সঙ্গে রেবাকে কথা বলার সুযোগ করে দিতে ঘর খালি করে দিল বিদ্যুৎ, নমিতা। ফাঁকা ঘর। টিউব লাইটের আলো পড়েছে রেবার মুখে। ফ্যাকাশে, রোগা দেখাচ্ছে তাকে। কিশোর প্রশ্ন করল, কেমন আছো?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রেবা। রেবার কাঁধে হাত রাখলো কিশোর। নরম গলায় বলল, কেঁদো না। তোমার ওপর অবিচার করেছি। মাপ করো।

ভেজা চোখে কিশোরের দিকে তাকালো রেবা। বলল, কোনো অবিচার করো নি তুমি। আসলে আমার মন খুব ভেঙে গেছে।

বুঝতে পারছি। ঝড় বয়ে গেছে তোমার ওপর।

আমি বোধহয় একটা অপরাধ করে ফেলেছি।

রেবার কথায় অবাক হয়ে কিশোর প্রশ্ন করল, কী অপরাধ?

আঁচলে চোখ মুছে রেবা বলল, তোমার খবর নিতে একটা চিঠি লিখে হারুদাকে রাজনগরে পাঠিয়েছি। হারুদার যদি কোনো বিপদ হয় ?

মনে মনে চমকে গেলেও শান্ত গলায় কিশোর প্রশ্ন করল, রাজনগরে কোথায় পাঠিয়েছো ?

হাসপাতালে। অনুপদার কাছে।

খবর শুনে গম্ভীর হলো কিশোর। বলল, হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে মাসখানেক হলো চলে গেছে অনুপ। কোথায় গেছে জানিনা।

অপরাধীর মতো মুখ করে বসে আছে রেবা। প্রায় দেড় বছর পরে কিশোরের সঙ্গে দেখা হলো। কতো কথা বলার আছে। অথচ হারুদার জন্যে দুশ্চিন্তায় একটা কথা বলতে পারছে না।

কবে গেছে হারুদা ?

কিশোরের প্রশ্নে রেবা বলল, পুলিশের হাত থেকে সোমবার ছাড়া পেয়েছি আমি। মঙ্গলবার দেখা হলো হারুদার সঙ্গে। বুধবার সকালের ট্রেনে বোলপুর গেছে সে।

কিশোর স্তব্ধ। আজ শনিবার। তার মানে তিনদিন আগে কলকাতা ছেড়েছে হারুদা। রাজনগর হাসপাতালে অনুপকে না পেয়ে ইতিমধ্যে হারুদার ফিরে আসার কথা। গতকালই ফেরা উচিত ছিল। কোথায় গেল হারুদা ? রেবার উদ্বেগ আর বাড়াতে চায় না কিশোর। প্রসঙ্গ বদলাতে সে প্রশ্ন করল, কবে অ্যারেস্ট্ করেছিল তোমাকে ?

রেবা শোনালো পুরো বিবরণ। এক মুহূর্ত চুপ থেকে রেবা বলল, আমাকে ওরা আবার অ্যারেস্ট্ করবে। ভয় করছে আমার।

কী বলবে কিশোর ভাবছে।

রেবা বলল, পনেরো দিন পরে কোর্টে হাজির হতে হবে আমাকে। আমি যাবো না। তার আগে চলে যাবো কোথাও।

কান্নায় বুজে এলো রেবার গলা। হারুদাকে রাজনগরে পাঠাবার কারণ, এতোক্ষণে আবছা বুঝতে পারছে কিশোর। রেবাকে সান্ত্বনা দিতে কিশোর বলল, হারুদার কোনো ক্ষতি হবে না। আমার বিশ্বাস, আজ, কালের মধ্যেই ফিরে আসবে।

খুশি ছড়ালো রেবার মুখে। গলা নামিয়ে কিশোর বলল, তোমাকে নিয়ে যাবো আমি।

কথাটা বলে হাঁপ ছাড়লো কিশোর। মনের গোপন ইচ্ছেটা কীভাবে জানাবে, ভেবে অনেকক্ষণ উসখুস করেছে। এখন মনে হলো, ভার নেমেছে। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রেবা। কিশোরের প্রস্তাব বুঝতে পারেনি সে। অথবা বুঝলেও আরও বিশদ শুনতে চাইছে। রেবার চোখের ভেতর দিয়ে তার বুক পর্যন্ত দেখে নিয়ে কিশোর বলল, আমি বিয়ে করবো। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। স্ত্রী পরিচয়ে নিয়ে যাবো তোমাকে।

রেবার গায়ে কাঁটা দিল। কিছু বলতে চায় সে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো না। রাত বাড়ছে।

আমার সঙ্গে যাবে তো?

কিশোরের প্রশ্নে ঘাড় নাড়লো রেবা। এই ডাকের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল সে। দরজার পর্দা সরিয়ে নমিতা প্রশ্ন করল, আসতে পারি?

নমিতার দিকে তাকিয়ে হাসলো কিশোর। কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো নমিতা। লব, না কুশ বুঝতে পারলো না কিশোর। বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নমিতা বলল, লবকে নিয়ে আসি।

নমিতা হাঁপাচ্ছে। রেবা প্রশ্ন করল, আমি যাবো?

আসুন।

নমিতার সঙ্গে বেরিয়ে গেল রেবা। লবকে কোলে নিয়ে ফিরলো রেবা। পেছনে নমিতা। বিছানায় শোয়া যমজ বাচ্চাদুটোর ওপর ঝুঁকে পড়ে রেবা দেখছে। বোধহয় কে লব, কে কুশ, আলাদা করে চিনতে চাইছে রেবার স্নেহাতুর দৃষ্টি। কিশোরকে অনেক কথা বলার আছে তার। বলতে পারছে না। নমিতা বলল, দুধ নিয়ে এখনই আসছি।

বিদ্যুৎ ফেরে নি। নমিতা বেরিয়ে যেতে কিশোরকে রেবা বলল, রাজনগরে হারুদার যাবার কথাটা প্রভাদিকেও বলতে পারিনি।

হারুদার নাম শুনে আবার দুশ্চিন্তা ঘনালো কিশোরের মনে। পুলিশ, মিলিটারি, গোয়েন্দায় থিকথিক করছে বীরভূম। রাজনগরের ওপর তাদের কড়া নজর। সন্দেহ করে হারুদাকে পুলিশ ধরলে বিপত্তি হবে। হারুদার কাছে আছে কিশোরকে লেখা রেবার চিঠি। চিঠিটা পেলে রেবার বাড়িতে হানা দেবে পুলিশ। কথাটা ভেবে দমে গেল কিশোর। তিনদিন আগে রাজনগরে গেছে হারুদা। এখনও বেপাত্তা। লোকটা ধরা পড়লো নাকি? পুলিশ কি পেয়ে গেল কিশোরকে লেখা রেবার চিঠি? আজ রাতে যদি রেবার বাড়িতে পুলিশ আসে?

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রেবা। একটা বড়ো গোলমাল পাকিয়েছে বুঝতে পারছে সে। দু'বোতল দুধ দুটো তোয়ালেতে জড়িয়ে ঘরে এলো নমিতা। রেবাকে আর আটকে রাখা ঠিক নয়। কিশোর বলল, বাড়ি যাও।

তাড়িয়ে দিচ্ছেন নাকি?

নমিতার ঠাট্টা শুনে কিশোর বলল, রাত ন'টা বাজলো। রেবাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে রেবা। কিশোর বলল, চলো রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি তোমাকে।

খুশিতে চকচক করছে রেবার চোখ। দরজার কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সে। বলল, নাহ্, রাস্তায় তোমার যাবার দরকার নেই।

ঠিক আছে, সদর দরজা পর্যন্ত।

সদর দরজার মুখে রেবাকে কিশোর বলল, সম্ভব হলে বাড়িতে থেকো না আজ

রাতে।

কেন ?

এমনি।

একপলক কিশোরকে দেখে রেবা বলল, ঠিক আছে।

রেবা চলে যাবার আধঘণ্টা পরে কিশোরের কাছে আবার এলো প্রভাদি। প্রভাদির সঙ্গে ঘরে ঢুকলো বিদ্যুৎ। প্রভাদি বলল, তোর সঙ্গে কাল দেখা করবে সূর্যদা।

খবর শুনে হাতে স্বর্গ পেল কিশোর। মুছে গেল তার ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা। মনে হলো, আর ভয় নেই। সংকট কেটে যাবে। কাজের জায়গায় আবার ফিরতে পারবে।

সুসংবাদ আনলেও প্রভাদির মুখ বিষণ্ণ। প্রভাদি বলল, সূর্যদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে প্রথমে সন্তুকে ধরলাম। তখনই সে নিয়ে যেতে চাইল আমাকে। তোর নাম বলতেই ছিটকে সরে গেল সন্তু। এমন কিছু কথা বলল, ছি ছি! ভাবা যায় না। কী ভীষণ সন্দেহ, অবিশ্বাস! বেশ রেগে গিয়ে তার ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ভাগ্য ভালো, পথে অতীনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছে জানলাম, সূর্যদা কলকাতায় আছে। অতীনকে ধরে সোজা গেলাম সূর্যদার ঠিকানায়। তোর নাম শুনে দেখা করতে রাজি হলো সূর্যদা। বলল, কালই নিয়ে আসুন কিশোরকে।

কাল সন্ধ্যের পর সূর্যদার কাছে নিয়ে যাবো তোকে।

প্রভাদির কথা চুপচাপ শুনছে কিশোর। দুই ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে নমিতা। বোতল ধরে স্ত্রীকে সাহায্য করছে বিদ্যুৎ। একটা লেপের তলায় দুই বাচ্চা হাত, পা ছড়িয়ে শুয়েছে। প্রভাদির সম্পর্কে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে কিশোরের বুক। প্রভাদি বলল, এতো দলাদলি, অবিশ্বাস নিয়ে কোনো বড়ো লক্ষ্যে কি পৌঁছানো যায় ?

যায়।

জবাব শুনে কিশোরের দিকে তাকালো প্রভাদি। কিশোর বলল, আপনি, আপনারা পাশে থাকলে দলাদলি, সন্দেহ কেটে যাবে।

কিশোরের কাঁধে হাত রাখলো প্রভাদি। কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে কিশোর বলল, কাল সন্ধ্যেতে সূর্যদার সঙ্গে দেখা করে পরশু সকালে চলে যাবো।

কোথায় ?

যেখানে ছিলাম।

কিশোরকে প্রভাদি আবার প্রশ্ন করল, রেবার কী হবে ?

সেও যাবে।

প্রভাদি তাকিয়ে আছে দেখে কিশোর বলল, বিয়ে করে নিয়ে যাবো।

বিদ্যুৎ বলল, কালই বিয়ে। এ বাড়িতেই।

নমিতা বলল, বিদ্যুৎ বরকর্তা।

তারপর হাসলো সে।

তিপান্ন

কিশোর, অজিত চলে যেতে এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে হতাশা, অবসাদ। রাত শেষ হতে জানাজানি হলো লালমুনির নিরুদ্দেশের খবর। লালমুনি উধাও হবার পরেও বিশেষ বিচলিত দেখালো না বসনমাঝিকে। গাঁয়ের মানুষও সহজভাবে মেনে নিল ঘটনাটা। লালমুনি কোথায় গেছে, না জানলেও, কার সঙ্গে গেছে, গাঁয়ের বেশিরভাগ মানুষের অজানা নয়। লালমুনির ঘটনায় বসনমাঝিকে সমবেদনা জানাতে তাই আগ্রহ দেখালো না কেউ। বসনমাঝি শক্ত ধাতের মানুষ। দরদ, সহানুভূতির পরোয়া করে না। মাঝবয়সী কালো মানুষটার মসৃণ মুখের চামড়ায় সবসময়ে জেগে থাকে গাম্ভীর্য। গাম্ভীর্যের সঙ্গে হয়তো সামান্য কৌতুকও নজর করা যায়। লালমুনি চলে যাবার পর কৌতুকের ছটা যেন বেড়েছে। তবে প্রায় বোবা হয়ে গেছে সে। লালমুনির জন্যে তার মাকে সমবেদনা জানিয়ে গেল গাঁয়ের দু' একজন বয়স্ক মা, বৌ। তাদের দেখে লালমুনির মা কাঁদলো। কেন কাঁদলো, প্রশ্ন করল না কেউ। মেয়ের জন্যে মা কাঁদবে, এটাই স্বাভাবিক। আদিবাসী সমাজে কারও ঘরোয়া বিষয়ে কুটকচালি করার রেওয়াজ নেই। সময়ও নেই। কঠিন দারিদ্র। সবাইকে খেটে খেতে হয়। হাড়ভাঙা খেটেও খেতে পায় না সবাই।

এ বছর আবার আলাদা বিপদ। খেটে খাবার সুযোগ সকলে পাচ্ছে না। ভিন্ জেলার লোক এনে ধান কাটা আগেই শুরু হয়েছিল। ফসল তোলার কাজ জোরকদমে চলছে এখন। মাঠে যারা কাজ করছে, তাদের পাহারা দিচ্ছে প্রতিরোধ-বাহিনী, পুলিশ, মিলিটারি। এলাকায় অগুনতি তাঁবু ফেলেছে তারা। গ্রাম ছেড়ে কাজের খোঁজে যারা চলে গিয়েছিল, বেঁচে গেছে তারা। ঘরে যারা আছে, তাদের সামান্য কয়েকজন ক্ষেত-খামারে কাজের সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিবেশী জেলা থেকে গতবছর গরীব-কৃষক, ক্ষেত-মজুররা এ জেলায় ঢোকেনি। সুযোগ ছিল না। জোতদাররা বেশিরভাগ গাঁ ছেড়ে পালিয়েছিল। গ্রামে যারা ছিল, এলাকার মজুরদের কাজে নিতে বাধ্য হয়েছিল তারা। এ বছর চেহারা পাল্টে গেছে। জোতদাররা গাঁয়ে ফিরেছে। ইচ্ছেমতো, দাপটে কাজের বিলিব্যবস্থা, তদারকী করছে তারা। এলাকার চাষীদের ভাগে চাষ করা জমির সঙ্গে তাদের ভন্না জমির ধানও নিজেদের খামারে জবরদস্তি তুলে নিচ্ছে জোতদার, মুরুব্বি। কৃষকসমিতির দখল করা সরকারি খাসজমির ফসলও লুটে নিচ্ছে তারা। তাদের প্রোচনায় পাশের জেলার খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে বাড়ছে এখানকার গরীব-কৃষক, ক্ষেত-মজুরের বিরোধ। বন্ধকী দলিল পুড়িয়ে ছ'মাস আগে যে সব ভন্নাজমি গরীব-চাষীকে জোতদার, মহাজন ফিরিয়ে দিয়েছিল, সে জমি আবার দখল

করল তারা। এ অঞ্চলের মাঝিপাড়ার যে সব মেয়ে মরদ কাজ পেয়েছে, তাদের নিঃশ্বাসে আগুন ঝরছে। দাঁত টিপে শান্ত মুখে কাজ করছে তারা। কারও দিকে তাকাচ্ছে না কেউ।

সদাশয় সাহার জমির ধান কাটছে পুনাই, ভাদু। পুনাই, ভাদু যে গণফৌজের লোক, সদাশয় জানে না। আসলে মাঝিপাড়ার লোকগুলোর বিদঘুটে নাম সবসময়ে খেয়াল করতে পারে না সদাশিব। বাস্তু, চাষের জমির দাগনম্বর দিয়ে তাদের মনে রাখে সদাশিব। ধারালো কাস্তের টানে ধানের গোছা কেটে আঁটি বাঁধছে পুনাই। শিশিরে ভিজে গেছে তার হাতের পাতা। রোদ উঠেছে আকাশে। ঠান্ডা বাতাসে নতুন ফসলের গন্ধ। গুনগুন করে গান গাইছে পুণাই, মাণ্ডেওয়া লতাররে, চামেদা লতাররে, কেঁড়ি কেঁড়ি নাচনিঅ বলয়েনা। ছাদনা তলায় কানা মেয়ের নাচ হলো গানের বিষয়।

সামনে সারহাই পরব। আদিবাসীদের সবচেয়ে বড়ো অনুষ্ঠান। পরবের আগেই তাদের মনে খুশির আমেজ। কাজে, কথায়, পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে গানের কলি, বাঁশিতে সুর। ভাদুর গলায় গান নেই। ঘাড় গুঁজে কাজ করছে সে। পাশের জমিতে ধান কাটছে চারজন অচেনা মেয়ে। মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে হেসে উঠছে এক, দুজন। পুণাই তাকালেও আমল দিচ্ছে না ভাদু। তার মাথায় অন্য চিন্তা। রবির পাত্তা নেই। কালও তাঁতলুই ফেরেনি সে। তার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। সে ফিরলে তৈরি হবে কাজের ছক। যাবার আগে কিশোর এরকমই বলে গেছে। রাজনগর, রাণীশ্বর, দুমকা, ভাগলপুরের কোথায় যে এখন রবি আছে বলতে পারছে না কেউ। অথচ রটছে নানা কথা। ভাগলপুরে শালডুংরির জঙ্গলে কৃপাণ হাতে রবিকে ঘুরতে দেখেছে টোংরার গৌরমাঝি। মেঘ থেকে তরণীপাহাড়ের মাথায় রবিকে নেমে আসতে দেখা গেছে একদিন। কে দেখেছে?

প্রশ্ন করলে নামও জানা যাবে। কিন্তু জেনে লাভ কি? রবির প্রতীক্ষায় ঘরের দাওয়ায় সারাদিন বসে আছে পুঁইশা। তার পেটের মধ্যে ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে রক্তমাংসের এক জীব। পৃথিবীতে তার আসার দিন যতো ঘনাচ্ছে, ততো বাড়ছে পুঁইশার ছটফটানি। সারাক্ষণ হাঁপাচ্ছে সে। উপোসে, উদ্বেগে কাঠির মতো হয়েছে তার শরীর। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। খরখরে শুকনো মুখ। মাটিতে পা ঠুকে মাঝে মাঝে আপনমনে বকবক করে। বঁটি নিয়ে কিশোরকে কাটতে গিয়েছিল একদিন। তারপর খুব কেঁদেছিল। ভাত খেয়ে শান্ত ছিল তিন, চার দিন। শহরে যাবার আগে পুঁইশার দায়িত্ব ভাদু, নরহরিকে দিয়ে গেছে কিশোর। দায়িত্ব মানে রবি ফিরে আসা পর্যন্ত পুঁইশার খাওয়া পরার ব্যবস্থা। আরও এক জরুরি কাজ আছে। যে কোনদিন মা হবে পুঁইশা। আচমকা কিছু না ঘটে যায়, দেখতে হবে। রাতে পুঁইশার ঘরে থাকে আন্না। নরহরিকে বলে এ আয়োজন কিশোর করে গেছে। কিন্তু কবে ফিরবে কিশোর? রবিই বা ফিরবে কবে?

তিনদিন আগে তাঁতলুইতে এক জঘন্য ঘটনা ঘটেছে। দশ বছর আগে মৃত রবির বাবা কবে নাকি সদাশয় সাহার কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়েছিল। সে টাকা উসুল করতে রবির ভিটের পেছনে যে কাঁঠাল গাছ ছিল, দু'জন করাতি এনে কেটে নিয়ে গেছে সদাশয়। তার সঙ্গে ছিল বন্দুক হাতে প্রতিরোধ বাহিনীর চারজন লোক। শেষ বিকেলে কাঁঠাল কাঠ বোঝাই গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ানের পেছনে বসে পুঁইশাকে সদাশয় বলেছিল, একা এখানে পড়ে থেকে কী লাভ তুর। তুইও চল আমার সঙ্গে। কাজের জোগান আমি দেবো।

গাঁয়ের বিস্তর মানুষ শুনেছে মুরুব্বির কথা। টুঁ শব্দ করেনি কেউ। ঠোঁট টিপে দাওয়ার খুঁটি ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল পুঁইশা। গরুরগাড়ি ঘিরে চার বন্দুকধারী। ফিকফিক করে হাসছিল তারা। সদাশয়ের চালচলন, কথায় ছড়িয়ে পড়ছিল মরুব্বিয়ানা। পার্টির মাজা যে ভেঙে গেছে, নেতারা পালিয়েছে, রবি হাঁসদা নিরুদ্দেশ, সব খবর এলাকার বড়োলোকরা জেনে গেছে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকে পড়তে তাই ভয় পাচ্ছে না তারা।

পুঁইশার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে সদাশয় বলেছিল, তুর বেন হ'ইয়ে গেলে আবার আসবো আমি। তুর মরদ হয়তো আর ফিরবে না।

কথাটা শুনে চমকে গিয়েছিল অনেকে। এ কথার মানে কি? মুচকি হেসে সদাশয় আবার বলেছিল, নতুন মেঝেন নিয়ে কুথাও মজে গেছে রবি।

সদাশয়ের খবর বানানো হলেও, রবি আর ফিরবে না, কথাটা ভাদুর মনে বিঁধে আছে।

ঘাড় তুলে ভাদু শুনলো গান গাইছে পুনাই। সূর্য মাথার ওপরে। রোদের তাপ বাড়ছে। টনটন করছে ভাদুর কোমর। মরুব্বির ঘর থেকে এখনই খোরাকি আসবে। ভাত, ডাল, লঙ্কা, পেঁয়াজ। শালবনের দিক থেকে হনহন করে নরহরিকে আসতে দেখলো ভাদু। পুনাইও নজর করেছে। কাস্তে হাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। ভাদুর সামনে এসে দাঁড়ালো নরহরি। সে হাঁপাচ্ছে। চারপাশে সতর্ক নজর বুলিয়ে চাপা গলায় বলল, বুধন আর নিতাই বাউঁড়ি ফিরে এ'ইচে।

ভাদু নরহরির পাশে এসে গেছে পুনাই। সে প্রশ্ন করল, খালাস হ'ইয়ে গেছে?

ফাটক ভেঙে পলাইয়ে এ'ইচে।

খবর শুনে কাঁটা দিল ভাদুর শরীরে। খুশিতে কাস্তেটা মাথার ওপর দু'পাক ঘুরিয়ে নিল পুনাই। সামনে, পেছনে আর একবার দেখে নরহরি বলল, ভোররাতে গাঁয়ে ঢুকেছে দু'জন। আগে গোঁইচিল রবির ঘরে। সিখান থিকে আমার কাছে তাদের নিয়ে এ'ইলো আন্না। আমিও ভেবেছিলাম, খালাস পেঁইয়েছে উরা। নিতাই-এর মুখে জেলভাঙার খবর শুনে ডর লাগলেও আহ্লাদে বুক ভরে গে'ইছে আমার। মরদের মতো কাম করেছে উরা।

উরা কুথায়?

ভাদুর প্রশ্নে জঙ্গলের দিকে আঙুল তুললো নরহরি। মুনিষ, মুজুরদের জন্যে মাঠে ভাত, মুড়ি আসা শুরু হয়েছে। সদাশয়ের ঘর থেকেও এখনই আসবে কেউ।

নরহরিকে ভাদু বলল, তুমি জঙ্গলে চ’ইলে যাও। ভাত নিয়ে যাচ্ছি আমরা।

নরহরি চলে গেল। খোরাকির পর একঘণ্টা ছুটি। গত তিনদিন ভাত, ডাল নিয়ে জঙ্গলে বসে ভাদু, পুনাই খেয়েছে। আজও খাবে। কারও সন্দেহ করার কিছু নেই। বুধন ফিরেছে শুনে বুকে বল পাচ্ছে ভাদু। রবির পরে বুধনই এখানে নেতা। ঝিমিয়ে পড়া এলাকা চাঙ্গা করে তুলতে পারবে সে। গতকাল বাগজোরা থেকে এখানে বরুণের মিটিং করতে আসার কথা ছিল। সে আসেনি। খবর পাঠিয়েছে, জরুরি কাজে বোলপুরে যাচ্ছে। তার বদলে কল্যান, অমল বাহেঙ্গায় সভা করবে কাল।

হালচাল দেখে ভাদুর মন খাবাপ হয়ে গেছে। জেল ভেঙে বুধন, নিতাই বেরিয়ে এসেছে শুনে তার মনে হলো, হুল থামেনি।

ভাদু, পুনাই এর খাবার নিয়ে এলো সদাশয়ের ঘরের এক মুনিষ। গামছায় খাবার বেঁধে জঙ্গলে ঢুকলো দু’জন। নিঝুম জঙ্গল। বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ। বুধন, নিতাইকে নিয়ে জঙ্গলে কোথায় নরহরি অপেক্ষা করছে, ভাদুর অজানা নয়। সেদিকে এগোচ্ছে সে। পেছনে পুনাই। সিধ নদীর কাছে বনকলমী ঝোপের পাশে বুধনকে দেখতে পেল ভাদু। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো বুধন। নিতাই হাসছে। সিধনদীতে হাতমুখ ধুয়ে দু’জনের ভাত ভাগ করে খেল পাঁচজন। খেতে খেতেই নিতাই শোনাচ্ছে পালাবার কাহিনী। মাঝে মাঝে খেই ধরিয়ে দিচ্ছে বুধন। নিতাই বলছে, পরশু রাতে জেলের পাঁচিল টপকে বত্রিশজন বেঁইরে এলাম। সিপাইরা হল্লা করছে। পাগলি ঘণ্টা বাজছে। গুলি ছুটছে দুমদাম। পাঁচিলের এপাশে নিকষ আঁধার। কুথায় পালাই হদিশ করতে নারলাম। সামনে ধুধু মাঠ। গাছপালা নাই, আড়াল নাই। অন্ধের মতো ছুটছিলাম আমরা। কোথায় কে ছিটকে গেল, খেয়াল ছিল না। আধক্রোশ ছুটে চোখ সঁইয়ে গেল আঁধারে। মনে হলো সামনে নদী। পেল্লাই নদী। ধুন্দুমার ঢেউ। নদীর নাম জানিনা। কিন্তু নদীর আকার দেখে খালি হঁইয়ে গেল বুক। পিছন থিকে বন্দুক হাতে তেঁইড়ে এসছিল পুলিশ। গোলাগুলির কামাই নাই। মাঠের মাঝে মুখ থুবড়ে পঁইড়লো দু’ চারজন। পিছনে নজর করার তখন সময় নাই। নদীতে লাফ দিল অনেকে। নদীর চরে বিরাট বিরাট খাঁড়ি। বুধন, তাঁতিপাড়ির বাবলু আর আমি এক খাঁড়িতে ঢুকে পড়লাম। গভীর খাঁড়। ঘুটঘুটে আঁধার। বাবলুরে শুধোলাম, কমোরেট গাড়ি কুথায়?

সে বলল, কোথাও কিছু গণ্ডগোল হঁইয়েছে।

জেলভাঙার নেতা ছিল বাবলু। সে বঁইলেছিল, পাঁচিলের বাইরে আমাদের জন্যে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে গণফৌজ। সব ভোঁভা। কেউ আসে নাই। নদীতে যারা পড়েছিল, তাদের উপর বড়ো বড়ো টর্চবাতি জেবলে গুলি চালাইছিল পুলিশ। কে মরলো, কে বাঁচলো জানি না। নদীর চরে টর্চের আলো ফেলে মাঝরাত পর্যন্ত তল্লাশি কঁইরল পুলিশ। মস্তো খাড়ির একদম পেটের মধ্যে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে-

ছিলাম আমরা।

উত্তেজনায় কাঁপছে নিতাই-এর গলা। হঠাৎ বোবা হয়ে গেছে বুধন। নিতাই বলল, শেষরাতে নদীর কিনারা ধরে উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু ক'ইরলাম। সকাল হতেই লুকিয়ে পড়লাম খাঁড়িতে। কাল চোপর রাত জঙ্গলের পথে হেঁটে সিধনদী পেঁইয়ে গেলাম।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে নিতাই বলল, ঝানুটোর কী হলো ধরতে লারছি। মাঠের মাঝে দৌড়ের সময় আমাদের পিছা ছাড়ে নাই সে। তারপর নদীর কাছে এসে তাকে আর দে'ইখলাম না।

একঘণ্টা কাবার হয়ে গেলেও ভাদুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। বুধনকে এলাকার সব খবর বলা দরকার। অনেক সময় লাগবে। ভাদুকে তাড়া দিয়ে পুনাই বলল, আর দেরি ক'ইরলে মনিব ডাঁটবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে নরহরিকে ভাদু প্রশ্ন করল, বুধনকে ব'ইলেছো সব ?

ঘাড় নাড়লো নরহরি। বলল, আজ সাঁঝে বাহেঙ্গায় মিটিন। মনে আছেতো ? হ্যাঁ, ভাদু বলল। তারপর যোগ বরল, বুধন, নিতাইও যাবে সিখেনে।

বনকলমী ঝোপের পাশ থেকে উঠে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করল ভাদু, পুনাই। জঙ্গলের শেষে বাঁ দিকে একানে তালগাছটা আড়চোখে দেখলো ভাদু। এ গাছের টং-এ লুকোনো আছে তার বন্দুক। নরহরির বাড়ি থেকে নির্মলাকে নিয়ে বাঘা সেই যে তিলাবুনি গেল, তারপর দেখা নেই। সবাই এভাবে একে একে উধাও হলে লড়াই চালাবে কে ? আর একটা ঘটনা শুনে ভয় পেয়েছে ভাদু। প্রায়ই দু'একটা লাশ এ অঞ্চলের মাঠঘাটে পাওয়া যাচ্ছে। শিয়াল, শকুন, কুকুরে খাওয়া মৃত সেই মানুষদের পরিচয় হাসিল করাও মুশকিল হয়ে ওঠে। শুধু বোঝা যায়, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তাদের শরীর। তবে রবির নাগাল পাওয়া পুলিশের কর্ম নয়। সাঁওতালপরগণার মাঠ, জঙ্গল, নদী, পাহাড় আগলে রেখেছে তাকে। সে সাধারণ মানুষ নয়। সিধু কানুর ভাই। কথাটা ভেবে রোমাঞ্চ জাগলো তার।

বাহেঙ্গার সভায় বুধন, নিতাই কিন্তু গেল না। ভাদুকে বুধন বলল, আমার আসার খবর পেঁাছে গেঁইচে বাহেঙ্গায়। তবু ইখন সভায় যাওয়া ঠিক হবেক নাই। চারপাশের হালহকিকৎ আগে ভালো ক'ইরে সমঝে নিই।

তার কথায় সায় দিয়ে নিতাই বলল, আমাদের সাথে দেখা হবার খবরটো সভায় চেঁইপে যেও। কাউকে ইখনই জানান দিতে হবেক নাই।

কারণ জানতে না চেয়েও বুধন, নিতাই-এর কথার সারবত্তা বুঝতে পারলো ভাদু। সে আর কথা বাড়ালো না। শেষ বিকেলে নরহরি, পুনাই, কির্তা, বুরুং মাঝিকে নিয়ে বাহেঙ্গার দিকে রওনা হলো ভাদু। মহুয়া গাছে সবুজ ধোঁয়ার মতো মুকুল জেগেছে। তিন মাস আগেও এ রাস্তায় চুপচাপ হাঁটতো তারা। সজাগ থাকতো চোখ, কান। ফসল কাটা শুরু হতে আবহাওয়া সামান্য পাল্টেছে। শিথিল

হয়েছে সতর্কতা। নতুন ফসল ঘরে ওঠায় চারপাশ খুশিতে মাতোয়ারা। কার ঘরে ফসল ঢুকছে, এ প্রশ্নের চেয়ে বড়ো হলো মরশুমী সংস্কার। নাচ, গান, উৎসব লেগেই আছে। আনন্দের তোড়ে ভেসে গেছে উদ্বেগ, ভয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় পুনাই বাঁশি বাজালেও তাই বারণ করল না কেউ। বাঁশির সঙ্গে গুণগুণ করে গান ধরলো বুরুং। জঙ্গলের প্রান্তে পেঁছে ভাদু শুনলো বাহেঙ্গা থেকে ভেসে আসছে মাদলের শব্দ। আরও কিছুটা হাঁটার পর সকলের কানে গেল গানের সুর। বাহেঙ্গায় উৎসব বসেছে। বুধনের ফেরার খবরেই যে গাঁয়ের মানুষ আনন্দে মেতেছে, ভাদু বুঝতে পারলো। খোলা মাঠে পা দিতে তার গায়ে লাগলো প্রথম বসন্তের বাতাস।

ভাদু যা ভেবেছিল, তাই হয়েছে। তাদের আগে বাহেঙ্গায় পেঁছে গেছে বুধন। কুলিমুড়োয় সঙ্গীদের রেখে ভাদু গেল বুধনের বাড়ি। ছেলে ফিরে আসায় বুধনের মা খুশিতে আট খানা। অজিত, লালমুনির খবর বুধনকে শোনাচ্ছিল বসন মাঝি। বুধন গম্ভীর। ভাদুকে দেখে চুপ হয়ে গেল বসন। বানাকুলি শব্দটা শুধু শুনতে পেল ভাদু। তরণীপাহাড়ের আর এক নাম বানাকুলি। বানাকুলির নাম শুনে রহস্যের আঁচ পেল ভাদু। চাপা গলায় বাবাকে বুধন কী বলল, শুনতে পেল না ভাদু। তার সঙ্গে অন্য কথা শুরু করল বুধন।

তার ধারণা আজ রাতেই বাহেঙ্গায় পুলিশ আসবে। তার খোঁজে চষে ফেলবে গ্রাম। লড়াই ছাড়া পথ নেই। হুল চাই। গরীব মানুষের বাঁচার একটাই পথ, তা হলো হুল।

ভাদুকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলো বুধন। নরহরি, পুনাই কির্তাকে ডেকে পাঁচজন গিয়ে বসলো খিড়কির কাঁটাঝোপের পেছনে। অন্ধকার হয়েছে। কিশোর, অজিত চলে গেছে শুনে নিতাই কাঁদছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে ভাদু বলল, উরা দুজনেই ফিন ফিরে আসবেক।

সভার সময় হতে বুধন, নিতাইকে ছেড়ে চার সঙ্গী নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হলো ভাদু। তারা যাবার পাঁচ মিনিট পরে উঠে পড়লো বুধন, নিতাই। সভার বাইরে কোনো একটা ঝোপে লুকিয়ে সভার আলোচনা শুনবে তারা। জঙ্গলের গভীরে সভার জায়গাটা পাঁচজনেরই চেনা। সেখানে পেঁছে ভাদু দেখলো, তাদের আগেই মাদারপুর, টোংরা, বৃন্দাবনী, বাঁশকুলির পার্টি প্রতিনিধিরা এসে গেছে। ভাদু, নরহরি, পুনাই, কির্তা, বুরুংকে দেখে হৈহৈ করে উঠলো সবাই। ভাদুর হাতে এককলসী হাঁড়িয়া পাঠিয়েছে বসনমাঝি। কলসী দেখে ফুর্তিতে সকলে ফেটে পড়ছে। গাছ থেকে শালপাতা ছিঁড়ে ঠোঙা বানিয়ে সবার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে বুরুং। হাঁড়িয়া ঢালছে পুনাই। এক, দেড় ঘণ্টায় কলসী শেষ হয়ে গেল। কল্যান, অমলের পাত্তা নেই। ব্যাপার বুঝতে পারছে না কেউ। হাই তুলছে, আড়মোড়া ভাঙছে দু'চারজন। শালবনে ঘন অন্ধকার। বরুং বলল, আমরা মিটিন শুরু ক'ইরে দেই।

হক কথা বটেক, সায় দিল পুনাই।

উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভেসে এলো শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ। কেউ আসছে। কান খাড়া করে বসেছে সবাই। খর দৃষ্টি তাদের। কে আসছে, চিনতে চাইছে। ছায়াশরীর একজন সামনে এসে দাঁড়ালো। বাগজোরার জিয়ন মুর্মুকে চিনতে পারলো ভাদু। কেউ কিছু প্রশ্ন করার আগে মাটিতে বসে পড়লো জিয়ন। বাগজোরা থেকে বাহেঙ্গা সাত মাইল। এতোটা পথ হেঁটে ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে সে। গামাছায় কপাল, মুখ মুচছে। জিয়নের কাঁধে হাত রাখলো নরহরি। কির্তা প্রশ্ন করল, কী খবর বটেক ?

ফ্যাঁসফেসে গলায় জিয়ন বলল, বাগজোরা ছেড়ে কমোরেটরা চ'ইলে গেঁইচে ?

খুলসা ক'ইরে বুল।

বুরুং মাঝির তাগাদায় জিয়ন যা শোনালো, তা হলো, ভাগলপুর জেল ভেঙে বন্দীরা পালাবার পর বাগজোরা তছনছ করছে পুলিশ। বরুনের খোঁজে কল্যান, অমল বোলপুরে গিয়ে আর ফেরেনি। বাগজোরায় মানুষ নেই। গ্রাম ছেড়ে সবাই ভেগেছে। জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে অনেকে। রবি হাঁসদার পরামর্শ নিতে তারাই জিয়নকে বাহেঙ্গায় পাঠিয়েছে। খবর শুনে সবাই চুপ। নরহরি বলল, রবির হদিশ নাই।

চুয়ান্ন

বিকেল শেষ হবার আগেই মানিকতলায় সূর্যদার ডেরায় পেঁাছে গেল কিশোর। আবছা অন্ধকার ঘর। শয্যাশায়ী সূর্যদাকে বেশ অসুস্থ লাগছে। ঘরের দরজায় কিশোরকে পেঁাছে দিয়ে প্রভাদি বলল, রাত আটটার মধ্যে ফিরবি। অপেক্ষা করবো আমরা।

কিশোরের কাঁধে হাত রেখে মিষ্টি করে হাসলো প্রভাদি। ঘরে ঢুকলো কিশোর। আবছা অন্ধকারে ধেঁধে গেল তার নজর। এক্ দু'সেকেন্ড্ দাঁড়িয়ে সূর্যদার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসলো কিশোর। ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে সূর্যদা বলল, ব'সো, কমরেড, তোমার অপেক্ষাতেই আছি।

রেবাকে বিয়ে করার কথা আজ সূর্যদাকে বলবে কিশোর। বলতেই হবে। রেবাকে নিয়ে ফিরবে সে।

স্থির চোখে এক মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে সূর্যদা প্রশ্ন করল, গণফৌজ কেমন কাজ করছে ?

একটু থতমত খেল কিশোর। তারপর বলল, কাজ সবে শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে।

কথা শেষ করতে না দিয়ে সূর্যদা বলল,জানি তোমাদের সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্তও ভুল। আত্মসমালোচনা করবে পার্টি।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। হৃৎপিন্ডে রক্তের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। পার্টি যে এমন উদার. নমনীয় হয়েছে, ধারনা করতে পারেনি সে। শান্ত গলায় সূর্যদা বলল, চীনের পার্টি সমালোচনা করেছে আমাদের। ঠিক করেছে। আমাদের গাফিলতি ধরে ফেলেছে তারা। তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে আমরা দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলাম।

দু' আঙুলে কপাল টিপে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে সূর্যদা বলল, অনেক ভুল করেছি আমরা। আসলে মূল তত্ত্বায়ন বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটা সঠিক কাজ করেছি। সংসদীয় গণতন্ত্রের মিথ্যাচার প্রমাণ করেছি। ভুয়ো বামদেব মুখোস খুলে দিয়ে কৃষিবিপ্লব যে একমাত্র পথ, এ সত্য প্রচারও কম কথা নয়। সেণ্ট্রাল কমিটির যে সদস্যরা বাইরে আছে, তাদের নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সভা ডেকেছি। সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্যরা ছাড়াও সংগ্রামী এলাকার নেতাদের সেখানে ডাকা হবে। সে সভায় তুমিও থেকে যাও।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে সূর্যদা হাসলো। ভাঙাচোরা মুখে বিষন্ন হাসি। বালিশের ওপর অকসিজেন টিউব্। বিছানার পাশে সিলিন্ডারে একটানা বুদ্বুদ

উঠছে, ভাঙছে।

কষ্ট হচ্ছে ?

কিশোরের প্রশ্নে সজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া কাঁচাপাকা চুলে আঙুল চালিয়ে সূর্যদা প্রশ্ন করল, কষ্ট, ? কীসের কষ্ট ?

আবছা অন্ধকার মুছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গোটা ঘর। হঠাৎ বালিশ ছেড়ে উঠে সূর্যদা প্রশ্ন করল, তোমরা কি কসাই ভাবো আমাকে ? জহ্লাদ, বুচার ?

সূর্যদার ভাঙাচোরা মুখে রক্তের ঝলক। থরথর করে মানুষটা কাঁপছে। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বিরক্ত গলায় অতীন বলল, সূর্যদা, এতো উত্তেজিত হবেন না।

এক মুহূর্ত থেমে কিশোরকে অতীন বলল, অনেক সময় নিয়েছেন। এবার চলুন।

অতীনের দিকে তাকিয়ে সূর্যদা বলল, তুমি যাও। আমি না ডাকা পর্যন্ত ঘরে ঢুকবে না।

থতমত খেল অতীন। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। অতীন যেতে সূর্যদা বলল, সেণ্ট্রাল কমিটি বসার পর পার্টির রাজনীতি, কর্মসূচি বদলে যাবে। ভুল শুধরে নেবো আমরা। তবে একটু সময় লাগবে। চটপট কিছু করলে পার্টিতে গোলমাল হবে। ডিমোরালাইজ্ড্ হবে পার্টিকর্মীরা। সে ঝুঁকি আমরা নিতে চাইনা।

সূর্যদার খোলামেলা কথা কিশোরের ভালো লাগছে। প্রকৃত নেতার মতো জবাবদিহি করছে সূর্যদা। সূর্যদা বলল, পুণ্যবাবু শহিদ হবার পর থেকে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি আমি। আমাদের ভুল রাজনীতির খেসারত দিলেন পুণ্যবাবু। কী বিরাট মানুষ ছিলেন তিনি ! জীবনের মূল্যে শিক্ষা দিয়ে গেলেন। তাঁর সম্মান আমরা রাখবো। মানুষ ভুল করে। মানুষই শুধরে নেয় ভুল।

কিন্তু ভুলের দায়িত্ব আপনার একার নয়। আমরাও ভুল করেছি।

কিশোরের কথায় এক সেকেন্ড্ চুপ থেকে সূর্যদা বলল, নেতার ভুল যে কেউ ক্ষমা করেনা কিশোর।

কিন্তু নেতা তো একা নয়। যৌথনেতৃত্ব। দায়িত্ব সবার।

ম্লান হেসে সূর্যদা বলল, ভারতীয় ইতিহাস একটু আলাদা। একজন নেতাকে এখানে মাথায় তোলা হয়। শুধু তার নামেই জয় ধ্বনি ওঠে। তারপর সে ব্যর্থ হলে তাকে জবাই করা হয়।

সূর্যদার কথা চুপচাপ শুনছে কিশোর। সময় বয়ে যায়। রাত আটটার মধ্যে বিদ্যুতের বাড়িতে পৌঁছোতে হবে তাকে। বিয়ের আয়োজন করে সেখানে বসে আছে সবাই। উত্তেজনায় ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে কিশোর। বারবার মনে পড়ছে রেবার মুখ। বিয়ের কথাটা মুখে এলেও বলতে পারছে না। কিশোরের মুখের ওপর সূর্যদার তীক্ষ্ণ নজর। অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। কয়েক সেকেন্ড্ চুপ

থেকে সে বলল, রেবাকে বিয়ে করতে চাই আমি। তাকে নিয়ে এলাকায় ফেরা আমার ইচ্ছে।

কবে বিয়ে করছো ?

সূর্যদার প্রশ্নে কিশোর বলল, আজই।

হাসি ছড়ালো সূর্যদার শীর্ণ মুখে। কিশোরের কাঁধে রোগা হাতটা রেখে প্রশ্ন করল, নেমন্তন্ন পত্র কোথায় ?

লজ্জায় কিশোর ঘামছে। ঘরে ঢুকে অতীন প্রশ্ন করল, আপনি কি এখন ইঞ্জেক্‌শন্‌ নেবেন ?

ঘুম পাড়াতে চাও আমাকে ?

সূর্যদার প্রশ্নে থতমত খেয়ে অতীন বলল, নাহ্‌, কষ্ট পাচ্ছেন, তাই।

ঘর ছেড়ে চলে গেল অতীন। কিশোরের কাঁধের ওপর সূর্যদার হাত। হাত কাঁপছে। কম্পন ছড়িয়ে পড়ছে কিশোরের সারা শরীরে। উঠতে পারছে না সে। বাইরে ঘন হচ্ছে অন্ধকার। ঘরে টিমটিমে আলো। ঘর ছেড়ে যাবার সময় আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিল অতীন। অল্প আলোয় ধূসর স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে সূর্যদাকে। সূর্যদা বলল, অসুস্থতাই কাল হলো আমার। জীবদ্দশায় বিপ্লবটা দেখার জন্যে তাড়াহুড়ো করেছিলাম আমি। বাস্তবে গোজামিল দিতে গিয়ে কিল খেয়েছি। থেঁতলে গেছে আমার ইগো, অহমিকা। তার চেয়ে বড়ো কথা, প্রাণ দিল কয়েকশো তরুণ। এখন তোমরাই ভরসা। আমি মরে যাবো। তবু বিপ্লব হবে। ভুলত্রুটি শুধরে তোমরাই খুঁজে বার করবে সঠিক রাস্তা।

আবছা আলোকিত ঘরে সূর্যদার খোলামেলা স্বীকারোক্তি শুনে কিশোর পাথর। মানুষটার ওপর রাগ হচ্ছে তার। তবু রাগতে পারছে না। ভাঙা গলায় সূর্যদা বলল, ভুল, নির্ভুল যা করেছি, সবটুকুর প্রেরণা ছিল বিপ্লব। বিদেশী শক্তির দালাল, ধান্দাবাজ হিসেবে তোমরা মূল্যায়ণ ক'রো না আমার। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখবো আমি।

সূর্যদার মুখের কুঁকড়োনো, শিথিল চামড়া বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। আবেগে তোলপাড় কিশোরের বুক। এখনই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে সে। ঠোঁট টিপে শান্ত করছে নিজেকে। সূর্যদার বিছানার ওপর একটা জলচৌকিতে সাদা কাগজ, খাপ খোলা ফাউন্টেন্‌ পেন। জলচৌকির দিকে তাকিয়ে সূর্যদা বলল, পার্টির কৌশলগত লাইন নতুন করে লিখছি। গণফৌজ আর গণসংগঠন গড়তে হবে। এ দুটো হলো বিপ্লবের জাদুকাঠি। সামনে হপ্তায় সেণ্ট্রাল কমিটির সভায় এ দলিল পেশ করবো।

একমুহূর্ত চুপ থেকে সূর্যদা প্রশ্ন করল, আর সাতটা দিন কি আমি বাঁচবো ?

কাঁধের ওপর সূর্যদার হাতটা চেপে ধরে কিশোর বলল, আপনার মৃত্যু নেই।

রহস্যময় হাসি জাগলো সূর্যদার মুখে। কিশোরের কাঁধ থেকে হাত তুলে নিয়ে চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে সূর্যদা বলল, অমরত্ব নয়, বিপ্লব চেয়েছিলাম আমি। একমাত্র বিপ্লবীই অমর। শুধু স্বপ্ন দেখে অমরতার দাবীদার হওয়া যায় না।

বিছানায় সোজা হয়ে একমুহূর্ত বসে জলচৌকিতে মাথা রাখলো সূর্যদা। কষ্টকর শ্বাস টানার শব্দ। মানুষটা কষ্ট পাচ্ছে। কিশোরের মনে হলো, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যেই সূর্যদার এই দুর্ভোগ। চৌকি থেকে ঘাড় তুলে সূর্যদা বলল, তুমি যাও। তোমার জন্যে নিশ্চয় অপেক্ষা করছেন অনেকে। বিশেষ করে ভাবী বধূর তো দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সেন্ট্রাল কমিটির খবর সময়মতো পেয়ে যাবে তুমি।

সূর্যদার ডেরা ছেড়ে অন্ধকার গলিতে এলো কিশোর। দু'মিনিট হেঁটে বাস রাস্তা। রাস্তায় ট্রাম, বাস, গাড়ির মিছিল, মানুষের জটলা। আলোয় ঝলমল দোকান। ফুচকাওলা, ভিখিরী, ভবঘুরে, নিরুপদ্রব জীবনস্রোত। কিশোরের ভয়, আতঙ্ক মুছে গেল। বাস, ট্রামে না উঠে বিদ্যুতের বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করল সে। হাঁটা পথে এখান থেকে বিদ্যুতের বাড়ি দশ, বারো মিনিট। চেনা পথ। শেষ শীতের হালকা ঠাণ্ডায় হাঁটতে আরাম লাগছে তার। বারবার মনে পড়ছে সূর্যদার মুখ, কথা। এক নতুন সূর্যদাকে আজ বিকেলে আবিষ্কার করেছে সে। এ সূর্যদা তার চেনা, একান্ত আপনজন। সুখ, দুঃখ, সফলতা, ব্যর্থতার সাথী। রাস্তায় এক, দু'জন সন্দেহজনক মানুষ দেখে বেহিসেবী স্পন্দন জাগছে কিশোরের বুকে। বেড়ে যাচ্ছে চলার গতি।

বিদ্যুতের বাড়িতে রাত সওয়া আটটায় পৌঁছোলো কিশোর। সে যা ভেবেছিল বাড়ির আবহাওয়া তাই। শুকনো মুখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। কিশোরকে জড়িয়ে ধরে প্রভাদি বলল, আর পাঁচ মিনিট দেখে সূর্যদার ডেরায় আমি চলে যেতাম।

নমিতা বলল, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

কিশোর হাসলো। একতলার উঠোনে জোরালো বাল্ব জ্বলছে। আলোয় ঝলমল করছে সিমেণ্ট ওঠা পুরানো উঠোন। উঠোনের কোনে ভাঙাচোরা শুকনো চৌবাচ্চাটাও খারাপ দেখাচ্ছে না। চৌবাচ্চার পাশে ছোট ঘরে মুরগিগুলো হকচকিয়ে দেখছে আলো, মানুষ। বিদ্যুতের ঘরে বসে আছে রেবা। তার পাশে সুনীপা। কিশোর ঘরে ঢুকতে সুনীপা বলল, আচ্ছা আক্কেল আপনার!

খুব দেরি হয়েছে?

কিশোরের প্রশ্নে নকল রাগে সুনীপা বলল, বাজে কথা বলবেন না।

কিশোরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নমিতা। কিশোর দেখলো, একটা দামী নতুন শাড়ি পরে বিছানায় বসে আছে রেবা। লজ্জা জড়ানো তার মুখ। নমিতা বলল, কিছুতেই আপনার বউ একটা হালফ্যাশনের খোঁপা বাঁধতে রাজি হলো না। খোঁপা বাধার এক্সপার্ট আমি। সুযোগ পেলাম না।

মুখ টিপে রেবা হাসছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে একটা শিশি নিয়ে রেবার কপালে কুমকুমের টিপ এঁকে দিল নমিতা। বাড়ির বাইরে কাউকে জানানো হয়নি বিয়ের খবর। রেবার বাড়ি থেকে শুধু তপতী এসেছে। মাকে ডেকে আনার কথা তপতীকে প্রভাদি বলেছিল। তপতী বলেছে, দরকার নেই।

সাদামাঠা বিয়ের অনুষ্ঠান। উঠোনের মাঝখানে কিশোর, রেবা পাশাপাশি দাঁড়াতে রুপোর একটা সিঁদুর কৌটো খুললো প্রভাদি। কিশোরকে বলল, রেবার সিঁথিতে সিঁদুর দে।

তাই করল কিশোর। নবদম্পতিকে ধান, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল বিদ্যুতের বাবা, মা। রেবাকে বুকে জড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রভাদি।

বিয়ের আসরে একবার চোখ বুলিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো বিদ্যুৎ। আজ নিজে বাজার করেছে সে। দু'কেজি মাংস, দেড় কেজি মাছ, দই, মিষ্টি, শাক্‌সব্জি যা কিনেছে, দমভোর খেতে পারবে সবাই। খাঁটি বরকর্তার ভূমিকা নিয়েছে বিদ্যুৎ। আবহাওয়া লঘু করতে চাপা গলায় উলুধ্বনি দিল সুনীপা। বিষাণ বলল, স্প্যানিশ গিটার বাজাবো আমি।

কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে সুধাংশু বলল, কাল, পরশু তোমার সঙ্গে জরুরি আলোচনায় বসবো। নেতাজী সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পেয়েছি।

বিয়ের পর্ব শেষ হতে বিদ্যুতের ঘরে ঢুকলো রেবা, কিশোর। আজ রাতে এ ঘরেই থাকবে তারা। দুপুর থেকে ঠাকুমার কাছে আছে লব, কুশ। বিদ্যুৎ নমিতাও সেখানে থাকবে একটা রাত। বিছানায় বসেছে রেবা। সামনে চেয়ারে কিশোর। সিঁথির গুঁড়ো সিঁদুর রেবার কপালে, নাকে ছড়িয়ে পড়েছে। সামান্য সিঁদুরে বদলে গেছে রেবার মুখশ্রী। কিশোরের দিকে একপলক তাকিয়ে চোখ নামালো রেবা। কিশোরের হঠাৎ মনে পড়লো, হারুদা আজও ফেরেনি।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যে খাওয়ার পাট চুকে গেল। বাইরের অতিথি ছিল শুধু দু'জন। তপতী আর প্রভাদি। যাবার আগে চাপা গলায় কিশোরকে প্রভাদি প্রশ্ন করল, সূর্যদার সঙ্গে কথা হয়েছে?

হ্যাঁ, কিশোর বলল।

সমস্যা মিটেছে?

মিটেছে।

প্রভাদি, তপতী চলে যেতে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে নমিতা বলল, রাত হয়েছে। আপনারা ঘুমোন।

হকচকিয়ে কিশোরের দিকে তাকালো রেবা। কিশোর প্রশ্ন করল, হারুদা ফিরেছে?

নাহ্‌।

রেবার ক্লান্ত গলার জবাব শুনে কিশোর আবার প্রশ্ন করল, তোমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল?

নাহ্‌।

সিঁদুর মাখা রেবার মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। কিশোর ঠিক করল, হারুদা সম্পর্কে আজ রাতে আর কোনো প্রশ্ন সে করবে না। ভবিষ্যতের কথা বলবে।

সত্য, মিথ্যে যা হোক, উজ্জ্বল অনাগতের কাহিনী শোনাবে। তাই করল সে। বুকে জমে থাকা অসংখ্য কথা মাঝরাত পর্যন্ত রেবাকে শোনালো। কথা তবু ফুরোয় না। শেষ হয় না। মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ, কুকুরের ডাক চমকে দিচ্ছে তাকে। রেবাকেও কথায় পেয়েছে। বলার কথা তারও কম নেই। রেবা বলল, আর সাত, দশ দিন অপেক্ষা করে তোমার কাছে চলে যেতাম।

কিশোর শোনালো, অজিত, লালমুনির কাহিনী। লালমুনির বাচ্চা হবে শুনে শিহরিত হলো রেবা। এতো কথা, সুখ, স্বপ্নের মধ্যেও কিশোরের মাথায় ঘুরে ফিরে ভেসে উঠছে মোতির মুখ। লখাই, শিবেন, বুদ্ধদেব ভিড় করছে তার স্মৃতিতে। শব্দহীন বুদ্বুদের মতো একটা প্রশ্ন মাঝেমাঝে জেগে উঠছে, কোথায় গেল হারুদা?

পঞ্চান্ন

কলকাতা থেকে এগারো দিন পরে বাহেঙ্গায় ফিরলো কিশোর। রেবাকে সঙ্গে এনেছে সে। কিন্তু আপাতত কিছুদিনের জন্যে সিউড়িতে মাধবের বাড়িতে রেখে এসেছে রেবাকে। হালচাল বুঝে এলাকায় নিয়ে আসবে তাকে। শেষবিকেলে সিধনদীর ধারে শালবনে কিশোরকে দেখে চমকে গেল ভাদু। একটু আগে তার মাথায় ওপর কোনো গাছে একটা পিঅই পাখি ডেকেছিল। চেষ্টা করেও পাখিটাকে দেখতে পায়নি ভাদু। তবু তার মনে হয়েছিল, আজ সুদিন। ভালো কিছু ঘটবে। পাঁচ মিনিট পরে কিশোরের মুখোমুখি হয়ে ভাদুর গায়ে কাঁটা দিল। ফিসফিস করে সে বলল, কমোরেট্!

ভাদুর কাঁদে হাত রাখলো কিশোর। ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো ভাদু। আনন্দের কান্না। এ সৌভাগ্য ভাবতে পারে নি সে। ভাদুর কান্না থামতে কিশোর প্রশ্ন করল, পুঁইশার খবর কী?

উজ্জ্বল হলো ভাদুর মুখ। সে বলল, বেটা হঁইচে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর প্রশ্ন করল, রবি কোথায়?

উর হদিশ নাই।

কিশোর আর প্রশ্ন করল না। গড়গড় করে ভাদু বলছে নানা খবর। জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে পুঁইশা সন্তান প্রসব করেছে। মাথায় কাঠের বোঝা, কোলে নবজাত বাচ্চা নিয়ে ঘরে ফিরেছিল সে। ভাদুর গল্প শুনে কিশোরের রোমকূপ খাড়া হয়ে গেছে। পুঁইশাকে একবার দেখার জন্যে অস্থির বোধ করছে সে।

শালবনে কিশোরকে দেখে বাহেঙ্গার কেউ গ্রামে খবর দিয়েছে। গ্রাম থেকে পিলপিল করে শালবনে ঢুকছে মানুষ। বাঁশি নিয়ে এলো পুনাই। তার সঙ্গে ধামসা, মাদল গলায় ঝুলিয়ে এসেছে একঝাঁক তরুণ। কিশোরকে ঘিরে নাচ, গান শুরু করল তারা। সকাল থেকে হাঁড়িয়ায় চুর হয়েছিল বুরুংমাঝি। তরুণদের সঙ্গে তালি বাজিয়ে সে গান ধরলো, গায় গুপি রেহ দাদা ঝমঝম। কাদাগুপি রেহ দাদা ঝমঝম!

আসর থেকে পুনাইকে ডেকে কিশোরের ফেরার খবর তাঁতলুইতে পাঠালো ভাদু। এক, দেড় ঘণ্টার মধ্যে তাঁতলুই-এর জনস্রোত আছড়ে পড়লো বাহেঙ্গার শালবনে। নাচগান, মত্ত আনন্দের মধ্যে কিশোর বলল, আজ রাতে এখানে থাকবে সবাই। অনেক কথা আছে।

মাঝরাতে নাচগানের আসর ঢিমে হতে কলকাতার খবর, পার্টির নতুন ভাবনার কথা সকলকে বলল কিশোর। তার বক্তৃতা শুনে হতাশ, ক্লান্ত মানুষগুলো উত্তেজনায়

টানটান হলো। তাদের মনের কথা বয়ে এনেছে কিশোর। এ কোনো মামুলি ঘটনা নয়। কিশোরের বক্তৃতার পরে ঠিক হলো সিধু, কানুর স্মরণসভা ডেকে পার্টির নতুন ভাবনা সাধারণ মানুষের সামনে রাখা হবে।

বুরুং নেচে যাচ্ছে, গায়গুপি রেহ চাদা ঝমঝম, কাদাগুপি রেহ দাদা।

নাচ, গান, হৈচৈ-এর মধ্যে ঠিক হলো, সারহাই পরব শেষ হলে সিংভূম, দুমকা, বীরভূম, ভাগলপুর, গোটা সাঁওতাল পরগণার মানুষকে ডেকে, অনুষ্ঠিত হবে স্মরণসভা। সিধু, কানু শুধু সাঁওতাল নেতা নয়, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি। মঙ্গল হেমব্রম আর থিওডোর সাবন্তীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে স্মরণ কমিটি গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হলো। মঙ্গল হিন্দু আদিবাসী, থিওডোর খৃস্টান আদিবাসী। মঙ্গল সিংভূম, আর থিওডোর দুমকার বাসিন্দা। দু'জনই গরীব কৃষক, পার্টির সমর্থক। চাষের কাজে প্রায়ই বাহেঙ্গায়, তাঁতলুইতে আসে তারা। মঙ্গল, থিওডোরকে খবর দেবে কে?

প্রশ্ন উঠতে কিশোর শুনলো, রবি, অজিত দুজনই বেপাত্তা। পুনাই, ভাদু, কির্তা দায়িত্ব নিলেও উচাটন কিশোরের মন। সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করল না সে। ভোররাতে বসনমাঝির বাড়ি যেতে কিশোরকে বুধন বলল, বানাকুলির বিশ, পঁচিশটা গুহা আঁতিপাতি খুঁজে কিশোর, লালমুনির হদিশ পায়নি সে। দু'দিন, তিন রাত বানাকুলিতে পড়েছিল বুধন। বসনমাঝি বলল, সাতদিন আগে অজিত, লালমুনির জন্যে পান্তাভাত নিয়ে গিয়েছিল সে। সেই শেষ দেখা।

অজিত, লালমুনি কোথায় যেতে পারে, হদিশ করতে পারছে না কিশোর। দুশ্চিন্তায় মুখ বুজে আছে সে। রাত শেষ হচ্ছে। মাধবের ঘাড়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ কিশোর চাপিয়ে দিয়ে এসেছে। সিউড়ি থেকে তাঁতিপাড়ায় রেবাকে পৌঁছে দেবে মাধব। কাল, পরশুর মধ্যে তাঁতিপাড়ায় এসে যাবে রেবা। মাধবের ঘাড়ে আরও একটা দায়িত্ব চাপিয়ে এসেছে কিশোর। রেবাকে তাঁতিপাড়ায় রেখে রাজনগরে হারুদার খোঁজ করবে মাধব। কোথায় গেল হারুদা! কলকাতা ছেড়ে যাবার পনেরো দিন পরেও কেন বাড়ি ফিরলো না সে? হারুদার হদিশ পেতে তার সব খবর মাধবকে বলেছে কিশোর। কিশোর জানে, জান লড়িয়ে হারুদার তল্লাশ করবে মাধব। হারুদার খবর না পাওয়া পর্যন্ত কিশোরের অশান্তি কাটবে না। মাধবকে সাহায্য করবে মানব। আরও একটা কাজ মানব করবে। গোপনে যোগাযোগ করে চটজলদি তাঁতিপাড়ায় একটা বৈঠক ডাকবে সে। মানব ভালো সংগঠক। কাজে খামতি নেই তার। বাহেঙ্গা, তাঁতলুই, বৃন্দাবনী, টোংরা ঘুরে দু'তিন দিনের মধ্যে কিশোর তাঁতিপাড়ায় পৌঁছে যাবে। এখন তার হাতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তাকে দেওয়া হয়েছে রিজিওনাল কমিটির সব দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কিশোর পেশ করেছিল একটি লিখিত দলিল, তরণীপাহাড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের রিপোর্ট। রিপোর্টটা সে লিখলেও সবার অভিজ্ঞতা সংকলিত হয়েছে দলিলে। স্তব্ধ বিস্ময়ে কিশোরের রিপোর্ট শুনেছিল কেন্দ্রীয় কমিটির চার সদস্য। কেন্দ্রীয় কমিটি রেখে দিয়েছে সে রিপোর্ট। ছাপিয়ে

পার্টির মধ্যে আলোচনার জন্যে বিলি হবে তরণী পাহাড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস। তার আগেই এলাকায় কিশোরকে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে পার্টি। আগের মতোই কাজ করবে সে! গণফৌজ, গণসংগঠন গড়ার যে উদ্যোগ সে নিয়েছে, পার্টি অনুমোদন করেছে। সূর্যদার সঙ্গে আলোচনার পর কিশোরের মনে হয়েছিল চিতাভস্ম থেকে যেন জেগে উঠেছে সে। তাকে আর রুখতে পারবে না কেউ।

বুধনের বাড়িতে রাতে আশ্রয় নিল কিশোর। আজই লালমুনির মা জেনেছে মেয়ের নিখোঁজ হবার খবর। সন্ধ্যে থেকে সেই যে কাঁদতে শুরু করছে মা, এখনও থামেনি। রাত প্রায় দশটা। নিস্তব্ধ, অন্ধকার গ্রাম। কোথাও মানুষের সাড়া নেই। দাওয়া থেকে ভেসে আসছে লালমুনির মায়ের ফোঁপানির শব্দ। উঠোনে আগুন জেবলে মুখোমুখি বসে আছে কিশোর, বুধন। দূর থেকে ভেসে এলো গুলির শব্দ। অনেক মানুষের আবছা হৈ চৈ। কাছের কোনো গ্রামে মিলিটারি, পুলিশ ঢুকেছে। ভাগলপুর জেল ভেঙে বন্দীদের পালাবার পর থেকে গ্রামে গ্রামে বেড়েছে ফৌজি তাণ্ডব। শুধু গ্রামে নয়, পাহাড়ে, জঙ্গলে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দিতে বহুগুণ বেশি শক্তি নিয়ে নেমে পড়েছে তারা।

উঠোন ছেড়ে কুলিতে এসে দাঁড়ালো কিশোর, বুধন। চাপা গলায় বুধন বলল, ইখন বানাকুলিতে একবার গেঁইলে কেমন হয় ?

বানাকুলি, মানে তরণীপাহাড়ে যাবার জন্যে বিকেল থেকে ছটফট করছিল কিশোর। অজিত, লালমুনিকে পাহাড়ের যেখানে বিদায় দিয়েছিল, তন্নতন্ন করে সে জায়গাটা কিশোর দেখতে চায়। পাহাড়ের কোনো গুহায় লালমুনিকে নিয়ে অজিত নিশ্চয় আছে। জঙ্গল ঘেরা সেই দুর্ভেদ্য পাহাড়ে গণফৌজের সদরদপ্তর। বাইরের কোনো আনকা লোক সে পাহাড়ে গিয়ে অজিত লালমুনির হদিশ পাবে না। পাহাড়ের গুহায় ষাট, সত্তরটা বন্দুক, বিস্তর গুলিও মজুত আছে। অজিত, লালমুনি অরক্ষিত নেই। তাছাড়া পাহাড়ী গুহা, জঙ্গলে আছে অনেক ভালুক, বুনো মোষ, খটাশ, ভাম। তাদের ভয়ে অজিত, লালমুনির খোঁজে যারা পাহাড়ে গিয়েছিল, খুব বেশি এগোয় নি তারা। বুধনকে নিয়ে অজিত সেখানে গেলে সমস্ত গোপন গুহা, আস্তানায় উঁকি দিতে পারবে। তাদের সাড়া পেলে অজিত, লালমুনিও লুকোনো আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। বুধনের কথায় কিশোর বলল, ঠিক আছে। চল্, এখনই বানাকুলি যাই আমরা।

কুলির মাথায় অন্ধকার গাছতলায় নরহরি, ভাদু বসেছিল। কিশোর বুধন তরণীপাহাড়ে যাচ্ছে শুনে তারাও সঙ্গী হলো। গত রাতে সিউড়ি পোঁছে দু'তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিল কিশোর। মাধব, মানবের সঙ্গে কথা বলতে রাত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে বাসে রানীশ্বর পোঁছে দশ, বারো মাইল হেঁটেছে। শরীরে অপরিসীম ক্লান্তি। তবু সামান্য ক্লান্ত লাগছে না। তার রাজনীতি পার্টি মেনে নিতে নতুন জীবন পেয়েছে সে।

তরণীপাহাড়ের গভীর জঙ্গলে শেষ রাতে পোঁছে গেল চারজন। অদৃশ্য সুইচ টিপে আড়াল থেকে কেউ একটা একটা করে নিভিয়ে দিচ্ছে আকাশের তারা।

বেশিরভাগ তারা নিবে যেতেই বোধহয় উজ্জ্বলতর হয়েছে পূব আকাশের শুকতারা। পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে বাঁয়ে ঘুরে একটা ঢিবির সামনে কিশোর দাঁড়ালো। সেই জায়গা। অজিত, লালমুনির কাছ থেকে এখানেই বিদায় নিয়েছিল কিশোর। আজ ঠিক পনেরোদিন হলো। পুবে ঢালের আড়ালে জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল অজিত, লালমুনি। সঙ্গীদের নিয়ে ঢালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো কিশোর। এখান থেকে তল্লাশী চালাতে হবে। এখনও বেশ অন্ধকার। সকালের আলো না ফুটলে এলোপাথারি ঘুরে লাভ নেই। দেড়, দু'ঘণ্টা পরে সূর্য উঠবে। ঢালের পাশে জঙ্গলে বসলো কিশোর। বুধন, নরহরি, ভাদুও বসেছে। অন্ধকারেও বুধনের উদ্বেগ বুঝতে কিশোরের অসুবিধে হলো না।

সূর্য ওঠার পর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জঙ্গলে, গুহায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও অজিত, লালমুনিকে পাওয়া গেল না। ক্ষিধে, ক্লান্তিতে চারজন ধুঁকছে। জঙ্গলের কোথাও মাটি খুঁড়ে একটা বুনো ওল জোগাড় করেছিল ভাদু। ওলটা পুড়িয়ে নরহরি, বুধন খাবার পরে গলা বসে গেছে তাদের। কথা বলতে পারছে না তারা। ওলটা খেতে বারণ করেছিল বুধন। ক্ষুধার্ত ভাদু, নরহরি নিষেধ শোনে নি। অজিত, লালমুনির হদিশ করতে না পেরে আশঙ্কায় কাঁপছে কিশোরের বুক। তার জন্যে এই পাহাড়ে অপেক্ষা করার কথা ছিল অজিতের। প্রতিশ্রুতি ভাঙার ছেলে অজিত নয়। তাহলে কোথায় গেল সে? কী হলো তার? পাহাড়ের পশ্চিমে কি আছে সে? পশ্চিমে সটান খাড়াই। গাছপালা কম। এরকম জায়গায় অজিতের আশ্রয় নেবার সম্ভাবনা কম। ডুগডুগির শব্দ শুনতে পেল কিশোর। খাড়াই বেয়ে উঠছে কেউ। দিনশেষের ফিকে আলোয় মানুষটাকে চিনলো কিশোর। ভালুকওলা কানুপা আসছে। তার সঙ্গী একটা ভালুক। দড়ি বাঁধা নিরীহ ভালুকটা চোখ বুজে হাঁটছে। তাহলে নতুন একটা ভালুক জোগাড় করেছে কানুপা। পাহাড়ের মাথায় আবছা অন্ধকারে কিশোর এবং তার তিন সঙ্গীকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল কানুপা। বুধন, নরহরি, ভাদুকে বিলক্ষণ চেনে কানুপা। এক মুহূর্ত অবাক চোখে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো কানুপা। ঢাল বেয়ে যে পথে এসেছিল, পালিয়ে যেতে চাইল। তাকে ঘিরে ধরেছে বুধন, ভাদু, নরহরি। ভয়ার্ত কানুপা বলল, ইথান থিকে এখনই ভেগে যা তুরা। পাহাড় ঘিরে আছে পুলিশ।

এক মুহূর্ত থেমে কানুপা বলল, তিন দিন আগে ইখানে চড়াও হঁইয়েছিল বহুৎ পুলিশ, মেলেটারি। গহীন রাত তখন। কাকে যেন ধঁইরে নিয়ে গেল, মালুম কঁইরতে নারলুম।

কিশোরের শিরা, স্নায়ুতে বয়ে যাচ্ছে হিম স্রোত। নরহরি, বুধন চুপ। ছটফট করছে বুধন।

কানুপা বলল, গুল্লি খেয়ে নানকু মঁইরে যাবার পরে বহুৎ তকলিফ করে এই ছোটকুটারে পেঁইয়েছি। ছোটকুরে বাঁচাতে কী ঘটছে ঠাহর কঁইরি নাই।

কাঁপা গলায় বুধন প্রশ্ন করল, পুলিশ কি শুধু একজনকে ধঁইরেছে?

তাই তো মনে লয়।

আমার বহিন লালমুনি ?

বুধনের প্রশ্নে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো কানুপা। তারপর বিড়বিড় করল, কোনো মাইয়ারে তো দেঁইখি নাই।

অজিত ধরা পড়েছে বুঝেও বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। কানুপা আবার বলল, একজন মরদকে দড়ি বেঁইধে পুলিশকে নিয়ে যেতে দেঁইখেছি। পেল্লায় আলো জ্বাইলেছিল তারা। কুনো মাইয়ারে তো দেখি নাই।

নরহরি, ভাদু মুখ চাওয়াচায়ি করছে। কানুপার কথায় বোঝা যাচ্ছে, শুধু অজিতকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। কানুপাকে অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। তাহলে লালমুনি কোথায় ? লালমুনির সাহস আছে। বাস্তববুদ্ধিরও অভাব নেই। কিশোরের অ্যারেস্টের খবর বাহেঙ্গায় তার পৌঁছে দেবার কথা। সাধারণ বুদ্ধি তাই বলে। কিন্তু তা না করে কেন নিরুদ্দেশ হলো লালমুনি ? তারও কি কোনো বিপদ ঘটেছে ? কী বিপদ ?

কিশোরের মাথা কাজ করছে না। পরপর ঘটনাগুলো সাজিয়ে ভাবতে চাইছে সে। অজিতের ধরা পড়ার পরে নিশ্চয় জঙ্গলে কোথাও লুকিয়ে দেখেছে লালমুনি। যদি তাই হয়, তাহলে বাহেঙ্গায় ফিরে যাওয়া লালমুনির উচিত ছিল। পথঘাট তার চেনা। সবচেয়ে বড়ো কথা, তার পেটে অজিতের সন্তান। সন্তানের জন্যেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবে সে। বাহেঙ্গায় বাপের ভিটের চেয়ে বেশি নিরাপদ আশ্রয় কোথায় সে পাবে ? তবু বাহেঙ্গায় যায়নি লালমুনি। তাহলে ? মাথার মধ্যে নিঃশব্দ প্রশ্নোত্তরে বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো কিশোর।

ডুগডুগি বাজিয়ে ঘরে ফিরছে কানুপা।

ছাপাম

অজিত ধরা পড়ার পরে কলকাতা থেকে যে উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিশোর ফিরেছিল, চুপসে গেছে। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, অজিতের এ্যারেস্ট্, কিশোরের কাছে এখনও হেঁয়ালি। নানা উপায়ে চেষ্টা করেও থানা হাজত, জেলে অজিতের হদিশ পায়নি কিশোর। .অজিতের খবর পেতে ভাগলপুর, দুমকায় নরহরিকে পাঠিয়েছিল কিশোর। নরহরির সঙ্গে ছিল মাধব। দু'জনের কেউ জোগাড় করতে পারেনি অজিতের খবর। তবে একটা খবর নরহরি যা বলেছে, তা হলো, পুলিশের চোখে কিশোরের চেয়ে অজিত অনেক বেশি বিপজ্জনক। অজিতের সাঁওতাল বনে যাওয়া, সাঁওতাল মেয়ের সঙ্গে দুলহার, কিছুই পুলিশের অজানা নয়। আদিবাসী সমাজে অজিতের সীমাহীন জনপ্রিয়তাও পুলিশ জেনেছে। তাই তাকেই পুলিশের বেশি ভয়।

এ খবর শুনে কিশোরের আতঙ্ক বেড়েছে। অজিতের মতো সংগঠককে বাঁচিয়ে রাখবে না প্রশাসন। মোতিকে যেমন তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে খুন করেছিল, সেভাবে অজিতকে নিঃশেষ করবে। অজিত নামে সর্বত্যাগী এক তরুণ দেশসেবকের মৃত্যুর কাহিনী দেশের ষাটকোটি মানুষের ষাট জনও জানবে না। তবু প্রতিটি সভায় অজিতের কাহিনী বলছে কিশোর। বাহেঙ্গা, তাঁতলুই, বাঁশকুলির সভার পর টোংরায় বৈঠক বসেছে আজ। পার্টি কর্মীদের অনেকে সভায় আসেনি। সরহাই পরব না চুকলে সকলকে পাওয়া যাবে না। কির্তা, পুনাই, বরুং, বীরসিং, গোরমাঝি সকলেই পরবে ব্যস্ত। কিশোরের সঙ্গে ছায়ার মতোর লেগে আছে বুধন, ভাদু, নিতাই, নরহরি। গত সনেও এই হয়েছিল। পরবের স্রোতে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল অন্য ঘনিষ্ঠ পার্টিকর্মীরা। তবে তখন পরিস্থিতি ছিল একদম আলাদা। সরব, সবল ছিল পার্টি। মুঠোর মধ্যে ছিল গোটা এলাকা। এখন অবস্থা বদলেছে। পার্টি পিছু হঠেছে। পুলিশ, মিলিটারি, প্রতিরোধবাহিনীর বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। জোতদার, ভূস্বামীরা গায়ের জোরে নিজেদের খামারে তুলেছে মাঠের ফসল। দলবল নিয়ে গাঁয়ে ঢুকে গ্রামের গরীবদের রোজ অপমান, নির্যাতন করছে। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে অর্ধেকের বেশি পুরুষমানুষ। রবি নিখোঁজ। বাঘা, নির্মলার পাত্তা নেই।

টোংরার সভায় কিশোর বলল, কমরেড অজিতের ত্যাগ ব্যর্থ হবে না। হাজার হাজার মানুষকে সিধুকানু মেলায় জমায়েত করে বোঝাতে হবে অজিতকে আমরা ভুলিনি, ভুলবোনা।

কিশোর থামতে বক্তৃতা করল নিতাই। কিশোরের বক্তব্য নিজের মতো গুছিয়ে

বলল সে। তার কথায় সায় দিল সবাই। কির্তা শুধু বলল, শাহি পরবের পরে হুল শুরু হইলে ভালো হয়।

নিতাই এর কথায় যারা সায় দিল কির্তাকেও ডেংটে সমর্থন জানালো তারা।

কিশোর বুঝতে পারছে, এখন ভাঁটার সময়। আগামী এক, দু'মাস ছোটখাটো সভা, বৈঠক, আলোচনা ছাড়া কোনো বড়ো কাজে হাত দেওয়া যাবে না। দেওয়া উচিতও নয়। বিপ্লবের চেয়ে আদিবাসী জীবনে সামাজিক উৎসব বড়ো ঘটনা। সামাজিক উৎসব না করলে তারা বিপ্লব করতে আগ্রহ পাবে না। সরহাই চুকলে পার্টির কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত হলো। সভা শেষ করার আগে কিশোর প্রশ্ন করল, পরবের এই সময়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে চাই আমি। কারও আপত্তি আছে? কেউ সঙ্গী হতে চান আমার?

শ্রোতারা মুখ চাওয়াচায়ি করছে। বুধন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কমোরেট, আমি থাকবো।

নরহরি বলল, আমিও থাকবো।

নিতাই বলল, তুমার সাথে নরক পর্যন্ত যেতে আমি রাজি।

ভাদু বলল, আমিও।

তাদের কথায় উদ্ভাসিত হলো কিশোরের মুখ। সে বলল. চারজনই যথেষ্ট। যারা পরবে থাকবেন, তাদেরও ভুলবো না। পরব শেষ হলেই তাদের ডাকবো।

পুনাই, কির্তা, বুরুং পরপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরাও আছি।

তাদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করল কিশোর। বলল, পরবও বিপ্লব। উৎসবের দিনে বিপ্লবের কথা মনে রেখো। অজিতকে মনে রেখো।

ভোর হবার আগে বুধন, ভাদুকে নিয়ে বাগজোরায় রওনা হলো কিশোর। বাগজোরা ছুঁয়ে বেলা বারোটার মধ্যে তাঁতিপাড়ায় পেঁাছোতে হবে। সেখানে সভা পাকা করে কিশোরকে খবর পাঠিয়েছে মানব। গোপন, গুরুত্বপূর্ণ সভা। কিশোরকে যেতেই হবে। পার্টির নতুন রাজনীতি তাঁতিপাড়ার কর্মীরা মেনে নিলে চারপাশে তার প্রভাব পড়বে। তেজ, ত্যাগ, বিচক্ষণতায় মধ্যবিত্ত এলাকার মধ্যে তাঁতিপাড়া আদর্শ। এ সভাতে না গিয়ে কিশোরের উপায় নেই। জেল ভেঙে বেরিয়ে বাবলু আবার তাঁতিপাড়ায় ঢুকেছে। অকুতোভয়ে কাজ করছে। কিন্তু এখনও সে আঁকড়ে আছে পুরোনো পার্টিলাইন। গণফৌজ, গণসংগঠন গড়ার সে বিরোধী। তাঁতিপাড়ায় তার অনেক অনুগামী আছে। বাবলুকে নিয়ে কিশোরের তাই দুশ্চিন্তা। কিশোরের কপালে, শরীরে লাগছে ভোরের ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস। শিশির ভেজা আলপথ। পায়ের পাতায় লেপ্টে যাচ্ছে জল, ঘাস, মাটি।

কলকাতা ছাড়ার আগের দিন রেবাকে নিয়ে মা, বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিশোর। মা, বাবাকে প্রণাম করেছিল রেবা। মা বেজায় খুশি। রেবাকে গম্ভীর মুখে বাবা প্রশ্ন করেছিল, সব জেনেশুনে বিয়ে করেছো তো?

মাথা নিচু করে রেবা বলেছিল, হ্যাঁ।

বাবার কথার মধ্যে রেবার গলা জড়িয়ে ধরে রেনু বলেছিল, বৌদি, এখানে থাকো তুমি।

রেনুর কাঁধে হাত রেখে রেবা হেসেছিল।

কিশোরকে রেনু বলেছিল, বৌদিকে রেখে যাও ছোড়দা।

কিশোর বলেছিল, এটা তোর বৌদির ব্যাপার।

ফসল উঠে যাওয়ায় ফাঁকা মাঠ। চুপচাপ হাঁটছে কিশোর। তার পেছনে চাপা গলায় কথা বলছে বুধন, ভাদু। লালমুনির খোঁজ এখনও ছাড়েনি বুধন। স্মৃতির স্রোত বইছে কিশোরের মাথায়। কলকাতা ছাড়ার আগে পুরোনো কিছু বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছিল সে। নিষ্ঠার সঙ্গে গণসংগঠন, গণআন্দোলন করার কথা তাদের বলে এসেছে। কিশোরের পরামর্শে রাজি হয়েছে তারা। রাজনীতির পালাবদলে তারা খুশি। নতুন উদ্যমে মহিলা সমিতি গড়ায় নেমে পড়েছে প্রভাদি।

ফসল কাটা ফাঁকা মাঠ। দু'এক টুকরো জমিতে এখনও ধান কাটা চলেছে। রোদের তাপ বাড়লেও বাতাসের গভীরে শীত ভাব। বাগজোরার সোজা পথ ছেড়ে বুধন, ভাদুকে নিয়ে আলপথ ধরেছে কিশোর। রেবাকে আজ তাঁতিপাড়ায় পৌঁছে দেবে মানব। নানা দুর্যোগ সত্ত্বেও তাঁতিপাড়ায় আজও পার্টি দরদীর সংখ্যা কম নয়। বেশ কিছু নিরাপদ আশ্রয় আছে সেখানে। তাঁতিপাড়ার সভার খবর নিয়ে কাল যখন মাধব বাহেঙ্গায় এসেছিল, কিশোর সেখানে ছিল না। সে তখন তরণীপাহাড়ে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পুরো সময়ের পার্টি কর্মী হতে চায় মাধব। কিশোরের সঙ্গে কথা বলে পাকা সিদ্ধান্ত নেবে। মাধবকে পার্টিকে এনেছে, কমরেড বানিয়েছে নরহরি। তাকে পার্টির পুরোসময়ের কর্মী বানাবার মতলবও নরহরির মাথা থেকে বেরিয়েছে।

বেলা দশটায় বাগজোরা পৌঁছোলো কিশোর। এই সকালেই গ্রামের কুলিতে গানের আসর বসেছে। তুমুল আনন্দ। মুখোমুখি দু'সারি যুবক, যুবতী। পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ঢেউয়ের মতো সামনে এগিয়ে আসছে তারা। আবার পেছিয়ে যাচ্ছে। তাদের পা, সুঠাম শরীরে মনোরম ছন্দ। গানের সুর, নাচের ছন্দে মিশে আছে জীবনের মহিমা। ধামসা, মাদল, বাজাচ্ছে দুই তরুণ। মাদল-বাদকের পাশে দাঁড়িয়ে ডগর। চোখের ইসারায় কিশোরকে ডেকে নিল ডগর। আসরে মাছির মতো আটকে গেছে ভাদু। বুনো ওল খেয়ে বুজে যাওয়া তার গলা এখনও সারেনি। চিঁচি করে কথা বলছে সে। তবু আসর ছেড়ে নড়ার লক্ষণ নেই তার। নরহরির অবস্থা আরও খারাপ। গলা বুজে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পেট-খারাপ হয়েছে তার। সে প্রায় শয্যাশায়ী।

কুলির মাঝ বরাবর ডগরের বাড়ি। কিশোর, বুধনকে বাড়িতে নিয়ে এলো ডগর। ডগরের বাড়ির উঠোনেও পাঁচ, সাতজন ছেলে মেয়ে। চালের পিঠে আর হাঁড়িয়া খাচ্ছে তারা। অকারণ হাসিতে মাঝে মাঝে সরগরম করছে বাড়ি। সরহাই পরব না মেটা পর্যন্ত পার্টির কাজ যে বিশেষ এগোবে না, বুঝে গেছে কিশোর। তবু পার্টির নতুন রাজনীতি সম্পর্কে ডগর, জিয়ন এবং বাগজোরার বন্ধুদের

দু'চার কথা কিশোর বলে যেতে চায়। বাগজোরা ছেড়ে বরুণ, অমল, কল্যাণ চলে যাবার পরে হতাশ হয়েছে এলাকার মানুষ। অগোছালো সংগঠন। কিশোরের ভরসা পেলে আবার হয়তো চাঙ্গা হবে তারা। এক তরুণীকে ডগর প্রশ্ন করল, জিয়ন কুথা?

প্রশ্ন শুনে মেয়েটা হেসে কুটিপাটি। একফালি রোদ পড়েছে উঠোনে। বাতাসে ভেসে আছে ধামসা, মাদলের শব্দ, গানের সুর। বাগজোরা থেকে তাড়াতাড়ি না বেরোলে ঠিক সময়ে তাঁতিপাড়ায় পেঁাছোনো যাবে না। ইতিমধ্যে একঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। আর অপেক্ষার সময় নেই। অধৈর্য বোধ করছে কিশোর। তিনটে শালপাতায় দুটো করে পিঠে নিয়ে এক তরুণী দাওয়ায় রেখে ডগরকে বলল, তুরা খা। ইখনই এইসে যাবে জিয়ন।

বুধন খেতে শুরু করেছে। পিঠেতে কামড় বসিয়ে একচুমুক হাঁড়িয়া খেল ডগর। ক্ষিধে, তেষ্টায় শরীর কাঁপলেও পিঠেতে হাত ঠেকালো না কিশোর। রুক্ষ গলায় মেয়েটাকে প্রশ্ন করল, জিয়ন কুথা?

সামনে একটা দোতলা মাচানের দিকে আঙুল তুলে মেয়েটা বলল, হোই হুথা।

মাচানে ওঠার জন্যে একটা মই খাড়া আছে। মই-এর দিকে কিশোর এগোতে মেয়েটা বলল, ইখন উখানে তু যাস না।

তার কথায় কান না দিয়ে মই বেয়ে মাচানের দোতলায় উঠে গেল কিশোর। সামনে একফালি বারান্দা। তারপর ঘর। নিচ থেকে ডগর ডাকলো কমোরেট, ইখন যাস না ঘরে।

তার কথা না শোনার ভান করে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো কিশোর। ঘরে একটা ছোট জানলা। অল্প আলো ছড়িয়ে আছে। ঘরের মেঝেতে চোখ পড়তে পাথর হয়ে গেল কিশোর। মেঝেতে চাটাই-এর ওপরে একজোড়া নগ্ন যুবকযুবতী। মিথুনমূর্তি। দরজায় কিশোরকে দেখে একটুও লজ্জা পেল না জিয়ন। বলল, তু একটু দাঁড়া। আধাঘণ্টার বেশি লাইগবে না আমার।

ঝাঁঝা করছে কিশোরের মাথা, কান। মই বেয়ে নিচে নেমে এলো সে। তার মুখ দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েরা। পনেরো মিনিটের মধ্যে মাচা থেকে নেমে এলো জিয়ন। সরল মুখে লজ্জার বালাই নেই। তরুণতরুণীদের কেউ একটা প্রশ্ন করল না তাকে। কিশোরের হাত চেপে ধরে জিয়ন হাসলো। তার শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে চেনা এক গন্ধ। কবে, কোথায় এ গন্ধ পেয়েছে, ভাবতেই কিশোরের মনে পড়লো, অজিতের শরীরেও একদিন জড়িয়ে ছিল এ গন্ধ। সাজি-মাটির গন্ধ! সাঁওতাল তরুণীর দেহ, শাড়ি থেকে এ গন্ধ বেরোয়।

বুধন, ডগরের মুখ দেখে তারা যে ইতিমধ্যে অনেকটা হাঁড়িয়া টেনেছে, বুঝতে কিশোরের অসুবিধে হলো না। বাড়ির পেছনে এক নির্জন জায়গায় বসলো তিনজন। ভাদুকে ডাকতে গিয়ে আসরে তাকে পেল না ডগর। একা ফিরলো সে। পার্টির খবর ডগর, জিয়নকে শোনালো কিশোর। মন দিয়ে কিশোরের কথা শুনে জিয়ন বলল, কমোরেট বরুণ চ'ইলে যেতে খুব চোট পেঁইচি আমরা। তবে

পিছা হঠবো না। পরব চুকলেই শুরু ক'ইরে দেবো পার্টির কাজ।

ডগর শোনালো সবচেয়ে আনন্দের খবর। দশ দিন আগে শাকবাড়ির দুই কমরেডকে নিয়ে বাগজোরায় এসেছিল রবি হাঁসদা। পার্টির গণফৌজে লোক জোটাতে এলাকা ঢুঁড়ছে সে। রবি চলে যাবার এক ঘণ্টা পরেই গ্রাম ঘিরে ফেলেছিল মিলিটারি, পুলিশ। ধরে নিয়ে গেছে অনেককে।

বাগজোরায় আলোচনা শেষ করে বুধনকে নিয়ে তাঁতিপাড়ায় রওনা হলো কিশোর। যাবার আগে ডগরকে বলল, ভাদুকে তাঁতলুই পাঠিয়ে দিবি। আজই যেন চলে যায় সে।

প্রায় শেষ দুপুরে তাঁতিপাড়ায় ঢুকলো কিশোর, বুধন।

সাতান্ন

রাস্তার ওপর সজাগ চোখে রেখে দাওয়ায় বসেছিল দিবাকর। সমবয়সী এক বৌয়ের সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করছে মাধু। আজ সকালে শিউড়ি থেকে এ বৌটি এসেছে। কার বৌ, কেন এলো, দিবাকর জানে না। ভোলার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছে মেয়েটি। শান্ত, গোবেচারা মেয়ে। ইচ্ছে থাকলেও মেয়েটির পরিচয় মাধুকে জিজ্ঞেস করেনি দিবাকর। মেয়েটির দু'হাত ধরে তাকে যেভাবে মাধু ঘরে নিয়ে গেল, দিবাকরের মনে হলো, মেয়েটির আসার খবর আগেভাগে মাধু জানতো। একটু বেলায় দিবাকরকে মাধু বলেছিল, এ আমাদের এক বৌদি। তাঁতিপাড়ায় বেড়াতে এসেছে। আজই চলে যাবে।

কচি মেয়েটা কেন হঠাৎ তাঁতিপাড়ায় বেড়াতে এলো, এখান থেকে কোথায় যাবে, এমন সব প্রশ্ন জেগেছে দিবাকরের মনে। মুখে কিছু বলেনি সে। তবে মেয়েটা ভালো। অল্প সময়ে মাধুর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। গায়ে গায়ে লেগে আছে দু'জনে। গল্প করছে। রান্নায় সাহায্য করেছে মাধুকে। স্বাধীন ঘরে ফিরলে এরকম এক ফুটফুটে বৌ ঘরের তুলবে দিবাকর। যমুনা মারা যাবার পরে একদম একা হয়ে গেছে সে। কাজে মন নেই ! সংসারের আকর্ষণও উবে গেছে। স্বাধীনের বৌ এলে মাধুও একজন সঙ্গী পাবে। সংসারে তখন হয়তো আবার ফিরে আসবে আনন্দ। শেষবার এ আনন্দটুকু দেখে মরতে রাজি আছে দিবাকর। চিরকালের মতো চোখ বোজার আগে স্বাধীনকে বলে যাবে, তোর দুঃখী দিদিকে দেখিস। দূর ছাই করিস না তাকে।

দিবাকর জানে, সেরকম ছেলে নয় স্বাধীন। বৌ পেলে দিদির অনাদর করবে না। দেশ-গাঁয়ের মানুষের ভালো করতে যে ছেলে জেল খাটে, মায়ের পেটের বোনকে ন্যায্য সম্মান সে নিশ্চয় দেবে। এ গাঁয়ে স্বাধীনের যারা বন্ধু, তারাও একথা বারবার দিবাকরকে শুনিয়েছে।

ঘরে চাপা গলায় বৌটির সঙ্গে কথা বলছে মাধু। তাঁতের ঠকাচ চং ঠকাচ চং শব্দ শোনা যাচ্ছে। সামনে ধুধু ফাঁকা মাঠ। বাঁয়ে পরাশিয়া, ডাইনে গুরুলগাছি গ্রাম। অনেক দূরে আকাশের গায়ে লেগে আছে রাজনগরের সীমানা। খাঁকি উর্দি পরে এ চত্বরের মাঠ, ঘাট ত্রিশ বছর চষে ফেলেছে দিবাকর। পুরোনো দিনগুলোর কথা ভেবে উদাস হলো সে। দুপুরে এসে ভোলা একবার বৌটার সঙ্গে দেখা করেছিল। যাবার আগে বলেছিল, সন্ধ্যের পর বৌদিকে নিয়ে যাবো।

বৌ যাবে কুথা ?

মুখ ফসকে দিবাকর প্রশ্নটা করে ফেলতে তরণী পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে

দেখিয়েছিল ভোলা। মুখে কিছু বলে নি। ইঙ্গিত বুঝে অবাক হলেও বাড়তি প্রশ্ন করতে ভরসা পায়নি দিবাকর। তবে মন খারাপ হয়েছিল তার। কয়েকঘণ্টায় কচি মেয়েটার ওপর মায়া পড়ে গেছে তার। দু'চারদিন এখানে থাকতেই পারতো। কিন্তু কারও বৌকে আটকাতে পারে না দিবাকর। সামর্থ্য নেই তার। সাহসেরও অভাব। হঠাৎ মনে পড়লো যমুনাকে। যমুনা থাকলে এ বৌটাকে আজই যেতে দিত না। পোষা, কুকুর বেড়াল চোখের আড়ালে গেলে অস্থির হতো সে। যমুনা নেই। সে আর ফিরবে না। স্বাধীন কি ফিরবে? প্রশ্নটা ভেবে ব্যাকুল হলো দিবাকর। আপন মনে বিড় বিড় করল, নিশ্চয় ফিরবে।

ফাঁকা মাঠ, গাছপালার দিকে তাকিয়ে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দিবাকরের দৃষ্টি। তার দুচোখ যেন ভিজে উঠলো। ছ'মাস আগেও এ ঘরে ছিল যমুনা। তাঁতিপাড়ায় তখন সোরগোল, উত্তেজনা। রোজ কিছু একটা ঘটছে। মাত্র কয়েক মাসে ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব। গাছে গাছে, স্কুলবাড়ির ছাতে যে লালপতাকাগুলো উড়তো, পুলিশ নামিয়ে দিয়েছে। পতাকা নামাবার কাজে গোড়ায় দিবাকরও সাহায্য করেছিল। কথাটা মনে পড়তে লজ্জা পেল সে। দেওয়াল লিখনে আলকাতরা লাগানো হয়েছে। লোক ভাড়া করে দেওয়ালে দেওয়ালে আলকাতরা বুলিয়েছে পুলিশ। দিবাকরকে হাত লাগাতে বলেছিল থানার বড়োবাবু। শরীর খারাপের ছুতোয় ঘর ছেড়ে বেরোয়নি সে। গত মাসে এক সকালে মারা গেল অবিনাশ তাঁতি। মরার আগে বড়ো ছেলের হাতের জল পেতে হা পিত্যেশ করেছিল সে। বেচারি অবিনাশ। মোতি যে পৃথিবীতে নেই, মরার মুহূর্তেও জানতে দেওয়া হয়নি তাকে। ময়ূরাক্ষীর চড়ায়, শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল অবিনাশকে। গাঁয়ের অনেকের সঙ্গে দিবাকরও শ্মশানে গিয়েছিল।

উত্তরের রাস্তায় পটলের সঙ্গে ইন্দুকে যেতে দেখে দিবাকরের খেয়াল হলো, সুধীর কুণ্ডুর বাড়িতে আজ এক গোপন সভা আছে। পার্টির এক বড়ো নেতা সভায় থাকবে। সভার খবর দিবাকরকে জানিয়ে চাপা গলায় ভোলা বলেছিল, দিবাকরকাকা, দাওয়ায় বসে রাস্তার ওপর নজর রেখো। বিপদ আপদ টের পেলে হাঁক দিও।

বিশেষ আর বলতে হয়নি ভোলাকে। রাজি হয়ে গিয়েছিল দিবাকর। ঝিমুনিতে বুজে আসছে দিবাকরের চোখ। পাঁচ, সাত মিনিট অন্তর গা ঝাড়া দিয়ে সজাগ করছে নিজেকে। কঠিন দায়িত্ব চাপিয়েছে ভোলা। দায়িত্ব পালনে পিছপা নয় দিবাকর। বুড়ো হাড়ে আজও ভেল্কি দেখাতে পারে সে।

আটান্ন

তাঁতিপাড়ায় পৌঁছোতে কিশোর দেরি করেছিল। সভা শেষ করতে তাই সন্ধ্যে হয়ে গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারপাশ। এখনই না বেরোলে তাঁতলুই পৌঁছোতে মাঝরাত হবে। কিশোর জানে সে না পৌঁছোনো পর্যন্ত তাঁতলুই-এর কুলিতে ভাদু বসে থাকবে। তাঁতলুই পৌঁছে, পুইশার ঘরে প্রথমে রেবাকে তুলে দিতে হবে। অন্ধকার, অচেনা রাস্তায় হাঁটতে রেবার অসুবিধে হবে। ফলে তাঁতলুই পৌঁছোতে ডবল সময় লাগবে। রাস্তায় বিপদও অনেক। যত্রতত্র ক্যাম্প করেছে সি. আর. পি, পুলিশ। অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘুরছে প্রতিরোধবাহিণী। বুধনকে আগেই তাঁতলুই রওনা করিয়ে দিয়েছে কিশোর। রেবা, মানবকে নিয়ে তাঁতিপাড়ার বাইরে এলো সে। মাঠ পেরিয়ে গুরুলগাছি পর্যন্ত সঙ্গী হতে চেয়েছিল ভোলা। তাকে আসতে দেয়নি কিশোর। তাঁতিপাড়ার সীমানা পর্যন্ত কিশোরের পাশে ছিল মাধব। চাকরি ছাড়তে তাকে বারণ করে কিশোর বলল, পুলিশের মধ্যেও আমাদের লোক থাকা দরকার। ভবিষ্যতে তোমাকে অনেক কাজে লাগবে। নরহরি যোগাযোগ রাখবে তোমার সঙ্গে। কালই কাজে যাবে তুমি।

হতাশ হলেও কিশোরের পরামর্শ মাধব মেনে নিয়েছে। গুরুলগাছির দুই পার্টিকর্মী সভায় ছিল আজ। কাজের ধরণ পার্টি বদলেছে শুনে খুশি হয়েছে তারা। এবড়ো, খেবড়ো মেঠো রাস্তায় হাঁটতে রেবার অসুবিধে হচ্ছে। গুরুলগাছি যেতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ আজ দেড়, দু ঘণ্টা লেগে যাবে। রেবার হাত ধরে সতর্ক পায়ে হাঁটছে কিশোর। আবছা অন্ধকার রাস্তা। আন্দাজে রেবা পা ফেলছে। আজ সভা করে কিশোর বেজায় খুশি। অনেকদিন পরে এমন জমজমাট বৈঠক হলো। বাবলু, তার অনুগামীরা সভায় আসেনি। কিশোরের হাতে পাঠানো সূর্যদার চিঠিকে আমল দেয়নি তারা। ভোলা, তারক, পটলকে বাবলু বলেছে, ওটা জাল চিঠি। পার্টি কমিটির সূত্রে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাজের ধারা বদলাবে না সে।

বাবলুর মতামত শুনে কোনো মন্তব্য করেনি কিশোর। মানব রিজিওনাল কমিটির সদস্য। সভায় সে আসবে জেনেও নিজের জেদ ছাড়েনি বাবলু। তবে বাবলু না এলেও সফল হয়েছে বৈঠক। তরণীপাহাড়ের সশস্ত্র সংগ্রামের রিপোর্ট মেনে নিয়েছে সবাই। সারাদিনের ক্লান্তি উদ্বেগের পর এখন হালকা বোধ করছে কিশোর। তাঁতলুই পৌঁছে কাল থেকে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করবে সে। মেয়েদের মধ্যে রেবার কাজ করার একটা ফর্দ কিশোর ভেবে রেখেছে। সভা-সমিতির বদলে কথায়, গল্পে আদিবাসী মেয়েদের সচেতন করবে রেবা। আদিবাসী সমাজে গুরুত্বপূর্ণ

জায়গা জুড়ে আছে মেয়েরা। পুরুষদের ওপর গভীর প্রভাব তাদের। মেয়েরা সচেতন হলে পার্টির প্রভাব শেকড়ে পেঁীছে যাবে। মেয়েদের চেতনার মান বাড়ানো তাই জরুরি কাজ।

গুরুলগাছি ঢোকার আগে রিলিফের দীঘির পাশে পেঁীছোলো তিনজন। সামনে উঁচু বাঁধ। খোশাগল্পে রেবাকে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মানব।

সুধীর কুণ্ডুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেরকম অন্ধকার লাগছিল, ফাঁকা মাঠের মধ্যে তেমন লাগছে না। বরং লালমাটিতে মিশে থাকা হালকা আলোয় চারপাশ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিশোরের হাত ছেড়ে দিয়েছে রেবা। বকের শেষ ঝাঁক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। দূরে দিগন্তের গায়ে কাজলের ফিকে দাগের মতো দেখা যাচ্ছে তরণী-পাহাড়। অনুপডাক্তারের খোঁজে রাজনগর হাসপাতালে যে হারুদা এসেছিল, মানব জোগাড় করেছে এ খবর। তারপর হারুদা কোথায় গেছে, নার্স অনসূয়াও বলতে পারেনি। কোথায় যেতে পারে হারুদা? প্রশ্নটা মনে খোঁচালেও আর কথা বলেনি কিশোর। সে ভেবেছে, কলকাতায় হয়তো ফিরে গেছে হারুদা। কিন্তু বাড়িতে যায়নি। কলকাতা ছাড়ার দিনেও হারুদার বাড়িতে খোঁজ করেছিল কিশোর। হারুদাকে পায়নি। হারুদার সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিল মানব। ব্যাখ্যাটা কিশোরের পছন্দ না হলেও এখন মনে হচ্ছে, এই সুযোগে দুমকা, দেওঘর বেড়িয়ে কলকাতায় ফিরবে হারুদা। বেড়াবার এমন মওকা কলকাতাবাসী হারুদা হাতছাড়া করবে না।

বাঁওড়ের বাঁধের পাশ দিয়ে তিনজন হাঁটছে। মানব প্রশ্ন করল, কষ্ট হচ্ছে রেবাদি।

নাহ্, রেবা বলল,।

সামনে বুনোকুলের ঝোপ অন্ধকারে বিশাল কচ্ছপের মতো দেখাচ্ছে। হোঁচট খেল রেবা। তার হাত চেপে ধরলো কিশোর। গুরুলগাছি প্রায় এসে গেছে। কচি বাচ্চা নিয়ে কেমন আছে পুঁইশা? তাকে দেখাশোনা করছে গাঁয়ের মানুষ। তার ঘরে রাতে থাকছে আন্না। তবু রবির জন্যে পুঁইশার ছটফটানি কমেনি। বরং বাচ্চা হবার পর স্বামীকে দেখার ইচ্ছে আরও তীব্র হয়েছে।

রবির আচরণও অন্যায় ঠেকছে কিশোরের কাছে। তাঁতলুইতে পুঁইশার সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত ছিল তার। তাঁতলুই-এর আশপাশের গ্রামে যার হরবকত যাতায়াত, নিজের গ্রামে স্ত্রীর সঙ্গে কেন দেখা করবে না সে? রবির সঙ্গে দেখা হলে তাকে সমালোচনা করবে কিশোর। রবির এই গাফিলতিতে যে পার্টির সুনাম নষ্ট হচ্ছে, জানিয়ে দেবে। পার্টি তো ভবঘুরে, দায়িত্বহীন লোকদের আড্ডা নয়, সবচেয়ে সাচ্চা মানুষদের সংগঠন। কিন্তু কেন এরকম করছে রবি? রহস্যটা কি? বাঘা, নির্মলাই বা কোথায় উধাও হলো? অজিত, লালমুনি? তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কিশোরের ভাবনাচিন্তা।

চৌকোনা, বিশাল দীঘির পূর্বদিকে চলে গেছে তিনজন। পেছনে সাতফুট উঁচু মাটির বাঁধ। অন্ধকারে চারপাশ লেপামোছা। একটানা এতো রাস্তা হাঁটার অভ্যেস

রেবার নেই। সে হাঁপাচ্ছে। তাঁতলুই আরও দু'মাইল। গুরুলগাছিতে পাঁচ, সাত মিনিট বিশ্রাম পাবে রেবা। তারপর ছোট এক মাঠ পেরিয়ে শালবন। শালবনে একবার ঢুকে গেলে আর ভয় নেই। নিরাপদে তাঁতলুই পেঁাছে যাওয়া যাবে। অন্ধকার শালবনে ঢোকার সাহস পাবে না পুলিশ। রেবার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় কিশোর প্রশ্ন করল, ভয় লাগছে ?

জবাব না দিয়ে কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরলো রেবা। বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গেছে মানব। তাকে দেখা না গেলেও শোনা যাচ্ছে তার পায়ের শব্দ। রেবার হাত ধরে সাবধানে বাঁধের ওপর উঠছে কিশোর। বাঁধের রাস্তায় হাঁটলে গুরুলগাছির দূরত্ব এক, দেড় ফার্লং কম হয়। বাঁধে চড়ার ঝামেলা সত্ত্বেও তাই এ রাস্তা ধরেছে কিশোর। কিশোরের হাত ধরে টিপে টিপে পা ফেলছে রেবা। একবার পিছলে গেলেই গড়িয়ে পড়বে মাঠে। বাঁধের মাথায় মানব। হনহন করে হাঁটছে সে। রেবাকে নিয়ে কিশোর বাঁধের ওপর উঠতেই হঠাৎ মাথার ওপর দপ করে জ্বলে উঠলো আলো। একটার পর একটা আলো মাটি ছেড়ে মাথার ওপর ভেসে উঠছে। আলোর ছটায় মাঝদুপুরের মতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারপাশ। মুহূর্তে কিশোর বুঝে গেল বাঁধের আড়ালে ওৎ পেতে আছে পুলিশ, মিলিটারি। বাইরে থেকে বুঝতে না পেরে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছে সে। বিহ্বল কিশোর কিছু করার আগেই তাকে ঘিরে ধরলো সাদা পোশাক চারজন পুলিশ। রিভলভর উঁচিয়ে একজন বলল, হ্যান্ডস্ আপ্। নড়লেই গুলি করব।

হাউই-এর প্রখর আলোতে ছুটতে শুরু করেছে মানব। গুলির শব্দ শুনে তাকিয়ে কিশোর দেখলো, মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে মানব। তাকে তাক করে ছুটে গেল আরও একঝাঁক বুলেট্। চোখ বুজলো কিশোর। চোখ খুলে কিশোর দেখলো, একটার পর একটা জ্বলন্ত হাউই নেমে আসছে। কিশোরের হাত ধরে থরথর করে রেবা কাঁপছে। রেবার পিঠে হাত রাখলো কিশোর। তখনই তার ঘাড়ে বন্দুকের কুঁদোর সপাট ঘা মারলো কেউ। আর্ত শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো কিশোর। জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে কিশোর শুনলো কাছে কোথাও কোকিল ডাকছে। পরমুহূর্তে মনে হলো রেবা কাঁদছে।

উনষাট

রাজনগর থানায় কিশোরকে যখন আনা হলো, তখন মাঝরাত। পুলিশভ্যানেই জ্ঞান ফিরেছিল তার। ভ্যানের চাতালে শুয়ে সে দেখলো তাকে ঘিরে একঝাঁক পুলিশ। ভ্যানে সে একা। রেবা, মানব কেউ নেই।

থানার বড়বাবুর ঘরে একটা চেয়ারে বসানো হলো তাকে। ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্‌ নেই। হ্যাজাক জ্বলছে। বড়োবাবুর দু'পাশে দুটো চেয়ারে বসে আছে জাঁদরেল দুই অফিসার। যন্ত্রণায় কিশোরের ঘাড় থেকে কোমর ছিঁড়ে যাচ্ছে। একপলক কিশোরকে দেখে সঙ্গী দুই অফিসারকে বড়োবাবু বলল, এ হলো কিশোর চক্রবর্তী। এলাকার নাম্বার ওয়ান্‌।

ঘাড়, পিঠের যন্ত্রণার সঙ্গে চোখে আবছা দেখছে কিশোর। ঘোলাটে মাথা। কী ঘটেছে, ঠিক বুঝতে পারছে না। টেবিলের উল্টোদিকে ছেঁড়াছেঁড়া তিনটে মুখ। হ্যাজাকের আলোয় হঠাৎ সে দেখলো টেবিলের ওপর একটা চেনা বাক্স। চোখের জমি, মনি বড়ো হয়ে গেল তার। বাক্সটা সে চিনেছে। অজিতের হোমিওপ্যাথি ওষুধের রঙওঠা বাক্স। এখানে এ বাক্স কী করে এলো?

চিনতে পারছেন বাক্সটা?

তিনজনের কেউ প্রশ্ন করল। কথা বলতে পারছে না কিশোর।

আরও অনেক কিছু দেখবেন।

কথাটা যে বলল, চেষ্টা করেও তার মুখ দেখতে পেল না কিশোর। আরও আধঘণ্টা পরে হাতে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি বেঁধে কিশোরকে লক আপে পোরা হলো। অন্ধকার হাজত। পুরো অন্ধকার নয়। লকআপের গরাদের বাইরে একটা টেমি জ্বলছে। মিটমিটে আলোয় লকআপে ভুতুড়ে পরিবেশ। বাতাসে পচা গন্ধ।

গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাকের এক অফিসার বলল, আপনার স্ত্রী রেবা, বন্ধু মানব আমাদের হেপাজতেই আছে।

লোকটার সব কথা শুনতে পাচ্ছে না কিশোর। দুহাতে লোহার গরাদ ধরে লোকটা প্রশ্ন করল, সূর্যবাবুর কী খবর?

ফাটকের বাতাসে পচা গন্ধে কিশোরের গা ঘুলোচ্ছে। অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিল না সে। তার জবাব শোনার আগ্রহ লোকটার নেই। সে বলল, আমাদের কাছে যা খবর, তাতে আপনাদের নেতা সূর্য খুব বেশি দেড়, দু'মাস বাঁচবে। ধরা পড়লে হয়তো আর একটু বাড়তো তার পরমায়ু। তবে এসব মানুষ যতো তাড়াতাড়ি মরে, ততো মঙ্গল।

এক মুহূর্ত থেমে লোকটা বলল, সূর্য মরে যাবে বলেই বেঁচে গেলেন আপনি। তা না হলে অজিতের দশা হতো আপনার। বেচারি!

জিভের ডগায় চুকচুক আওয়াজ করে লোকটা বলল, সূর্যের খবর পাবার পরে অজিত ধরা পড়লে। যাক, যা হবার হয়েছে।

হেঁয়ালির মতো লোকটার কথা শুনে অসাড় হয়ে যাচ্ছে কিশোর। তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে লোকটা বলল, আমাদের ধারণা ছিল আপনাকে ধরা অসম্ভব। এখন বুঝছি অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই। দিন কয় আগে বুঝলে অজিত।

হঠাৎ চুপ করে গেল লোকটা। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জাঁদরেল এক অফিসার। অফিসারের পেছনে হ্যাজাক হাতে এক সিপাই। আলোয় ঝলমল করছে ফাটক, লোহার গরাদ, চাতাল। জাঁদরেল অফিসার প্রশ্ন করল, অজিত যে সাঁওতাল মেয়েটাকে গর্ভবতী করেছে, কী যেন নাম, হ্যাঁ, লালমুনি, সে কোথায় ?

কিশোর চুপ। অফিসার বলল, লালমুনি নয়, তার পেটের ভ্রূণটাকে বেশি দরকার। পৃথিবীর আলো দেখার আগে সে ভ্রূণকে আমরা নিকেশ করতে চাই। এটা করতেই হবে। খুব জরুরি।

এক মুহূর্ত কিশোরকে দেখে অফিসার বলল, কাল দুপুরে আপনার সঙ্গে বসবো।

হ্যাজাকের সঙ্গে মিলিয়ে গেল দুই অফিসার। গরাদের বাইরে টেমি জ্বলছে। ম্লান আলো। তীব্র হয়েছে পচা গন্ধ। দু'হাতে লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। চিন চিন ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে ঘাড়, পিঠ, কোমরে। টেমির আলোয় চোখ সয়ে যেতে কিশোর স্পষ্ট দেখছে লকআপ। এখন শুতে চায় সে। তার মনে হচ্ছে, কাদায় তৈরি দু'পা গলে যাচ্ছে। গরাদ ছেড়ে ভেতরে এলো সে। বাঁ পাশে চটে মোড়া কি একটা পড়ে আছে। দুর্গন্ধের উৎস, কিশোরের মনে হলো, চটের এই পুঁটলি। পুঁটলির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। কটু, কদর্য গন্ধ। সামান্য ঝুঁকে চটের ঢাকা সরিয়ে ডুকরে উঠলো সে। চটে মোড়া অজিতের মুণ্ডু। চোখ, নাক, কান গলতে শুরু করেছে। তবু অজিতকে চেনা যায়।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কিশোর গোঙাচ্ছে। গরাদের বাইরে থেকে সাদা পোশাক অফিসার বলল, মুণ্ডুটা তাজা রাখার জন্যে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনি। ব্যাকওয়ার্ড দেশ। কী করা যাবে ? তবে গত পাঁচদিনে যারা এ লকআপে থেকে গেছে, তাদের কেউ মুণ্ডুটা চিনতে ভুল করেনি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে কিশোর। অন্ধকার পৃথিবী নিস্তব্ধ অথচ দৃশ্যমান। সে দেখছে ঢেউ খেলানো লালমাটি, শালবন, সিধনদী। অদৃশ্য ছবির জগতে তলিয়ে গেল সে।

প্রায় মাঝরাতে লকআপের লোহার গরাদের সামনে দাঁড়ালো কিশোর। দূর থেকে ভেসে আসছে মাদলের শব্দ। অনন্তকাল যেন বেজে চলেছে হাজার হাজার মাদল। দু'চোখ বুজে মাদলের ধ্বনির সঙ্গে কিশোর শুনলো এক নবজাত শিশুর কান্না। সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। চোখ খুলে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, অজিত, তোর সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখবো আমি। নিশ্চয় বাঁচাবো।